* ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র *

৪৫শ বর্ষ] ভাদ্র—১৩৭১ [৫ম সংখ্যা

বিদ্যার জাহাজ

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

বল্ দেখি ভুতো, কোথা হনলুলু ?
কোথা বল্ কটোপ্যাক্সি ?
কল্‌কাতা আর কোয়েম্বাটুরে
কতো কোটি আছে ট্যাক্সি ?
কতো দিন লাগে যেতে জর্ডন,—
মেক্সিকো থেকে মক্কা ?
ইটালিতে কেউ খায় কি পটোল,—
লিবিয়ায় আলু-ছক্কা ?

গিয়ে ঠন্‌ঠনে দেখেছিস গুণে
কতোগুলো আছে লণ্ঠন ?
হন্‌টন্‌ ক'রে দুপুরের রোদে
মাথা কেন করে টন্‌টন্‌ ?
বম্বেতে কেউ দেয় সম্বারা
কাঁচা তেঁতুলের অম্বল ?
কেউ এতো ধনী—কেন কারো নেই
কানাকড়িটিও সম্বল ?
কোন্‌টা কতোটা তেতো বল্‌ দেখি—
কুইনিন্‌ আর উচ্ছে ?
ময়ূর কেন সে ডাকে মেঘ দেখে
উচ্চে তুলিয়া পুচ্ছে ?
গুরু নানকের দাড়ি কতো বড়ো,
নিজামের গাড়ি কয়টা ?
পাঁচটার সাথে একটা মিলালে
কেন হয় বল্‌ ছয়টা ?
আগ্রার তাজ কয় হাত উঁচু,
কতোটা লম্বা দিল্লী ?
বল্‌ চট্‌ করে কতো ক্রোশ হবে
চিল্কার থেকে চিল্লি ?
বল্‌ তো আকাশে কতকগুলো তারা ?—
বুঝবো এবার বিদ্যে !
এটা যদি তুই না জানিস গাধা,
পড়াশুনা তোর মিথ্যে !

অনেক দূরের দেশে

শ্রীসত্যেন সেন

বাতাস ছুটে যাচ্ছিল বোঁ বোঁ বোঁ, শন্ শন্ শন্ !

খুকু বলল, বাতাস, ও বাতাস, দাঁড়াও, দাঁড়াও—আমি তোমার সঙ্গে যাব। বাতাস বলল, উঁহুঃ, আমার একটুও দাঁড়াবার সময় নেই, আমার কত কাজ !

খুকু জিগ্যেস্ করল, কি তোমার কাজ বল না ? বাতাস বলল, কি কাজ ? কাজের কি আর অন্ত আছে ? ওই যে মেঘগুলো দেখছ না, শাদা শাদা মেঘগুলো ? আমি ওদের বয়ে নিয়ে যাব অনেক দূরে, অনেক দূরের দেশে।

খুকু উপর দিকে তাকিয়ে দেখল, সত্যিই তো, মেঘের পর মেঘ, কত মেঘ ! সে আবার জিগ্যেস করল, কেন, ওদের নিয়ে যাবে কেন ? ওরা কি করবে ? কোন দূরের দেশে ?

বাতাস বলল, অনেক দূরের দেশে, যে দেশে বিষ্টি হয় না, ঘাস গজায় না, ফসল ফলে না, ফুল ফোটে না, ফল ধরে না—যে দেশে আয় বৃষ্টি, আয় বিষ্টি বলে সবাই বিষ্টিকে ডাকে, ওরা যাবে সেই দেশে। সে দেশের ছেলেমেয়েরা ওদের দেখে হাততালি দিয়ে নাচবে আর গাইবে :

আয় বিষ্টি ঝেঁপে
ধান দেব মেপে।

খুকু হাততালি দিয়ে বলে উঠল, বারে-বা, ভারী মজা তো। ও বাতাস আমায় তোমার সঙ্গে করে নিয়ে যাও।

এই বলে সে দু'হাত দিয়ে বাতাসের আঁচল চেপে ধরল। বাতাস বলল, খুকু, আমায় ছাড়ো ছাড়ো। আমি তোমায় কেমন করে নিয়ে যাব ? তুমি চলে গেলে তোমার মা কাঁদবে যে।

খুকু বলল, না মা কাঁদবে না। আমি তো আবার ফিরে আসব। ও বাতাস, আমায় নিয়ে যাও, আমি সারা পথ তোমার সঙ্গে খেলতে খেলতে যাব।

বাতাস এবার আর 'না' বলতে পারল না। এমন একটা সুন্দর খুকু আর তো দেখেনি কেউ। সবাই তার সঙ্গে খেলতে চায়। বাতাস বলল, সত্যি তুমি যাবে ?

হুঁ, যাবই তো, খুকু নেচে উঠল।

তবে চোখ বোজো !

খুকু চোখ বুজল। বাতাস সুর করে মন্তর পড়তে লাগল :

আল্‌ঘুরানি তাল্‌ঘুরানি
আয়রে পাখা ফুরফুরানি।
খুকুর গায়ে লাগ্‌ লাগ্‌
গায়ের বোঝা খ'সে যাক।

ও খুকু, চোখ মেলো, চোখ মেলো। চোখ মেলে একবার দেখোই না।

খুকু চোখ মেলে দেখে, ওমা, সত্যিই তো সে খুকু তো আর সে খুকু নেই। পাখীদের মত তার দু'পাশে দুটো পাখা গজিয়ে গেছে। আর কেমন হাল্‌কা হয়ে গেছে সে। সে ভাবল, একটু নেড়ে-চেড়ে দেখি পাখাটা—দেখি তো কি হয়। ও মা, যেই না একটু নেড়েছে অমনি সঙ্গে সঙ্গেই সে মাটি ছেড়ে উপরে উঠতে লাগল। আরও উপরে, আরও উপরে, শেষে তাদের সব চেয়ে উঁচু ঘরটা, সেও তার পায়ের তলায় পড়ে রইল।

এমন সময় খুকুর মা আর বাবা ওকে দেখতে পেয়ে বলল, ওমা এ কি, ওমা এ কি, ও খুকু তুই কোথায় যাস্?

খুকু হাসতে হাসতে বলল, অনেক দূরের দেশে।

ওরা তখন কেঁদে কেঁদে ডাকতে লাগল, ও খুকু যাসনে, ফিরে আয় ফিরে আয়। তোকে ছেড়ে আমরা কেমন করে থাকব?

খুকু বলল :

ও মা গো, ও বাবা গো
কাঁদছো কেন ছিঃ!
আজকে যাব, কাল আসব
কান্নাকাটির—কি?

যে ঝোপড়া আম গাছটার তলায় বসে খুকু পুতুল খেলত, সে খুকুকে ডেকে বলল, সোনা খুকু, লক্ষ্মী খুকু, যেও না যেও না—তুমি চলে গেলে আমার তলায় বসে খেলবে কে?

খুকুর নাক-ভাঙা পুতুলটা এ কথা শুনে কেঁদে কেঁদে ডাকতে লাগল, যেও না, যেও না, তুমি না থাকলে আমাকে নিয়ে খেলবে কে?

খুকুর বড় আদরের বেড়াল ছানাটা আকাশের দিকে মুখ তুলে ডাকতে লাগল :

ম্যাও ম্যাও ম্যাও

কিন্তু তখন বাতাস ছুটে চলেছে বন্ বন্ বন্, শোঁ শোঁ শোঁ। কারু কোন কথা তার কানে গেল না। বাতাসের উপর ভর দিয়ে খুকু উড়ে চলল। খুকু যে পথ দিয়ে চলেছে, তার এদিকে ওদিকে কত ছোট ছোট পাখী আকাশের বুকে ডিগ্‌বাজী খাচ্ছে আর খেলা করছে। তারা ডেকে বলল, ও খুকু, এসো এসো, আমরা তোমার সঙ্গে খেলা করব। খুকু বলল, না ভাই অন্য সময় আসব। আমার যে এখন সময় নেই। আমায় অনেক দূরের দেশে যেতে হবে।

ওরা জানতে চাইল, সে দেশ কোন্ দেশ ভাই?

খুকু বলল, সে অনেক দূরের দেশ। সে দেশে বিষ্টি হয় না, ঘাস গজায় না, ফসল ফলে না, ফুল ফোটে না, ফল ধরে না। আমরা সেই দেশে গিয়ে ঝুপ-ঝুপনি বিষ্টি নামাব। আর তখন সেই মরা মাটিতে ঘাস গজাবে, ফসল ফলবে, ফুল ফুটবে আর ফল ধরবে। সে বড় মজার খেলা। পাখী, ও পাখী, তোমরা আমার সঙ্গে যাবে?

ওরা বলল, না ভাই, আমরা ছোট পাখী, আমাদের ছোট্ট পাখা। আমরা কি অত দূর যেতে পারি?

পাখীরা সব পিছে পড়ে রইল। বাতাস ছুটে চলল বন্ বন্ বন্, শোঁ শোঁ শোঁ। আর সেই সঙ্গে খুকু উড়ে চলল। মাথার উপর শাদা শাদা মেঘগুলো বাগানের উপর চেপে বসে ছুটে চলেছে। আর নীচে, অনেক নীচে, মাটি জল, গাছপালা কেবলই পিছন দিকে সরে সরে যাচ্ছে। খুকু দেখল, মাঠে গরু চরছে, পুকুরের মধ্যে হাঁসগুলি শুধু ডুবছে আর উঠছে, মেয়েরা ঘাটে বসে বাসন মাজছে, বাড়ীর উঠোনে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খেলছে, কিন্তু কিছুই স্থির হয়ে থাকে না, কেবলই সরে সরে যায়!

শেষে চলতে চলতে চলতে চলতে কত দিন আর কত রাত্তির পার হয়ে খুকু এসে পৌছল সই অনেক দূরের দেশে।

খুকু জিগ্যেস করল, বাতাস ভাই, এবার বল এদেশের নাম কি? এ দেশের কি আর কোন নাম নেই।

বাতাস বলল, আছে বই কি। এ দেশের নাম রাজশাহী।

এঁ্যা, রাজশাহী! এ নাম যে খুকুর বড় চেনা। কতদিন এই নাম শুনেছে! কিন্তু কিছুতেই না, কিছুতেই না, কিছুতেই সে মনে করতে পারল না। কিন্তু বাতাস আর তাকে বেশী কথা ভাবতে দিল না। বলল, "খুকু দেখো দেখো, ওই যে ছেলেমেয়েগুলি মেঘ দেখে কি নাচানাচি করছে।

সত্যিই তো! খুকু স্পষ্ট দেখতে পেল ওরা হাততালি দিয়ে নাচছে, আর স্পষ্ট শুনতে পেল গাইছে:

ঝুপঝুপানি ঝুপঝুপানি, আয় আয় আয়।
তোর হাতে দেব সোনার কাঁকন, নূপুর দেব পায়।
উড়কি ধানের মুড়কি দেব,
বাটি ভরে পায়েস দেব,
টুপটুপানি, ঝুপঝুপানি, ঝমঝমিয়ে আয়।

উড়কি ধানের মুড়কি দেবে! শুধু তাই নয়, বাটি ভরে পায়েস দেবে! এর পর কি আর বিষ্টি না নেমে থাকতে পারে? প্রথমে ফোঁটা ফোঁটা, তারপর ঝুপঝুপিয়ে শেষে একেবারে ঝমঝমিয়ে নামল। উঃ, সে কি বিষ্টি আর কি যে মেঘের গরগরাণি!

সেই গরগরাণির শব্দে খুকু চোখ মেলে চাইল। বাইরে তখন ঝমঝমিয়ে বিষ্টি পড়ছে। মা বলল, কি রে খুকু ঘুম ভেঙ্গে গেল?

খুকু অবাক হয়ে ভাবল, তাই তো, সে কেমন করে এখানে চলে এলো? শেষে বুঝল, বাতাস তাকে ফিরিয়ে দিয়ে গিয়েছে। আহা, তার এমন সুন্দর পাখা দুটি, তাও নিয়ে চলে গেল সে বলল, মাগো মা, আমি অনেক দূরের দেশে গিয়েছিলাম, যে দেশের নাম রাজশাহী।

মা হেসে বলল, দূর বোকা, তুই তো এতক্ষণ আমার বুকেই ঘুমোচ্ছিলি। খুকু বুঝল, মা কিছু টের পায়নি। যাক্, এখন আর কোন কথা বলে দরকার নেই।

সোনার কাঠি

মহম্মদ গোলাম আম্বিয়া

মোদের মধুর পরশ দিয়ে
জাগিয়ে সবে যাব,
ইন্দ্রজালে ঘুমিয়ে থাকা
যেথায় যাকে পাব।
জ্বালিয়ে যাব জ্ঞানের বাতি
প্রাণের বেদীমূলে,
দেখবে তারা জগৎটাকে
প্রীতির আঁখি খুলে।

দৈত্যরাজের কবল থেকে
মুক্তি পাবে তারা,
দৈন্য-দুঃখ ঘুচ্‌বে তাদের
ভাঙবে পাষাণ-কারা।
তাই বলি ভাই কিশোর, তরুণ
বন্ধু আমার যত,
জাগিয়ে তোল পরশ দিয়ে
সোনার কাঠির মত।

তিনটি প্রশ্ন

শ্রীসন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

এক রাজা। রাজার মনে একদিন হঠাৎ তিনটি প্রশ্নের উদয় হ'ল। তিনি কিছুতেই প্রশ্নগুলির সদুত্তর পেলেন না। তখন তিনি চারিদিকে ঘোষণা করলেন যে, তাকে প্রশ্নগুলির ঠিক ঠিক উত্তর যে দিতে পারবে, তাকে অনেক টাকা পুরস্কার দেবেন। প্রশ্নগুলি হ'ল : প্রত্যেক কাজের উপযুক্ত সময় কখন? সবচেয়ে প্রয়োজনীয় লোক কে? সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ কি?

রাজার ঘোষণা শুনে দেশ-বিদেশ থেকে বহু পণ্ডিত লোকের আনাগোনা শুরু হ'ল রাজসভায়। যে-যার ইচ্ছামত পরামর্শ দিতে লাগলেন রাজাকে। এক একজন লোক এক একরকম উত্তর দিলেন প্রশ্নগুলির। কিন্তু কোন উত্তরই রাজার উপযুক্ত মনে হ'ল না। শেষকালে বিরক্ত হয়ে উঠলেন তিনি।

রাজ্যের প্রান্তে থাকেন এক সাধু, রাজামশাই শেষ পর্যন্ত তার কাছে প্রশ্নের উত্তর জানতে যাবেন ঠিক করলেন।

একদিন তাই লোকজন নিয়ে রাজা বেরিয়ে পড়লেন সাধুর আস্তানার উদ্দেশে।

সাধুর আশ্রমের কাছে পৌঁছে লোকজনকে অপেক্ষা করতে বলে তিনি একাকী চললেন সেখানে।

রাজা দেখলেন সাধু কোদাল দিয়ে জমি কপাচ্ছেন। মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে পড়ছেন। রাজা এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলেন : আপনার কাছে তিনটি প্রশ্নের উত্তর জানতে পারি কি?

সাধু বললেন : কি প্রশ্ন?

রাজা বললেন : প্রতি কাজের উপযুক্ত সময় কখন? সবচেয়ে প্রয়োজনীয় লোক কে? সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ কি?

সাধু প্রশ্ন শুনে কোন উত্তর দিলেন না। তিনি আবার মাটি কোপাতে আরম্ভ করলেন।

রাজা তখন কি ভেবে সাধুকে বললেন, আপনার কোদালখানা আমাকে একবার দিন। আপনার কষ্ট হচ্ছে।

সাধু তখন কোদালখানা রাজাকে দিলেন। রাজা তখন মাটি কোপাতে লাগলেন। এই ভাবে অনেকক্ষণ কেটে গেল। রাজা তখন আবার সাধুর কাছে প্রশ্ন তিনটির উত্তর জানতে চাইলেন। কিন্তু সাধু কোন উত্তর দিলেন না। আস্তে আস্তে সন্ধ্যা গড়িয়ে এল। রাজা ভয়ানক অধৈর্য হয়ে উঠলেন। তিনি তখন সাধুকে অনুনয় করতে লাগলেন উত্তর দেবার জন্য।

ঠিক সেই মুহূর্তে রাজা দেখলেন, একজন লোক দু'হাতে পেট চেপে ধরে তাঁদের দিকে দৌড়ে আসছে। পেট থেকে লোকটির ভয়ানক রক্তপাত হচ্ছে। রাজা সঙ্গে সঙ্গে লোকটার কাছে গিয়ে দেখলেন, তার দেহে প্রকাণ্ড আঘাতের চিহ্ন। রাজা তখন যত্ন করে লোকটার ক্ষতস্থান বেঁধে দিলেন নিজের পোশাক ছিঁড়ে। তারপর লোকটিকে ধরাধরি করে সাধুর কুটীরে নিয়ে গেলেন। সেখানে যত্ন করে তাকে শয্যায় শুইয়ে দিলেন।

সারাদিনের পরিশ্রমে রাজাও কম ক্লান্ত হননি। তিনিও আর জেগে থাকতে পারলেন না। ঐ ঘরেই তিনি শুয়ে পড়লেন আর পারিপার্শ্বিক সমস্ত অবস্থা ভুলে ঘুমিয়ে পড়লেন।

সকাল বেলা রাজার ঘুম ভেঙে গেলে তিনি দেখলেন, সেই আহত লোকটিও জেগে উঠেছে এবং সে রাজার দিকে তাকিয়ে আছে। লোকটি রাজাকে বললে, মহারাজ আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

রাজা বললেন, তোমাকে তো আমি চিনি না। ক্ষমা করব কি জন্যে?

লোকটি বলতে লাগল : মহারাজ আমি আপনার একজন শত্রু। আপনি আমার ভাইদের হত্যা করেছেন, তাই আপনাকে খুন করার জন্যেই কাল আমি আসছিলাম। আপনার লোকজন আমাকে দেখতে পেয়ে আঘাত করে। আমি আহত হয়ে এইখানে ছুটে চলে আসি। আর আপনিই আমাকে সেবা-শুশ্রূষা করে বাঁচিয়েছেন। আপনি আমার প্রাণ রক্ষা করেছেন। আর আপনার সঙ্গে আমার শত্রুতা নেই। আমি আজীবন আপনারই সেবা করব।

রাজা সব কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তিনি আনন্দের সঙ্গেই লোকটিকে ক্ষমা করলেন।

রাজার তখন সব কথা মনে পড়ল। তখন তিনি ঘরের বাইরে এসে দেখলেন, সেই সাধু জমিতে কাজ করছেন। রাজা তখন এগিয়ে এসে বললেন, আমার প্রশ্নের জবাবগুলি যদি দেন তো বাধিত হব।

আপনার প্রশ্নের জবাব আপনি তো পেয়ে গেছেন। সাধু বললেন।

জবাব পেয়ে গেছি? রাজা আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

হ্যাঁ। কারণ, কাল যদি আপনি আমার হয়ে মাটি না কোপাতেন, তাহলে ঐ আহত লোকটি নিশ্চয়ই আপনাকে আক্রমণ করত। সেই জন্য যে সময় আপনি মাটি কোপাচ্ছিলেন, সেই সময়টাই সবচেয়ে উপযুক্ত সময়; আমি ছিলাম উপযুক্ত লোক, আর আমার উপকার করাই ছিল আপনার গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তারপর যখন ঐ লোকটি আহত অবস্থায় ছুটে এল, আপনি তাকে সেবা করলেন; তাই সেই সময়টাই উপযুক্ত সময়, কারণ ঠিক তখনই আপনি সেবা না করলে লোকটি অবশ্যই মারা যেত, আপনার ক্ষমা লাভ করে আপনার বন্ধু হতে পারত না। সেই জন্যে সেই সবচেয়ে উপযুক্ত লোক আর তার সেবা যা আপনি করেছেন, সেইটাই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই হ'ল আপনার সব প্রশ্নের উত্তর। আশা করি এই থেকেই আপনি শিক্ষালাভ করে মানুষের কল্যাণসাধন করতে পারবেন।

রাজা আনন্দে অভিভূত হয়ে সাধুকে প্রণাম জানিয়ে ফিরে চললেন নিজের রাজ্যে।*

* টলস্টয়ের গল্পের অনুবাদ।

বর্ষাদিনের ছোট পাখী

(শিশু-নাটিকা)

শ্রীস্নুলতা কর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

(রাজ প্রাসাদের অন্দর মহল। দুপুর বেলা। সাজান খাবার ঘরে দামী আসনে রাজা খেতে সেছেন। আসনের সামনে সোনার থালা, সোনার বাটিতে নানারকম ব্যঞ্জন। সাতরাণী সাতটি পানার বাটি হাতে নিয়ে এসে রাজার সামনে রাখল।)

রাজা—"এই যে রাণীরা, এস এস। চড়ুয়ের মাংস রেঁধে এনেছ তো? শীঘ্র এস। যা খিদে পয়েছে!"

বড়রাণী—এই যে মহারাজ, মাংসের বাটিগুলি আপনার আসনের সামনে রাখলাম। আমরা াতরাণী সবাই নিজের হাতে, খুব যত্ন করে আপনার জন্যে সাত রকম করে চড়ুয়ের মাংস রেঁধেছি। ায়ে দেখুন মহারাজ। ভাল লাগে কিনা বলুন।"

রাজা (হাসতে হাসতে)—"খাব কি বড়রাণী, কি সুগন্ধই না বেরোচ্ছে, প্রত্যেকটি বাটি কে। গন্ধতেই অর্ধেক খাওয়া হয়ে গেল। আচ্ছা, তবে প্রথম বাটির মাংস আগে খাই। ঃ কি অপূর্ব স্বাদ, কি চমৎকার গন্ধ! এই মাংস তো বড়রাণী তুমি রেঁধেছ? রান্নায় তুমি ৌপদী।"

বড়রাণী (হাসতে হাসতে)—"আপনার ভাল লেগেছে শুনে খুব আনন্দ হ'ল।"

রাজা—"এবার তবে সবশেষ বাটির মাংস খাই। এই বাটির মাংস তো ছোটরাণী রেঁধেছ? াটরাণী, তোমাদের সবায়ের ছোট, দেখি ও কেমন রেঁধেছে। এই মাংস মুখে দিলাম। ও াটরাণী, এত ভাল রান্না কি করে শিখলে? মনে হচ্ছে স্বর্গে বসে অমৃত খাচ্ছি!"

ছোটরাণী (হাসতে হাসতে)—"অত বেশী প্রশংসা করে লজ্জা দেবেন না মহারাজ। চড়ুয়ের ংস যত্ন করে রেঁধেছি। আপনার খেতে ভাল লাগছে, শুনে কত আনন্দ হ'ল।"

(ঠিক এই সময় রাজার মাথার উপর শব্দ হ'ল ঝট্‌পট্ ঝট্‌পট্।)

রাজা (চম্‌কে)—"এ কি, কিসের শব্দ? যেন পাখীর ডানার ঝট্‌পট্ আওয়াজ পাচ্ছি!"

(চড়ুই পাখী খোলা জানালা দিয়ে উড়ে এসে রাজার মাথার উপর উড়তে আরম্ভ করল।)

চড়ুই পাখীর (গান)—"বোকা রাজার কাণ্ড দেখ, কোলাব্যাঙের মাংস খায়।
চড়ুই পাখী মরল বলে আনন্দেতে হাসে-গায়।"

রাজা—"এ তো দেখছি সেই চড়ুইটা। গান গেয়ে বলছে—আমি বোকা, রাণীরা কোলাব্যা মেরে রেঁধে আমাকে খাইয়েছে। বেঁচে যখন রয়েছে, নিশ্চয় ওর কথা সত্যি। (ঘেন্নায় না শিঁটকে, মুখের মাংস ফেলে দিয়ে) ওয়াক্ থুঃ থুঃ। মুখের মাংস ফেলে দি। গোলাপ জলে মুখ ধুই।

রাজা (রেগে চীৎকার)—"সেনাপতি, সেনাপতি।"

সেনাপতি (ছুটে এসে)—"মহারাজ, কি হুকুম।"

রাজা—"এখনি এই সাত রাণীর নাক কেটে দাও। এত বড় আস্পর্ধা ওদের। কোলা ব্যাঙের মাংস আমাকে খাওয়ায়। দুষ্টুদের ঠিক শাস্তি হোক।"

সেনাপতি (রাণীদের টানতে টানতে)—"চল চল সবাই। রাজা মশায়ের হুকুম তামিল করি।"

রাণীরা (কাঁদতে কাঁদতে)—"ওরে চড়াই, কি সর্বনাশ করলি আমাদের।"

(সেনাপতি রাণীদের নিয়ে চলে গেল। রাজা চলে গেলেন।)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(রাজসভা। রাজা, মন্ত্রী, সভাসদেরা রাজসভায় বসে আছেন। চড়ুই রাজসভায় ঢুকে উড়তে লাগল, গান করতে লাগল।)

চড়ুই (গান)—"দুষ্টু রাজা কাটে রাণীদের নাক।
সভার মাঝে বসে দেখায় কত জাঁক।"

প্রথম সভাসদ (দ্বিতীয় সভাসদকে)—"ও সভাসদ মশাই, চড়ুইটা কি বলছে বুঝতে পারছেন ?"

দ্বিতীয় সভাসদ (ফিস্‌ফিস্ করে)—"মহারাজ শুনতে পেলে বিপদ হবে। আস্তে আস্তে বলছি শুনুন। চড়ুইটাকে মহারাজ রাণীদের মহলে পৌঁছে দিতে বলেছিলেন, শুনেছিলেন তো ? রাণীদের হাতে চড়ুই ঠিকই পৌঁচেছিল। কিন্তু ছোটরাণীর হাত ফস্কে চড়ুই পালিয়ে গেছল। রাণীরা ভয় পেয়ে কোলাব্যাঙ রেঁধে চড়ুয়ের মাংস বলে মহারাজকে খাওয়াচ্ছিল, ঠিক এমন সময় চড়ুই সেখানে উড়ে এসে রাজাকে ঠাট্টা করতে লাগল। রাজা রেগে সাতরাণীর নাক কাটার হুকুম দিলেন।"

প্রথম সভাসদ—"এত কাণ্ড হয়ে গেছে। তাই বুঝি চড়ুই ওই সব কথা বলে গান করে

াজামশাইকে ঠাট্টা করছে। চড়ুয়ের গান শুনে রাজামশায়ের মুখ রাগে লাল হয়ে উঠল, সিংহাসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন দেখেছেন।"

রাজা (রেগে)—"এত বড় আস্পর্ধা ক্ষুদে পাখী তোর। রাজসভার মাঝখানে এসে দেশের াজাকে বোকা বলে ঠাট্টা করছিস। মন্ত্রী, এখনি সিপাই-সান্ত্রীদের হুকুম দাও দুষ্টু চড়াইটাকে ধরে ানুক।"

মন্ত্রী (চীৎকার)—"সিপাই-সান্ত্রীরা ছুটে যাও। চড়ুইটাকে ধরে আন।"

প্রথম সভাসদ (দ্বিতীয় সভাসদকে)—"চড়ুইটা রাজামশায়ের রাগ দেখে রাজসভা ছেড়ে ইরের মাঠে পালাল, দেখেছেন।"

সিপাই-সান্ত্রীরা—"ধর্ ধর্, ছোট ছোট সবাই। ধর্ ধর্ চড়ুইকে। চড়ুইটা সামনের মাঠে ড় গেছে।" (সিপাই-সান্ত্রীরা চলে গেল। রাজসভা ভাঙ্গল।)

তৃতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

(রাজবাড়ীর সামনের মাঠ। সিপাইরা চড়ুইকে ধরবার জন্যে ছুটাছুটি করছে।)

প্রথম সিপাই (দ্বিতীয় সিপাইকে)—"ও সিপাই ভাই, ওই যে চড়ুইটা আমগাছের ডালে া রয়েছে। ছোট্ ওদিকে।"

দ্বিতীয় সিপাই (তৃতীয় সিপাইকে)—"ও সিপাই ভাই, ছুটতে ছুটতে গিয়ে আম গাছে াম, চড়াইটা পালিয়ে জাম গাছের ডালে বসল। ছোট্ ওদিকে।"

তৃতীয় সিপাই (চতুর্থ সিপাইকে)—"ও সিপাই, ছুটতে ছুটতে গিয়ে জাম গাছে উঠলাম, ইটা বট গাছে উড়ে পালাল। ছোট্ ওদিকে।"

চতুর্থ সিপাই (প্রথম সিপাইকে)—"বাপ্, কি জোরে না ছুটলাম জাম গাছের ডাল থেকে ইটাকে ধরবার জন্য। কোনদিকে যে উড়ে পালাল কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না।"

প্রথম সিপাই (অন্য সিপাইদের)—"কি দুষ্টু চড়াই রে, এতগুলো জোয়ান সিপাই-এর ছুটতে ত প্রাণ বেরিয়ে গেল, তবু এতটুকু ক্ষুদে পাখীকে ধরতে পারছি না। ছোট্ ছোট্ সবাই। মাঠের াছ নাড়া দিয়ে দেখ। তা নইলে রাজামশায়ের রাগের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে পারবি না।"

দ্বিতীয় সিপাই (চীৎকার)—"ওরে সিপাইরা, পেয়েছি রে ধরেছি রে চড়ুইটাকে। পেয়ারা ছর সবুজ পাতার ফাঁকে ঘুপটি মেরে লুকিয়ে বসেছিল। ছুটে গিয়ে খপ্ করে ধরে ফেলেছি। দেখ, এই দেখ সবাই, হাতের মুঠোর ভিতর কেমন চেপে ধরেছি।"

চতুর্থ সিপাই (দ্বিতীয় সিপাইকে)—"বেশ করে মুঠোর মধ্যে চেপে ধরিস। দেখিস, যেন পালায় না। কি দুষ্টু দেখছিস তো !"

তৃতীয় সিপাই (দ্বিতীয় সিপাইকে)—"বাঁচালি আমাদের। দুষ্টু চড়াইটাকে ধরতে না পারলে রাজামশায়ের রাগে আমাদের সবাইকে মরতে হ'ত !"

প্রথম সিপাই (দ্বিতীয় সিপাইকে)—"উঃ, কি ছুটই না ছুটিয়েছে আমাদের দুষ্টু পাখীটা। কপাল দিয়ে ঘাম বার করিয়ে দিয়েছে। এখন ছুটে চল রাজসভায়। রাজামশায়ের হাতে চড়ুইটাকে দিবি। কপালটা তোর খুব ভাল। অনেক টাকা বকশিশ পাবি !"

(সিপাইরা চড়ুইকে নিয়ে রাজসভায় চলল।)

তৃতীয় অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

(রাজসভা। রাজা রাগে মুখ লাল করে বসে রয়েছেন। মন্ত্রী, সভাসদেরা গম্ভীর মুখে বসে রয়েছেন। সিপাইরা রাজসভায় ঢুকল। দ্বিতীয় সিপাইয়ের হাতে চড়াই।)

দ্বিতীয় সিপাই—"মহারাজ সেলাম। এই সেই দুষ্টু চড়াই। আপনার জন্য ধরে এনেছি।"

রাজা (হাসতে হাসতে)—"এতক্ষণে আমার রাগ থামল। মন্ত্রী, হাজার টাকা বকশিশ দাও এই সিপাইকে। দাও সিপাই, আমার হাতে দাও চড়ুইকে।"

(সিপাই রাজার হাতে চড়ুই দিল।)

দ্বিতীয় সিপাই—"এই নিন মহারাজ, মুঠোর মধ্যে চেপে ধরেছি।"

রাজা বললেন—"কিরে দুষ্টু চড়াই, বড় না জব্দ করেছিলি আমাকে। এবার দেখ, তোকে কেমন জব্দ করি। আর রান্নার দরকার নেই, কাঁচাতেই তোকে খাব। এই মস্ত বড় হাঁ করে গিলে ফেললাম তোকে।"

(রাজা হাঁ করে চড়াইকে মুখে ফেলে গিলে ফেললেন। তারপর (হাঁপাতে হাঁপাতে)—"ও মন্ত্রী, ও মন্ত্রী—প্রাণ যায় !"

মন্ত্রী (চীৎকার)—"ও রাজবৈদ্য, এগিয়ে আসুন। চড়াইকে গিলে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে রাজামশায়ের চোখ যে উল্টে গেল !"

রাজবৈদ্য (ছুটে এগিয়ে এসে)—"এই আমি এসেছি। কিন্তু এ তো দেখছি খুব বিপদ হয়েছে। চড়াইটা রাজার গলার নলীর কাছে পৌছেই ধারাল ঠোঁট দিয়ে গলার নলী টিপে ধরেছে। সেইজন্যই রাজা মশায়ের এই দশা হয়েছে !"

মন্ত্রী—"ও রাজবৈদ্য, ও রাজবৈদ্য, রাজামশায় বাঁচবেন তো ?"

রাজবৈদ্য—(গম্ভীর সুরে)—"আমি রাজবৈদ্য থাকতে ভাবনা কি! রাজামশাই, এই ওষুধের বড়িটা খেয়ে ফেলুন। এই বড়িটা যেই গিলে ফেলবেন অমনি চড়াই আপনার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে। আপনার প্রাণ বাঁচবে।"

রাজা (হাঁপাতে হাঁপাতে)—"সেনাপতি, খোলা তরোয়াল হাতে নিয়ে আমার মুখের সামনে দাঁড়াও। আমার মুখ দিয়ে যেই চড়াইটা বেরোবে অমনি তাকে কেটে দু'খানা করবে।"

সেনাপতি—"মহারাজ, এই ঝক্‌ঝকে তরোয়াল নিয়ে আপনার মুখের সামনে দাঁড়ালাম। এক কোপেই চড়ুইকে কেটে দু'খানা করব।"

রাজা—"বেশ, তবে আমি এই বড়ি খাচ্ছি।" (রাজা বড়ি গিলে ফেললেন। চড়াই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল।)

সভাসদের (চীৎকার)—"সর্বনাশ হ'ল, সর্বনাশ হ'ল। সেনাপতির হাত ফস্কে গেল। চড়ুইটা উড়ে পালাল। খোলা তরোয়াল রাজামশায়ের নাকে পড়েছে। অর্ধেকটা নাক উড়ে গেছে। সিংহাসনে রক্তগঙ্গা বইছে। রাজামশাই এবার বুঝি মারা যান।" রাজা (চীৎকার)—"ওঃ যন্ত্রণায় মরে গেলাম! রাজবৈদ্য রাজবৈদ্য, শীগগির এগিয়ে এস, কাটা নাকের ওষুধ দাও!"

রাজবৈদ্য—"এই আমি এসেছি। ওষুধ দিয়ে কাটা নাকের রক্ত বন্ধ করছি। কোন ভয় নেই। কিন্তু মন্ত্রীমশায়, চড়ুইটা যে আবার উড়ে এল দেখছি, আবার গান গাইছে। এ আপদ গিয়েও যায় না!"

(চড়ুই রাজসভায় উড়ে এল। রাজার মুখের সামনে ঘুরতে ঘুরতে গান করতে লাগল।)

চড়ুই (গান)— "দুষ্টু রাজার শাস্তি দেখে হাসলো সকল লোক,
ছোট্ট চড়ুই মারতে গিয়ে পেলেন নাকে কোপ।
এবার তবে নীলাকাশে আমি ভেসে যাই,
দুষ্টু রাজা জব্দ হলেন প্রাণ ভ'রে গান গাই।"

(গাইতে গাইতে চড়ুই আকাশের কোলে মিলিয়ে গেল।)

প্রথম সভাসদ (দ্বিতীয় সভাসদকে ফিস্‌ফিস্ করে)—"রাজামশাই শুনতে না পান, আস্তে আস্তে বলছি একটা কথা, শুনুন সভাসদ মশাই।

ছোট্ট চড়ুই কিন্তু দুষ্টু রাজাকে খুব জব্দ করেছে। নাক-কাটা রাজার কষ্ট দেখে সভাসুদ্ধ লোক মুখ টিপে হাসছে দেখছেন। রাণীদের নাক কেটে দেওয়া, চড়ুইদের খেতে না দেওয়া, গরীব লোকদের রাশ রাশ টাকা আত্মসাৎ করার ঠিক ফল ফলেছে!"

ময়দার তৈরী ছেলে

শ্রীকমলাপ্রসাদ ভট্টাচার্য

কোনো এক গরীব লোকের কোন ছেলেপিলে হয়নি।

তার বউয়ের মনে বড় দুঃখ। ছেলেপিলে না থাকলে মন খারাপ হবেই তো। তাই না?

একটি ছেলের জন্যে তাঁরা ভগবানের কাছে দিনরাত প্রার্থনা করেন, কিন্তু ভগবান তাঁদের কথা শুনলেন না।

মনের দুঃখে দিন কাটে···

একদিন বউটি তার বরকে বললে: ওগো, তুমি আমাকে ময়দা এনে দাও, আমি ময়দার ছেলে নিয়ে বুক জুড়োব।

হাটবারে স্বামী ময়দা এনে দিলেন।

বউটি সারাদিন ধরে একটি সুন্দর ফুটফুটে ছেলে তৈরী করলে সেই ময়দা দিয়ে। তার আনন্দ আর ধরে না!

তারপর সেই ছেলেকে আগুনে সেঁকতে দিয়ে বউটি রান্নাঘরের দরজা ভেজিয়ে চলে গেল।

ফিরে এসে সে তো অবাক্! দেখে, উনুনে ছেলে নেই! ছেলে কোথায় গেল!

তিনি ডুক্‌রে কেঁদে উঠতে যাবেন, এমন সময় রান্নাঘরের এক কোণ থেকে কে যেন বলে উঠল: এই যে মা, আমি এখানে! আমাকে কেউ নেয়নি।

গলার আওয়াজ শুনে বউটির বড় ভয় হোল।

ভয়ে ভয়ে বউটি বললে: তুমি কে?

—আমি যে তোমার ছেলে মা।

বউটির তখন আর আনন্দ ধরে না। ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

ছেলেটির নাম রাখা হোল হামুর।

সাধারণ ছেলেরা বাড়ে মাসে মাসে। হামুর রোজ রোজ বড় হতে লাগল। বার দিনের হামুর ঠিক বার বছরের ছেলের মত দেখতে হোল।

একদিন হামুরের বাপের শরীরটা খারাপ হয়েছে। তিনি মাঠে যেতে পারবেন না। অথচ তাঁর ঘোড়াটা মাঠে চরছে, তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে।

বাপ হামুরকে বললে: আমার ঘোড়াটাকে মাঠ থেকে ধরে নিয়ে এসো তো বাবা।

হামুর মাঠে গিয়ে কোন ঘোড়া দেখতে পেলে না। সে বনের দিকে এগিয়ে চল্‌ল। এমন সময় বন থেকে একটা বুনো শূয়োর ভীষণ বেগে বেরিয়ে আসছিল। হামুর চট্ করে সেটাকে বেঁধে ফেললে।

হামুরের খুব মজা! যাক্, ঘোড়াটাকে শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল। আর একটু হলে পালিয়ে গিয়েছিল আর কি!

শুয়োরটাকে ঘোড়া ভেবে হামুর তাকে নিয়ে বাড়ী ফিরল। বাড়ীতে ফিরে ছেলের কি হাঁক-ডাক!

বাপ ছুটে এসেই চমকে উঠলেন। ও মা, এ যে বুনো শুয়োর!

হামুরকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শুয়োরটাকে আবার বনে ছেড়ে দিয়ে আসতে বলা হোল।

এদিকে হামুর দিন দিন বেশ বেড়ে উঠ্ছে।

তার গায়ে ভীষণ জোর। তার সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে সে যখন খেলা করে, তখন দু'একটা ছেলে রোজই মরে যায়! আর হাত-পা খোঁড়া হয়ে যাওয়া তো প্রত্যেক ছেলের ভাগ্যে নিত্যই ঘটে!

পাড়ার লোকেরা বলে, কি দাস্য ছেলে রে বাবা! হামুরের জন্যে কি অন্য সব ছেলেরা মারা যাবে নাকি! তা হতেই পারে না! ওকে চাঁদ-পাহাড়ের পারে যে গহন বন আছে সেইখানে ছেড়ে দিয়ে আসতে হবে! গাঁয়ের মধ্যে হামুরকে রাখা চলবে না!

হামুর এধারে ছেলে ভাল। বাপ-মার কথা শোনে। বাপ-মা লোকের কথায় কষ্ট পাচ্ছেন শুনে সে চাঁদ-পাহাড়ের পারের বনে যেতে রাজী হোল।

যাবার আগে সে এক-পেট খেয়ে নিলে, আর নিলে একটা মোটা লাঠি।

অনেক দূরের পথ চাঁদ-পাহাড়।

যখন সে পাহাড়ের কাছে এসে পৌছল, তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। পাহাড়টা একবার সে ভাল করে তাকিয়ে দেখলে। পাহাড়ের তলার দিকটা কাল, মাঝখানটা সবুজ, আর ওপরটা সাদা।

পাহাড়ে উঠতে উঠতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। এদিকে বেশ অন্ধকার হয়ে আসছে।

কি করবে ভাবছে, এমন সময় একটা ভারী গলার আওয়াজ শোনা গেল। গলার আওয়াজে চারিদিক যেন কাঁপছে। হামুর ফিরে চেয়ে দেখে একটা ভীষণাকার দৈত্য তার কাছে দাঁড়িয়ে।

দৈত্য চীৎকার করে বললে: আরে পাগল, তুই এখানে কি করছিস্! কোনো কালে কোনো লোক এখানে পা দেয়নি। তোর সাহস তো কম নয়! তুই কি মরবি!

হামুর জবাব দিলে: দেখা যাক্ কে মরে! এই না বলে হামুর লাঠির বাড়ী দৈত্যকে আঘাত করলে, আর একটা আঘাতেই সে কাবু!

এই রকম চারটে দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করে, আর তাদের মেরে ফেলে সে যখন হাঁপাচ্ছে, এমন সময় একটা গর্তের মধ্যে থেকে কী যেন ভীষণ চক্‌চক্ করছে দেখতে পেলে।

এদিকে ভোর হয়ে এসেছিল। কখন যে রাত কেটে গেছে সে জানতেই পারেনি। সে সেই চক্‌চকে জিনিসগুলোর কাছে গিয়ে দেখলে যে সেগুলো সিন্দুক।

প্রথম সিন্দুকটি লোহার। খুলে দেখলে—রূপো রয়েছে।

দ্বিতীয় সিন্দুকটি রূপোর। খুলে দেখলে—সোনা রয়েছে।

তৃতীয় সিন্দুকটি সোনার। খুলে দেখলে—হীরে রয়েছে।

চতুর্থ সিন্দুকটি হীরে বসান। খুলতেই সে অবাক্ হয়ে গেল। সেই সিন্দুকের মধ্যে একটি অপরূপ সুন্দরী মেয়ে। মেয়েটি একটি পরী। দৈত্যের হাতে বন্দী হয়ে পড়েছিল। হামুর সেই মেয়েটিকে নিয়ে আবার দেশে ফিরল।

পরীর সাহায্যে সে অতুল ধনরত্ন আর রাজপ্রাসাদ পেলে। তখন সে নিজেকেই রাজা বলে ঘোষণা করলে।

সে দেশের রাজা অবশ্য যুদ্ধ করতে এলেন, কিন্তু হামুরের কাছে সকলেই হেরে গেল। পরী-বউ হামুরকে অনেক পরী-সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেছিল।

হামুর কিন্তু খুব ভাল ভাবে রাজ্যশাসন করত। সে আর আগের মত দুষ্টু ছিল না।

গল্প আমাদের এখানেই শেষ হোল।

দেবদূত ব্যাঙ

শ্রীঅমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়

এক যে ছিল ব্যাঙ
কে যেন তায় বল্‌ল ডেকে
অপূর্ব তোর ঠ্যাঙ
গানটি তোর আরও মিঠে
গ্যাংওর গ্যাংওর গ্যাঙ।

রাজপুত্তুর তুই
কি অপরূপ দেখতে তোরে
পড়শী বলে এক
কষ্ট করে আয়না নিয়ে
একটু চেয়ে দেখ।

এরা যখন কয়
ব্যাঙটা তখন ভাবে কভু
মিথ্যা এসব নয়
এমন সকল গুণের আধার
দেবদূতেরা হয়।

অমনি ব্যাঙের গলা
ফুল্‌ল আর দেমাকেতে
শুরু হ'ল চলা
এমন ফোলা ফাট্‌ল পেট
খতম ইহলীলা!

২৩শে এপ্রিল

(শেক্সপীয়ারের কথা)

শ্রীবিমল দত্ত

২৫শে বৈশাখ সকল বাঙালীর কাছে স্মরণীয় দিন—তাদের পুণ্যাহ। এ-দিনে তাদের শ্রেষ্ঠ কবি জন্মেছিলেন—সেই কবি বিশ্বকবির মর্যাদায় ভূষিত হয়েছেন, এ বাঙালীর পক্ষে বড় কম কথা নয়—বুক-ভরা গর্বের কথা।

তেমনি ২৩শে এপ্রিল হলো ইংরাজদের কাছে একটা স্মরণীয় সোনায় মোড়া দিন। এ দিনে তাদের বিখ্যাত নাট্যকার, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপীয়ার জন্মেছিলেন। সেই ২৩শে এপ্রিল আবার এসেছে ৪০০ বছর পরে। ইংরাজদের তাই এটা বড় গর্বের দিন। ইংরেজ জাতটা সব দিক দিয়ে ভাগ্যের বরপুত্র। তবুও তারা মনে করে যে, এমন দিন যদি আসে যখন তাদের সম্পদ, সাম্রাজ্য সব চলে যায় তবুও তারা জগতে মাথা উঁচু করে চলতে পারবে—শুধু তাদের উৎকৃষ্ট সাহিত্যের জোরে—এই সাহিত্যের মুকুটমণি হচ্ছেন, উইলিয়াম শেক্সপীয়ার যাঁর মত প্রতিভাবান নাট্যকার পৃথিবীতে আর জন্মান নি।

এই শেক্সপীয়ারের কথা আজ তোমাদের বলব। বড়ই দুঃখের কথা এঁর সম্বন্ধে প্রভূত গবেষণা করেও এঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায়নি। লোকটি মিশে আছেন লুকিয়ে, আছেন তাঁর নাট্য-সাহিত্যে। থিয়েটারের সাজঘরে গেলে যেমন আমরা আসল নটদের দেখতে পাই না, তাদের দেখি বিভিন্ন ভূমিকার সাজে সজ্জিত, এ যেন ঠিক তেমনি ব্যাপার।

জন্মেছিলেন তিনি ২৩শে এপ্রিল ১৫৬৪ সালে—ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ড-আপ্‌অন-য়্যাভন্‌-এ। এঁর ঠাকুর্দা রিচার্ড শেক্সপীয়ার ১৫৫২ সালের অন্ততঃ সাত বছর আগে থেকেই স্নিটার ফিল্ডে চাষবাস করছিলেন। স্নিটার ফিল্ড ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ডের চার মাইল উত্তরে। এখান থেকে শেক্সপীয়ারের বাবা জন্ শেক্সপীয়ার চলে আসেন ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ডে। এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য করে তিনি ফিরে যান স্নিটার ফিল্ডে এবং সেখানকার জমিদারের কন্যা মেরী আর্ডেনকে বিয়ে করেন। শেক্সপীয়াররা চার ভাই, চার বোন ছিলেন। শেক্সপীয়ার বাপ-মার তৃতীয় সন্তান। ভাই বোনদের মধ্যে উইলিয়াম আর এক বোন জোন্ ছাড়া আর সকলেই ছেলেবেলায় মারা যান।

ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ডে শেক্সপীয়ার কিছুকাল কাটালেন। কিন্তু কি করে কাটত তাঁর দিনগুলো? ইতিহাসের পাতায় কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। সমসাময়িক লোকেদের ছিটেফোঁটা বিবরণ থেকে জোড়াতালি দিয়ে তাঁর জীবনী খাড়া করা হয়েছে। তিনি অভিনেতা সম্প্রদায়ের সঙ্গে নাটক দেখে

বেড়াতেন আর সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে দল বেঁধে হৈ হৈ আর হাঙ্গাম বাঁধানো ছিল তাঁর নিত্যকর্ম। আর পাঁচজনের মতই সামান্য রকম লেখাপড়া শিখে ফেলেছিলেন। কিন্তু সে লেখাপড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকার বাইরে। তার সমসাময়িক নাট্যকার বেন্‌জন্‌সন্‌ তো স্পষ্টই লিখে গেছেন যে, শেক্সপীয়ার সামান্য লাতিন জানতেন আর গ্রীক জানতেন তার চেয়েও কম। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়া এক জিনিস আর প্রকৃতির পাঠশালা অন্য জিনিস। শেক্সপীয়ার প্রকৃতির পাঠশালাতেই শিখেছিলেন অনেক কিছু।

তখনকার কালটা ছিল এক বিরাট আলো ঝল্‌মলে সকাল। ইংলণ্ডের বড় ঐশ্বর্যের দিন। সব দিকে তখন ইংরেজ-প্রতিভা শতধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। তখনকার দিনে মনের খোরাক আপনিই পাওয়া যেত চার পাশ থেকে। নানা দেশ আবিষ্কার হচ্ছে—নানা দেশের কথা লেখা হচ্ছে—লেখকরা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় মেতে উঠেছে। সেই আলো কি শেক্সপীয়ারের মনে পড়েনি? পড়েছিল বৈকি!

উনিশ বছর বয়সে শেক্সপীয়ার বিয়ে করলেন য়্যান হ্যাথাওয়ে-কে। মেয়েটি থাকতেন ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ডের কাছেই 'শ্যাটারী'-গ্রামে। বয়সে কিন্তু আট বছরের বড় ছিলেন তিনি তাঁর স্বামীর থেকে। কিন্তু এতে বিয়ে আটকালো না। ১৫৮২ সালে তাঁদের বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ে-থা করে শেক্সপীয়ার সংসারী হলেন। ছেলেমেয়েও হলো তিনটি। কিন্তু স্বভাব বদলালো না, সেই যাত্রা-থিয়েটার দেখা আর হৈ-চৈ করে কাল কাটানো। কেউ কেউ বলেন যে, তিনি স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করেছিলেন। কিন্তু মাষ্টারি করলেও শেক্সপীয়ারের মনটা ঝুঁকেছিল লণ্ডনের দিকে। সেখান থেকে যে সব নাট্য-সম্প্রদায় নাটক করতে আসতো তাদের মুখে লণ্ডনের কথা শুনে শেক্সপীয়ারের মনটা সেই দিকেই তাকে টানতো, কিন্তু লণ্ডনের মত বড় শহরে সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় শেক্সপীয়ার গিয়ে কি করবেন? সাহসে কুলাতো না।

এই সময়ে স্থানীয় জমিদার স্যর টমাস্‌ লুসীর কোপ-দৃষ্টিতে পড়ে গেলেন শেক্সপীয়ার। ও-অঞ্চলে লুসীর দোর্দণ্ড প্রতাপ। তাঁর একটা সংরক্ষিত জঙ্গল ছিল। সে জঙ্গলে হরিণ ছিল প্রচুর। পাছে কেউ অনধিকার প্রবেশ করে হরিণ মেরে চুরি করে নিয়ে যায়, তাই সেখানে বনরক্ষী নিযুক্ত ছিল কয়েকজন। কিন্তু এখানে প্রায়ই শেক্সপীয়ার আর তাঁর দলটি হানা দিত আর হরিণ চুরি করে বিনা পয়সায় ভোজ খেত। কিন্তু একদিন ধরা পড়ে গেলেন তিনি বনরক্ষীদের হাতে। তারা হাজির করলো শেক্সপীয়ারকে লুসীর কাছে। ব্যাপার গুরুতর। মামলা হলে সাজা হবে আর জনের মাথা হেঁট। কাজেই শেক্সপীয়ার সটকান দিলেন স্ট্র্যাটফোর্ড ছেড়ে অজ্ঞাত শহর মায়াময়ী লণ্ডনের দিকে। ভাগ্য তাঁকে পথ দেখালো সেই দুর্দিনের অন্ধকারে।

কিন্তু লণ্ডনে কি করবেন তিনি ? কি তাঁর সহায়, কি তাঁর সম্বল ! বিদ্যে-সাধ্যি বেশী নয় তো ! এখানে দেখা হলো পুরোনো নাটুকে বন্ধুদের সঙ্গে। যাকে দেখেন বলেন, "একটা কাজ দেবে, ভাই ?"

"কাজ ? এখানে কি কাজ করবে তুমি ? কি কাজ জানো ?"

মনে মনে শঙ্কিত হ'ন শেক্সপীয়ার। মনে পড়ে অতীত দুষ্কৃতির কথা—অন্ধকারে বনরক্ষীদের ফাঁকি দিয়ে হরিণ চুরি—এই তো তাঁর বিদ্যে। মাথা হেঁট করে চলে আসেন। আবার শুরু হয় লণ্ডনের পথে-পথে ঘোরা।

মাঝে মাঝে স্ত্রীর কথা মনে হয়। মনে হয় ছেলেমেয়েদের কচি মুখগুলো—স্নেহধারায় বুক উথলে ওঠে। কিছু করতে হবে তাঁকে, করতেই হবে। ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে হবে, সর্বশক্তি প্রয়োগ করে দাঁড়াতে হবে নিজের পা দুটোর উপর সোজা হয়ে—মাথা উঁচু করে। লুসীর ঔদ্ধত্য বরদাস্ত করতে পারবেন না তিনি, ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ডে এখন ফিরবেন না

উদ্যমের ফলে আশার আলো ফুটে উঠলো সেই ঘনান্ধকারে। চাকরি জুটলো থিয়েটারে। কিন্তু বড় হীন চাকরি। ঘোড়ার সহিস্ বলা যায়। যে সব বড় লোক ঘোড়ার গাড়ী করে থিয়েটার দেখতে আসেন, তাদের ঘোড়ার তদারক করা। তাই সই। থিয়েটারের চাকরি তো ! শেক্সপীয়ার এই কাজেই লেগে গেলেন।

এর ফলে থিয়েটারের লোকদের সঙ্গে সম্পর্কটা ঘন হতে লাগল। লণ্ডনের সংস্কৃতির সংস্পর্শে মন-প্রাণ রঙ্গীন হয়ে উঠলো তাঁর। থিয়েটারগুলো তখন বিরাট জনতাকে আকর্ষণ করছে। শেক্সপীয়ার নাটকের অভিনয় দেখেন আর সহিসের কাজ করেন। এর ওপর জুটলো এক ছাপাখানার কাজ। তাও করেন—সেখানে নাটকও ছাপা হয়। ভাগ্যচক্র ক্রমশঃ শেক্সপীয়ারকে এনে ফেললো থিয়েটারের মধ্যে। এখানে চাকরী পেলেন ম্যানেজারের সহকারীর পদ। সাজঘর থেকে অভিনেতাদের ঠিক সময়ে খবর দিয়ে ষ্টেজে হাজির করা। তারপর একদিন অভিনেতা রূপে স্বয়ং আবির্ভূত হলেন রঙ্গমঞ্চে—ছোটখাটো ভূমিকায়।

নাট্যকারদের সঙ্গে ক্রমশঃ তাঁর পরিচয় হতে লাগল। আবার ম্যানেজারের সঙ্গে সম্পর্ক নিবিড় হতে লাগল।

তখন নতুন নতুন নাটকের বড় চাহিদা। দু'তিনটে থিয়েটার পাল্লা দিয়ে চালিয়েছে। পুরোনো বই আর চলে না—চাই নতুন নতুন বই। কিন্তু অত নাট্যকার কোথা ? ম্যানেজাররা পুরোনো বই নতুন করে ঢেলে সাজতে লাগলেন। এ কাজে শেক্সপীয়ারও হাত লাগালেন। স্কুল-মাষ্টারি করেছেন—কিন্তু খাতার ভুল শোধরানো বিদ্যেতে কি নাটক অদল-বদল করা যায় ? কিন্তু

প্রতিভা ছাই চাপা আগুন। শেক্সপীয়ারের প্রতিভা এতে প্রকাশিত হতে লাগল। কোথাও ভাষা বদ্‌লান, কোথাও দৃশ্যটা একেবারে নতুন করে ফেলেন কোথাও নতুন চরিত্র সৃষ্টি করেন। কাজটা ভাল লাগে—দর্শকরা পছন্দও করে। শেক্সপীয়ারের দক্ষতা বাড়ে, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস আসে। তাঁর সমসাময়িক নাট্যকার মার্লোর তখন খুব নাম। দু'জনের বয়সও এক। ভাষা যেমন ঝলমলে নাটকের প্লট্ তেমনি জমাটি! মার্লোর প্রভাব পড়লো শেক্সপীয়ারের উপর। কিন্তু মার্লো ক্যাম্ব্রিজের বি. এ. তাঁর কত বিদ্যে, আর শেক্সপীয়ার সামান্য শিক্ষা-দীক্ষার লোক। তবুও যত্ন ও অধ্যবসায়ে কি না হয়। মনটা জাগলে তার আহার সে আপনিই জুটিয়ে নেয়। শেক্সপীয়ারও মন-ভাণ্ডার পূর্ণ করতে লাগলেন।

প্রথম অপরের সহযোগিতায় নাটক লিখতে শুরু করলেন। এদিকে ১৫৯৩ সালে সহসা বন্ধু মার্লো এক হাঙ্গামায় পড়ে খুন হলেন।

শেক্সপীয়ার নিজেই বই লিখতে লাগলেন, নিজে অভিনয়ও করেন। ধীরে ধীরে তাঁর নাটক জনপ্রিয় হয়ে উঠতে লাগলো। যে সব নাট্যকার শেক্সপীয়ারের নতুন প্রভায় নিষ্প্রভ হয়ে গেলেন, তাঁরা তখন শুরু করলেন শেক্সপীয়ারের কুৎসা। কিন্তু মধ্যাহ্নের সূর্যের মত তখন শেক্সপীয়ার লণ্ডন শহরকে আলোকিত করে তুলেছেন।

১৬০০-৬ সালের মধ্যে শেক্সপীয়ার রচনা করলেন তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি—হ্যামলেট্, ওথেলো এবং কিং লিয়র।

শেক্সপীয়ার অনেক পুরানো বই থেকে গল্পের বিষয়বস্তু নিয়েছেন। কিন্তু সেজন্য তাঁর কৃতিত্বকে কম করা যায় না। তিনি প্রতিভার আগুনে তা গলিয়ে নতুন রূপ দিয়েছিলেন। চরিত্রগুলো স্বাভাবিক রক্তমাংসের মানুষ—তারা এত স্বাভাবিক যে মনে হয় তাদের আমরা কোথায় দেখেছি। এত জানা, এত চেনা তারা। এই জন্যেই শেক্সপীয়ারের জগৎ-জোড়া খ্যাতি। লিয়রের মত কন্যাস্নেহে অন্ধ পিতাকে কন্যার হাতে দুর্ব্যবহার পেতে কে না দেখেছে? কে না দেখেছে ম্যাকবেথের মত লোভী ক্ষমতালোলুপ ব্যক্তিকে—যে রক্তের ঢেউ তুলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে শেষকালে ভেঙে পড়েছে পাপের বোঝার চাপে।···

১৬১০ সালে শেক্সপীয়ার লণ্ডন ছেড়ে ষ্ট্র্যাটফোর্ডে-আপ্‌অন্-য্যানভ-এ ফিরে এলেন লণ্ডনের কয়েকটি থিয়েটারে তাঁর অংশ ছিল। প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন তিনি, তার উপর প্রচুর খ্যাতি। স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে সুখে তাঁর দিন কাটতে লাগল।

শেক্সপীয়ার যে নাটকগুলি লিখেছেন, তাদের মোটামুটি চার পর্যায়ে ভাগ করা যায়।

১৫৮৪—১৫৯৪	১৫৯৪— ১৫৯৯	১৫৯৯—১৬০৮
কমেডি অব এরর্স	মিডসামার নাইট্‌স ড্রীম	টুয়েলফ্‌থ্‌ নাইট
টেমিং অব দি শ্রু	মার্চেন্ট অব ভেনিস্‌	ট্রয়লাস এণ্ড ক্রেসডি
টু জেন্টল্‌মেন অব ভেরোনা	মেরী ওয়াইবস্‌ অব উইণ্ডসোর	মেজার ফর মেজার
হেনরী দি ফোর্থ ১ম, ২য় ও ৩য়	মাচ্‌ এডু এবাকট নাথিং	অলস্‌ ওয়েল
রিচার্ড দি থার্ড	এজ ইউ নাইক ইট	জুলিয়াস্‌ সীজার
কিং জন	রোমিও-জুলিয়েট	হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, ওথেলো,
টিটাস্‌ এণ্ড্রনিকাস্‌	রিচার্ড দি সেকেণ্ড্‌	কিং লীয়র
লাভস্‌ লেবার লস্ট্‌	হেনরী দি ফোর্থ (১ম ও ২য়)	টাইমন
ভেনাস্‌ ও য়্যাডনিস্‌ (কাব্য)	হেনরী দি ফিফ্‌থ	এণ্টনী ও ক্লিওপেট্রা
রেপ্‌ অব লুক্রিস্‌ (কাব্য)		

১৬০৮—১৬১৩

করিওলেনাস্‌ উইণ্টার্স্‌ টেল,
পেরিকল্‌স্‌, সিম্বেলিন, টেম্পেষ্ট, হেনরী দি এইটুথ্‌

এ ছাড়া শেক্সপীয়ারের লেখা আরো কিছু কাব্য ও ১৫৪টি সনেট পাওয়া গেছে।

এই সব নিয়ে গবেষণা হয়েছে দেশ-বিদেশে এবং আজ শেক্সপীয়ার সোসাইটি সে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে।

তাঁর সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনায় অবসান হয়নি আজও। কেউ বলেছে তাঁকে সাহিত্যিক চোর, কেউ বলেছে, তাঁর নাটকগুলো ফ্র্যান্সিস্‌ বেকন্‌ নামে প্রবন্ধকারের লেখা, কেউ বা বলেছে মার্লো এ সব ছদ্মনামে লিখেছেন।

কিন্তু সব জল্পনা-কল্পনাই শেষ পর্যন্ত ভুল প্রতিপন্ন হয়েছে। নাটকগুলির রীতি, শব্দ-প্রয়োগ ও ভাবধারা, ইত্যাদির দ্বারা প্রমাণিত হয় সব এক হাতের লেখা, তবে নাট্যকারের যেমন যেমন ধাপে ধাপে মানসিক উৎকর্ষ হয়েছে, নাটকগুলিতেও তেমনি ভাবের নিদর্শন মেলে।

তাঁর সম্বন্ধে যে কিছু জানা যায় না, তার কারণ শেক্সপীয়ার আত্মম্ভরী ছিলেন না—নিজেকে প্রচার করেন নি—কাজই করে গেছেন খালি।তাই তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয় তাঁর লেখাগুলি। গান্ধীজীর মত বলা যায়—তাঁর নাটকগুলিই তাঁর জীবনী।

১৬১৬ সালের ২৩শে এপ্রিল শেক্সপীয়ার মারা যান। এঁর জন্ম-তারিখ আর মৃত্যু-তারিখ মাস দিনে একই। ভারী অদ্ভুত নয়?

চা সম্বন্ধে দু চার কথা

—শ্রীতীর্থংকর চট্টোপাধ্যায়—

ভোর বেলা ঘুম ভাঙতেই হাতের কাছে আমরা যে জিনিসটা চাই, তার নাম 'চা'। আবার ভোর বেলা কাগজ পড়তে বসেও চা না হলে ভালোই লাগে না। আবার আপনার বাড়ীতে কেউ বেড়াতে এসেছে তাকে অন্ততঃ এক কাপ চা না দিলে তো ভদ্রতাই থাকলো না। এমনিভাবে দেখতে গেলে দেখা যাবে যে, বর্তমান সভ্যজগতের সঙ্গে একটা অংশই 'চা' জুড়ে রয়েছে।

এই 'চা' কোথা থেকে আমাদের এই ভারতবর্ষে এলো, এবং কি ভাবে এলো, জানতে হলে শতাধিক বছর পিছিয়ে যেতে হবে। ১৮৩৪ সালের কথা। গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের নেতৃত্বে এক 'চা' সমিতি গঠিত হলো এবং সেই 'চা' সমিতিই ভারতের 'চা' জন্মানোর জন্য প্রথম বীজ চীনদেশ থেকে নিয়ে এলো। আশ্চর্যের কথা এই যে, এই 'চা' বীজ প্রথমে লাগানো হ'ল এই কলকাতারই বোটানিকাল গার্ডেনে। এই বীজ থেকে জন্মানো চায়ের চারা নিয়েই মুসৌরী, মাদ্রাজ এবং সেই সঙ্গে আসামেও লাগানো হয়। এই ভাবেই প্রথম চায়ের চাষ আরম্ভ হয়।

টী (Tea) বা 'চা' নামের উৎপত্তি চীনাভাষার থি (Thea) বা দী (Thee) থেকে। চীন দেশেই প্রথম চা পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পরে ভারতে ও অন্যান্য দেশেও ওর আবাদ এবং ব্যবহার শুরু হয়।

চায়ের গাছগুলি চিরসবুজ। চা চাস করতে উষ্ণ অথচ আদ্র জলবায়ুর প্রয়োজন। জমিও খুব উর্বর হওয়া দরকার। ঠাণ্ডা আবহাওয়াতে ভাল বীজ চা চাষের জন্য লাগাতে হয়। ৬ মাস থেকে ১৮ মাস পরে ঐ বীজ থেকে উৎপন্ন চারা এক নির্দিষ্ট দূরত্ব অন্তর লাগাতে হয়। সাধারণতঃ এক একরে ৩০০০ হাজার চারা লাগানো যায়। গাছগুলোতে যাতে বেশী রোদ্দুর না লাগতে পারে সেই জন্য এই গাছগুলির ফাঁকে ফাঁকে অন্য আর একরকমের গাছ লাগানো হয়। গাছগুলোকে যদি বাড়াতে দেওয়া যায়, তবে ২০' ফুটেরও বেশী উঁচু হতে পারে। কিন্তু বেশী পাতা পাবার জন্য এবং পাতা তুলবার সুবিধার জন্য এদের ৩।৪ ফুটের বেশী বাড়তে দেওয়া হয় না। কিছুদিন অন্তর অন্তর গাছগুলোকে একবার করে ছেঁটে দেওয়া হয়। তার ফলে, গাছগুলো এক একটা ঝোপে পরিণত হয়।

চা গাছ লাগানোর কয়েক বছর পর তার থেকেই 'চা' শ্রমিকরা তুটি কচি কচি পাতা ও একটা কুঁড়ি (পাতার কোরক) তুলতে থাকে। গাছগুলি থেকে চা পাতা ৪০।৫০ বছরেরও বেশী তোলা যায়। বর্তমানে কোথাও কোথাও প্রতি একরে 'চা' ৫মণ থেকে ২০ মণেরও বেশী হয়।

'চা' তিন রকমের হয় তার মধ্যে কালো রঙের চায়েরই ব্যবহার বেশী। এই চা কারখানায় বিশেষ কায়দায় কম উত্তাপে পাতাগুলোকে শুকিয়ে নিয়ে তৈরী হয়।

ভারতের মোট উৎপন্ন চায়ের $\frac{4}{5}$ ভাগ ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে—উত্তর বাংলা ও আসামের ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় জন্মায়।

ভারতের চায়ের মধ্যে আবার দার্জিলিং-এর চা গন্ধের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু আসামের চায়ের লিকার বেশী। এই জন্য ভাল চা তৈরীর জন্য চা-মেশানো বা Blending এর প্রয়োজন হয়।

চা রপ্তানি ও উৎপাদনের দিক থেকে ভারত পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। ফলেই প্রচুর বিদেশী মুদ্রা আমরা এর থেকে পেয়ে থাকি।

ভারত বাদে অন্য উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকার দেশগুলোর মধ্যে আছে চীন, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, জাপান ও পাকিস্থান প্রভৃতি। ভারত থেকে চা ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মিশর, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে রপ্তানি করা হয়। র্তমান পৃথিবীতে অত্যাধিক চা জন্মানোর ফলে ভারতকে কিছুটা অসুবিধাতেও পড়তে হয়েছে।

করুণাধারায় এসো

শ্রীসুধাংশু গুপ্ত

যুদ্ধ চলছিলো। রোহিণী নদীর অপর পারে কোলী রাজার সঙ্গে কপিলাবস্তুর শাক্যজাতির নায়ক শুদ্ধোদনের। অস্ত্রশস্ত্রের ঝনঝনানি, গোলা-বারুদের গুড়ুম গুড়ুম শব্দে আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠছিলো।

সহসা কে এলেন? ওই জ্যোতির্ময় পুরুষ। যুদ্ধের তাণ্ডবলীলার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। চিৎকার করে উঠলেন: থামাও এ যুদ্ধ, ক্ষান্ত হও।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো দু'দলের সেনাপতি যুদ্ধ থামাবার ইংগিত করলেন। শাক্যদলের নায়ক এগিয়ে এলেন। দিব্যকান্তি, প্রশান্ত মানুষটি তখন জিগ্যেস করলেন: তোমাদের এ-যুদ্ধে লিপ্ত হবার কারণ কি, জানতে পারি?

নায়ক বললে: তবে শুনুন। কপিলাবস্তু ও কোলী শহরের অল্প দূরেই রোহিণী নদী। এ নদীর মাঝে রয়েছে এক পয়ঃপ্রণালী। একমাত্র অবলম্বন।

প্রণালীর জলধারাই উভয় রাজ্যের চাষবাসের অনবৃষ্টির দরুণ ভীষণ জলাভাব ঘটেছে। কোলী রাজা ঘোষণা করেছেন, কোন মতেই প্রণালীর জল ব্যবহার করতে দেবেন না। তাই আমরা রুখে দাঁড়িয়েছি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে···চাষী ভাইদের এ-ভাবে তিলে তিলে মরতে না দিয়ে নিজেদের শক্তি প্রয়োগ করে কোলী রাজার দর্প চূর্ণ করতে। বলুন, আমাদের এতে কী অন্যায় হয়েছে···আপনিই বিচার করুন।

গম্ভীর আনন্দময় সৌম্যমূর্তির মুখ থেকে নিঃসৃত হলো: জলের চেয়ে প্রাণের মূল্য তোমাদের নিশ্চয়ই বেশি। আমি তোমাদের এই কথাই বলতে চাই যে, সামান্য মন-কষাকষির ব্যাপারে উত্তেজিত না হয়ে হানাহানি, খুনোখুনি করে লাভ কী ভাই! দু'দলের সেনাপতি নিজ নিজ রাজাদের কাছে এই আবেদনই জানাও যে যুদ্ধ তোমরা চাও না···চাও একটা আপোস মীমাংসার মধ্যে এসে বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে। জান তো স্নেহ-ভালবাসার মধ্যে গড়ে ওঠে শান্তি, মিত্রতা ও সুধা-স্নিগ্ধ আনন্দ-ধারা।

উভয় সেনাপতিই মাথা নীচু করে নতি স্বীকার করলেন। মেনে নিলেন ওইপরম-সুন্দর মানুষটির মৈত্রীর বাণী। কে মানুষটি! তিনি আর কেউ নন, শাক্যবংশের করুণাধারা রাজকুমার বুদ্ধদেব···রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ মানব।

মগহর

(ভ্রমণ-কথা)

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর
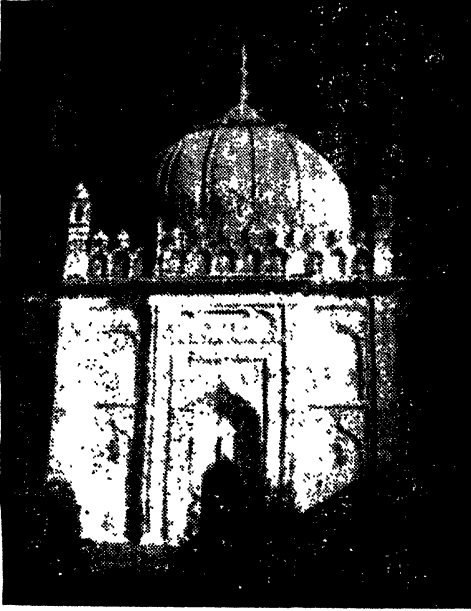
মগহর-এ কবীর চৌরা

উত্তর ভারতের গোরখ্‌পুর থেকে কুড়ি মাইলের মত পথ। বাসে যেতে সময় লাগে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক।

মগহর একটি নগণ্য গ্রাম, গাঁয়ের চৌমাথায় যেখানে বাস থেকে নামতে হয়, সেখানে খান চারেক খাবারের দোকান ছাড়া আর কিছু নেই। পাশে মাঠের উপর দিয়ে সোজা চলে গেলে মিনিট দশেক পরেই একটি নদী। ছোট নদী। তবে নদীর ঘাট পাথর দিয়ে বাঁধানো। ঘাটের উপরেই একটি উপাসনা-কক্ষ আর তার পিছনে পাশাপাশি একটি মন্দির ও একটি মসজিদ। একই ধরনের গড়ন—দুয়েরই মাথায় গোল গম্বুজ, চার কোণে চারটি মিনার। মন্দিরের মিনারগুলি খাটো ও স্থূল, কিন্তু মসজিদের মিনারগুলি লম্বা ও সরু

আমরা প্রথমে মন্দিরে প্রবেশ করলাম। মন্দির মধ্যে দু'-আড়াই ফুট উঁচু চতুষ্কোণ একটি বেদী। বেদীটি আগাগোড়া ফুল দিয়ে সাজানো। কোন বিগ্রহ নেই। পিছনের দেয়ালে কবীরের দু'খানি ছবি আছে। একখানি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আমরা দেখেছি, আরেকখানি নতুন।

কবীরপন্থী কয়েকজন সাধু আশেপাশেই বসেছিলেন, একজন উঠে এসে আমাদের হাতে কয়েকটি ধূপ দিলেন, আমরা সেগুলি জ্বালিয়ে দিলাম বেদীর সামনে। সমস্ত ঘরখানি পুষ্প-সুরভিতে স্নিগ্ধ হয়ে আছে।

মন্দিরের পাশেই মসজিদ। সেখানেও ওই। মধ্যে চতুষ্কোণ এক বেদী, লাল মখমল দিয়ে ঢাকা, মখমলের উপর ফুল সাজানো। তবে এখানে কোন ছবি নেই।

কেউ আমাদের কাছ থেকে কিছুই চাইল না। ধূপের দামের কথাও কেউ বললো না। মন্দিরের দ্বারে তালা-বন্ধ একটি দানের বাক্স্ ছিল, আমরা তাতেই কিছু কিছু পয়সা ফেলে দিলাম। শত শত বছর ধরে মহাপুরুষের ঐতিহ্যের ধারা যারা পালন করে চলেছেন, দেশবাসীর কা ছ থেকে তাঁদের পাওনা অনেক, আমরা তা দিতে পারি কই ?

আমরা উপাসনা-কক্ষের সামনে নদীর ঘাটে এসে বসলাম। কয়েকজন সাধুসন্ত ইতস্ততঃ কাপড় কাচছিলেন ও স্নান করছিলেন। কাছাকাছি সাধারণ মানুষ বা কোন গ্রাম নজরে এলো না। শুধু একটি বড় মন্দির চোখে পড়লো একটু তফাতে।

ভারতের এই এক মহাতীর্থ—কবীর চৌরা।

লাগরু গ্রামের নীরু জোলার কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে কবীর। বারাণসীর কাছে লহর তলাও-এর পাশে নীরু শিশুটিকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। জোলার ছেলে লেখাপড়া শেখেনি, শিখেছিল কাপড বুনতে। দিনে দু'খানি করে কাপড় বুনতেন। একখানি বেচে লাভের পয়সা সংসারে খরচ করতেন। আরেকখানি বেচে লাভের পয়সা ভিখারীদের দান করতেন।

দক্ষিণ ভারত থেকে রামানুজ স্বামীর শিষ্য রামানন্দ এলেন কাশীতে। তাঁর ধর্মকথা শুনে কবীর বললেন, প্রভু আমি আপনার শিষ্য হবো।

রামানন্দ বললেন—কি নাম ? কোন জাতি ?

—নাম কবীর, জাতি জোলা।

—কিন্তু ব্রাহ্মণ ছাড়া আমি আর কাউকে দীক্ষা দিই না।

কবীর দুঃখিত মনে ভাবতে ভাবতে বাড়ী ফিরলেন।

পরদিন ঊষাকালে রামানন্দ স্বামী গঙ্গাস্নানে চলেছেন। পূর্বাকাশ তখনও ভালো করে ফরসা হয়নি। মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার থমথম করছে, কিছুই ঠাহর করা যায় না। ঘাটের পাষাণ সোপান দিয়ে রামানন্দ নামছেন। মুখে মন্ত্র জপছেন—ওঁ রামায় নমঃ।

সহসা পায়ে কি ঠেকলো। একটা মানুষ পড়ে আছে। মৃতদেহ নাকি ? রামানন্দ ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলেন—রাম কহ ! রাম কহ !

কবীর উঠে বসলেন, পায়ের ধূলো নিয়ে বললেন—প্রভু এই আমার দীক্ষা হয়ে গেল।

রামানন্দকে বিস্মিত করে কবীর অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

কবীর গাঁয়ে ফিরলেন। মস্তক মুণ্ডিত, গলায় তুলসীর মালা, কপালে ও বাহুতে চন্দনের তিলক। মা নীমা বললেন—এ কী !

প্রতিবেশীরা হাসলো। হিন্দুরা বিরক্ত হলো—যবনের গলায় তুলসীর মালা, গায়ে তিলক,

কেউ কবীরকে সইতে পারলো না। শেষে কবীর একদিন ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়লেন।

কবীর এলেন দিল্লীতে। সেকেন্দার লোদী তখন দিল্লীর বাদ্‌শা। বাদ্‌শাহী দরবারে হিন্দু ও মুসলমান দু'দলই গিয়ে নালিশ জানালেন—কবীর নামে এক জুয়াচোর সাধুর ভান করে নগর-বাসীদের ঠকাচ্ছে।

পাইক-পেয়াদা কবীরকে ধরে আনলে দরবারে। বাদ্‌শা বললেন—তুমি ভণ্ড!

কবীর বললেন—আমি সাধনা করে সত্য লাভ করতে চাই।

বাদ্‌শা বললেন—এই ভণ্ডকে হাতীর পায়ের নীচে ফেলে দাও।

রক্ষীরা হাতীর সামনে কবীরকে ফেলে দিল। হাতী কিন্তু কবীরের অঙ্গ স্পর্শ করলো না অঙ্কুশ দিয়ে হাতীকে খুঁচিয়েও কোন ফল হলো না। বাদ্‌শা এই প্রথম দেখলেন হাতীর পায়ের নীচে থেকে মানুষ জীবন্ত ফিরে আসে। বাদ্‌শা বললেন, তুমি মুসলমান হয়ে রাম নাম কর কেন?

কবীর বললেন—সাধুর কাছে ধর্ম বা সম্প্রদায় বলে কিছু নেই, ভগবানের চিন্তাই সব।

বাদ্‌শা কবীরকে ছেড়ে দিলেন।

দিল্লী থেকে কবীর ফিরলেন। লোকে জিজ্ঞাসা করলো—কি দেখে এলেন?

কবীর বললেন—দেখলাম সহজ পথে কেউ চলে না। ব্রাহ্মণ বেদপাঠ করে না। সাধুরা খেতে পায় না, জুয়াচোররা সুখে আছে। পণ্ডিতের কথা কেউ শোনে না, ধূর্তের কথায় সবাই চলে। দুধ পথে ফেরি করে বেচতে হয়, কিন্তু মদ দোকানে বসেই বিক্রি হয়। নগরীর মানুষ অধঃপাতে গেছে।

উত্তর ভারতের পথে পথে কবীর ঘুরলেন। যে তাঁর কথা শোনে, সে-ই তাঁর শিষ্য হয়।

কবীরও একটি ছেলেকে কুড়িয়ে পেয়ে মানুষ করেছিলেন, তার নাম কামাল।

এক অন্ধকার রাত্রে গঙ্গার তীরে কবীর বসেছিলেন। শেয়ালের ডাকে তাঁর ধ্যান ভেঙে গেল। চোখ মেলে দেখ্‌লেন, গঙ্গা দিয়ে এক শব ভেসে যাচ্ছে। যোগবলে শবটিকে তিনি আকর্ষণ করে আনলেন তীরে। সদ্যমৃত সুদর্শন একটি বালকের সব। কবীর শবটির দেহে প্রাণসঞ্চার করলেন, তাকেই মানুষ করলেন ছেলের মত।

শেষে কবীর এলেন এই মগহরে। তখন তাঁর মাথার চুল শাদা হয়ে গেছে, শাদা দাড়ী নেমে এসেছে বুক অবধি। এক একাদশীর দিনে তিনি শিষ্যদের ডেকে বললেন, আমার বিদায় নেবার সময় হয়েছে।

শিষ্যদের সেদিন শেষ উপদেশ দিলেন—হিন্দু ও মুসলমানের ঈশ্বর এক। ধর্মাচরণে সবাকার সমান অধিকার। চরিত্রের পবিত্রতা ও ঈশ্বরে ভক্তি সকল ধর্মের সার। কুসংস্কার, কুকথা, কুনীতি,

হিংসা, দ্বেষ সাধনায় বাধা দেয়। চরিত্রহীনেরা ধর্মচর্চা করতে পারে না। জীবনে পবিত্রতা না থাকলে ধার্মিক হওয়া যায় না।

উপদেশ শেষ হলো, সূর্য অস্ত গেল, কবীরও দেহরক্ষা করলেন।

শেষকৃত্যের সময় দেখা দিল বিরোধ। হিন্দু শিষ্যেরা বললো—দাহ করা হোক। মুসলমান শিষ্যেরা বললো—কবর দেওয়া হোক।

যিনি সারাজীবন ধর্ম-সমন্বয়ের সাধনা করলেন, তাঁর শেষকৃত্য নিয়েই শেষে বাঁধবে ধর্মবিরোধ? একজন শিষ্য এসে বললেন—কেন এই বিবাদ, তাঁর দেহ বলে তো কিছু নেই।

শাদা চাদরখানি তুলে দেখা গেল, চাদরের নীচে একরাশি ফুল।

হিন্দুরা অর্ধেক ফুল নিয়ে দাহ করে তার উপর মন্দির বানালো, মুসলমানরা অর্ধেক ফুলের কবর দিয়ে দর্গা বানালো। পাশাপাশি এই মন্দির ও মসজিদ তৈরী করার টাকা দিলেন কাশীর রাজা বীরসিংহ। পাশাপাশি মন্দির ও মসজিদ, মনের মন্দিরে ঈশ্বরের আবাহন করার জন্য এখানে কোন বিরোধ তো নেই, কিন্তু আমরা বছরের পর বছর ধরে এই দু'টি উপাসনা-ক্ষেত্র নিয়ে কত হিংস্র বিরোধের বেড়াজাল রচনা করেছি।

নদীর তীর ধরে একটু এগিয়ে গিয়েই এক শিব মন্দির। উত্তর ভারতের মন্দির যেমন হয়। ভিতরে বড় শিবলিঙ্গ। কয়েকজন পুরোহিতও রয়েছেন। মন্দিরটি খুব পুরানো না হলেও নতুন নয়।

আমরা স্টেশনে ফিরলাম। স্টেশন মাস্টার বাঙালী, বললেন—ট্রেন দু'ঘণ্টা লেট করেছে, আপনাদেরকে ততক্ষণে গান্ধী আশ্রমটা দেখিয়ে আনি।

স্টেশনের পাশেই গান্ধী আশ্রম। কয়েক বিঘা জমি নিয়ে অনেক ঘর, অনেক বিভাগ। —এটি-একটি বড় শিল্পকেন্দ্র। বৈদ্যুতিক করাত-কল চালিয়ে, জানালা দরজা টেবিল চেয়ার চরকা তৈরী হচ্ছে। তাঁতশালায় সুতো কাটা, কাপড় বোনা, রং করা, ছাপানোর কাজ হচ্ছে। কাপড় ছাপার ডিজাইনের ব্লকও তৈরী হচ্ছে। বড় বড় প্যাকিং-হয়ে চালান যাচ্ছে সব জিনিস। এখানে বসেও বিক্রী হচ্ছে। আমরা কিছু টাকার রুমাল, টেবিল ক্লথ, জানালার পর্দা প্রভৃতি কিনলাম।

ইতিমধ্যে বাস এসে পড়লো। ট্রেনের জন্য অপেক্ষা না করে আমরা বাসেই উঠে পড়লাম। জায়গা নেই, আটজনকে দাঁড়িয়েই আসতে হলো। তবু আগে ফেরা গেল, এইটুকুই লাভ।

দাবি

শ্রীনবগোপাল সিংহ

না, না, আজ আর কোন কথা নয়। কাকুতি-মিনতি, আবেদন-নিবেদন অনেক হয়েচে, আর নয়। আজ ঘেরো মালিককে, ঘেরো, ঘেরো, ঘিরে ফেলো। দেখতে দেখতে কারখানার শতশো কুলি আপন আপন কাজ ছেড়ে ঘিরে ফেললো মালিককে। হপ্তা চাই, ভুঁখা হুঁ।

"তা আমাকে আটলে রাখলে কি হবে? আমাকে ছেড়ে দাও, ভাবতে দাও, টাকার যোগাড় করতে সময় দাও।" মালিকের পাল্টা আবেদন। মজুরেরা কিন্তু নাছোড়বান্দা। তারা বলে, ভাববার সময় দেওয়া হয়েছে অনেক, কিন্তু আজ ছ'মাসের মধ্যে কোনো ব্যবস্থাই হয়নি। এমন স্তোকবাক্য তারা অনেক অনেক বার শুনেচে, আর নয়। এখন একমাত্র উপায় হলো মালিককে আটকে রাখা, খেতে যেতে না দেওয়া। ক্ষিদে যে কাকে বলে, অভুক্ত থাকার যে কি যন্ত্রণা তার একটা বাস্তব অনুভূতি হওয়া চাই মালিকের। 'কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে' ,এই রকমের ভাবটা আর কি।

অভ্র শিল্পাঞ্চলের একটা কারখানার কথা। অনিয়মিত মাইনে আর ঘেরা ঘেরির ব্যাপার নিত্য-নৈমিত্তিক। মালিক সারাদিন বন্দী থাকলো। সিপাহী এলো, দারোগা এলো। মালিক মুক্তি পেলো সন্ধ্যের পর। কিন্তু এ-কাহিনীর উদ্দেশ্য ভিন্ন। সেই গল্পই বলচি।

এ কারখানায় বিশ বছরের চাকরী আমার। দীর্ঘ দিনের একটা নিয়ম দেখে আসচি— বিকেল চারটের সময় কিছু দানা (বুট) ছড়ানো হয় কবুতরদের উদ্দেশ্যে। পায়রাগুলো সারাদিন যেখানেই থাক্, ঠিক সময়ে এসে বসে ঠিক একই জায়গায়, টিনের চালে। গ্রীষ্ম বর্ষা শীত, মুক্ত বা মেঘে-ঢাকা আকাশ, প্রাকৃতিক কোনো বিপর্যয়ই এদের যথাসময়ে উপস্থিতির কোনো ব্যতিক্রম ঘটাতে পারে না। ওরা ভিড় জমালেই বুঝতে হবে বেলা চারটে। কৌতূহলবশতঃ পরীক্ষাও করা হয়েচে অনেক দিন। একজন সর্দার গোছের লোক, একটা নির্দিষ্ট কুঠরী থেকে বের করে দানা ছড়ায়। তার অনুপস্থিতিতে অন্য কেউ বা।

পরশু দিনের কথা। সর্দারটা আসেনি। আমিও নানান কাজে ব্যস্ত ছিলাম, খেয়াল ছিল না যে দানা ছড়ানো হয়নি। বিশ বছরে মালিক অনেক বদলেচে, কিন্তু দানা ছড়ানোর নিয়ম বদলায়নি। পরিমাণে কিছুটা কমেছে আজকাল।

পাঁচটায় ছুটি হ'লে তালা বন্ধ করে বেরুতে যাবো। ফড়ফড় করে উড়ে এসে ঘিরে ধরলো রং-বেরঙের প্রায় দুশো পায়রা। ঘুরতে লাগলো আমার গা-ঘেঁষে চারপাশে। কি ব্যাপার? কুবুতরগুলো এরকম করচে কেন? হঠাৎ খেয়াল হলো—ঝারি গোপ আসেনি, দানাও দেওয়া হয়নি আজ। তাই আমি আজকের মত চলে যাচ্ছি দেখে আমাকেই ঘিরে ধরেচে, ঠিক ক'দিন আগে কুলিরা যেমন ঘিরেছিল ওদের মালিককে।

হোক পাখী, তবু ওদের দাবি ওরা ছাড়বে কেন?
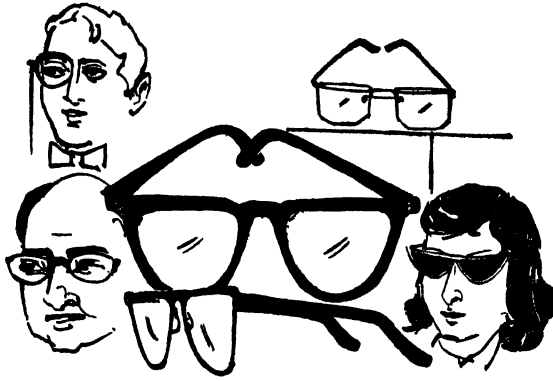
চশমার কথা

শ্রীস্বরূপ সিংহ

তোমার বুড়ো দাদুকে একটা মোটা কাঁচের চশমা পরে থাকতে দেখো। দাদা, বাবাকেও রোদের সময় কাল কাঁচের চশমা পরে বেরুতে দেখতে পাও। চশমা অনেকেই ব্যবহার করে। কেউ প্রয়োজনে চশমা পরে, প্রয়োজন অর্থাৎ কেউ যদি চোখে কম দেখে, ডাক্তারের কথা মত তখন তাকে চশমা পরতে হয়। কেউ একটা ষ্টাইলের জন্য চশমা ব্যবহার করে, এটা তার একটা ফ্যাসান। সভ্য মানুষ ঠিক কখন থেকে চশমা চোখে দিয়ে আসছে সে বিষয়ে তোমরা কিছুই জানো না হয়তো ?

১২৮৫ খৃঃ অব্দে ইটালীর "ফ্লোরেন্স আর্মাসিও" প্রথম চশমা আবিষ্কার করলেন। সে চশমা ছিল এক চোখের। দু'পাশ থেকে দুটো ফিতে দিয়ে বাঁধা কিংবা সুতার ফাঁস লাগানো। হ্যাঁ, একটা কথা, গণ্যমান্য বা গুরুজন স্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলবার সময় চশমাটি খুলে রাখা তখনকার দিনের প্রচলিত রীতি ছিল। আদালতে বিচারকের সামনে চোখে চশমা দিয়ে কথা বলাও একটা গুরুতর অপরাধ বলে মনে করা হোত, এবং এ অপরাধের কোন মার্জনা ছিল না। অনেক দিন, অর্থাৎ প্রায় ১০০ বছর পর্যন্ত সারা দেশে চশমার প্রচলন খুবই প্রসার লাভ করল। চশমা ব্যবহার করাকে সেদিন সাধুতা, বিচারবুদ্ধি এবং সৎচরিত্রের নিদর্শন রূপে গণ্য করা হ'ত। মহিলাদের মধ্যেও চশমার ব্যবহার সেদিন থেকেই সুরু হয়ে গেল। ক্রমশঃ চশমার উন্নতি হতে আরম্ভ করল। দু'একটা নূতন ডিজাইনও বেরিয়ে গেল। চশমার একটা নূতন রূপান্তরও ঘটল। এর নাম হ'ল লর্নেট। এই লর্নেট ছিল একটা ছোটখাট নলচে যার দুটো দিকই লেন্স দিয়ে ঢাকা। নূতন চশমা লর্নেট খুবই জনপ্রিয় হতে থাকল। ক্রমে এক চোখের চশমা বিদায় নিল। একই ফ্রেমে দুটি কাঁচ বসানো দু'চোখের চশমা হ'ল চালু।

উনবিংশ শতাব্দীর সুরু হবার কিছু পরেই চশমা আরো উন্নতির পথে অগ্রসর হতে থাকল। বর্তমানে এর চাহিদা, উপযোগিতা এবং ফ্যাসান সামাজিক রীতিনীতির জন্য খুবই বেড়ে গেছে। সোনা, রুপো, সেলুলয়েড প্রভৃতি ধাতুর ও বস্তুর বিভিন্ন রকমের ফ্রেমে কাচ লাগিয়ে আজ বিভিন্ন দেশের মানুষের চোখে শোভা পাচ্ছে এই রকমারি চশমা। জাপানে চশমার ব্যবহার সবচেয়ে বেশী। এক এক দেশে আজ শতকরা ৭০-৭৫ জন লোকের চোখ খারাপ এবং তারা চশমা ব্যবহার করে থাকে। ভবিষ্যতে এই চশমার চাহিদা আরো অগ্রগতির পথে যাবার আশা রয়েছে।

বর্ষা এলো

শ্রীরাজীব বিশ্বাস

আকাশ জুড়ে মেঘ জমেছে
আঁধার ঘিরে আসে,
হৃদয় আমার নেচে ওঠে
ছুটির-ই আশ্বাসে।
মেঘের ভিড়ে হারিয়ে গেছে
নীল আকাশের রঙ,
পাঠশালে ঐ ছুটির ঘণ্টা
বাজলো রে ঢঙ ঢঙ।

কেয়াবনের ভেতর দিয়ে
আসলো ছুটে হাওয়া,
নারিকেলের উচ্চশিরে
মর্মরিয়া গাওয়া।
ঝুরু ঝুরু কদম রেণু
ঝরে পথের পরে'
তমাল বনে নিবিড় ছায়ে
দাদুরী তান ধরে।

বিজন বাটে পথিক একা
চলেছে খরতর,
ত্রস্ত গাভী ডাকছে মাঠে
কাঁপছে থরথর।
বেতস বনের ওপার হতে
বৃষ্টি এলো নেমে,
ঝরিয়ে সুধা তৃষ্ণাহরা
অকুণ্ঠিত প্রেমে।
দিগ্‌বালিকা বরণ-মালা
পরালো তার গলে।
আকাশ ছেয়ে বরষা এলো,
হরষে ধরাতলে।

কাঁকর-পথের যাত্রী

(উপন্যাস)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

৭

শম্ভুচরণের দিদি অন্নপূর্ণা। তাঁর স্বামী ব্রজরাজ রাঁচীর কলেজে প্রফেসর এবং ভাইস-প্রিন্সিপাল। তাঁরা থাকেন রাঁচীতে। অগ্রহায়ণ মাসের দু' তারিখে অন্নপূর্ণা এলেন টালায়, তাঁর বড় ছেলে ছকুকে নিয়ে। ছকু রাঁচীতে বি-এ পড়ে। টালায় থাকেন ব্রজরাজের ছোটভাই হেমরাজ—ইনি টালা ওয়াটার ওয়ার্কস্-এ কাজ করেন। তাঁর মেয়ের বিবাহ। সেই বিবাহে অন্নপূর্ণা এলেন নিমন্ত্রণে। বিবাহের দু-তিন দিন পরে অন্নপূর্ণা এলেন বেলেঘাটায় উমাচরণের গৃহে—সেখানে যাওয়া-আসা তেমন ঘটে না। ভাবলেন, যখন বহুকাল পর কলকাতায় এসেছেন তখন একবার বেলেঘাটায় ক'দিন থেকে যাবেন। ছেলে ছকু বল্লে,—আমি মা, থাকতে পারবো না—আমার পার্সেন্টেজ কম পড়বে…' মা বল্লেন, তুই যা, আমি পাঁচ-সাত দিন পরে যাব। চুণী কি

তাই হ'ল। মাকে বেলেঘাটায় রেখে ছুকু রাঁচী চলে গেল। অন্নপূর্ণাকে পেয়ে উমাচরণ, পার্বতী দেবী···সকলেই মহাখুশী। উমাচরণ বল্লেন,—তোর সঙ্গে মা, বৈষয়িক পরামর্শ কিছু আছে : তুই তো জানিস, এ বাড়ীর পেছন দিকে ঐ যে ডোবা আর কলাবাগান ছিল···ওটা বহুকাল আগে কিনেছিলুম। ভেবেছিলুম, শম্ভু ও জমির বিলি-ব্যবস্থা করবে, কিন্তু কাজের ধান্দায় তাকে এখান-সেখান ঘুরে বেড়াতে হয়—বাড়ীতে এসে দু'দিনের বেশী তিন দিন থাকতে পারে না। তোকেই বলি আমার মনের কথা,—ও জমিটা ডোবা বুঝিয়ে, কলাবাগান সাফ করিয়ে, ওখানে একতলা একটা বাড়ী করি। তোর কি মত? বৌমা বলেন, তিনি ওসব বোঝেন না।

অন্নপূর্ণা বল্লেন,—আমিও ওই কথা বলি কাকাবাবু, আপনি যা ভাল বোঝেন করুন।

পিসীমা আসা ইস্তক, চুনী সাহেব যতক্ষণ বাড়ী থাকেন, পিসীমার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন, কেন না, পিসীমা উমাচরণকে বার বার মিনতি জানাচ্ছেন, রাঁচীতে তাঁর ওখানে দু-চার মাস থাকবার জন্ত। চুনী সাহেবের ভয়, এর মধ্যে পিসীমার নিশ্চয় মতলব আছে : সে মতলব কাকাবাবুকে হাত করে বিষয়-সম্পত্তি কিছু লিখিয়ে নেবেন! প্রদীপের উপর দাদুর দরদের বহর দেখে সে সন্ত্রস্ত হয়ে আছে, এখন আবার তার উপর পিসীমা!

আজকের আসরে চুনী সাহেব উপস্থিত,—পিসীমাও ঠিক কথা বলেছেন, দাদু। আপনি যেমন ভাল বুঝবেন এমনকি আর কেউ বুঝবে? আমিও বলি,—আপনি এখন দাদু আর কোন দিকে মন না দিয়ে জমিটার দিকেই মন দিন।

পাঁচ-সাত দিন পরে রাঁচী থেকে চিঠি এল ব্রজরাজের খুব জ্বর···অন্নপূর্ণা বল্লেন,—আমি তাহলে আজকে রাত্তিরের গাড়ীতেই চলে যাই। কিন্তু কার সঙ্গে যাব ইন্দ্র?

পান্না বলে উঠল,—না, না, ইন্দ্র যাবে কি? আমি নিয়ে যাব।

উমাচরণ বল্লেন,—তোমার টেস্ট পরীক্ষা?

পান্নার বুকখানা ধড়াস করে উঠল। মনে সাহস সঞ্চয় করে সে বল্লে,—আমার পরীক্ষা তো ডিসেম্বরের সেকেণ্ড উইকে। আমি বইটই নিয়ে যাব, ওখানে পড়বো। পিসেমশায় আছেন, ছকুদা আছে···আমার খুব হেল্প হবে। তাছাড়া সেখানে তো আর আমি থাকতে যাচ্ছি না পিসীমাকে পৌঁছে দেওয়া শুধু···পিসেমশায় পথ্য পেলেই আমি চলে আসবো।

এই ব্যবস্থা মত পান্না পিসীমাকে নিয়ে রাঁচী গেল। রাত্রে মানিক বল্লে,—প্রদীপদা মেজদার প্ল্যানটা বুঝেছো? প্রদীপ বল্লে,—এর মধ্যে আবার প্ল্যান কি? পিসেমশায়ের অসুখ, পিসীমাকে নিয়ে যাচ্ছে···

মানিক বল্লে,—হুঁ:, পিসীমা পিসেমশায়ের জন্ত ভাবনায় ওঁর যেন ঘুম হচ্ছে না। দেখেনিও,

আমি বলে দিচ্ছি, বগলে পেঁয়াজ পুরে জর করে টার্মিন্যাল পরীক্ষায় ফাঁকি দিয়েছেন, এখন টেস্ট পরীক্ষায় ফাঁকি দেবার জন্য এই রাঁচী।

ঈষৎ ভর্ৎসনার সুরে প্রদীপ বল্লে,—না মানিক, এ তোমার ভারী অন্যায়, পানুদা তোমার বড় ভাই তাকে তুমি সম্মান করতে না পার আপমান করবে না। সেই যে সেবার তুমি পানুদাকে ভূত সাজবে বলেছিলে, যার জন্যে পানুদা তোমায় চড় মেরেছিল, আমি কোন কথা কইনি…কেন না সেবারে তুমিই আপরাধ করেছিলে।

ব্রজরাজের অসুখ তেমন কঠিন নয়,—তবে তিনি একটু "নালা কাতুরে" মানুষ। একটু সর্দি-কাশি হলেই তিনি ভাবেন এবার নিউমোনিয়া হলো! পিসীমা অন্নপূর্ণা তাকে বরাবর সামলে নিয়ে আসছেন। এবারেও একটু জর হতেই তিনি ছেলেদের বল্লেন,—তোমাদের মাকে আনাও, আমার অসুখটা সিরিয়াস মনে হচ্ছে। কাজেই ছকু মাকে চিঠি লিখে আনাতে বাধ্য হয়েছে।

অন্নপূর্ণা আসবার তিনদিন পরেই ব্রজরাজ সুস্থ হয়ে পথ্য করলেন এবং নিয়মিত কলেজ যাতায়াত শুরু হ'ল।

অন্নপূর্ণা বল্লেন পান্নাকে,—এবার তুমি বাড়ী ফেরো বাবা, তোমার সামনেই টেস্ট পরীক্ষা।

পান্না বল্লে,—আমার পরীক্ষা সেই ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি, তার পাঁচ-ছ'দিন আগে গেলেই চলবে। পড়াশুনা আমার সব তৈরী,—তাছাড়া এখানে দরকারি বই, খাতা এনেছি। রাঁচীতে এলুম,—কোথাও তো যেতে পাই না—রাঁচী শহরটা একবার দেখবো না? এর পরে পিসীমা আর কিছু বল্লেন না। স্নেহের ভাইপো,—তার বিদ্যার দৌড় তো পিসীমা জানেন'না,—ভাবলেন, আহা, কোথায় যেতে পায় না রাঁচীতে এসেছে দু'দিন থাকুক।

পান্না খোশ-খেয়ালে রাঁচী শহর প্রদক্ষিণ করে বেড়ায়। কোন দিন কোন পাহাড়ে চড়ে, কোন দিন যায় মোরা-বাদিতে, সেখানে পাহাড়ের বুকে জ্যোতিঠাকুরের বাড়ীটি ভারী চমৎকার লাগে। সন্ধ্যার পরে বাড়ী ফিরে দেখে পিসীমার দুই ছেলে ছকু আর লকু বসে লেখাপড়া করছে। চক্ষুলজ্জায় পড়ে সেও বই খুলে বসে—এক ছত্রও পড়ে না, শুধু বইয়ের পাতা ওল্টায়। কত কি আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকে—যতক্ষণ না রাত্রে খাবার ডাক পড়ে ততক্ষণ বইয়ের পাতা উল্টে সময় কাটাতে হয়। খাওয়া চুকলেই শয়ন ও নিদ্রা।

ইংরেজীতে একটা কথা আছে: যে সব পাখী একই জাতের, দেখা হলেই তারা বেশ মিশ খায়, খেয়ে জোট বাঁধে, (Birds of the same feather flock together)। পান্না তার

স্বগোত্রকে একদিন পেয়ে গেল…হঠাৎ সেদিন পুরুলিয়া রোড ঘুরে যাবার পথে একটা বাংলো-বাড়ীতে শুনলো "এ্যাকটিং" হচ্ছে। পান্না থমকে দাঁড়াল। দেখলো, বাংলোর ফটকে কাঠের একটা সাইনবোর্ডে লেখা "রবীন্দ্র-নাট্য সমিতি"। পান্নার মনে হোল, এতক্ষণে রাঁচীতে আসা সার্থক হোল। পা টিপে টিপে সে বাংলোর মধ্যে ঢুকলো। সামনে বারান্দায় উঠতেই সমবয়সী এক ছোকরার সঙ্গে দেখা। ছোকরা বল্লে,—কি চান? সসঙ্কোচে পান্না বল্লে,– আপনাদের রিহার্সাল হচ্ছে না? ছোকরা বল্লে—হ্যাঁ।

পান্না বল্লে, আমিও এ্যামেচার থিয়েটার করি কলকাতায়। কলকাতায় রেডিয়োতে মাসে একটা করে নাট্যাভিনয়ে পার্ট পাই (এটা "গুল" তোমরা বুঝতেই পারছো)। আপনাদের রিহার্সালে একটু বসতে দেবেন?

ছোকরার দু'চোখ বিস্ফারিত হোল? সে বল্লে,—বটে! আসুন ভিতরে। পান্নাকে নিয়ে ছোকরা ঘরে ঢুকলো, সকলে মুখের দিকে তাকাল। ছোকরা বল্লে,—ইনি কলকাতার রেডিয়োর ড্রামায় প্লে করেন।

সকলে খাতির করে পান্নাকে বসালো,—কি কি ড্রামায়, কি কি পার্ট প্লে করেছেন? পান্না অসঙ্কোচে যা খুসী জবাব দিয়ে চল্ল। বল্ল,—সাজাহানে ঔরঙ্গজেব, চন্দ্রগুপ্তে চাণক্য, চন্দ্রশেখরে প্রতাপ, রাণা প্রতাপে প্রতাপ, ইত্যাদি।

একজন বল্লে,—কিন্তু আমি রেডিয়োর প্রত্যেকটা নাটক মন দিয়ে শুনি, আপনার নাম কখনও শুনেছি বলে মনে পড়ছে না।

মৃদু হেসে পান্না বল্লে,—আমি নিজের নাম দিই না। বাড়ীতে জানতে পারলে ধমকাবে তাই ছদ্মনামে প্লে করি।

সকলে বল্লে—ও!

তারপর পরিচয়: কলেজের প্রফেসার ব্রজরাজবাবু তার পিসেমশায়, তার নাম পান্না। সে এসেছে কিছুদিনের জন্যে রাঁচী বেড়াতে—A change!

তারা জিজ্ঞাসা করল,—ক'দিন থাকবেন এখানে? পান্না বল্লে,—ইচ্ছা আছে বড়দিন পর্যন্ত থাকবো।

তারা—বল্লে, তাহলে আমাদের এই নাটকেও একটা পার্ট নিন। আমাদের সমিতির নাম "রবীন্দ্র-নাট্য সমিতি"।

পান্না বল্লে,—আপনারা কি নাটক প্লে করেছেন?

তারা বল্লে,—আমাদের নিজের লেখা নাটক "ঘূর্ণির কবলে"।

পান্না বল্লে,—আপনাদের সমিতির নাম "রবীন্দ্র-নাট্য সমিতি"—রবি ঠাকুরের কোন নাটক করেন না কেন ?

তারা বল্লে,—রবি ঠাকুরের নাটক মশায় কে বুঝবে, আর তাছাড়া ওতে অনেক হাঙ্গাম।… দেখুন, আপনি কোন পার্ট নেবেন ?

পান্না বল্লে,—কি পার্ট ?

আমাদের হিরো সাজবার কথা যাঁর, তাঁর বাবা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ; তিনি বদলী হয়ে পাটনা চলে যাচ্ছেন—আমাদের হিরোকেও যেতে হবে। সেই পার্ট।

পান্না বল্লে,—পার্টটায় প্লে করবার মত বেশ মসলা আছে তো ? মানে, জেশ্চার-পশ্চার দেখাবার আর গলা কাঁপিয়ে বড় বড় কথা বলবার চান্স ?

তারা বল্লে,—বহুত।

পান্না বল্লে,—করবো।

সকলে মহাখুশী। যে ছোকরা হিরোর পার্ট করবে তার নাম ইন্দ্রনীল। তাকে সকলে বল্লে,—তোমার পার্ট লেখা কপিটা এঁকে দিয়ে দাও। তখুনি ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল। পান্নাকে পার্ট-লেখা কপি দেওয়া হোল এবং তাকে বলা হোল বিকেলে বেলা ৫টা থেকে রাত নটা পর্যন্ত এবং সকালে বেলা ৭টা থেকে বেলা ১০টা পর্যন্ত রোজ আমাদের রিহার্সাল। আসতে পারবেন তো ?

পান্না বল্লে,—হ্যাঁ নিশ্চয়ই আসবো। সমিতির সেক্রেটারি এবং নাট্যাচার্য প্রভৃতি সকলের সঙ্গে পরিচয় হোল। সেক্রেটারির নাম মৃত্যুঞ্জয় আর নাট্যাচার্যের নাম অক্ষয়কান্ত।

অক্ষয় বল্লে, —আজ ব'সে রিহার্সাল শুনুন, নাটকটা follow করতে পারবেন। তারপর পার্টটা বাড়ী নিয়ে যাবেন—পড়ে রাখবেন। আর কাল থেকে আপনি রিহার্সাল শুরু করবেন।

(ক্রমশঃ)

ভাদ্রে

শ্রীশৈলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাদ্রেতে বিকশিত কদম্ব ফুল, শাখে শাখে পুষ্পিত গন্ধে আকুল।
চঞ্চল ভৃঙ্গল গুঞ্জরে তায়; ময়ূরকণ্ঠী নীল আকাশের গায়।
সুদূর পাহাড়-নীলে স্বপনের দেশ, সেথা হ'তে আসে কার উল্লাস রেশ।
মেঠো-পথে ওঠে গান আনন্দ সুর, সেই সুর ভেসে যায় দূর হ'তে দূর।
শিহরিছে নদী-জল টইটুম্বুর, ওপারেতে বেণু-বনে হাওয়া ঝুরঝুর।
এ পারেতে শালবনে রাখালের দল, খেলে 'ছুঁই' 'ছুঁই' খেলা খুশীতে পাগল

নভোলোকের রহস্য

শ্রীদিলীপকুমার সিংহ

মাথার উপরে মেঘযুক্ত নীল আকাশ দেখলে কার না আনন্দ হয়। কিন্তু এই বিরাট নিঃসীম তার কতদূর পর্যন্ত বায়ুর স্তর বিস্তৃত তা তোমরা বোধ হয় অনেকেই জানো না। বর্তমান লে বৈজ্ঞানিকগণ বেলুন ও রকেটের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, পৃথিবীকে বেষ্টন রিয়া যে বায়ুর স্তর আছে তাহা মহাশূন্যে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, গঠন ও প্রকৃতি খুবই জটিল ও স্তময়।

একশো বছর আগে বিজ্ঞানীরা মনে করিতেন যে, বায়ুমণ্ডলের গঠন খুবই সরল। যত ারে উঠা যায়, বায়ুস্তরের ঘনত্ব ততই কমিয়া আসে, পরিশেষে মহাশূন্যের শূন্যতায় মিলাইয়া য়। কিন্তু তখন তাঁহারা বায়ুর বিভিন্ন স্তর যে কত জটিল ও তাহার বিভিন্ন অংশে যে কত দ্ভুত বিচিত্র খেলা চলে জানিতেন না। আজকাল উচ্চ বায়ুস্তরে পর্যবেক্ষণ যন্ত্রবাহী রকেট ও ত্রিম পার্থিব উপগ্রহ পাঠাইয়া অনেক নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই অনুসন্ধান ার জন্য সারা জগৎব্যাপী বৈজ্ঞানিক তোড়জোড় সুরু হইয়াছে ১৯৫৭ সালের ১লা জুলাই হইতে ৯৫৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ভূতত্ত্ব বৎসরে। বায়ুমণ্ডলের চারিটি স্তর আছে। ্নিম্ন ঘন বায়ুস্তরটির নাম ট্রপোস্ফিয়ার (troposphere)। পৃথিবীর উপরিভাগে ঠিক আমাদের বার উপর হইতেই এই স্তরের সুরু। ইহার ঘনত্ব বিষুবরেখার সন্নিকটস্থ স্থানে ১০ মাইল ও মেরুতে পাঁচ মাইল। ট্রপোস্ফিয়ারের উচ্চতম সীমা হইতে উর্ধ্বে ৫০ মাইল বিস্তৃত বায়ুস্তরের ম স্ট্রাটোস্ফিয়ার (stratosphere)। ইহার পর হইতে মহাকাশে ২৫০ মাইল পর্যন্ত স্থান ড়িয়া যে বায়ুস্তর তাহার নাম আয়নস্ফিয়ার। অবশ্য এই সীমারেখারও বাহিরে এই স্তরের স্তিত্ব আছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। আয়নস্ফিয়ারকেও অতিক্রম করে যে বায়ুস্তর তাহাকে ক্সোস্ফিয়ার (Exosphere) বলে। এইটি মহাশূন্যের বায়ুস্তরের এমনই স্তর, যাহাকে গ্রহরাজ্য কে পৃথক করা যায় না। পৃথিবীর উর্ধ্বে ১৮,০০০ মাইল পর্যন্ত এই বায়ুস্তর বর্তমান। য়নস্ফিয়ারের অর্ধাংশ ও এক্সোস্ফিয়ার সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা সঠিক কিছু জানতে ারেন নি।

পৃথিবীকে বেষ্টন করে একটি বায়ুস্রোত আছে (the get stream) উত্তর গোলার্ধে ইহা ৩,০০০ ফিট হইতে ৪০,০০০ ফিট উচ্চে পশ্চিম হইতে পূর্বে সারা বৎসর ধরিয়াই প্রবাহিত হয়। ই বায়ুস্রোতে পড়িয়া পশ্চিম হইতে পূর্বগামী দূরপাল্লার উড়োজাহাজগুলি অনেক দ্রুত পরিভ্রমণ রে।

স্ট্রাটোস্ফিয়ারের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল নিম্নভাগে ১০ মাইল হইতে ২০ মাইল উচ্চতায় ওজোন গ্যাসের স্তর। ওজোন গ্যাস, যে অক্সিজেন গ্যাস আমরা নিঃশ্বাসের সহিত গ্রহণ করি তাহারই প্রকারান্তর। ইহার প্রতি অণুতে (molecule) তিনটি করিয়া অক্সিজেনের পরমাণু (atoms) আছে। কিন্তু অক্সিজেন গ্যাসের অণুতে দুইটি করিয়া অক্সিজেনের পরমাণু থাকে। সূর্য হইতে প্রতিনিয়ত তীব্র আলট্রা-ভায়োলেট আলোক বিচ্ছুরিত হয়। তাহার বেশীরভাগ অংশ শোষণ করে ওজোন গ্যাসের স্তর। ফলে, পৃথিবীর মানুষ, জীবজন্তু ও গাছপালাকে এই আলট্রা ভায়োলেট আলোকের সম্পূর্ণ বিকিরণ সহ্য করিতে হয় না। তাহা না হইলে পৃথিবীর সব কিছুই শুকাইয়া যাইত।

স্ট্রাটোস্ফিয়ারের উর্ধ্বে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া আয়নস্ফিয়ারের রহস্যময় বিরাট অজ্ঞাত রাজ্য। আমেরিকান ও সোভিয়েট বিজ্ঞানীগণ বহু বৎসর ধরিয়া মহাকাশে রকেট, কৃত্রিম উপগ্রহ নিক্ষেপ করিয়া এই অনন্ত রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই স্তরে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারিত হয়। অতি-দূরত্বের বেতার-তরঙ্গ প্রেরণে ইহা খুবই সাহায্য করে। পৃথিবী হইতে প্রেরিত বেতার-তরঙ্গ আয়নস্ফিয়ারে ধাক্কা খাইয়া আবার পৃথিবীতেই ফিরিয়া আসে। বিজ্ঞানীগণ অতি-দূরত্বের বেতারবার্তা প্রেরণের উন্নতির জন্য আয়নস্ফিয়ারের প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছেন। তোমরা নিশ্চয় জানো, সূর্য একটি বিশাল জ্বলন্ত বাষ্প-পিণ্ড। ইহা আয়তনে পৃথিবী অপেক্ষা ১৩,০০,০০০ গুণ বড়। সূর্যের উপরিভাগে প্রায়ই বিস্ফোরণ হয়। এই সকল বিস্ফোরণের শক্তি প্রচণ্ড ধ্বংসকারী শক্তিসম্পন্ন হাইড্রোজেন বোমা বা এটম বোমের অপেক্ষা অনেক অনেক গুণ বেশী। এই সকল বিস্ফোরণের সময় আয়নস্ফিয়ারে বেশ গোলযোগ ঘটে, তখন বেতার-তরঙ্গ প্রেরণে বেশ ব্যাঘাত হয়। উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে সময় সময় একপ্রকার অত্যুজ্জ্বল আলোক দেখা যায়। তাহা তোমরা অবশ্যই শুনিয়াছ। এই আলোকের নাম উত্তর মেরুতে উত্তর মেরু-জ্যোতিঃ (aurora borealis) ও দক্ষিণ মেরুতে দক্ষিণ মেরু-জ্যোতিঃ (aurora australis) বলে। সূর্যে অবস্থিত হাইড্রোজেন গ্যাসের পরমাণু দ্বারা ইহার সৃষ্টি হয়। এই আলোকের উৎপত্তি আয়নস্ফিয়ারে। সূর্য অথবা অন্যান্য জ্যোতিষ্ক হইতে আর এক প্রকার আলোক বিক্ষিপ্ত হয়, তাহাকে মহাজাগতিক রশ্মি (cosmic ray) বলে। গ্রহে ও উপগ্রহে অভিযান করিবার পূর্বে, মহাকাশে রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে মানুষ পাঠাইয়া এই সকল বিভিন্ন আলোক রশ্মির প্রকৃতি ও মনুষ্য দেহের উপর প্রভাব নির্ণয় করিবার জন্য বহু গবেষণা চলিতেছে।

সর্বশেষ বায়ুস্তর এক্সোস্ফিয়ারে বায়ু স্থির ও অত্যন্ত পাতলা। এই স্তর সম্বন্ধে আমাদের অধিকাংশ জ্ঞানই কল্পনাপ্রসূত। ইহার সম্বন্ধে অথবা আয়নস্ফিয়ারের উচ্চতম সীমার প্রকৃতি, তাহা কেমনভাবে বেতার-তরঙ্গ ও পৃথিবীর আবহাওয়া নিয়ন্ত্রিত করে প্রভৃতি বিষয়ে এখনও পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে কিছুই জানা যায়নি।

আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে জ্ঞানপিপাসু মানুষের অক্লান্ত চেষ্টা ও অদম্য উৎসাহ মহাকাশের এই গূঢ় রহস্যে নিশ্চয়ই আলোকপাত করিবে।

বিচিত্র-সংবাদ
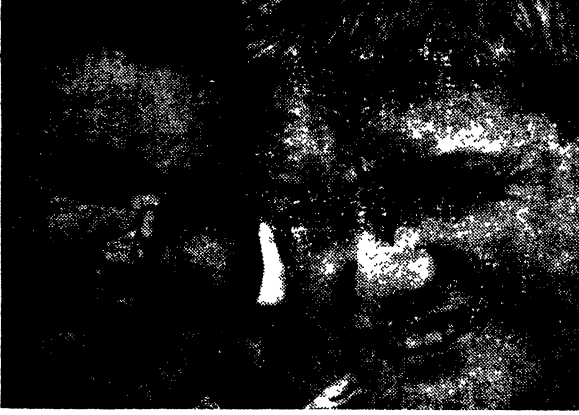
ঝিঁঝিপোকা ধরার মজা

প্রত্যেক দেশেই বোধহয় ছাত্রদের মাস্টার মশাইদের কিছুটা উপদ্রব সহ্য করতে হয়। গরমের দিনে সন্ধ্যাবেলায় গাছের কচিপাতা খাবার লোভে হাজার হাজার ঝিঁঝিপোকা উড়তে থাকে। জার্মান ছেলে-মেয়েরা তাদের ধ'রে দেশলাইয়ের খালি খোলের মধ্যে পুরে রাখে। ওদের মধ্যে ঝিঁঝিপোকার আবার বিনিময়ও চলে—যেমন বড়র বদলে চারটে ছোট পাওয়া যায়। যাহোক এ তো গেল ঝিঁঝিপোকা ধরার ব্যাপার। আসল মজা হয় ক্লাসে। সেখানে চুপিচুপি তারা ঝিঁঝিপোকা ছেড়ে দিয়ে মজা দেখে। অনেক মাস্টারমশাই চটে গিয়ে হম্বিতম্বি করেন, কিন্তু চালাক মাস্টারমশাইরা সঙ্গে সঙ্গে পড়ার বিষয় বদলে ঝিঁঝিপোকা সম্বন্ধে লেকচার দিতে শুরু করেন—যেমন, ঝিঁঝিপোকা মাত্র কয়েক সপ্তাহ বাঁচে, স্ত্রী ঝিঁঝিপোকা মাটির নিচে ডিম পাড়ে, ডিম থেকে গুটি হয়, গুটিগুলো গাছের শেকড় খায়, তারপর একদিন গুটি থেকে ··। ব্যাস! ছাত্রদের মুখ চুন!

গ্যারেজের ছাদে ভেড়া চরার মাঠ

কোন শহরের মাঠে না হয়ে যদি বাড়ির ছাদে ভেড়া চরতে দেখ, তোমরা তাহলে নিশ্চয়ই থমকে দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে দেখবে! পশ্চিম জার্মানীর হামবুর্গ শহরের এক বিরাট গ্যারেজের মালিক তার গ্যারেজের ছাদে সবুজ ঘাসের এক বন বানিয়েছিল। কিছুদিন বাদে ঘাস বড় হয়ে ওঠাতে কাটার জন্যে তাকে একজন মালী রাখার কথা ভাবতে হ'ল, কিন্তু পশ্চিম জার্মানীতে শ্রমিকের বড় অভাব, যাও বা পাওয়া যায় তাদের মজুরি বড় বেশি। তাই সবদিক ভেবেচিন্তে তিনি দুটো ভেড়া এনে ছাদে ছেড়ে দিলেন। সবুজ কচি ঘাস খেয়ে ভেড়া দুটি এখন বেশ নধরকান্তি হয়েছে। শুধু তাই নয়, শহরের বেশির ভাগ ছেলে-বুড়ো জীবনে যারা ভেড়া দেখেনি, তারাও ভেড়া দেখার লোভে গ্যারেজের ছাদে জড় হচ্ছে। তারাও শুধু হাতে আসে না, অবলা জীব দুটির জন্যে ভালোমন্দ খাবার

নিয়ে আসে। ভেড়া দুটি এখন এতো জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে যে, ছাদের ঘাস কোনদিন শুকি তাদের যাতে খাবারের কষ্ট না হয়, তার জন্যে পাড়া-প্রতিবেশীরা বেশ মোটা চাঁদা তুলে এ গড়ে তুলেছে। এসব দেখে-শুনে ব্যাপারটা যে এতদূর গড়াবে তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি।

মরা গাছের জীবনলাভ

পশ্চিম জার্মানীর নূরেনবার্গের কাছে একটা খামারে একটা গাছ আছে যেটাকে কে আবার নতুন ক'রে গজানো হয়েছে। খামারের মালিক ছিল "কলম" বাঁধার একজন

একজন প্রতিবেশীর নিয়ে সে খামারের দুটো "অ্যাশ গাছ" খামারের ফটকের পা "কলম" বেঁধে বসিয়ে গাছ দুটো জড়াজড়ি বেঁচে ওঠে ও বড় হয়ে ওপর খিলেন তৈরী ঘটনাটা ঘটে ৫৫ বছর দু'জনের মধ্যে বাজি গাছ বেঁচে উঠলে এক বিয়ার দিতে হবে। ত পিপে বিয়ার টেনে খ মালিক কিরকম বুঁদ হ সেকথা জানা যায়নি!

কিশোর বয়সে পথ শিক্ষালাভ

ডুসেলডর্ফের জা ইংরেজ ছেলেমেয়েদের চলার নিয়মকানুন শে জন্যে বৃটিশ মিলিটারি পুলিশ ও পশ্চিম জার্মান ট্রাফিক পুলিশ বিশেষ এক ব্যবস্থা গ্রহণ ক এই উদ্দেশ্যে খাস লণ্ডন থেকে গোরা পুলিশ ডুসেলডর্ফে এসেছে। ছোটদের চালাবা আনকোরা নতুন পনেরখানা মোটরগাড়ী পথচলার আইনকানুন শেখাবার কাজে ব্যবহার কর ছেলেমেয়েরা তাদের খেলার মাঠে এই গাড়ীগুলো চালাবে, আর দুই দেশের পুলিশবাহিনী আইনমাফিক গাড়ী চালাতে শেখাবে। ছোটবেলায় পথ-চলার আইনকানুন রপ্ত হয়ে গে হয়ে রাজপথে গাড়ী চালাবার সময় তারা সতর্কতা ও শৃঙ্খলার সঙ্গে গাড়ী চালাতে পারবে।
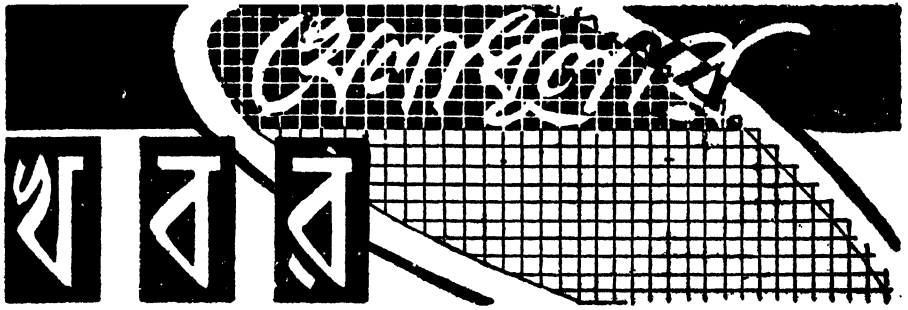
মেঠুড়ে

প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগ

ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগান ঃ মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল দলের চ্যারিটি খেলা গোলশূন্যভাবে শেষ হয়। খেলার প্রথমার্ধে ছিল ইস্টবেঙ্গল দলের আধিপত্য এবং দ্বিতীয়ার্ধে ছিল মোহনবাগানের পর্যাপ্ত প্রাধান্য। খেলার দ্বিতীয়ার্ধে প্রতি মুহূর্তে ইস্টবেঙ্গল রক্ষণব্যূহে ত্রাসের সঞ্চার করেও মোহনবাগান সুবিধেজনক জায়গা থেকেও গোলে সট করতে পারেনি, একমাত্র ইস্টবেঙ্গল দলের রক্ষণভাগের অনমনীয় দৃঢ়তার জন্য। প্রায় তিরিশ গজ দূর থেকে দু'বার দুটো লম্বা সট করা ছাড়া মোহনবাগান আর কিছু করতে পারিনি। এ খেলায় মোহনবাগানের পাঁচজন ফরোয়ার্ডের ভেতর তিনজন ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। তবু আক্রমণ রচনায় মোহনবাগানের পর্যাপ্ত প্রাধান্যের কারণ ছিল—চুণী গোস্বামীর চমৎকার খেলা, আর অমল চক্রবর্তীর আক্রমণের ধারা। এই দিন চুণী গোস্বামী যেরকম খেলা খেলেছেন, তা অনেক দিন দর্শকদের মনে থাকবে।

মোহনবাগান বনাম মহমেডান স্পোর্টিং ঃ কলকাতার প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগের আর একটা চ্যারিটি খেলা হয়ে গেছে। গতবারের লীগ চ্যাম্পিয়ন এবং এ বছরের লীগ কোঠায় শীর্ষস্থানের অধিকারী মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের গোলশূন্য এই চ্যারিটি খেলায় মোহনবাগানকে একটা মূল্যবান পয়েন্ট হারাতে হলেও লীগের অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি।

শক্তিশালী দলের সঙ্গে মহমেডান চিরদিন ভালো খেলে এটা নতুন কথা নয়। কিন্তু মোহনবাগানের সঙ্গে এই চ্যারিটি খেলায় মহমেডান দল সেই সংগ্রামী শক্তির পরিচয় দিতে পারেনি। খেলাটি যে গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হয়েছে, সেটা মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের খেলোয়াড়দের কৃতিত্বের পরিচয় নয়—মোহনবাগানের পুরোভাগের খেলোয়াড়দের গোল করার শোচনীয় ব্যর্থতায়। একটা খেলায় এমন আধিপত্য বজায় রেখে এবং কয়েকটা গোল করার স্বর্ণ সুযোগ পেয়েও যে মোহনবাগান গোল করতে পারিনি তা কতকটা অদৃষ্টের জন্যে।

উইম্বলডন চ্যাম্পিয়নশিপ

উইম্বলডন বিশ্ব টেনিসের শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা, বিজয়ীর সম্মানও অনন্ত। উইম্বলডন বিজয় বিশ্ব টেনিসের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানলাভ। উইম্বলডন জয় খ্যাতনামা টেনিস খেলোয়াড়দের জীবনের স্বপ্ন ও সাধনা। গতবারের রানার্স ফ্রেড স্টোলেকে ফাইন্যালে হারিয়ে, অস্ট্রেলিয়ার সুখ্যাত টেনিস খেলোয়াড় রয় এমারসন এবার উইম্বলডন চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছেন। যদিও গতবারের উইম্বলডন বিজয়ী অস্ট্রেলিয়ার মার্গারেট স্মিথকে মহিলাদের ফাইন্যালে ব্রেজিলের স্বনামধন্যা মেরিয়া বুনোর কাছে হার স্বীকার করতে হয়েছে, তবু চরাটে প্রধান প্রতিযোগিতার বিজয়ীর পুরস্কার গিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার ঘরে। পুরুষদের সিঙ্গলস ও ডাবলস, মহিলাদের ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস—সবেতেই বিজয়ী হয়েছে অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়রা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আঠারো বার ডেভিস কাপের খেলায় অস্ট্রেলিয়া জিতেছে এগার বার আর গত ন'বছরের উইম্বলডন অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়রা সাতবার বিজয়ীর সম্মান পেয়েছে।

ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ : ইংলণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া

দ্বিতীয় টেস্ট : ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হবার পর লর্ডস মাঠে দু' দেশের দ্বিতীয় টেস্ট খেলাও অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। বৃষ্টির জন্যে প্রথম টেস্টের প্রায় পনের ঘণ্টা সময় নষ্ট হয়েছিল, দ্বিতীয় টেস্টেও অর্ধেকের কিছু বেশি সময় নষ্ট হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় দিন একেবারেই খেলা হয়নি। তৃতীয় ও চতুর্থ দিন খেলা হবার পর আবার পঞ্চম দিন মধ্যাহ্ন-ভোজের বিরতির একটু পরেই খেলা বন্ধ হয়ে যায়। প্রথম টেস্টের মতন দ্বিতীয় টেস্টেও ইংলণ্ড বোলিং ও ব্যাটিং দু' দিকেই অস্ট্রেলিয়ার ওপর আধিপত্য করেছে। দুটো টেস্টের মধ্যে যে একজন খেলোয়াড় সেঞ্চুরী করেছেন, তিনি ইংলণ্ডের উঠতি খেলোয়াড় জন এডরিচ।

দ্বিতীয় টেস্টে ইংলণ্ড টসে জিতলেও বৃষ্টি-ভেজা উইকেটে প্রথম ব্যাট করার সুযোগ দিয়ে অল্প রানের ভেতরই ইংলণ্ড তাদের ইনিংশ শেষ করে দেয়। যে দু'দিন পুরো সময় খেলা হয়, সে দু'দিনেই পড়ে এগারোটা উইকেট। খেলার তৃতীয় দিন, অর্থাৎ খেলা আরম্ভের প্রথম দিন ১৭৬ রানে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস শেষ হবার পর, ইংলণ্ড ১ উইকেট হারিয়ে ২৬ রান তোলে। দ্বিতীয় দিন আবার ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস ২৪৬ রানে শেষ হবার পর, অস্ট্রেলিয়া ১ উইকেট হারিয়ে ৪৯ রান তোলে। এই খেলায় ডেক্সটার ওপেনিং ব্যাটসম্যান হিসেবে সুবিধে করতে না পা... ।, অধিনায়ক হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করে পরের তিনটে টেস্টের জন্যে ইংলণ্ডের অধিনায়কত্ব করার সম্মান পান। আর ফ্রেডি ট্রুম্যান এই মরসুমে শ্রেষ্ঠ অ্যাভারেজে ৪৮ রানে ৫টি এবং ৫২ রানে ১টি উইকেট দখল করে ইংলণ্ড দলে তাঁর স্থান পাকা করে নেন।

অস্ট্রেলিয়া ॥ প্রথম ইনিংস—১৭৬ রান।
দ্বিতীয় ইনিংস—১৬৮ (৪ উইকেট)।
ইংলণ্ড ॥ প্রথম ইনিংস ২৪৬ রান।
খেলা অমীমাংসীত।

তৃতীয় টেস্ট ঃ লীডস মাঠের তৃতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়া ৭ উইকেটে ইংলণ্ডকে হারিয়ে দিয়েছে। লীডসের মাঠে সুন্দর আবহাওয়ায় ইংলণ্ড অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারবে সেটা কেউই আশা করেনি। ভালো মাঠে টসে জিতে প্রথম ব্যাট করার সুবিধে অনেকখানি। সে সুবিধে পেয়েও ইংলণ্ড, কেন হারল সেটা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়।

তৃতীয় টেস্টে ইংলণ্ডের অধিনায়ক টেড ডেক্সটার যখন টসে জিতলেন তখন অনেকেই মনে করেছিলেন, এ খেলায় ইংলণ্ডের জয় মোটেই অসম্ভব নয়। কিন্তু প্রথম দিনের খেলায় ২৬৮ রানে যখন ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হয় তখন অনেকেই খরাপ চিন্তা করেছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার দুই ফাস্ট বোলার গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জি ও নীলের বোলিং-ই ইংলণ্ডের বিপর্যয়ে র কারণ। এঁরা যথাক্রমে প্রথম ইনিংসে উইকেট পান ৪ ও ৫ টি। দ্বিতীয় দিন অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিংয়ের সূচনা ভালো হলেও বিল লরীর রান আউটের পর অবস্থা বেশ সঙ্গিন হয়ে পড়েছিল। ১ উইকেটে অস্ট্রেলিয়া যেখানে করেছিল ১২৪ রান, সেখানে ১৭৮ রানে ৭টি উইকেট পড়ে গিয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ার যখন অষ্টম উইকেট পড়ে, তখন রান সংখ্যা ছিল ২৮৩ অর্থাৎ ইংলণ্ডের রান পেরিয়ে ১৫ রান বেশি, হাতে দুটো উইকেট। এই অবস্থার জন্যে কৃতিত্ব প্রায় সবটা পিটার বার্জের। দিনের শেষে সেঞ্চুরী করেও নট আউট। তৃতীয় দিনের খেলায় ৩৮৯ রানে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস শেষ হবার পর, দ্বিতীয় ইনিংসে ইংলণ্ডের ৪ উইকেটে ১৫৭ রান ওঠে।

অস্ট্রেলিয়ার জয়ের মূলে একা বার্জ বললেও খুব বেশি বলা হয় না। বিপর্যয়ের মুখে যে দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যাটিং করে তিনি শেষ পর্যন্ত ১৬০ রানে আউট হয়েছেন, তাতে বলা যায় অস্ট্রেলিয়া দলকে ভরাডুবির হাত থেকে তিনিই রক্ষে করেছেন। ২২৯ রানে ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হবার পর অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসে ৩ উইকেট হারিয়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১১১ রান সংগ্রহ করে।
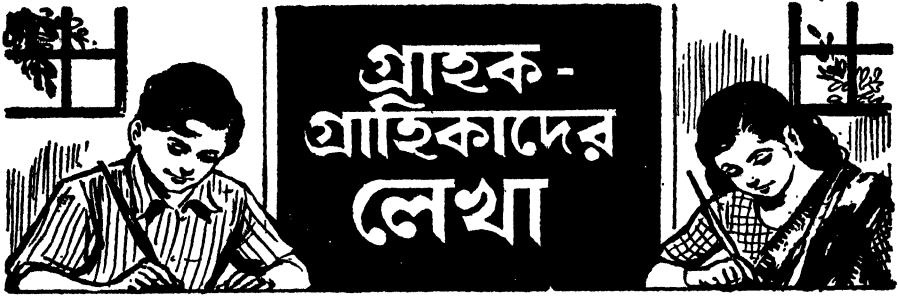
হরিণ চোর

জমিদারের হুকুম কেউ হরিণ মারতে পারবে না, হোক সে বনের হরিণ—এমনি অত্যাচারী ছিলেন স্যার টমাস লুসি। কিন্তু তবু হরিণ চুরি যায়। একদিন টমাস লুসি তাই ভাবছিলেন কি করবেন। এমন সময় একটি লোক এসে বললে, "স্যার লুসি, কাল একটা চোর ধরা পড়েছে।" টমাস লুসি বললেন, "নিয়ে এস তাকে।" তারপর, সেই চোরকে বেতমারার হুকুম দিলেন। চোর তার সেই অপমানের প্রতিশোধ নিতে একটি কবিতা লিখল। কবিতাটি এই রকম—

পার্লামেন্টের সভ্য সে যে,
আদালতের জজ সে হাঁদা।
ঘরের মধ্যে জুজু বুড়ো,
বাইরে তাকে দেখায় গাধা।

তারপর চুপিচুপি কবিতাটি স্যার টমাসলুসির বাড়িতে রেখে পালিয়ে গেল। আবার যখন সে দেশে ফিরল, সে তখন আর সে-চোর নয়, বিখ্যাত নাট্যকার—তার নাম উইলিয়াম সেক্সপীয়ার।

শ্রীঅভিপ্রিয় বসু

জয়ঢাক

বর্ষার দিন। টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে। গ্রামের রাস্তা। প্রকাণ্ড একটা ময়াল সাপ পাশের বন থেকে বেরিয়ে পথে এলো। পথে এসে দেখে, দূর থেকে একটা ঘোড়ার গাড়ী আসছে তার দিকে। ঘোড়ার গাড়ীতে একটা ঘোড়া জোতা। আর কোচ-বাক্সে গাড়োয়ান ঝিমুচ্ছে। তার হাতে লাগাম। ঘোড়ার গাড়িটা আস্তে আস্তে চলেছে। দেখে ময়াল ভাবলো, বেশ শিকার মিলেছে। পথ জুড়ে শুয়ে থাকব, গাড়ীখানা এলে অমনি এক পাক দিয়ে গাড়ী উল্টে ফেলব, তারপর ঘোড়াটাকেও খাব আর মানুষটাকেও খাব।

সে আরো ভাবলো, কিন্তু এত বড় কাজ করব কেউ জানবে না। কাছেই একটা ব্যাঙ্ ছিল। ময়াল তাকে ডেকে বললে,—তুই গ্যাঙোর গ্যাং আওয়াজ কর। তখন ব্যাঙ গ্যাঙোর গ্যাং আওয়াজ করতে লাগল। গাড়ীটা যখন কাছে এলো, সেই ব্যাঙের ডাকে গেল গাড়োয়ানের ঘুম ভেঙে। গাড়োয়ান তখন দেখে সামনেই প্রকাণ্ড এক ময়াল! ভয়ে সে গাড়ীটা থামালো—গাড়ী যে ঘুরিয়ে নিয়ে যাবে তারও উপায় নেই। তখন সে জোরে লাগাম টেনে ঘোড়ার পিঠে মারলো চাবুক। ঘোড়া পাঁই পাঁই করে তীরের বেগে সাপের উপর দিয়ে বেরিয়ে গেলো। সাপ গাড়ীর চাকায় কেটে চার টুকরো হয়ে গেল। ব্যাঙ ভাবলো, তাই তো, কাজ করবার আগে কেন যে বোকা সাপ আওয়াজ করে জানাতে গেলো!

এই বলে ব্যাঙ নিজের গর্তে চলে গেল।

কুমারী সুলতা মুখোপাধ্যায়

একে একে সব পরীক্ষার ফলই বেরুলো। পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হয়নি। যারা কৃতকার্য হয়েছ, তাদের জন্য রইলো আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। আর যারা কৃতকার্য হতে পারলো না, তাদের বলবো আবার চেষ্টা করো। কৃতকার্য হতে না পারার দুঃখ আছে, কিন্তু তার সঙ্গে এও সত্যি যে, কৃতকার্য হতে পারা বা না-পারা মানুষের পরিচয়ে সীমাবদ্ধ নয়। পুঁথিগত বিদ্যার বাইরে যে জগত আছে, সেখানে আমাদের আচার-আচরণ সামাজিক নিয়ম-শাসন মেনে চলা এবং তাকে নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করার মধ্যেই মানুষের আসল পরিচয়। বাস্তবজীবনে নিতান্তই ব্যবহারিক প্রয়োজনের জন্য স্কুল-কলেজ বা উচ্চতর-শিক্ষার প্রয়োজন। শুধু তা দিয়েই মানুষের চিন্তার বিকাশ সম্ভব নয়। ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য বছরের পর বছর আমাদের স্কুল-কলেজ যেতে হয়, হবেও এবং পরীক্ষায় পাশও করতে হবে, না হলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব প্রয়োজন মেটানো সম্ভব নয়। অতএব যার প্রয়োজন একান্তভাবে সীমাবদ্ধ, তার জন্যে আমাদের চেষ্টা করা যেমন দরকার, তেমনিই প্রয়োজন এই চলমান পৃথিবীর সঙ্গে নিজেকে গড়ে তোলা। যারা কৃতকার্য হলে এবং যারা হলে না, তাদের প্রত্যেকের জন্যই আমার এই কথাই রইলো। এবার গল্প বলি।

অমর জীবন—

দু'হাজার বছরেরও আগের কথা। পারস্য ও মধ্য এসিয়া জয় করে আলেকজাণ্ডার গ্রীক বাহিনী নিয়ে দুর্বার স্রোতে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত পথে ভারতবর্ষের তটভূমিতে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছেন। গাঙ্গেয় উপত্যকা ছাড়া উত্তর ও উত্তর পশ্চিম ভারতে তখন ঐক্যবদ্ধ কোন রাষ্ট্র ছিল না। সমগ্র দেশ ছিল কতকগুলি খণ্ড স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত। সুতরাং এই সব দেশকে জয় করতে আলেকজাণ্ডারের মত দিগ্বিজয়ী বীরকে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। ভারতের সীমান্ত প্রদেশে অশমক নামে এক উপজাতি তখন বাস করতো। এদের রাজ্য আক্রমণ করার কালে আলেকজাণ্ডারকে প্রবল বধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গ্রীক বীরই জয়ী হলেন। অশমক অধিপতি যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গেলেন, কিন্তু যুদ্ধ এখানেই শেষ হলো না—সে রাজ্যের রাণী কৃপী শত্রুর কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে চাইলেন না—প্রাণপণ শক্তিতে তিনি দুর্গ রক্ষা করতে লাগলেন।

শেষ পর্যন্ত তাঁর চেষ্টা বিফল হলো। গ্রীক সেনারা দুর্গটি অধিকার করে নিলো। ক্রপীর এই অসামান্য বীরত্বের কাহিনী গ্রীক ঐতিহাসিকরা বর্ণনা করে গেছেন, কিন্তু আমরা বীরাঙ্গনাকে এখনও অবধি তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছি।

এমনি আর একজন বীরাঙ্গনার কথা জানা যায় অষ্টম শতকের প্রথম ভাগে, যখন আরব বাহিনী সিন্ধুদেশ আক্রমণে উদ্যত হয়েছিল। সিন্ধুরাজ দাহির প্রাণপণ চেষ্টা করে সে আক্রমণের গতিরোধ করতে পারেন নি। বীরের মত তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন, কিন্তু সিন্ধুরাজের মৃত্যুর পরেও দাহির পত্নী রাণীবাঈ রাওর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ চালনা করতে লাগলেন। শত্রুবাহিনী তাঁর দুর্গের চতুর্দিকে অবরোধ রচনা করলেও, তিনি উদ্যমে হতাশ হননি। কয়েক দিন ধরে অবিরাম যুদ্ধ চালনার পর রাণীবাঈ দেখলেন যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁর সাফল্যলাভের কোনো আশাই নেই। শত্রুর কাছে ধরা দেওয়ার অপেক্ষা মৃত্যু বরং ভালো। এ কথা মনে করে তিনি জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করলেন। অশ্মক রাণী ক্রপী অপেক্ষা রাণীবাঈ ভাগ্যবতী। কারণ ইতিহাসে তাঁর নাম উপেক্ষিত হয়নি।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতবর্ষের নারীরা রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তার দৃষ্টান্ত মহারাণী রুদ্রাম্বা। কিন্তু রুদ্রাম্বাই এ বিষয়ে একমাত্র দৃষ্টান্ত নয়।

এ প্রসঙ্গে যিনি আমাদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন, তিনি কাশ্মীর মহিষী দিদ্দা। দশম শতকের মধ্যভাগ থেকে সুরু করে একাদশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত কাশ্মীরের রাজনৈতিক ইতিহাস রচিত হয়েছিল রাণী দিদ্দাকে কেন্দ্র করে। তিনি ছিলেন উদভান্ত পুররাজ সিংহরাজ দুহিতা। কাশ্মীর অধিপতি ক্ষেমগুপ্তর সঙ্গে এর বিবাহ হয়েছিল। কহ্লন তাঁর 'রাজতরঙ্গিনী'তে দিদ্দার যে চরিত্র অঙ্কন করেছেন, তাতে দেখা যায় যে ক্ষেমগুপ্ত নামেই রাজা ছিলেন, প্রকৃত শাসন ক্ষমতা ছিল দিদ্দার অধিগত। সে যুগের তাম্রমুদ্রাতে দিদ্দা ক্ষেমর একত্র উল্লেখ থেকে রাজমহিষীর প্রাধান্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ক্ষেমগুপ্তের মৃত্যুর পর বালক অভিমন্যু কাশ্মীরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হলেন। দিদ্দা নিযুক্ত হলেন রাজ্যের অভিভাবিকা। এই সময়ে মন্ত্রীসভার একাধিক সদস্য ক্ষমতা লাভে উদ্যত হলেন। দিদ্দা কঠোরভাবে তাদের দমন করলেন। তারপর থেকে একটির পর একটি চক্রান্ত ব্যর্থ করে রাজনীতির পিচ্ছিল পথে দিদ্দা নিজের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে অগ্রসর হয়ে গেলেন। তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষার বেদীতলে কত প্রাণ বলি হলো, ক্ষমতাপ্রিয় কত নায়ক অকালে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। নিজের স্বার্থ সিদ্ধ করার অভিপ্রায়ে ন্যায়-নীতির বিধান লঙ্ঘন করে এগিয়ে চলল দিদ্দার উচ্চাকাঙ্ক্ষার রথ। তার তলায় পিষ্ট হলো কত নিরীহ প্রাণ। তবু আকাঙ্ক্ষার গতিবেগ শিথিল অথবা সংযত করতে রাজী হলেন না দিদ্দা। ষড়যন্ত্র, অন্তর্বিপ্লব, হত্যা

হয়ে উঠল তাঁর নিত্য সহচর। শেষ পর্যন্ত তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো তিনি পেলেন রাজ্যের রক্ষয়িত্রীর সম্মান। পরিতৃপ্ত হলো তাঁর রাজ্যশাসনের নেশা। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় কুখ্যাতি অর্জন করেছেন দিদ্দা। ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করার সে সংকল্প তিনি গ্রহণ করেছিলেন, তা থেকে তিনি এক মুহূর্তের জন্য চ্যুত হননি। উচ্চাকাঙ্ক্ষার কাছে ন্যায়-নীতির বিবেকবোধ বহু পুরুষ বহু ক্ষেত্রে বিসর্জন দিয়েছেন। ইতিহাসে এমনতর দৃষ্টান্তের অভাব নেই কিন্তু মধ্যযুগের রাজনীতির প্রশস্ত পটভূমিকায় রাণী দিদ্দা একান্তভাবে একক দৃষ্টান্ত। নারী চিত্তের স্বাভাবিক বৃত্তিকে দমন করে তিনি রাজনীতিকেই প্রাধান্য দিয়ে যে ভাবে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে এগিয়ে গিয়েছিলেন, নীতির দিক থেকে অনেক ক্ষেত্রে তা সমর্থনের অযোগ্য হলেও, এটি অস্বীকার করা যায় না যে, তার সকল প্রচেষ্টায় পিছনে আত্মগোপন করেছিল একটি বলদৃপ্ত অকুতোভয় ব্যক্তিসত্তা। তিনি নারী দিদ্দা বলে পরিচিত হতে চাননি, চেয়েছিলেন রাজা দিদ্দা রূপে পরিচিত হতে। তাঁর সে উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে। তাঁর ভাবভঙ্গী এমনি পুরুষোচিত হয়ে উঠেছিল যে, অনেকে ভুলেই গিয়েছিল যে তিনি রাণী। তারা বলত রাজা দিদ্দা।

রাজা হবার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে গিয়ে তিনি মাতৃত্বের কণ্ঠরোধ করেছিলেন। তাঁর চক্রান্তে আত্মাহুতি দিয়েছিল তাঁরই আত্মজেরা। রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার কাছে নারীত্বের পরাভব ঘটিয়ে তিনি যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে আর দুটি মেলে কিনা সন্দেহ। কিন্তু নারীত্বের পরাভবকে তিনি শেষ অবধি চরম বলে মেনে নিয়েছিলেন—এ কথা বলা হয়তো ভুল। রাজদণ্ড পরিচালনা করতে গিয়ে, কঠোর ভাবে শুষ্ক শাসন প্রণালী নিয়েই দিদ্দা সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি, তাই জীবনের সন্ধ্যায় উদগ্র কামনা যখন সংযত হয়ে এসেছিল, চিত্তে অনুভব করেছিলেন স্থৈর্য, তখন তাঁর নারীহৃদয় তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল 'জনসেবা-প্রজাকল্যাণ এই ব্রত' উদ্‌যাপনের। তাই তাঁর নির্দেশে গড়ে উঠেছিল অসংখ্য মঠ, মন্দির, বিহার, নগর। কিন্তু জনহিত-ব্রত উদযাপন করার পূর্বেই মৃত্যু এনে দিল জীবনে ছেদ। রাজা দিদ্দার পরিচয় জেগে রইল নারী দিদ্দার পরিচয় ছাপিয়ে।

নিরু ও বিপুল রায়, কোলকাতা—

মস্ত বড় চিঠি তোমাদের—অনেক কথা—চিঠির উত্তর না পাওয়ার কথাও হয়েছে। আর জুতো আবিষ্কার কে করেছেন সে কথাও জানতে চেয়েছ—

জুতোর পূর্বপুরুষ হচ্ছে কাঠের পাদুকা বা খড়ম। খুব প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষ আর চীন দেশের লোকেরা কাঠের তৈরী খড়ম ব্যবহার করতো। আর তার অনেক বছর পর চামড় দিয়ে জুতো তৈরী করার কৌশল আবিষ্কার করা হয়। মিশর, রোম আর গ্রীস দেশে এই চামড়ার

জুতোর প্রচলন ছিল। প্রথমে যে ধরনের চামড়ার জুতো তৈরী হতো, সেগুলো অনেকটা স্যাণ্ডালের মত দেখতে ছিল। তাতে সবটা পা ঢাকা যেতো না। তারপর ইউরোপেই প্রথম যাতে সবটুকু পা ঢাকা যায় সেই ধরনের জুতোর প্রচলন হয়—সেও অনেক দিনের কথা, প্রায় ৯০০ বছর আগে।

নন্দিতা রায়, শ্রীরামপুর; অঙ্গুলেখা গুহ, কাঁচরাপাড়া; সুস্মিতা ও সুস্থতা সেন, কোলকাতা; ভক্তিমায়া বসু, কোন্নগর; চৈতালী ও ভাস্কর বসু ও মিতা পাল, কোলকাতা; অণিমা, তণিমা, মণিমা, সুরমা তালুকদার, বর্ধমান; শুভ্রজ্যোতি, পুণ্যজ্যোতি, ধ্রুবজ্যোতি মিত্র, আসানসোল—চিঠি পেয়েছি। তোমাদের চিঠিতে কোন প্রশ্ন নেই, তাই সকলকেই আমার ভালবাসা জানালাম।

তোমাদের
'মধুদি'

মৌচাকের পূজা-সংখ্যা

আগামী আশ্বিন-সংখ্যা মৌচাকের বিশেষ পূজা-সংখ্যা হিসাবে বর্ধিত আকারে খ্যাতনামা লেখক-লেখিকাদের রচনায় ও ছবিতে সমৃদ্ধ হয়ে মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হবে।
এই সংখ্যার পৃষ্ঠা বর্ধিত হলেও, দাম সাধারণ সংখ্যার মতই থাকবে।

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত
ও তৎকর্তৃক প্রভু প্রেস ৩০ বিধান সরণী কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

* ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র *

৪৫শ বর্ষ] আশ্বিন—১৩৭১ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

যাচ্ছি পুজোয়

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

মোটরে কেউ কেউ স্টীমারে
কেউ চড়বে ট্রেনে,
এরোপ্লেনেও কেউ বা যাবে
ঝড়কে সাথী মেনে।

যাচ্ছে ওরা দার্জিলিঙে
চলল তারা পুরী,
হিল্লী দিল্লী কত মুলুক
করবে ঘোরাঘুরি।

আমি কোথায় যাচ্ছি, জানো ?
—এমন মজার দেশে,
পাক দিয়ে এই ছুনিয়াখানা
মেলে সবার শেষে।

সব কিছু তার অন্য রকম
মানুষ, মাটি, জল,
চোখ দিয়ে যে দেখতে জানে
তার কাছে কেবল !

খুশিতে নীল আকাশে তার
মেঘের সাদা হাসি,
তারই জবাব দিচ্ছে বুঝি
মাঠে কাশের রাশি।

রোদ নয় ত' সোনা-ই যেন,
পড়ছে গলে ঝ'রে।
যে দিকে চাও পূজো পূজো
গন্ধে আকুল ক'রে।

কেমন ক'রে সে দেশে যায় ?
কায়দাটা আজগুবি।
দরজা খুলে দাঁড়াও শুধু
বলছি চুপি চুপি।

মা-কোকিল "কাকের বাসায় ডিম পাড়ার নতুন কৌশল"—নামক একখানা বই পড়ছিল। াৎ একবার সে ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকাতেই চমকে উঠল। সর্বনাশ! আজ পয়লা ফাল্গুন, নও ছেলেমেয়েরা শুয়ে আছে? আজ ওরা কলকাতা যাবে, গিয়ে সেখানকার সবাইকে তো াতে হবে বসন্তকাল এলো? নইলে ওরা জানবে কি ক'রে? ওখানকার মানুষেরা তো ন্ন কালের ধার ধারে না। কেবল বর্ষায় পথ ডুবে গেলে প্রতি বছর কয়েক দিনের জন্য চৈ করে। বলে, এ আমরা কিছুতেই সহ্য করব না। তারপর বর্ষা সরে গেলে সব ভুলে যায়।

তাই সে ওদের কাছে গিয়ে বলল, ওরে তোরা ওঠ। আজ পয়লা ফাল্গুন। তাড়াতাড়ি ই খেয়ে নিয়ে শহরে যা।

মা-কোকিল ওদের জাগিয়ে দিয়ে আবার এসে বই নিয়ে বসল।

এমন সময় পাড়ার এক বুড়ী কোকিল এসে বসল ওর কাছে। সম্পর্কে দিদি হয়। সে ন একবার আসে নানা উপদেশ দিতে, আর একটু চা খেতে।

তুমি শহরের কথা কি বলছিলে বোন? আমি আবার ঐ কলকাতা শহর দেখিনি। আমাদের ন কি আর যেখানে-সেখানে যাবার হুকুম ছিল? একটা গাছেই জীবন কাটিয়ে দিলাম।

বোন-কোকিল বলল, দেখ না দিদি, আমার ছ'টি ছেলেমেয়ের কাজ হচ্ছে কলকাতা গি বসন্তকালের খবর পাঁচজনকে জানান দেওয়া। হাল-আমলে কত সব আইন-কানুন হয়েছে। যা যার এলাকা একেবারে সরকার থেকে বেঁধে দিয়েছে। তুমি ভেবে দেখ দিদি, মস্ত বড় শহ কলকাতা, তাকে ছ'ভাগ করলে এক-একটা ভাগই এক-একটা বড় শহরের মতন হয়। এর প্রি ভাগে একটা ক'রে কোকিল ডেকে কি আর বসন্ত নামাতে পারে? কি আর বলব দিদি, প্রতি ভা কম করে দশটা কোকিল দরকার। আচ্ছা না হয় একটা করেই বরাদ্দ হ'ল। তাতেও আপ ছিল না, কিন্তু কলকাতার লোকেরা কি আর এখন কোকিলের ডাক শুনতে চায়, না শুনতে সম পায়? ছেলেমেয়েরা বলে, এখন আর সেখানকার কোনো কবি কোকিল নিয়ে কবিতা লেখে না।

দিদি-কোকিল বলল, বটে! আজকাল ওখানকার অবস্থা এত খারাপ হয়েছে? কে ঈশ্বর গুপ্ত, বঙ্কিম চাটুজ্জে, এঁরা বুঝি বেঁচে নেই? আমরা ছোটবেলায় ওঁদের লেখা পড়ে গদগ হয়েছি।

তুমি একেবারে সেকেলে, দিদি। ও যুগ কবে চলে গেছে।

তবে তোমাদের কালে কোকিল দিয়ে কি হবে? ছেলেমেয়েদের সেখানে পাঠাচ্ছ কেন?

বা! আমাদের তো একটা কর্তব্য আছে? মানে, বসন্ত ঋতুর প্রতি কর্তব্য। সে ক ভুলে যাচ্ছ কেন? মানুষ যতই খারাপ হোক, আমাদের ডাক তো বন্ধ করতে পারি না।

দিদি-কোকিল বলল, মানুষরা এখন তা হ'লে বুঝি কেবল মানুষের গানই শোনে?

হাঁ দিদি। শুনেছি, রবীন্দ্রো-সঙ্গীত খুব চলছে আজকাল। আমারই এক মেয়ে রবীন্দ্রো সঙ্গীত শুনে একেবারে গ'লে পড়েছিল। বলে, শুনলে মনটা ভাল হয়, মা। বড় ভাল সে গান আর সে গানেও কোকিলের কথা আছে।

তবে তাই শিখুক না ওরা? যে কালের যা।

ও দিদি, সে চেষ্টাও করেছিল। এই তো গত বছর। ওরা নাম-ঠিকানা সংগ্রহ ক'রে পঙ্কজ দেবব্রত, সন্তোষ, সুবিনয়, হেমন্ত, সুনীল, শুভ, আরও কতজনকে গিয়ে ধরেছিল।

ওরা কি বলল?

ওরা এদের ইচ্ছার কথা শুনে খুশিও হ'ল, সবই হ'ল, কিন্তু কপাল! দিদি, কপাল!

সে আবার কি? খুশি হ'ল, তবু শেখাল না?

সেই কথাই তো বলছি। ওরা একে একে বাছাদের গলার সঙ্গে সুর মেলাতে গিয়ে হা মানল। বলল, ওরে বাপ রে! এ যে চিতেনও নয়, একেবারে পরচিতেন! অত চড়া সুরে পার না। তোমরা বরং মেয়েদের কাছে যাও।

চিতেন, পরিচিতেন, এ সব সেকেলে কথা তো বোন, আমাদের কালে কবিগানে শুনেছি। এখনও চড়া সুরকে ঐ নামেই বলে বুঝি ;—কিন্তু যাক্ গে, তারপর কি হ'ল?

শেষকালে সুনীল রায় বলল, আমি আরও একবার চেষ্টা ক'রে দেখি। যদি পারি, তা হ'লে যে গানগুলোয় তোমাদের কথা আছে, সেইগুলো শিখিয়ে দেব। কিন্তু কত চেষ্টা করল, পারল না। ওর গলা খানিকটা মেলে, কিন্তু সবটা মিলল না।

তারপর?

তারপর গেল ওরা মেয়েদের কাছে। নীলিমা, কণিকা, সুচিত্রা, পূরবী, প্রতিমা, গীতা, সুমিত্রা, সুপ্রীতি, ঋতু, পূর্বা, মঞ্জু এবং আরও অনেকের কাছে, সব নাম মনে নেই। কিন্তু কেউ দম রাখতে পারল না। শেষকালে হতাশ হয়ে পরামর্শ নিতে গেল ওরা সুরেশ চক্রবর্তীর কাছে। সে ওদের দেখেই প্রথমে এসরাজ বার করল। বলল, গলায় যা হ'ল না, এসরাজে তা হবে।

শিখতে পারল?

না, দিদি। ওরা সুরেশের বাজনা শুনল, কিন্তু যে ভাবে বাজাতে হয়, তার কৌশল ওদের দু'খানা পায়ে হবে কি ক'রে? দেখে-শুনে বলল, পারব না। আমাদের যা আছে তাই থাক।

সুরেশ বলল, তোমাদের বুদ্ধি আছে।

ভালই বলেছিল।

কিন্তু বুদ্ধি ওদের সে সময়ের জন্য একটুখানি নষ্টই হয়েছিল, দিদি।

ও! এর পরেও চেষ্টা করল বুঝি?

করল আমার বড় ছেলেটা। আর সবাই তখন ঘরে ফিরে এসেছে।

ঠিক এই সময় মা, মা, বলে বোন-কোকিলের বড় ছেলেটি এসে হাজির। বলল, মা, বেশ তা ব'লে দিলে তোমরা কলকাতা যাও, কিন্তু আমাদের ডায়ারিখানা খুঁজে পাচ্ছি না যে।

সে কি? ঐ তো, ওখানে ওটা কি?

ঐটেই তো খুঁজছিলাম। ওতে কলকাতার কত নম্বর ওয়ার্ডে আমাদের কা'কে এবারে যেতে হবে, তা লেখা আছে। দুই নম্বর ওয়ার্ডে আমি যেতে ভয় পাই, মা। তাই আগে দেখে নেব, আমার আবার ঐ দুই নম্বরেই এবারেও যেতে হবে কি না।

কেন, সেখানে ভয় কিসের?

সেখানে, জান না তো মা, মুখপোড়ারা থাকে। আমরা যেখানে ছোট গাছের ছোট ছোট ফল খেতে যাই, সেইখানে ওরা আসে কলা পেঁপে ফুল খেতে। তাই তো ঐ দুই নম্বর ওয়ার্ডে আমার যেতে ইচ্ছা করে না। বিশ্রী দুষমনদের মতন এক-একটার চেহারা। বাপ রে! মনে করতেও বুক কাঁপে

সে তো জানি। শুনেছিলাম ঐ সব মুখপোড়াদের ধ'রে ধ'রে বাইরে চালান দেওয়া হবে, ওদের ঝাড়ে-বংশে বিদায় করলে তবে আমাদের শান্তি। কিন্তু সে কথা এখন থাক্, বাছা রবীন্দ্রো-সঙ্গীত শিখতে গিয়ে তোদের কি সব বিপদ হয়েছিল, বল্ তোর মাসিকে। আমি সুরে চক্রবর্তী পর্যন্ত বলেছি।

মাসি, সে বড় লজ্জার কথা। ঐখানেই থেমে গেলে ভাল হ'ত। কিন্তু এক ঠগের পাল্লায় প'ড়ে মিছিমিছি সময় নষ্ট হ'ল। আর খাটুনি যা হ'ল সে আর কি বলব!

ঠগটা কে?

সে এক কাক। আমি সে দিন ভাইবোনদের বিদেয় দিয়ে সুরেশ চক্রবর্তীর কাছ থেকে উড়ে এসে একটা ডালে বসেছি। মনে বড় দুঃখ। তাই বোধ হয় একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে থাকব। এমন সময় আমার উপরের ডাল থেকে ঐ ঠগটা বলে উঠল, কি হয়েছে ভাই তোমার? কাকের গলায় এত দরদ আমি আর আগে কখনো দেখিনি, মাসি।—তারপর সে নেমে বসল আমার পাশে। আমার পিঠে ডানা বুলিয়ে দিতে লাগল। বলল, সব কথা খুলে বল।

বললে খুলে?

বললাম। কাক বলল, মানুষের গান শেখবার একটা সহজ কৌশল আছে, তোমাকে আমি সব বলছি। কিন্তু তার আগে আমার একটা উপকার করতে হবে।

মাসি, মনে আশা জাগল। রাজি হয়ে গেলাম তার কথায়। সে বলল, এই শহর থেকে, আর শহর থেকে না হোক এই জেলা থেকে, আমার জন্য কিছু সরষের তেল জোগাড় ক'রে আন আগে, তারপর গান শেখার মন্তর ব'লে দেব। তেলটা খাঁটি হওয়া চাই।

কিন্তু মাসি, সমস্ত দিন আমি সমস্ত শহর ঘুরে তেল পেলাম না। ডানা দুটো ব্যথায় টনটন করছিল। মেডিক্যাল কলেজের আউটডোরে গিয়ে কিছু ওষুধের ব্যবস্থা করিয়ে নেব ভেবে সেখানে গিয়ে দেখি, সে কি কাণ্ড! সে যা ভিড় তার মধ্যে পিঁপড়েও ঢুকতে পারে না। তাই কাছাকাছি একটা গাছের ডালে গিয়ে বসলাম। চোখে জল এলো মাসি, ঠেকানো গেল না। এমন সময় দেখি, আমার পাশে আমার চেনা এক বুলবুল পাখী ব'সে আছে। আমরা একই গাছের ফল খেয়েছি কত দিন, তাই চিনতাম। বন্ধু লোক, তাই তাকে সব বললাম। সে বলল, একি অসম্ভব প্রস্তাব! ভেজাল ছাড়া তেল তুমি কোথায় পাবে? তবে হাঁ, মনে পড়েছে। হাজিনগরের হুকুমচাঁদের তিন নম্বর গেট দিয়ে যদি মিতার কাছে যেতে পার, তবে সে বোধ হয় এক সরষের তেলের কারখানার খবর ব'লে দিতে পারবে। ঐদিকে কোথায় যেন মাটির নিচে খ্যাকশেয়ালরা এক তেলের কল চালায়। জায়গাটা আমার ঠিক মনে পড়ছে না, মনে পড়লে আমিই বলে দিতে পারতাম।

আমি বুলবুলকে বললাম, ভাই, কাজটি তুমিই ক'রে দাও আমার জন্তে। আমি এখন আর ত পারছি না।

সে বলল, বেশ আমি ঠিকানা এনে দিচ্ছি। তবে সেখানেও খাঁটি সরষের তেল পাবে কিনা না।

বুলবুল উড়ে চলে গেল মিতার কাছে। পরদিন সকালে ফিরে এসে জানাল, ঠিকানা রছি। নৈহাটি স্টেশন থেকে যে পথ হুগলী লাইনের নিচে দিয়ে বেরিয়ে গেছে, তার কিছু দূরে র দিকে একটা জায়গায় ঘন জঙ্গল। তার মধ্যে ঢুকে যাবে। গেলে দেখতে পাবে একটা ল সেখানে ব'সে আছে। তোমাকে দেখলেই সে জিজ্ঞাসা করবে, মিত্র না শত্রু? তুমি বলবে, । তা হ'লে সে তোমাকে পথ ছেড়ে দেবে। ঐখানে তুমি একটি গর্ত দেখতে পাবে। সোজা গর্তে ঢুকে পড়বে। সেইখানে শেয়ালদের তেলের কল চলছে দিনরাত।

মাসি, আমার তখন ডানার জোর ফিরে এসেছে অনেকটা আমি সোজা সেই শেয়ালদের কলে গিয়ে পৌছলাম।

যা বলেছিল, তাই। এক শেয়াল লাঠি নিয়ে বসে আছে। আমি যেতেই জিজ্ঞাসা করল, মিত্র না শত্রু? আমি হঠাৎ শত্রু ব'লে ফেলেছিলাম আর কি! ভুল হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু "শ" পর্যন্ত বলেই মনে পড়ল। বললাম, মিত্র। আমাকে সে বলল, ঐ গর্তের পথে যাও।

গর্তের পথে গিয়ে দেখি মস্ত কারখানা। অনেক ঘানি চলছে। কিন্তু সামনে অনেকখানি জায়গায় দশ-বারোটা শেয়াল সরষের সঙ্গে কি যেন মেশাচ্ছে। আর একদল শেয়াল সেই ভেজাল মেশানো সরষে নিয়ে ঘানিতে ঢালছে।

একটি শেয়ালকে জিজ্ঞাসা করলাম, ও কি মেশাচ্ছ সরষের সঙ্গে?

সে গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, শেয়াল কাঁটার বীজ মেশাচ্ছি। আমরা শেয়াল তো? বুঝতেই পার, এ ছাড়া আর কি মেশাব? আমরা যদি মানুষ হতাম, তা হ'লে এর চেয়ে মারাত্মক বিষ মেশাতাম।

তা হ'লে এ থেকে যে তেল বেরোচ্ছে, সে তেল তো ভেজাল তেল হচ্ছে?

তা একটু হচ্ছে বৈ কি।

একটুখানি খাঁটি তেল দিতে পার আমাকে?

কি ক'রে পারব? ঘানিগুলো এমন যে শুধু সরষে দিলে চলে না, বন্ধ হয়ে যায়। অনেক দিনের অভ্যাস কি না।

এর পর মাসি, একটি কথা না বলে সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম। প্রথমেই গেলাম সেই কাকের কাছে। কিন্তু কোথায় সে? সে স্রেফ একটা ধাপ্পা দিয়েছে বুঝতে পারলাম। খাঁটি তেল মিলবে না জেনেই সে আমাকে বোকা বানিয়ে ছাড়ল। আর ও পথে যাইনি তারপর থেকে। ভাল করিনি মাসি?

খুব ভাল করেছ।

আচ্ছা, তা হ'লে আমরা এখন চলি। আমাদের কর্তব্য আমরা ক'রে যাব। তাতে ফল যাই হোক। একদিন না একদিন মানুষ আমাদের ডাক আবার ভালবাসবে, সেই বিশ্বাস নিয়েই চলছি, মাসি। আচ্ছা, চলি তা হ'লে?

তরুণ কোকিলরা সবাই ওদের দু'জনকে প্রণাম করে কলকাতা শহরের দিকে উড়ে চলে গেল।

ওরা পৌছে যাবার পর থেকে কলকাতায় বসন্তকাল শুরু হ'ল।

কিন্তু শহরের লোকেরা কেউ তা জানতেও পারল না।

নব-কথামালার গল্প

(রূপকথা)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

এক গৃহস্থ,—দিন আনে, দিন খায়। হঠাৎ মনে হলো, বয়স হয়েছে—তীর্থ-ধর্ম করতে বে। দুশো টাকা খরচ করবে—বাড়ীতে থাকবে বৌ আর দুটি ছেলেমেয়ে। জমানো পুঁজি ছিল হাজার টাকা—এ টাকাটা বাড়ীতে রেখে যেতে ভরসা হলো না। সে যখন থাকবে না, যদি এসে চুরি করে নিয়ে যায়। এ টাকা কোথায় কার কাছে রেখে যাবে?

পাড়ায় থাকে ধনী সদাগর—পাঁচতলা তার বাড়ী, গাড়ী জুড়ি—অগাধ টাকা—বাড়ীতে জন গমগম করছে—ভাবলো, ঐ সদাগরের কাছে রেখে যাবে, তারপর ফিরে এসে টাকা আনবে কাছ থেকে।

গৃহস্থ এলো সদাগরের বাড়ী—সদাগরকে বললে—আমি পাড়ায় থাকি গরীব গৃহস্থ—তীর্থে, তিনমাস পরে ফিরবো। আমার এই গেঁজিয়ার মধ্যে আছে এক হাজার টাকা—বাড়ীতে যেন ভরসা হয় না—আপনার কাছে রেখে যেতে চাই, তাহলে টাকা নিরাপদ থাকবে। ফিরে টাকা নিয়ে যাবো। আপনি দয়া করে রাখবেন?

তারপর একমাস যায়—দু'মাস যায়—তিনমাস গেল—গৃহস্থ এলো ঘরে নানা তীর্থ ঘুরে। নানাহার করে সে চললো বৈকালে সদাগরের বাড়ী।

সদাগর তখন বৈঠকখানায় বসে গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছে—দু'দিকে দু'জন চাকর করছে র বাতাস—গৃহস্থ এসে প্রণাম করে দাঁড়ালো। সদাগর যেন তাকে চেনেন না—কখনো যেন দেখেন নি, এমনি ভাবে বললেন—কে?

গৃহস্থ বললে—আজ্ঞে, আমি এই পাড়াতেই থাকি।

সদাগর বললেন—বটে! তা, এখানে কেন? কি চাই?

গৃহস্থর বুকখানা ধক করে উঠলো। ঢোঁক গিলে গৃহস্থ বললে—আজ্ঞে, আমি সেই তিনমাস তীর্থে গিয়েছিলুম।

সদাগর বললেন—ও · বটে!

গৃহস্থ অবাক! সে বললে—আজ্ঞে, তীর্থে যাবার সময় আমার যা কিছু পুঁজি—এক হাজার গেঁজিয়ায় ভরে আপনার কাছে গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলুম,—আপনি গুণে দেখেছিলেন—বলে লুম,—তীর্থ থেকে ফিরে টাকা নিয়ে যাবো।

'গৃহস্থ তখনো মিনতি জানালো—কান্নাকাটি করলো।'

সদাগরের ভুরু হলো কুঞ্চিত। সদাগর বললেন—পাগল নাকি! আমার কাছে তুমি কবে আবার টাকা রেখে গেলে! আমি কারো টাকা গচ্ছিত রাখি না বলে, আমার নিজের টাকা রাখবার জায়গা নেই—আমি রাখবো পরের টাকা।—যাও যাও পাগলামি করো না।

গৃহস্থ বললে—বলেন কি হুজুর! আপনি আমার টাকা জলজ্যান্ত উড়িয়ে দিতে চান! এত বড়লোক আপনি, আর আমি ছাপোষা গরীব গৃহস্থ···

সদাগর বললেন তুমি যে টাকা রেখে গিয়েছ—তার প্রমাণ? সাক্ষী আছে?

গৃহস্থ বললে- এর আবার সাক্ষী-সাবুদ কি, হুজুর···আপনি লক্ষপতি মানুষ—আপনাকে বিশ্বাস করে···

বাধা দিয়ে সদাগর বললেন—বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা নয়, বাপু! টাকাকড়ির ব্যাপারে বিশ্বাস-অবিশ্বাস চলে না। এ ব্যাপারে চাই দলিল, চাই সাক্ষী, প্রমাণ···

গৃহস্থ তখনো মিনতি জানালো—কান্নাকাটি করলো। সদাগর তাতে কান পাতলো না—সে

দিলে গৃহস্থকে হাঁকিয়ে···বললে—যাও রাজার কাছে নালিশ করো গে– বিচারে যা ঠিক হবে, তাই করবো। নিরুপায় গৃহস্থ কাঁদতে কাঁদতে সদাগরের বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলো—চললো রাজার কাছে, গিয়া নালিশ করবে—কাঁদতে কাঁদতে সে চললো রাজপুরীর পথে।

এ-মোড় ঘুরে, ও-মোড় বাঁয়ে রেখে, সে-মোড়ে ঢুকে গৃহস্থ এলো রাজ্যের বড় শহরের পথে। এ পথে যত বড় বড় লোকের বাড়ী-ঘর। কাঁদতে কাঁদতে গৃহস্থ চলেছে এ-পথে—তাকে দেখে এক গৃহিণীর কেমন মমতা হলো। তিনি বললেন—কাঁদচো কেন গো ? কি হয়েছে ?

গৃহস্থ তাঁকে সব কথা খুলে বললো। শুনে গৃহিণী বললেন—তোমাকে রাজপুরীতে নালিশ করতে যেতে হবে না—আমি তোমার টাকা আদায় করে দেবো। তুমি এসো আমার সঙ্গে আমার বাড়ী··তোমাকে যা যা করতে হবে বলে দেবো। টাকা ফাঁকি···এ সৎকাজ হয় না!

গৃহস্থকে নিয়ে গৃহিণী এলেন নিজের বাড়ীতে···এসে গৃহস্থকে তিনি বললেন—তুমি রোজ রোজ সকালে ঐ সদাগরের কাছে যাবে··গিয়ে দু'বার তিনবার তোমার টাকা ফেরত চাইবে, তার বেশী বার চাইবে না··কাল পরশু তরশু--তিনদিন যাবে। তারপর তরশু বারের দিন তুমি ওখানে থাকতে থাকতে আমি যাব সদাগরের কাছে···গিয়ে তার সঙ্গে আমি অন্য কথা কইবো···আমার কথার ফাঁকে ফাঁকে তুমি শুধু বলবে--আমার সেই গচ্ছিত টাকা হুজুর···তারপর যা করবার, আমি করবো।

এই ব্যবস্থাই হলো। তিনদিন চেয়ে-চেয়েও গৃহস্থ টাকা পেলো না।

চারদিনের দিন সেই গৃহিণীর কথা মতো গৃহস্থ আবার এলো সদাগরের কাছে···সদাগর বললেন —রোজ রোজ কেন আসছো বাবু—আমাকে জ্বালাতন করতে! আমার কাছে থেকে তুমি একটি পয়সাও আদায় করতে পারবে না।

নিঃশ্বাস ফেলে গৃহস্থ বললে—আজ্ঞে, দয়া···দয়া করুন!

—না না না, দয়া-টয়া আমার কোষ্ঠীতে লেখেনি!·· তুমি পথ ছাখো! দারোয়ান দিয়ে বার করে দিতে পারি···কিন্তু তা চাই না, শুধু পাড়ায় হৈ-হৈ রব উঠবে—ঐ হৈ হৈ রব আমি পছন্দ করি না?

এই কথা হচ্ছে, এমন সময়ে দামী শাড়ী-পরা সেই গৃহিণী এলেন···তাঁর হাতে চেনার কাঠের তৈরী চমৎকার একটি বাক্স।

সদাগর বললেন—কি চান?

গৃহিণী বললেন—আমি ও-পাড়ায় থাকি…আমার স্বামী হলেন মস্ত সদাগর—তিনি গেছেন জাহাজে চড়ে বিদেশে বাণিজ্য করতে—প্রায় চারমাস তাঁর কোনো খবর নেই, এখন শুনছি তাঁর জাহাজ পড়েছে বোম্বেটেদের হাতে…তিনি তাদের হাতে বন্দী—তাই আমি বেরুবো তাঁর সন্ধানে।—যাবার আগে আমার এই বাক্সটি—এ বাক্সে আছে প্রায় লক্ষটাকা দামের হীরা মোতি পান্নার গহনা—এ বাক্স আপনার কাছে গচ্ছিত রেখে যাবো—আপনার খুব খ্যাতি শুনেছি—সাধু-সজ্জন বলে…

কথা শুনে সদাগরের বুক দুলে উঠলো। তিনি ভাবলেন—আরে ব্যস—লাখ টাকার গহনা…কিন্তু তার আগে এই গৃহস্থটাকে বিদায় করা চাই—ও যদি ওর সেই টাকা চায় এঁর সামনে!

সদাগর বললে গৃহিণীকে—আরে তা বেশ বেশ…আপনার জিনিস আপনি তাহলে রেখে যেতে পারেন—তারপর গৃহস্থর দিকি চেয়ে সদাগর বললেন—হ্যাঁ, তোমার সেই এক হাজার টাকা আমার কাছে রেখে গিয়াছিলে তো—তা, বসো, আমি এখনি নিয়ে এসে তোমার টাকা তোমাকে গুণে বুঝিয়ে ফেরত দিচ্ছি।

বলে, এক মিনিট দেরি নয়—সদাগর গৃহস্থের গেঁজিয়া-ভরা হাজার টাকা এনে তার হাতে তুলে দিলে—গৃহস্থ আরামের নিঃশ্বাস ফেলে বেরিয়ে যাবে, হঠাৎ গৃহিণীর যোয়ান ছেলে এসে বললে—মা মা, সুখবর…বাবা ফিরে এসেছেন—বাড়ী চলো—তাঁর কোনো কিছু লুটপাট হয়নি…তিনি অক্ষত দেহে এসেছেন!

—বটে! একথা বলে গৃহিণী চাইলেন সদাগরের দিকে। বললেন—তাহলে আপনাকে আর কষ্ট দেবো না—আমার এ গহনা আপনার কাছে রাখবার দরকার নেই—আমার স্বামী ফিরে এসেছেন—আমি তাহলে আসি।

গহনার বাক্স নিয়ে ছেলের সঙ্গে গৃহিণী এলেন পথে—গৃহস্থও তাঁর সঙ্গে। গৃহস্থ বললে—ভগবান আপনার মঙ্গল করুন মা - আপনার দয়াতেই আমার টাকা ফেরত পেলুম।

আর ওদিকে ঐ সওদাগর…সে যাকে বলে থ! লাখ টাকার গহনার লোভে এক হাজার টাকাও তাকে ফিরিয়ে দিতে হলো!

তিমিঙ্গিল

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

ছেলেবেলায় ইস্কুলে পড়ার সময় বড়দের মুখে তিমিমাছের কথা শুনেছিলাম। সে প্রায় ৬০।৬৫ বছর আগেকার কথা, এবং তখন এ দেশের সাধারণ লোকে তিমিকে মাছ বলেই জানতো, এমন কি লেখাপড়া জানা লোকেও। বাড়ীতে যে অভিধান ছিল "প্রকৃতিবাদ", তাতেও "তিমি" শব্দের মানে দেওয়া ছিল, "প্রকাণ্ড মৎস্য বিশেষ"। আবার সেই সঙ্গে ঐ শব্দার্থের নীচে আরও একটি শব্দ ছিল "তিমিঙ্গিল", যার অর্থ দেওয়া ছিল, "তিমিকে যে গেলে···অতি প্রকাণ্ড মৎস্য"। বড়দের জিগেস করায় তিমি সম্বন্ধে কিছু শোনা গেল। তাতে বুঝলাম যে তিমি সমুদ্রে থাকে এবং এক-একটা তিমি ৮০।৯০ এমন কি ১০০ ফুট লম্বা আর সেই মত চওড়া, মোটা ও ভারী হয়। আবার কেউ বললেন, তিমিমাছ মাছই নয়, ওটা জলচর জন্তু, সমুদ্রে থাকে মনে খট্‌কা লেগেছিল নিশ্চয়, তবে অভিধান যখন বলে "প্রকাণ্ড মৎস্য" তখন কার কথা মানবো? "তিমিঙ্গিল" বা "তিমিঙ্গিলগিল" (এ শব্দও অভিধানে ছিল) সম্বন্ধে কেউ কিছু বলতে পারলেন না। কাজেই নিজের মনে শুধু একটা প্রশ্ন রয়ে গেল, "তিমিমাছ যদি ৮০।৯০ ফুট লম্বা হয়, তবে তাকে গিলে খায় যে মাছ, না-জানি সেটা কত বড়!" তারও আগের প্রশ্ন হোলো তিমিমাছ সত্যি-সত্যিই মাছ, না আর কিছু এবং যদি সেটা আর কিছু হয়, তবে সেটা কি?

বড় হয়ে ইংরাজী ডিক্স-নারিতে এবং অন্য জীবজন্তুর বিষয়ে লেখা বইয়ে দেখলাম যে, তিমি মাছ নয়, গরু ভেড়া ছাগলের মত স্তন্যপায়ী জন্তু। অবশ্য সে-সকল স্থলচর জন্তুর মত তিমির চারটে বা দুটো পা নেই। কিন্তু ঠিক ওদের মতই তিমির বাচ্চা হয়, মাছের মত ডিম পাড়ে না, এবং তিমির বাচ্চা মায়ের দুধ খেয়েই বড়

'তিমিঙ্গিল' জাহাজে বড় তিমি টেনে তোলা হচ্ছে।

হয়, ডাঙ্গায় চলা স্তন্যপায়ী প্রাণীরই মতন। তিমি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলে ডাঙ্গার জন্তুদেরই মত, মাছের মত কানকুয়া দিয়ে জল থেকে বাতাস বা অক্সিজেন শুষে নেয় না। তবে তিমি দম ধরে রাখতে পারে অনেকক্ষণ। খাবারের সন্ধানে সমুদ্রের গভীর জলে ডুব দিয়ে ২০।২৫ এমন কি প্রায় ৭০ মিনিট পর্যন্ত জলের নীচে ডুবে থাকতে পারে। তিমি উপরে উঠে যে নিঃশ্বাস ছাড়ে, সেটা ফোয়ারার মত ২০।২৫ ফুট উঁচু, জলের বিন্দু-মিশানো প্রশ্বাসের হাওয়া। তিমি-শিকারীর দল ঐ ফোয়ারা দেখে তিমির সন্ধান পায় এবং সেদিকে নৌকা বা মোটরলঞ্চ নিয়ে যায়।

প্রাচীন লোকেরা কিন্তু তিমিকে মাছ বলেই জানতেন। শুধু যে "প্রকৃতিবাদ" অভিধান তিমিকে "প্রকাণ্ড মৎস্য বিশেষ" বলেছেন তাই নয়। "শব্দকল্পদ্রুম" নামে সংস্কৃত অভিধানেও আছে "তিমি মহাকায়ো মৎস্যঃ সামুদ্রঃ" অর্থাৎ তিমি সমুদ্রের প্রকাণ্ড মাছ। আবার "তিমিঙ্গিল"ও আছে সেই অভিধানে। মনে হয় সে সব পুরাকালের দিনে বিজ্ঞলোকেও চোখে দেখে বা লোক-মুখে বর্ণনা শুনে তিমিকে মাছ বলেই জেনেছিলেন। তখনকার দিনে তিমি মাছ মারা বা ধরা বোধহয় বিশেষ একটা হোতো না, কেন না শুধু আমাদের দেশে নয় অন্য দেশের প্রাচীন বইয়েতেও তিমিকে মাছই বলা হয়েছে। যেমন আছে বাইবেলে।

বাইবেল শুধু খৃষ্টানদেরই ধর্মগ্রন্থ নয়, এর যে অংশ প্রাচীন (Old Testament) সে অংশকে ইহুদি এবং মুসলমানরাও ধর্মগ্রন্থ বলে স্বীকার করে। আমাদের পুরাণের মত বাইবেলের ঐ অংশে প্রাচীনকালের সেমিটিক জাতির ও পশ্চিম এশিয়া ভূমিখণ্ডের ইতিহাস এবং কিংবদন্তী অংশের এই সেমিটিক জাতিই য়িহুদি ও আরবদের পূর্বপুরুষ। কাজেই ও দুই জাতির লোকের কাছে বাইবেলের ঐ অংশ ধর্মের পুস্তক বলে শ্রদ্ধাভক্তি পায়!

প্রাচীন বাইবেলে যোনাহ (Jonah) নামে এক ভবিষ্যৎবক্তা ও ঈশ্বর প্রেরিত দূতের উপাখ্যান আছে। সেই উপাখ্যান অনুসারে ঈশ্বর যোনাহকে আহ্বান করে আদেশ দিয়াছিলেন, নিনেভেহ নামক অসুরদের (Assyrian) প্রাচীন, বিশাল ও পাপে পূর্ণ নগরের বিরুদ্ধে ভবিষ্যৎবাণী করতে। কিন্তু তিনি পাছে ঐ ভবিষ্যৎবাণীর ফলে নিনেভেহবাসীগণ অনুতপ্ত হয়ে ধ্বংস হতে রক্ষা পায়, এই ভয়ে তিনি যোপ্পা বন্দরে গিয়ে সমুদ্র-পথে টারশিশ নগর যাত্রা করেন। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই সমুদ্রে ভীষণ ঝড় ওঠে—যে ঝড়ের কারণ তিনি নিজেই তা প্রমাণিত হয়। তখন তাঁর নিজেরই অনুরোধে তাঁকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়। ফেলবামাত্রই ঝড় শান্ত হয় এবং এক ("বিরাট মৎস্য") তিমি ঈশ্বরের আদেশে তাঁকে গিলে ফেলে। তিন দিন পরে য়াহবেহের (Yahweh = ঈশ্বর) আদেশে সেই তিমি তাঁকে শুষ্ক জমির উপর উগরিয়ে দেয়। তিনি পুনর্বার ঈশ্বরের আদেশ পান এবং এবার সেই আদেশ পালন করেন।

বাইবেলে যাঁকে ঈশ্বর প্রেরিত দূত যোনাহ বলা হয়েছে, তিনি আরবদের কাছে নেবি য়ুনুস নামে পরিচিত। ১৯৩২ সালে আমি ইরাকের মোসল (Mosul) নামে শহরে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে প্রাচীন নিনেভেহ শহরের বিস্তৃত ধ্বংসস্তূপরাশি দেখবার সময় তারই কাছে নেবি য়ুনুসের সমাধি দেখিতে যাই। ভিতরের সমাধিস্থলে আমি যেতে পারিনি। কিন্তু য়ুনুসের ভক্ষক ও রক্ষক সেই তিমির চোয়ালের অস্থি যে সেখানে টাঙ্গানো রয়েছে, তা আমায় দেখানো হয়। তখন আলো ভাল ছিল না এবং আমি বেশ একটু দূর থেকেই দেখেছিলাম বটে, তবে বিরাট একটা নৌকার কাঠ মোর মত কিছু রয়েছে যে সেটা মনে হয়েছিল। অবশ্য সেটা তিমির চোয়াল কিনা এবং যদি তাই হয়, তবে সে তিমি বাইবেলের উপাখ্যানের তিমি কিনা সে কথার আমি কিছুই জানি না।

তিমি নামে যে সামুদ্রিক জন্তু, সে যে মাছ নয় সে কথা আগেই বলেছি। এখন এটাও বলা দরকার যে, তিমি ও তিমির জাতভাই বলতে নানা আকারের ছোট বড় অনেক রকমের জলচর জীব আছে। এরা কেউই ডিম পাড়ে না মাছের মত। সকল অবস্থায় এরা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলে ডাঙ্গার জন্তুর মত, সোজা নাকের ভিতর দিয়ে বাতাস টানে এবং এদের মায়েরা তাদের ছানাদের দুধ খাওয়ায় গরু ভেড়া ছাগলেরই মত। দেখতেও এদের মধ্যে নানা রকমের চেহারা পাওয়া যায়। সে সবের ছবি ও বৃত্তান্ত দিতে হলে একটি ছোট বই লিখতে হয়।

তিমির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক খাদ্যের প্রয়োজনে এবং অন্য নানা কারণে। তিমির চর্বি গালিয়ে যে তেল পাওয়া যায়, সেটা নানাভাবে খাওয়ার কাজে লাগানো হয় এবং চর্বির কিছুটা সাবান, ক্রিম ও অন্য ঐ জাতীয় মুখে গায়ে মাখবার জিনিস ইত্যাদিতেও ব্যবহার করা হয়। জাপানে তিমির মাংস সাধারণ ভাবে সবাই খায় এবং ইয়োরোপেও নানা দেশে ওটা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া কোন কোন জাতের তিমির মুখের ভিতরে ঝালরের মত যে হাড়ের পাত থাকে, সেটার ব্যবহার নানাভাবে করা হয়ে থাকে। এই সব জিনিস ভাল দামে বিক্রী হয় এবং এক-একটা তিমি থেকে বিরাট পরিমাণে এসব পাওয়া যায়। সেই কারণে তিমি শিকার একটা প্রকাণ্ড ব্যবসা। আগেকার দিনে অর্থাৎ প্রাচীনকালে, তিমি প্রায় সকল সমুদ্রে ও মহাসাগরে চরে বেড়াতো। এখন শিকারীদের এড়াবার জন্য দুর্গম মেরু অঞ্চলে এরা বেশী থাকে। তবে মাঝে মাঝে মহাসমুদ্র পার হয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণ মেরু যাবার সময় এদের দেখা যায়। আবার মেরু অঞ্চলে যখন শীতকাল, তখন তিমির খাবার সেখানে জোটেনা ব'লে তাদের বাধ্য হয়ে সমুদ্র ও মহাসাগরের গরম অঞ্চলে চলে আসতে হয়।

১৯১৯ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের পরে যখন আমি বিলেত থেকে দেশে ফিরি, তখন আমি 'সিটি অফ স্পার্টা' নামক একটি জাহাজে দেশে ফিরছিলাম। সেই জাহাজ বেতারে সংবাদ পায় যে, একটা জার্মান যুদ্ধ-জাহাজ আফ্রিকার উপকূল ঘেঁষে শিকার খুঁজে বেড়াচ্ছে। যুদ্ধের সময় জার্মানরা কয়েকটা

খুব দ্রুতগামী বাণিজ্য জাহাজে কামান মেসিন গান ইত্যাদি অস্ত্র বসিয়ে এবং সাধারণ নাবিকের বদলে লড়াইয়ে মানোয়ারি নাবিক দিয়ে মিত্রপক্ষের (ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা ইত্যাদি) বাণিজ্যের জাহাজ মারতে পাঠায়। এগুলি মিত্রপক্ষের বা যুদ্ধে নির্লিপ্ত দেশের নিশান দেখিয়ে ও জাহাজে পরদা ইত্যাদি লাগিয়ে ছদ্মবেশে সমুদ্রে ঘুরে বেড়াতো। যদি দেখতো যে, কোনোও মিত্রপক্ষের জাহাজ রক্ষী রণ-পোত ছাড়াই চলেছে, তখন সে ছদ্মবেশ ছেড়ে কামান চালিয়ে সেই জাহাজ আট্‌কাতো। তারপর সে জাহাজ থেকে খাদ্যদ্রব্য কয়লা ইত্যাদি যা প্রয়োজন সে সব কেড়ে নিতো ও জাহাজের সব নাবিকদের বন্দী করে নিজেদের জাহাজে তুলে সেটা ডুবিয়ে দিতো। এইভাবে চার পাঁচখানা জাহাজ
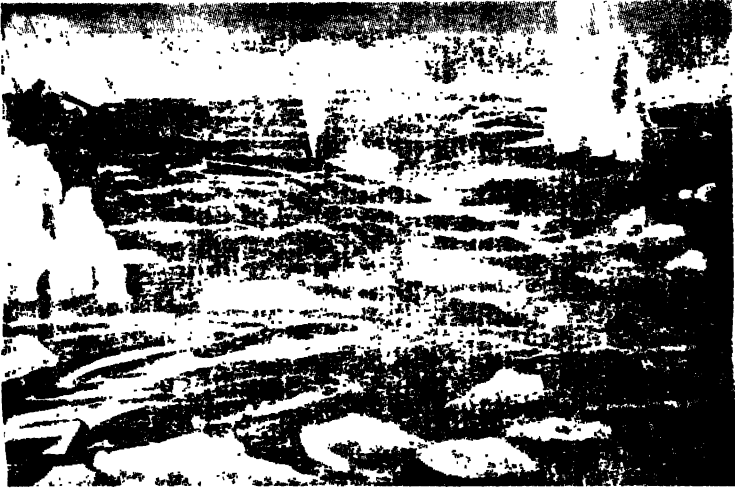
পৃথিবীর সর্বকালের বৃহত্তম স্তন্যপায়ী জন্তু 'নীল তিমি' শিকার। নীল তিমি ১০০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়।

ডুবিয়ে, একটা ছোট জাহাজে সব বন্দী চড়িয়ে ছেড়ে দিতো এবং সেই জাহাজ কোনও বন্দরে পৌছলে বাইরের জগৎ টের পেতো যে ঐ শিকারী-জাহাজ কোথায় ঘুরছে। এই রকম দু'তিনটে জাহাজ প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার পরেও প্রায় দেড় দুই বৎসর ঐভাবে সমুদ্রে জাহাজ মেরে বেড়িয়েছিল। যা হোক তার গল্প অন্য সময়ে বলা যাবে।

আমি যখন ফিরি তখন আগষ্ট মাসের শেষ, অর্থাৎ দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে প্রচণ্ড শীতকাল। কাজেই তখন সে অঞ্চলের অনেক তিমি বিষুবরেখার দিকের মহাসমুদ্রে এসেছে। এদিকে আমাদের

জাহাজ বেতারে ঐ শিকারী জার্মান জাহাজের খবর পেয়ে, ভারত-গামী জাহাজের সাধারণ সমুদ্র-পথ ছেড়ে, সোকোট্রা দ্বীপের পাশ দিয়ে দক্ষিণ মুখে পাড়ি দেয়। কেন না, ঐ রকম শিকারী-জাহাজ সাধারণ জাহাজ-চলা সমুদ্র-পথের আশেপাশেই ফেরে। একদিন ভোরে আমরা সোকোট্রা দ্বীপ দেখলাম, তারপর সেই দিনই সন্ধ্যায় আকাশের দক্ষিণ অংশে দেখলাম "সাউদার্ণ ক্রশ" (দক্ষিণ আকাশের ক্রুশ, Southern Cross) নামে নক্ষত্রমালা জলজল্ করছে। আমরা কেন এতো দূর দক্ষিণে চলে এসেছি সেকথা অবশ্য আমরা তখনো জানতুম না। সেকথা আমাদের বলা হোলো পরের দিন; যখন মিত্রপক্ষের যুদ্ধ-জাহাজ রাত্রে এসে ঐখানে টহল দেওয়ায়, ভোরের দিকে জাহাজের মুখ আবার ফিরিয়ে বোম্বাইয়ের দিকে চালানো হোলো। আমরা সেই সময় শুনলাম যে, জাহাজ বিষুবরেখা পার করে আরও বেশ কিছু দক্ষিণে গিয়েছিল—এখন ফিরে চলেছে।

ছোট জাহাজ, তারপর যুদ্ধের দরুণ জাহাজের কেবিনের কামরায় পাখা ছিল না। তাই আমরা গরম এড়াবার জন্য রাত্রে খোলা ডেকে শুয়েছিলাম। হঠাৎ শুনলাম দূরে তিমির পাল চলেছে। ধড়মড়িয়ে বিছানা ছেড়ে রেলিংয়ের ধারে দাঁড়িয়ে মাল্লাদের নির্দেশ মত দূরে তাকিয়ে দেখলাম। অতি প্রত্যুষের আবছায়া আলোয় প্রথম কিছু বুঝলাম না। পরে 'উয়ো দেখো' 'there she goes' শুনে চেঁচিয়ে চেয়ে মনে হোলো সমুদ্রের ঢেউ কাটিয়ে একটা আয়ো গাঢ় কালো রংয়ের কিছু চলেছে, আর তার সামনের দিকে সমুদ্রের জল ছাড়িয়ে একটা ছোট ফোয়ারার মত কি যেন জলরেখা দেখা যাচ্ছে। দেখতে দেখতে সে সবই মিলিয়ে গেলো। কিন্তু তারপরে জাহাজের যাত্রী এক সাহেবের (Zeiss-এর Night glass) বাইনোকুলার দূরবীনের সাহায্যে সেই রকম আর একটা কালো বস্তু ও সেই রকম ফোয়ারা কিছুটা স্পষ্ট ভাবেই দেখা গেলো।

তিমি ছোট বড় নানা রকম হয়। সব চেয়ে বড় রকম তিমির নাম "নীল তিমি"। এর এক একটা ১০০ ফুট পর্যন্ত লম্বা ও ৩০০০।৩২৫০ মণ ভারী হয়। আবার "পিগ্‌মি রাইট হোয়েল" জাতীয় তিমিরা হয় মাত্র ২০ ফুট লম্বা। খাওয়াদাওয়া হিসাবেও তিমিদের মধ্যে নানা প্রকার তফাত আছে। নীল তিমি অত বড় হলে কি হয়, তার গলা এতো সরু যে ছোট চিংড়ি জাতীয় জীবই এর প্রধান খাদ্য এবং এক এক দিনের খোরাক প্রায় ৩০।৩২ মন চিংড়ি মাছ। অন্য দিকে "ঘাতক তিমি" (Killer Whale) সীল, শুশুক, সিন্ধুঘোটক এই সব ধরে খায় এবং বড় বড় তিমিরও মাংস কামড়ে ছিঁড়ে খায়। এই ২৮।৩০ ফুট লম্বা তিমিই সমুদ্র ও মহাসাগরের সবচেয়ে হিংস্র জীব এবং এর কাছে হাঙর অক্টোপাস (Octopus) ইত্যাদি বিরাট জীবও হার মেনে যায়। এই ভয়ানক জীবগুলি আবার দল বেঁধে সমুদ্রে ঘুরে বেড়ায় এবং এক একটা দলে ৩ থেকে ৪০টা পর্যন্ত এক সঙ্গে থাকে। এদের এলাকা মেরু অঞ্চল থেকে বিষুবরেখা পর্যন্ত সমস্ত সমুদ্র অঞ্চল।

গঙ্গার শুশুক। প্রায় অন্ধ, কিন্তু অদ্ভুত স্পর্শশক্তি।

তিমির এক আমাদের গঙ্গা নদীতে বাস করে যার নাম গঙ্গার শুশুক।

বিড়াল যদি বাঘের মাসী হয় তবে শুশুক তিমির মামা। আগে এদের হুগলী নৈহাটি অঞ্চলের গঙ্গায় খুব দেখা যেতো। এখনো পাটনা, মোকাম ঘাট প্রভৃতি বিহার অঞ্চলের গঙ্গায় যথেষ্ট দেখা যায়। এরা ৮।১০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। এদের দৃষ্টিশক্তি খুবই ক্ষীণ, কিন্তু স্পর্শশক্তি ও শ্রবণশক্তি খুবই তীক্ষ্ণ।

গঙ্গার শুশুক সারা জীবন 'মিঠে' জলেই থাকে, সমুদ্রে বা মোহানার নোনা জলের মধ্যে এদের দেখা যায় না। অবশ্য এদের অনেক জাতভাই সমুদ্রে ও মহাসাগরেই চরে বেড়ায়।

সবশেষে "তিমিঙ্গিলের" কথা। অনেক বই ঘেঁটে, অনেক জীববিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানী লোককে জিজ্ঞাসা করে, এমন কি এদেশ ও বিদেশের অনেক 'যাদুঘর' ঘুরেও তো তার কোনও হদিস পাওয়া গেল না, শুধু যা ঐ বাংলা ও সংস্কৃত অভিধানের লেখা-জোখায় আছে। তবে তিমি শিকারের জন্যে আজকাল যে সব প্রকাণ্ড বড় ২০।২৫ হাজার টনের ভারবাহী জাহাজ ব্যবহার করা হয়, সেগুলোয় সত্যিসত্যিই আস্ত তিমি গিলে ফেলে।

এই প্রবন্ধের প্রথম পাতার ছবিটি উল্টে দেখ, দেখবে, কেমন জাহাজের সামনের গলুইয়ের মুখ খুলে প্রকাণ্ড একটা তিমিকে জাহাজের পেটে ঢোকানো হচ্ছে। জাহাজের যন্ত্রপাতিতে তিমির প্রায় সব কিছু কাজে লাগাবার জন্যে নানা রকম ব্যবস্থা আছে। কাজেই এই জাহাজগুলোকে "তিমিঙ্গিল" জাহাজ বলা যায়।

অন্য কোনও "তিমিঙ্গিল" বা এই তিমিঙ্গিলকে গিলতে পারে এমন "তিমিঙ্গিলগিল" সম্পর্কে কোনও খবর আমার জানা নেই। তোমরা যদি জানতে পারো তো "মৌচাক" অফিসে জানিয়ো।

ধর্‌-ধর্‌-ধর!

॥ স্বপনবুড়ো ॥

মামা আর ভাগ্‌নে!

বিরূপাক্ষ আর হোঁদলরাম!

মামা বিরূপাক্ষ চায়ের কাপটা শেষ করে হুঙ্কার দিলে,—বুঝ্‌লি হোঁদলরাম, দেশের যা অবস্থা দাঁড়াচ্ছে, তাতে আর চুপ করে বসে থাক্‌লে চল্‌ছে না!

হোঁদলরাম ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলে, তাহলে কি করবে মামা?

মামা বিরূপাক্ষ টেবিলের ওপর একটা ঘুঁষি মেরে বল্লে, এইবার ধরতে হবে সব ব্যাটাকে। রাঘব বোয়াল থেকে স্থুরু করে চুনোপুঁটি অবধি!

হোঁদলরাম যেন ওর মামার কথা শুনে অগাধ জলে পড়ে! তবু কুঁই-কুঁই করে কাতর আর্তনাদ জানায়, কিন্তু মামা, এই সব রাঘব বোয়ালদের তুমি পাবে কোথায়?

মামার কর্মক্ষমতায় যেন আঘাত লাগে।

তাই বিজ্ঞের হাসি হেসে মামা জবাব দেয়, হুঁ! হুঁ! পাবো কোথায়? বারে বারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান,—এইবার ঘুঘু তব বধিবো পরাণ! ওরা সব আনাগোনা করে কালো-বাজারের পথে। সেইখানে ঘাপ্‌টি মেরে থাকতে হবে।

ভাগনে মামার কথার প্রতিবাদ করতে সাহস পায় না! তবে এইটুকু বেশ বুঝে নিলে যে, কপালে অনেক দুঃখ আছে। কোথায় কালো-বাজার,—কোথায় তার অন্ধকার পথ · পিছ্‌লে পড়ে প্রাণটা যাবে আর কি!

মামা বিরূপাক্ষ ওর পেটে একটা খোঁচা মেরে বল্ল, এত আকাশ-পাতাল ভাববার কি আছে শুনি? প্রথমেই আমরা মাছের ব্যাপারে অভিযান স্থুরু করবো। শুনেছিস ত' মাছ নিয়ে ব্যাপারীরা সব কালো-বাজারে লুকিয়ে রাখছে। তাই আমাদের সরে-জমিনে তদন্ত করতে হবে।

ভাগনে হোঁদলরাম নাকি স্থরে বল্লে, আচ্ছা মামা, কালো-বাজারটা কোথায়? আগে তার সন্ধান করলে হয় না?

মামা জবাব দিলে, হবে কেন্ পাহাড়-পর্বতের কালো গহ্বরে। মাছগুলো নিয়ে ব্যাটারা সেইখানেই ত' লুকিয়ে রাখে। তাই ত' আমরা প্রাণ ভরে মাছ-ভাত খেতে পারিনে!

মামা বিরূপাক্ষ গম্ভীর গলায় ফতোয়া জারি করলে, আজ রাত বারোটায় আমাদের অভিযান স্থুরু করতে হবে। তুই আবার ঘুমিয়ে কাদা হয়ে থাকিস নে যেন!

এইবার ভাগনে সত্যি ভয় পেয়ে গেল।

এক বন্ধুর দৌলতে নাইট-শোর টিকিট কেনা ছিল। ভেবেছিল, ছবি দেখে ভূরি-ভোজনের পর পুরুষ্ট একটি ঘুম লাগাবে,—আর উঠবে পরদিন বেলা ন'টায়। মামা না হলে এমন শত্রুতা আর কে করবে? সিনেমা আর নিমন্ত্রণের একেবারে গঙ্গাযাত্রা!

মামা ওকে চুপ করে থাকতে দেখে ভারী বিরক্ত হ'ল। বল্লে, তুই একটা ব্যাগ নিয়ে তৈরী থাকিস। আমি তোকে সময়মত ডেকে নিয়ে যাবো।

—ব্যাগ? ব্যাগ কি হবে মামা?

ভুরু কুঁচ্‌কে মামা জবাব দিলে, মাছের নমুনা নিয়ে আসতে হবে না? আগেই বা মাছ কেমন থাকে, আর কালো-বাজারে যাওয়ার পরই বা তার কি আকৃতি হয়,—সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নোট করে রাখতে হবে। হ্যাঁ, ভালো কথা, নোট বই আর পেন্সিল চাই।

ভাগনের মনে তবু ক্ষীণ আশা সুতোর মতো ঝুলে থাকে। জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা মামা, তুমি যাবে কোথায়?

মাথা চুল্‌কে মামা উত্তর দেয়, আরে সেই কথাটাই ত' এখনো ঠিক করিনি! আচ্ছা ধর, পাতিপুকুর ছাড়িয়ে আরো বেশ কিছুটা গেলে অনেক জলা জায়গা আর ভেড়ী আছে। তারই আশে-পাশে গভীর রাত্রে ঝোপ-জঙ্গল দেখে লুকিয়ে থাকতে হবে। জেলেরা কি ভাবে মাছ ধরে সেটা নিরীক্ষণ করতে হবে ত'। কাজটা অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ। তাই গোড়া থেকেই সুরু করতে হবে!

ভাগনে মনে-মনে অঙ্ক কসে নিলে।

বেশ বুঝতে পারলে, নাইট-শোতে সিনেমা দেখার বারোটা বেজে গেল। এমন লোভনীয় কর্ম-তালিকাটা ছিল! প্রথমে সিনেমা দেখা, তারপর বন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষে পেট-পুরে পোলাও-কালিয়া ভোজন। এই মণিকাঞ্চন সুযোগ জীবনে আর ক'বার আসবে?

আচ্ছা, কালো-বাজার কি পালিয়ে যাচ্ছে? আজকের দিনটা সাদা-বাজারে ঘুরে বেড়ালে ক্ষতি কি?

গভীর রাত্রে মামা-ভাগ্নে ব্যাগ নিয়ে রওনা হ'ল। দেশবন্ধু পার্কের পিছনে একটা ছোট ছইওয়ালা নৌকা বাঁধা ছিল। এ ব্যবস্থা মামা বিরূপাক্ষ আগে থেকেই করে রেখেছিলেন। ওরা দু'জনে উঠতেই মাঝিরা নৌকা ছেড়ে দিলে। সারা রাত ধরে মশার কামড় খেতে খেতে ওরা কৃষ্ণরামপুরের খাল দিয়ে অনির্দেশের পথে এগিয়ে চল্লো। কালো-বাজারের সন্ধান করতে হলে এই রকম কালো-রাত্রেরই যে প্রয়োজন ভাগ্‌নে সে কথা বিলক্ষণ বুঝতে পারলে!

কিন্তু প্রতিবাদ করবার কোনো উপায় নেই! 'পড়েছি যবনের হাতে,—খানা খেতে হবে সাথে।'

যখন পাতিপুকুরের খালের মশার কামড় একেবারে অসহ্য হয়ে উঠল, সেই সময় মামা হঠাৎ ফিস্ ফিস্ করে মাঝিকে বল্লে, এইখানেই আমাদের নাম্তে হবে। সামনেই মাছ ধরার একটা বড় ভেড়ী আছে। আমাদের গোয়েন্দার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজ সুরু করতে হবে।

মাঝি চুপচাপ নৌকো ভেড়াল খালের ধারে। বিরূপাক্ষ উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে, ওরে হোঁদলরাম, ্যাগ নিতে ভুলিস নি যেন। আমাদের মাছের 'স্যাম্পেল' যোগাড় করতে হবে।

হোঁদলরাম তখন মনে মনে বিরূপাক্ষ মামার পিণ্ডি চটকাচ্ছে! আহা! এমন সিনেমা আর াওয়া ছেড়ে পাতিপুকুরের খালের ধারে মশার কামড় খেতে হচ্ছে!

মাঝির হাতে মামা করকরে কয়েকটি নোট গুঁজে দিলে। তারপর সে যে অন্ধকারের মধ্যে ্াথায় অদৃশ্য হয়ে গেল—হোঁদলরাম তার কোনো হদিশ পেলে না!

এখন এই কাদা-প্যাচপেচে পথ দিয়ে মামাকে অনুসরণ করে মহাপ্রস্থানের পথে এগিয়ে যেতে ব।

মামা সাবধান করে দিলে, হি—স্! চল্বার সময় শব্দ করিস নে। ওই যে দূরে জলা ্গায় টিম্‌টিম্ করে আলো জ্বলছে ওইখানেই রাত্রে মাছ ধরা হয়। খবরের কাগজের ্পার্টারের মতো আমাদের সব সংবাদ সংগ্রহ করতে হবে। কিন্তু সাবধান! ব্যাটারা জানতে ্লেই জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে।

হোঁদলরাম তখন মনে মনে 'দুর্গানাম' জপ করছে। ওর বন্ধুরা বোধ হয় এতক্ষণে সিনেমা ্ দিব্যি গরম কাটলেট গলাধঃকরণ করছে! আর ও কিনা পাতিপুকুরের প্যাচপেচে কাদায় ্র কামড় খেয়ে মরছে। মার ভাই মামা যে এমন মারাত্মক মহামারী হয়—হোঁদলরাম তা কি ্ জানবে বলো? এই ত' সেদিনের কথা। বন্ধুরা মিলে কলেজ স্কোয়ারের কফি হাউসে কফি খেয়ে ্বেলার দিকে কলেজ স্কোয়ারে ঘুরছিল,—এমন সময় এক গনৎকার তাকে দেখতে পেয়ে কাছে ্ছিল! তারপর তার কপাল দেখে ভবিষ্যৎ-বাণী করেছিল, সামনেই ওর একটা ভীষণ ফাঁড়া ্ছে। এমন কি ওকে মাদুলী পর্যন্ত দিতে চেয়েছিল।

হোঁদলরাম তখন কিছু বিশ্বাস করেনি। মুখ টিপে হেসেছিল! এখন সে হাড়ে-হাড়ে বুঝতে ্ল ফাঁড়া কাকে বলে।

মামা তখন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে আপন মনে পথ চলছে। একটু বাদেই পকেট থেকে বাইনাকুলার করলে বিরূপাক্ষ। জেলেদের গতিবিধি নিরীক্ষণ করবে। পেছন দিকে না তাকিয়েই বিরূপাক্ষ

বল্লে, হুঁসিয়ার! একটু শব্দ হয়েছে-কি জেলে ব্যাটারা সব জানতে পারবে। তখন জ্যান্ত পুঁতে ফেললেও কোন আপিল চলবে না।

একেই ত' রাত্তিরে হোঁদলরামের খাওয়া হয়নি। মনে হচ্ছে পেটের ভেতরটায় কে যেন মাঝে মাঝে খাম্‌চে ধরছে! তার ওপর ক্রমাগত মশার কামড়। পাতিপুকুরের মশাগুলো কেমন ট্রেনিং নিয়েছে। চলার পথেও ছেড়ে কথা কইছে না। একমাত্র চুলটাকে বাদ দিয়ে কপাল থেকে পা পর্যন্ত কুটুস্ কুটুস্ কামড় চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ প্রতিবাদ করবার কোনো উপায় নেই।

বিরূপাক্ষ মামা আবার ফোঁড়ন কাটলে, দেখছিস হোঁদলরাম, জেলের দল কেমন টপাটপ মাছ ধরছে! অথচ বাজারে গেলেই দেখতে পাবি—Invisible fish! নিশ্চয়ই ওরা বিজ্ঞানচর্চা করে। মাছের গায়ে কোনো 'লোশন' কিংবা পাউডার মাখিয়ে দেয়। এর একটা ভালো রকম খবরাখবর নেয়া দরকার। এই যে জলা জায়গাটার পাশে বেশ ঘন ঝোপ রয়েছে,—এইখানে ব্যাগগুলো রাখ। তোকে এগিয়ে গিয়ে দেখতে হবে, কি করে জেলেরা মাছ ধরে, মাছ জল থেকে ডাঙায় তুলে কি কৌশলে ঝুড়ি ভর্তি করে। সেই সময় মাছের গায়ে কিছু মাখায় কিনা, আর ত্মাথ সুযোগ বুঝে একটি মাছ তুলে নিয়ে পালিয়ে আসবি। আমার এক বন্ধু রসায়নাগারে কাজ করে। তাকে দিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করাতে হবে।

হোঁদলরামকে ইতস্তত: করতে দেখে বিরূপক্ষ মামা সাহস দিয়ে বল্লে, তোর কোনো ভয় নেই। আমি ত' কাছেই রয়েছি। এই বায়নাকুলার চোখে দিয়ে সব কিছু লক্ষ্য রাখবো। আমার পকেটে রয়েছে একটা শঙ্খ। তোর কোনো বিপদ দেখলেই সেটাকে আমি ভোঁ করে বাজিয়ে দেবো। তখন দেখবি পিল্‌পিল্ করে লোক এসে জেলেদের একেবারে গ্রেপ্তার করে ফেল্‌বে।

হোঁদলরাম তখন ভাবছে অন্য কথা। বন্ধুরা এতক্ষণে বোধকরি ভোজ শেষ করে আইসক্রীমের পাত্‌লা কাচের কাপে হাত দিয়েছে।

মানুষ অনেক রকমে বিপদে পড়ে। জেনে-শুনে আগুনে হাত দিলে এক রকম বিপদ আছে। সে বিপদে চট্ করে হাত সরিয়ে নেয়া চলে। পথ চলায় বিপদ আছে, পরীক্ষা দেয়ার একটা বিপদ আছে, জলে ডোবার বিপদ আছে, গাড়ী চড়ার বিপদও নেহাত কম মারাত্মক নয়; মাসের শেষের বাজারের বিপদ— ত' জেনে-শুনে শত্রুর শিবিরে প্রবেশ করা। লেট করে ইস্কুলে যাওয়ার বিপদের স্বাদ আবার অন্য রকম। খেলার মাঠের বিপদ রে-রে শব্দে পিঠের ওপর এসে পড়ে। কিন্তু মামা থাকার যে বিপদ…তার অভিজ্ঞতা ওর আদপেই ছিল না। আজ হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছে।

তবু এইবার মরিয়া হয়ে হোঁদলরাম আপত্তি জানাবার চেষ্টা করল।

বল্লে, মামা,—তুমি থাকবে এত দূরে, আর আমি চলে যাবো জেলেদের মাঝখানে?

বায়নাকুলার দিয়ে আমার বিপদ অবলোকন করবে বটে,—তবে সত্যি যদি কোনো সঙ্কট আসে, তখন তুমি আমায় কি করে রক্ষা করবে শুনি ?

বিরূপাক্ষ মামা খিক-খিক করে হেসে সব আপদ-বিপদকে যেন আবহাওয়াতত্ত্ববিদের আকাশের মেঘের মতো উড়িয়ে দিল। বল্লে, ওরে হোঁদলরাম, কিছু ভাবিস নে তুই। আট-ঘাট বেঁধে তবে আমি কাজে হাত দিয়েছি। যেই দেখবো বিপদ ঘনীভূত হয়ে এসেছে—অমনি আমি শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খের মতো এই শাঁখটা বাজিয়ে দেবো। মামা তার পকেট থেকে একটা ছোট্ট শাঁখ বের করে দেখালে।

'লক্ষ্মী ছেলেটির মত এক পা দু'পা করে এগিয়ে গেল।'

এর পরে আর কোনো আপত্তি করা চলে না। হোঁদলরাম লক্ষ্মী ছেলেটির মতো এক পা দু'পা করে এগিয়ে গেল।

বিরূপাক্ষ মামা ওকে পেছন থেকে ফিসফিসে গলায় সাবধান করে দিলে, ওরে হোঁদলরাম, চোখ-কান খুলে চলবি। কোনো বিপদ-আপদ দেখলে পেছন ফিরে তাকাবি। তোর মামা এখানে সজাগ প্রহরীর মতো বিনিদ্র-রজনী জেগে রইল! তার হাতে থাকল বায়নাকুলার, আর পকেটে থাকল পাঞ্চজন্য শঙ্খ।

এত কাণ্ডের পর আর ভয় করা চলে না তাকে বলে কাপুরুষতা। তাই হোঁদলরাম গুটিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চললো।

সেই কলেজ ষ্ট্রীটের গনৎকারের কথা তার কেবলি মনে পড়তে লাগল। তখন যদি কথাটাকে হেসে উড়িয়ে না দিয়ে একটা মাদুলী চেয়ে নিতো,—তাহলে বোধ করি এই কালো অমানিশা রাতে—কালো-বাজারের মৎস্যকুল অনুসন্ধান করতে তাকে জলাভূমিতে এসে নিশাচরের মতো পদচারণা করতে হ'ত না।

ঝোপ-জঙ্গলের আড়ালে আড়ালে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেল হোঁদলরাম। জেলেদের কথা শোনা যাচ্ছে—

একজন বল্লে, ওরে মহেশ, রোজ আমাদের মাছ চুরি যায়,—সব দিকে নজর রাখবি।

মহেশ বল্লে, হ্যাঁ খুঁড়ো, মাছ-চোর এলে আজ আমরা তার মাথা ফাটিয়ে দেবো না!

এই কথা শুনে হোঁদলরাম ভয় পেয়ে যেই পেছুতে গেল অমনি ঘপাৎ করে একটা জল-ভর্তি গর্তের মধ্যে পড়ে গেছে।

আর সঙ্গে সঙ্গে বিরূপাক্ষ মামা শাঁখ বাজিয়ে দিয়েছে। সেই শাঁখের শব্দে জেলেরা সব ছুটে এলো।—ওরে মাছ চুরি করতে এসেছে রে—ধর্—ধর্—ধর!...

ছুটলে' সব জেলের দল।

হোঁদলরাম তখন প্রাণের ভয়ে যেদিকে চোখ যায় কাপড় গুটিয়ে পালাতে লাগলো।

কাদায় সারা শরীর মাখামাখি। কাঁটাগাছে সারা দেহ ছড়ে গেল। এমন সময় নামল বৃষ্টি। আছাড় খেয়ে, ধুতি ছিঁড়ে, দাঁত ভেংগে আর হাত মচ্‌কে হোঁদলরাম যখন বড় রাস্তার পাশে এসে হাজির হ'ল— তখন একটা খোলার ঘরের ছাদে মোরগ ডেকে উঠল—কোঁ—ক - র কোঁ!

মনে মনে হোঁদলরাম ভাবলে, ফাঁড়াটা তাহলে কি কাট্‌লো? নিজের গায়েই চিমটি কাটলে।—বেঁচে আছি ত'?

আশ্বিনের গান

শ্রীসন্তোষ মুখোপাধ্যায়

আশ্বিন, তুমি অমল-আলোর পাখনা দু'টো মেলে
খুশীর স্রোতে ছন্দ-গানে আবার তুমি এলে।
সবুজ-সবুজ গাছের 'পরে ডাকছে রঙিন পাখি
কাশের বনে উজল দেখি সোনা-রোদের রাখী।

চতুর্দিকে ফুল ফুটেছে মৌমাছিদের ঝাঁক...
দিগন্তরে বকের সারি দিচ্ছে শুধুই পাক।
হাওয়ার বুকে আসছে ভেসে নতুন খুশীর দোল
প্রাণের মাঝে শুনছি যেন কিসের কলরোল।

'আগমনী'র বাঁশীর ডাকে উঠলো নতুন ঢেউ—
এমন দিনে বন্ধ ঘরে থাকবে কি আর কেউ!

হাতীর দল

সাপের পা কোথায় গেল

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত

পৃথিবীতে কোনো কোনো প্রাণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বাহুল্য তোমরা লক্ষ্য করে থাকবে। এই যেমন হাতীর শুঁড়, হরিণের খুর, বিড়ালের থাবা ইত্যাদি। আবার দেখবে অনেক প্রাণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষমতা লোপ পেয়েছে। জীব-জগতে যার যেটুকু প্রয়োজন প্রকৃতি তা যেমন ঠিক ঠিক দিয়ে যাচ্ছে, তেমনি আবার কালক্রমে অনাবশ্যক বোধে কতক কতক লোপ করে দিচ্ছে।

হাতীর চোখ দেখেছ? কী প্রকাণ্ড জীব, অথচ তার চোখ দুটো একেবারে এতটুকু! বেচারা চোখে কম দেখে। আবার চোখ থেকেও কোনো কোনো জলচর প্রাণী দেখতে পায় না। নিউজিল্যাণ্ডে আদিম সরীসৃপ জাতীয় একটি প্রাণীর নাকি তৃতীয় একটি চোখ আজও আছে। কিন্তু দৃষ্টিশক্তি নেই তার। বিজ্ঞানীরা বলেন, এককালে মেরুদণ্ডী স্তন্যপায়ী প্রাণী মাত্রেরই মস্তকে তৃতীয় নেত্র ছিল,—মানবেরও; যদিও আজ তার চিহ্ন মাত্র নেই। ভালই হয়েছে। আমরা দুই চোখে যা দেখি, অনেক সময়ে তারই কোনো কূল-কিনারা করতে পারি না। কী বল?

প্রকৃতির এক অপূর্ব সৃষ্টি এই চক্ষু। প্রাণের আবির্ভাবের শুরু থেকে ক্রমবিবর্তনের ফলে চক্ষু আজ বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁচেছে।

তীব্র ঘ্রাণশক্তি মানুষের নেই, যেমন আছে কুকুর বিড়ালের। ঘ্রাণশক্তির দ্বারা মানুষ অন্ধকারে পথ খুঁজে নিতে পারে না। মানুষের এই ক্ষমতার অভাব মোচন করেছে তার মস্তিষ্ক।

ঘ্রাণশক্তি আর স্মরণশক্তি এই দুইয়ের খুব নিকট সম্পর্ক। কোনো একটি ফুলের গন্ধ কিংবা একটা এসেন্সের সুবাস অনেক সময়ে আমাদের মনে অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

পৃথিবীতে আবির্ভাবের প্রথম অবস্থায় মানুষের যে গঠন ও আকার ছিল, ক্রমবিবর্তনের ফলে আজ তার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। সে শুধু ঘ্রাণশক্তিই হারায় নি, হারিয়েছে আরো অনেক কিছু। এখন তার শরীরের লোম নেই; যে কান ছিল বানরের কানের মতো তার রূপান্তর ঘটেছে; ছোট হয়েছে পায়ের আঙুল। অনেক কিছু হারিয়ে সে আজকের সর্বাঙ্গসুন্দর অবস্থায় এসে পৌঁচেছে। অনেক কিছু হারিয়েছে বটে, কিন্তু তাতে তার ক্ষতি হয়নি বরং লাভ হয়েছে,—মানুষ আজ অবিনশ্বর আত্মার অধিকারী।

তবে এটা ঠিক যে, প্রকৃতির রহস্য ভেদ করা কঠিন।

এক কালে সাপেরও পা ছিল। বর্তমানে তা নেই। পা নেই বটে, কিন্তু সাপ বানরের চেয়ে

দ্রুত গাছে চড়তে পারে।. জলে মাছের চেয়ে দ্রুত সাঁতার কাটতে পারে, ভাল কুস্তিগিরের চেয়েও বেশিক্ষণ লড়তে পারে, বাঘকেও পিষে মেরে ফেলতে পারে। এ কি কম কথা হ'ল? সাপ মাটিতে পাঁজরের সাহায্যে, জলে সাঁতার দেয় মোচড় কেটে কেটে।

আচ্ছা, পা থাকলে সাপকে কেমন দেখাত? চার পা-ওয়ালা প্রকাণ্ড অজগর সাপ গাছে উঠতে চেষ্টা করছে, কিংবা দৌড়ে পালাচ্ছে ঝোপ-জঙ্গলে, ব্যাপারটি কল্পনা করত? অবশ্য পায়ের অভাব সাপের পক্ষে খুব ক্ষতিকর হয়নি। পৃথিবীতে সাপের সংখ্যাধিক্যই তার প্রমাণ। পা লোপ পাবার আগেই নিশ্চয় সাপ পাঁজরের সাহায্যে এঁকে-বেঁকে চলার অভ্যাস করেছিল। কিন্তু শরীরবিদগণ বলেন, সাপের পা একেবারে লোপ পায়নি! কিছু অংশ ওদের গায়ের চামড়ার তলায় লুকোনো আছে। তবে এমন বেমালুম অদৃশ্য হয়েছে যে, বাইরে থেকে কিছু বুঝবার জো নেই।

হাঁ, সাপের পায়ের নিদর্শন রয়ে গেছে। লক্ষ্য কর ইংরেজীতে এমন দু'চারটে শব্দ আছে, যাতে একটা করে অক্ষর রয়েছে যা অপ্রয়োজনীয়, শব্দের উচ্চারণে যা কাজে আসে না। যেমন—alms শব্দের 'l' এবং debt শব্দে 'b'। এই অক্ষর থেকে গেছে কেবল শব্দের ইতিহাস প্রমাণের জন্যে।

সাপ পা হারিয়েছে, মাছি নোংরা স্থানে থেকে থেকে উড়ে চলবার ক্ষমতা হারিয়েছে, তিমি-মাছের পেছনের পা লোপ পেয়েছে, সামুদ্রিক জীব সীলের পেছনের দু'পা রূপান্তরিত হয়েছে শক্ত পাখনায়। এই পরিবর্তন ভালই হয়েছে বলতে হবে।

গরিলা ভয়ংকর জন্তু, গায়েও ভীষণ জোর। কিন্তু কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিরোধ ক্ষমতা লোপ পেয়েছে। তাই বর্তমানে সে আশ্রয় নিয়েছে গভীর জঙ্গলে, লোকচক্ষুর অন্তরালে। আবার এক সময়ে যখন সভ্যতার আলো তার জঙ্গলের রাজ্যে গিয়ে পৌঁছুবে, তখন তার অবস্থাটা শোচনীয় হয়ে উঠবে নাকি?

দক্ষিণ আমেরিকায় এক প্রকার পিঁপড়ে-খাদক জীব আছে। পুরাকালে তার মুখে বড় বড় দাঁত ছিল, একালে তার একটিও দাঁত নেই; চোয়াল ও জিহ্বার আকারও বদলেছে; এখন টিকটিকির মতো লম্বা লিক্‌লিকে জিভ বের করে সে খাদ্য সংগ্রহ করে।

পাখির উদ্ভব হয়েছিল সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী থেকে। এককালে দাঁত ছিল পাখির। এখন নেই। দাঁতের অভাব মিটিয়েছে চঞ্চু। ঐ চঞ্চু বা ঠোঁটেই তাকে মানিয়েছে ভাল।

উড়ে চলার ক্ষমতা হারানোর ফলে অনেক পাখি লোপ পেয়েছে পৃথিবী থেকে। পেঙ্গুইন পাখির ডানা লোপ পেয়েছে। এখন সে পায়ের সাহায্যে জল কেটে কেটে চলে। প্রকৃতি যদি তাকে রক্ষা না করে, তবে হয়ত শতাব্দীকালের মধ্যেই পেঙ্গুইন জাতি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হবে।

কোনো কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হারিয়ে বহু প্রাণীর খুব ক্ষতি হয়েছে, একথা আমি বলছি না।

জীবনযাত্রা-প্রণালী এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার দরুণ ওদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লোপ পেয়েছে। তবে, প্রাণীর জীবনধারণের জন্যে যখন যেমনটি প্রয়োজন, প্রকৃতি ঠিক তেমন ব্যবস্থাই করেছে।

প্রকৃতির এ ধরনের খামখেয়ালীতে অনেক সময় আমাদের অবাক লাগে। আসলে প্রাকৃতি তার কাজ ঠিকই করে যাচ্ছে, সবই নিছক খামখেয়ালী নয়।

আধুনিক সভ্যতার যুগে মানুষ নানাভাবে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম উপভোগ করছে। নিজকে নিরাপদ মনে করছে। ফলে কী হয়েছে? কোনো কোনো ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা লোপ পেয়েছে। এই যেমন যে কোনো ভাষার বড় বড় জোড়া শব্দগুলো ভেঙ্গেচুরে ছোট হচ্ছে।

আমার আঙুলহাড়া হয়েছিল,—তাতে হস্তলিপি আর এক রকম হয়ে গেছে।

মা এসেছে

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

তাক্ কুড়-কুড় তাক্ কুড়া-কুড়
　　ড্যাম কুড়-কুড়—তাক্,
সকাল থেকেই খুকুর মনে
　　বাজছে পুজোর ঢাক!
শরৎ-হাওয়া মিষ্টি কেমন
　　আকাশ কেমন নীল,
শালিক-টিয়া নাচছে গাছে
　　ঝকঝকে খাল-বিল!

শিশির-ভেজা ঘাসের বনে
　　সোনালী রোদ্দুর,
নৌকো চলে নদীর বুকে,
　　নদী—সমুদ্দুর!
দেখবি তো আয় কাশের মেলা
　　শিউলি ফুলের দোল,
অপ্‌রাজিতা পালকী হয়ে
　　বিছায় কেমন কোল!

মা এসেছে—গানের সুরে
　　আগমনীর ডাক,
খুকুর মনে খুশির আমেজ,
　　তাক্ কুড়া-কুড়—তাক্!

বাজি

শ্রীপ্রভাত দেবসরকার

বণিক মাধব দত্ত ছিলেন অগাধ ধনী। তিনি এত ধনী যে ইচ্ছে করলে নিজের বাড়ির সামনে রাস্তাটা রুপোর পাত্ দিয়ে মুড়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি, তার বদলে তিনি এক পয়সা খাটিয়ে দু'পয়সা, দু'পয়সা খাটিয়ে চার পয়সা, এমনি করে প্রচুর পয়সা করেছিলেন।

কিন্তু তাঁর একমাত্র পুত্র সাগর ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন মেজাজের। বাপের স্বভাব সে পায়নি। বাপের মৃত্যুতে প্রচুর বিষয়-সম্পত্তির অধিকারী হয়ে সে কেবল পয়সা ওড়াতে লাগল। নানা বদখেয়াল আর বদসঙ্গীর অনুরক্ত হ'য়ে উঠল। নোট দিয়ে ঘুড়ি বানিয়ে আকাশে ওড়ালে, আর রুপোর টাকাগুলো দিয়ে খোলাম-কুচির মতন এক্কা-দোক্কা খেললে! ফলে যা হয়, টাকা গেল, বন্ধু গেল, সাগর দত্ত গরীব হ'ল, দিন-চলা ভার! সুখের দিনের বন্ধুরা এখন দেখা হ'লে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। পায়রা-স্বভাব বন্ধুদের! বাপের পয়সায় সুখ ক'রে সাগর এখন বুঝলে সত্যিকারের সুখটা কি!

এই যখন অবস্থা তখন একদিন সাগরের বাড়িতে কে যেন টিনের একটা তোরঙ্গ পাঠিয়ে দিলে। নাম-ধাম কিছু নেই, সঙ্গে একটা চিরকুটে লেখা—এখনো সময় আছে, যা আছে তাই নিয়ে পেঁটরায় ভর্তি করে সরে পড়, যদি ভাল চাও!

বিষয়-সম্পত্তির কিছু আর অবশিষ্ট ছিল না। গায়ে ঐ ছেঁড়া-খোঁড়া একটা জামা আর পায়ে তালি-দেওয়া একজোড়া চটি! সাগর দত্ত অনেক ভেবে নিজেই তোরঙ্গের মধ্যে বসে ডালাটা হাত দিয়ে ফেলে দিলে। আর যায় কোথায় তোরঙ্গটা মাটি ছেড়ে আকাশে উড়তে লাগল। তারপর উড়তে উড়তে অনেক দূর এসে এক সময় তোরঙ্গটার তলা ছেড়ে গেল, আর সাগর দত্ত ধুপ করে এক বনের মধ্যে গেল পড়ে। কিন্তু কি ভাগ্যি, তার দেহের কোথাও এতটুকু আঘাত লাগল না। মাটিতে পড়তে তোরঙ্গটা যেমন ছিল তেমনি আবার গোটা হয়ে গেল!

তোরঙ্গটা বনের শুকনো লতা-পাতায় ঢাকা দিয়ে সাগর দত্ত আশ্রয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। খানিকটা আসতে দেখলে, দিব্যি শহর, রাস্তা-ঘাট দোকান-পসরা সাজান-গোছান!

রাস্তায় একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে দেখা হতে সাগর দত্ত তাকে জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা ঐ যে রাস্তার ওপরে একটা মস্ত বাড়ি দেখা যাচ্ছে ওইটিই কি তোমাদের রাজ-বাটি?

স্ত্রীলোকটি বললে, ওটা রাজ-বাটি হতে যাবে কেন, রাজ-বাড়ি তো ওই ওখানে!

সাগর দত্ত লক্ষ্য করে দেখলে, আকাশ ফুঁড়ে বড় বড় থাম আর মিনার-ওলা মস্ত একটা প্রাসাদ :

সাগর দত্ত জিজ্ঞেস করলে, তাহলে ওটা ?

স্ত্রীলোকটি বললে, ওখানে রাজকুমারীকে আটকে রাখা হয়েছে।

কেন ?

স্ত্রীলোকটি মুখের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললে, বড় ঘরের বড় কথা! আমার বাপু অত কথার দরকার কি ?

সাগর দত্ত পেড়াপীড়ি করতে স্ত্রীলোকটি চোখ-মুখ একরকম করে বললে, তাহলে শোন একান্তই যখন শুনবে, কিন্তু খবরদার কাউকে বলোনা যে আমি বলিছি—রাজ-

'আমি স্বর্গ থেকে আসছি—আমিও দেবতা!'

জ্যোতিষী নাকি গুণে বলেছে, রাজকুমারীর ভালবাসার মানুষ একদিন রাজকুমারীর মনে ভারী দাগ্‌ দেবে। সেই জন্যে রাজা কারো সঙ্গে রাজকুমারীকে মিশতে দেন না। খাঁচার পাখির মতন ঐ বাড়িতে বন্দী করে রেখেছেন।

সাগর দত্ত সব শুনে, কিছু না বলে বনের মধ্যে চলে গেল। তারপর তোরঙ্গের মধ্যে বসে মুহূর্তে রাজকুমারীর ঘরে এসে পৌঁছল। হীরা-জহরৎ, মণি-মাণিক্যের ছটায় ঘর আলোয় আলো, একধারে একটি আরাম কেদারায় শুয়ে রাজকুমারী ঘুমচ্ছে।

খোলা জানালা দিয়ে উড়ন্ত তোরঙ্গটা ঘরে পড়তে কিছু শব্দ হয়েছিল, সেই শব্দে রাজকুমারীর ঘুম ভেঙে গেল, সঙ্গে সঙ্গে সে চেয়ে দেখলে, ভয়-বিহ্বল কণ্ঠে বললে, একি! কে তুমি ? এখানে কি ক'রে এলে ? পালাও পালাও, রাজা দেখলে বিপদ হবে!

এদিকে সাগর দত্ত রাজকুমারীকে দেখে এমনি মোহিত হয়ে গেছে যে, পালাবার কথা

কল্পনা করতে পারলে না। সাগর গদ্‌গদ স্বরে বললে, আমি স্বর্গ থেকে আসছি। তুমি একলা আছ কিনা তাই দেবতারা আমাকে পাঠিয়েছে তোমার সঙ্গে আলাপ করতে। আমিও দেবতা!

খুসী হয়ে রাজকুমারী ইশারা করে আগন্তুককে কাছে ডেকে পাশে বসিয়ে গল্প করতে লাগল। সাগরও অনেক মজার মজার গল্প বললে, দু'জনের খুব ভাব হয়ে গেল। হঠাৎ একসময় সাগর জিজ্ঞেস করলে, তুমি আমাকে বিয়ে করতে রাজী, রাজকুমারী?

রাজকুমারী সলজ্জ হেসে মাথা নাড়লে, হাঁ!

তারপর বিদায়ের সময় জানালার পাল্লা দুটো ধরে রাজকুমারী বললে, আসছে শনিবার আবার এসো, সেই দিন বাবা-মা এসে আমার এখানে চা খাবেন, তোমার নেমন্তন্ন রইল! আর একটা কথা শোন, বাবা-মা গল্প শুনতে খুব ভালবাসেন। তবে দু'জনে দু'রকমের গল্প পছন্দ করেন: মা চান নীতি-কথার গল্প, বাবা চান মজা আর হাসির গল্প! তুমি আসবার সময় দু'রকমই গল্প আনবে, বুঝলে?

সাগর বললে, আনবে।

দেওয়ালের গায়ে ঝোলান একটা তরোয়াল পেড়ে সাগরকে দিয়ে রাজকুমারী বললে, এটা তুমি সঙ্গে নাও, কাজে লাগবে।

সত্যিই কাজে লাগবে, কেননা তরোয়ালের বাঁটের মধ্যে অনেকগুলো মোহর ছিল। রাজা-রাজড়ার ব্যাপার, তারা যেখানে খুসী সোনা-দানা রেখে দেন!

রাজা-রাণী শুনলেন, স্বর্গের কোন দেবতার সঙ্গে রাজকুমারীর ভাব হয়েছে, আর সেই দেবতা তাদের মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছে। খুবই আনন্দের কথা!

এদিকে সাগর দত্ত বনের মধ্যে গিয়ে নানা গল্প ভাবতে লাগল। মনে মনে গল্প তৈরী করলে। দেখতে দেখতে শনিবার এসে গেল।

রাজা-রাণী এলেন, সঙ্গে পাত্র-মিত্রও এল। রাজকুমারীর বাড়িতে উৎসব লেগে গেল। চায়ের নেমন্তন্ন মানে ছোটখাটো ভোজ আর কি! রাজকুমারী খুব সেজেছে, এই আয়োজনেই তার পাকা দেখা হবে যেন।

সাগর দত্তও খুব সেজে এসেছে, গায়ে নতুন সার্টিনের জামা, পায়ে নতুন বার্নিশ করা জুতো, মাথায় জরির টুপি, দেবতার মতনই দেখতে হয়েছে! রাজকুমারীর দেওয়া তরোয়ালের বাঁট থেকে পাওয়া মোহরের সদ্ব্যবহার করেছে সাগর!

সাগর দত্ত আসতে রাজা খুব খাতির ক'রে সামনে বসালেন, সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে

দিলেন। রাণী নিজের হাতে চা ঢেলে আপ্যায়ন করলেন। রাজকুমারী আড়ালে ঘরে গিয়ে নিজের মনে হাসতে লাগল।

সবাই বললে, হ্যাঁ, দেবতাই বটে, রাজার হবু জামাই!

খাওয়া-দাওয়া চুকতে রাণী বললেন, বাছা, এবার একটা গল্প বল শুনি, যে গল্প শুনলে বেশ শিক্ষা হয়!

রাজা বললেন, আর যাতে বেশ মজার ব্যাপার আছে, শুনলে সবাই প্রাণ খুলে হাসতে পারে!

সাগর দত্ত গল্প আরম্ভ করলে :

এক সময় এক বাক্স দেশ্‌লাই কাঠি তাদের বংশ মর্যাদা নিয়ে বড়ই বড়াই করতো! বলতো তাদের খুব উঁচু বংশে জন্ম, মানে বনের সব চেয়ে উঁচু যে দেবদারু গাছটা সেটাকে কেটে চিরে-চিরে বারুদ-মশ্‌লা মাখিয়ে দেশ্‌লাই কাঠি তৈরী করা হয়েছে!

এখন সেই দেশ্‌লাই বাক্সটা রান্নাঘরের উনুনের তাকের মাথায় একটা চকমকি পাথর আর ডিম-ভাজা চাটুর মাঝখানে পড়ে আছে। দেশ্‌লাই-কাঠিগুলো প্রায়ই তাদের ছেলেবেলার গল্প করে। বলে, যখন তারা সবুজ ডালে ডালে ঘুরে বেড়াত, তখন তারা খুব আনন্দে ছিল। রোজ সকাল-সন্ধ্যায় তারা হিমের চা খেতো, মানে লোকে যাকে শিশির বলে তাই আর কি! সারাদিন তারা রোদ পোহাত, কত ছোট ছোট পাখি এসে তাদের সঙ্গে গল্প করতো। বনে যত গাছ ছিল সবার তুলনায় তারাই ছিল ধনী, সম্পন্ন, কেন না যে গাছে তাদের জন্ম, সেই দেবদারু গাছটা বারমাসই সবুজ পোশাকে ঢাকা থাকতো, অন্য গাছ তো সব বসন্ত আর গ্রীষ্মে কেবল সবুজ পোশাক পরে!

একদিন বনের মধ্যে কাঠুরেরা এল, দেবদারু গাছটাকে কেটে লণ্ডভণ্ড করে দিলে। সেই সঙ্গে তারাও ছড়িয়ে পড়ল। কাটা পড়ে দেবদারু গাছের কাণ্ড দিয়ে জাহাজের মাস্তুল বানান হয়েছে, আরে তারা এখন দেশ্‌লাই কাঠি হয়ে প্রয়োজনে গরীবদের ঘরে আলো হয়ে জ্বলছে!

"এখন তা হলে বুঝতে পার কত বড় বংশে আমাদের জন্ম! কি কষ্টে এখন রান্নাঘরে নরলোকের সঙ্গে বাস করছি!" দেশলাই কাঠিগুলো বললে। ডিম-ভাজা লোহার চাটু বললে, "আমার জন্ম-কাহিনী কিন্তু একেবারে আলাদা। এই পৃথিবীতে জন্ম নেওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত আমাকে কতবার যে ঘসা-মাজা করা হয়েছে তার ঠিক নেই। তবে আমি চাই, কারো কাজে লাগি। আর এ-বাড়িতে আমার প্রয়োজন বড় কম নয়! আমার একমাত্র সুখ, খাওয়া-দাওয়ার পর বেশ ঝক্‌ঝকে তকতকে হয়ে উনুনের তাকের ওপর দাঁড়িয়ে সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে গল্প করি। কেবল ঐ দলের কুঁজোটা যখন-তখন এখান-ওখান থেকে এসে গোলমাল করে, না হলে

এখানে বেশ শান্তিতে আছি ! আমাদের বাইরের সব খবর এনে দেয় বাজারের ঐ ঝুড়িটা! কিন্তু এমন ভাবে মানুষের ন্যায়-অন্যায় নিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলে, একদিন তো উনুনের তাকের ওপ থেকে মাটির পাত্রটা টুকরো-টুকরো হয়ে ভেঙ্গেই গেল !

চকমকি পাথর বাধা দিয়ে বললে, "তুমি বড় বাজে কথা বল !" বলতে বলতে লোহার সং ঘষটা লেগে আগুনের ফুল্‌কি ছুটলো।

"তার চেয়ে এস না কেন আমরা সন্ধ্যেটা আনন্দে কাটাই !"

"সেই ভাল ! কিন্তু তার আগে আমাদের মধ্যে কে মর্যাদায় বড় ঠিক হোক !" দেশলাই কাঠিগুলো বললে।

জলের কুঁজো বললে, "নিজের সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই না, সেটা উচিতও নয়। তা চেয়ে একটা ভাল গল্প বলি, কি বল ? গল্পটা অবশ্য রোজকার, সবাই জানে।—উত্তর সাগরের নিকট, ঝাউগাছের সারির মধ্যে—"

শুনে খাবার থালাগুলো একসঙ্গে বলে উঠলো, "বাঃ, আরম্ভটা তো ভারী চমৎকার : এ গল্প আমাদের সবার ভালো লাগবে !"

জলের কুঁজো বলতে লাগল, "হ্যাঁ, আমার যৌবনও সেই শান্ত পরিবেশের মধ্যে কেটেছে— আসবাবপত্র আর ঘরের মেজ, মেজে-ঘযে রোজ চকচকে তকতকে করে রাখা হতো, পনরো দিন অন্তর অন্তর ঘরে পরিষ্কার পর্দা টাঙানো হ'ত—"

সম্মার্জনীটা বললে, "বাহা, কি সুন্দর, কি চমৎকার ! কি সুন্দর করে তুমি গল্প বলতে পার ! যেন একটি মহিলা কথা বলছেন !"

"আমাদের ঘর-দোরও খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ক'রে রাখা হ'ত—"বলতে বলতে জলের কুঁজো লাফিয়ে উঠলো, আর ছলাৎ ক'রে চল্‌কে জল মেঝের উপর পড়ে গেল।

এদিকে আনন্দে সম্মার্জনীটা করলে কি, ধুলোমাটির পাত্র থেকে খানিকটা কাদা দিয়ে জলের কুঁজোর জন্যে একটা মুকুট বানিয়ে ফেললে।

হঠাৎ সাঁড়াশিটা সোৎসাহে বললে, "এবার আমি নাচবো !"

বলতে বলতে এমন অদ্ভুত ভাবে সে হাত-পা ছুঁড়ে নাচতে লাগল যে, তাই দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল।

সাঁড়াশিটা বললে, "কই আমাকে মুকুট পরাবে না ?"

তাকেও মুকুট পরান হ'ল।

দেশলাই কাঠিগুলো ভাবলে, "এরা সব একেবারে বাজে-মার্কা, ইতর, অশ্লীল।"

এবার চা-দানিকে সবাই মিলে গান গাইতে বললে, কিন্তু সে বললে, তার ঠাণ্ডা লেগেছে, না ফোটালে তার গলার স্বর বেরবে না। আসলে ওটা তার গর্ব। চা-পানের মজলিস ছাড়া তার গলা খোলে না। সে গান গাইতে রাজী হয় না।

জানালার কুলুঙ্গীতে একটা পুরোনো চিলের পালকের কলম ছিল। সে বললে, "ও যদি গান গাইতে না চায়, না গাইলে! বাইরে বারান্দার রেলিং-এ খাঁচার মধ্যে কোকিলটা আছে তাকে গাইতে বল না!"

চায়ের কেটলী বললে, "তা কেমন করে হয়। কোথাকার কে সে আমাদের গান শোনাবে? কেন আমাদের মধ্যে আর কেউ কি গাইতে পারে না, কি গো বাজারের ঝুড়ি?"

"আমি জানি না। আর এখন এসব কথাই বা কেন? তার চেয়ে চুপচাপ বসে যে-যার কাজ কর দেখি!" বাজারের ঝুড়ি মুখ ব্যাজার করে বললে।

সকলে বললে, "তাই ভাল, তাই ভাল!"

বলতে বলতে রান্নাঘরের দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল, আর একজন পরিচারিকা ঘরে ঢুকলো। সকলে একেবারে চুপ। কেউ আর নড়ে না, চড়ে না।

পরিচারিকা দেশলাই বাক্সটা থেকে একটা কাঠি বার করে ঘ'ষে আগুন বার করলে। দেশলাই কাঠি যেই ভাবলে, এবার সবাই আমার মর্যাদা বুঝবে, অমনি মুহূর্তে কাঠিটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল! এই তার বংশ মর্যাদার বড়াই!

*　　　　*　　　　*

গল্প শুনে রাণী বললেন, চমৎকার! আমার মনে হচ্ছিল আমি বুঝি সেই রান্নাঘরের মধ্যে বসে আছি! হ্যাঁ, তুমি আমার মেয়ের উপযুক্ত! রাজাও মত দিলেন, আগামী সোমবার বিয়ের দিন ধার্য হ'ল।..

রাজকুমারীর বিয়ের আগের দিন সমস্ত শহর আলোক-মালায় সাজান হ'ল। প্রজারা পেট পুরে মণ্ডা-মিঠাই খেলে, ছেলেরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে মুখে 'সিটি' বাজাতে লাগল। খুব জাঁক-জমক হ'ল, বাজনা-বাদ্যি বাজল।

এদিকে সাগর দত্ত ভাবলে, এবার অমি আমার কাজ করি। সে বাজারে গেল, সেখান থেকে দেখেশুনে অনেক অতস বাজি, পটকা কিনে আনলে। তারপর সেগুলো উড়ন্ত তোরঙ্গের মধ্যে ভরে মেঘরাজ্যে গিয়ে পটাপট ছুঁড়তে লাগল। বাহারে কি মজা! রোশনাইয়ে আকাশ লালে লাল হয়ে গেল! তাই দেখে রাজ্যের লোক আহ্লাদে আটখানা হয়ে নাচতে লাগল। তাদের

বিশ্বাস দৃঢ় হ'ল যে, প্রকৃত দেবতার সঙ্গে তাদের রাজকুমারীর বিয়ে হচ্ছে। না হলে আকাশে অমন রঙ ধরবে কেন ?

বাজি ছুঁড়ে সাগর দত্ত তোরঙ্গ নিয়ে মাটিতে নেমে এল। সেটাকে লতাপাতার মধ্যে ঢেকে রেখে শহরে ঘুরতে গেল। ভাবটা, শোনাই যাক না লোকেরা তার বাজি পোড়ান নিয়ে কি বলছে

লোকে ধন্য ধন্য করছে, অমন বাজির খেলা তারা জন্মে কখনো দেখেনি !

সাগর দত্তর এবার ইচ্ছে হ'ল, বিয়ের আগে একবার গিয়ে ঐ উঁচুতলার বাড়িতে রাজকুমারীর সঙ্গে দেখা করে আসে। জিজ্ঞেস করে বাজি-পোড়ান তার কেমন লেগেছে, বিশ্বাস হয়েছে যে তার ভাবী স্বামী সত্যিই দেবতা !

কিন্তু হায়, সাগর দত্ত বনের মধ্যে এসে উড়ন্ত তোরঙ্গটা আর খুঁজে পেল না! দেখলে, যেখানে তোরঙ্গটা ছিল সেখানে খানিকটা ছাই পড়ে আছে !

খুব সম্ভব আতসবাজির আগুনে বনের শুকনো পাতার সঙ্গে তোরঙ্গটাও পুড়ে গেছে।

সাগর দত্ত আর আকাশে উড়ে রাজকুমারীর ঘরে পৌঁছাতে পারল না। রাজকুমারীও সারাদিন জানালায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় থেকে দয়িতের সাক্ষাৎ পেলে না।

বেচারা সাগর, বেচারা রাজকুমারী !*

---

* **Hans Andersen**-র গল্পাবলম্বনে।

হতভাগ্য

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

পিটপিটে, মিটমিটে, দুটি ভাই ডানপিটে,
খাবে ব'লে পুলিপিটে টিটেগড়ে ছুটল।—হায়, হায় !
পথে কাদা চিটচিটে, পিছলে পা-লেগে ইঁটে,—
ছ'ড়ে কেটে বুকে-পিঠে কালসিটে ফুটল।—হায়, হায় !
শেষে গিয়ে দেখে তারা, বাড়ি নেই পিসিমারা,
দরজায় তালামারা, খড়খড়ি বন্ধ।—হায়, হায় !
ব্যথা নিয়ে গাঁটে গাঁটে ফিরে এসে কালীঘাটে
চিৎপাত হ'ল খাটে, ভাগ্যটি মন্দ।—হায়, হায় !

আত্মীয় কলহ!

শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী

মাথা ভাবে নিজের ব্যথা সেই ত বোঝা বয়,
তারই যত মাথার ব্যথা—কেউ তার কেউ নয়।
সারা অঙ্গ বলে তোমার রঙ্গ দেখে নারি,
তুমিই সবার ওপর বোঝা, তোমার বোঝাই ভারী।
হাতরা বলে ফাৎনা মোরা? নেবই কি এক হাত?
গলা জড়াই, গালে চড়াই, করতে পারি কাত।
চক্ষু বলে বৎস, আমার কেবল দেখা সার।
আমি বুজলে, বুঝলে ভায়া, তুনিয়া অন্ধকার!
নাক বলে যে লোকে আমায় বলে উন্নাসিক।
সত্যি কথা। আমার মাথা উঁচুই বটে ঠিক।
নিজের গুমোর করছ যে চোখ! তুমি কী অপয়া!
তোমার চোখে ধুলো দিলেই তোমার দফা গয়া!
কেবল তোমার গয়াই নয় হে, হাঁকরে বলে নাক:
চক্ষুদানের ফলে চোখা লোকেরও সব ফাঁক!
নিজের ছ্যাঁদা দেখেছো কি, চক্ষু বলে তাকে—
চোখ বুজতে পারে না কেউ রাত্রে তোমার ডাকে।
তোমার ছ্যাঁদায় নস্যি দিলে নাকাল তারই ঠেলায়।
কান বলে হায়, কী কষ্ট মোর যায় যে ছেলেবেলায়!
কেউ তোলে না আমার কথা কানে, এই যা তুখ,
সবাই তখন আমায় ম'লেই বাগায় হাতের সুখ।
সবার বোঝা আমার উপর, কহেন শ্রীচরণ,
হায় রে কপাল, ভুতের বোঝা বইছি আমরণ।
আমার কথা ভুলো না ভাই, বলে যে শিরদাঁড়া:
আমি আছি বলেই তোমরা সবাই আছো খাড়া।
সবার ওপর আমি—হাঁকেন মাথা মহাশয়।
পেট কয়, আমি হড়কে দিলে কেই বা কোথায় রয়!

'বাবা এত এত টাকা নষ্ট করে কেন যে অত বড় একটা বাড়ী বানাচ্ছেন!' ধ্রুব বলল দুঃখু দুঃখু মুখে, 'এর থেকে বাবা যদি একটা রেলগাড়ী বানিয়ে নিতেন।'

শুভো চোখ ড্যাবা করে বলে উঠল, 'বাড়ীর বদলে রেলগাড়ী? রেলগাড়ীতে থাকতাম আমরা?'
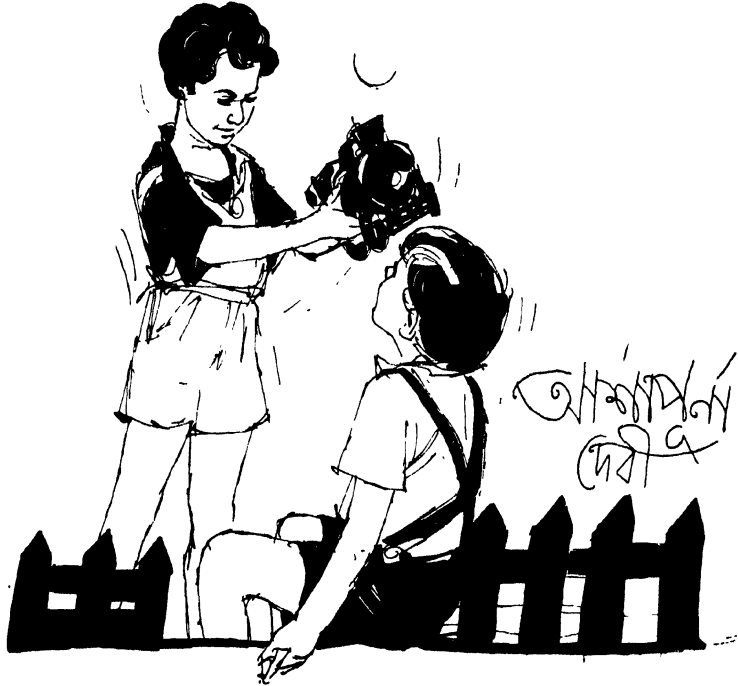
ধ্রুব জোর দিয়ে বলে, 'নিশ্চয়! থাকবার পক্ষে ওর থেকে ভাল জায়গা আর কি আছে শুনি? ওতে থাকতে পাচ্ছিস তুই, আবার দৌড় দিয়ে দিয়ে কাঁহা কাঁহা দেশে চলেও যাচ্ছিস! ঘরে বসে পৃথিবী দেখছিস!'

'কিন্তু দাদা,' শুভো সন্তর্পণে বলে, 'রোজ রোজ কি রেলগাড়ীতে থাকা যায়?'

'যায় না?' ধ্রুব এই মুখ্যু গাধা ছোট ভাইটার ওপর রেগে আগুন হয়ে উঠে বলে, 'কেন যায়

না শুনি? কী নেই রেলগাড়ীতে? শোবার জায়গা নেই? বসবার জায়গা নেই? চান করবার জায়গা নেই? আলো নেই? পাখা নেই? আর্শি নেই? কী নেইটা কি তাই শুনি? একেবারে নিজেদের একলার জন্যে নিজেরা যদি একটা তৈরি করে নেওয়া হয়, অন্যলোক উঠে পড়ে তো ভিড় করবে না? রোজ রোজ তো টিকিট কাটতে হবে না?'

শুভো তবুও অসঙ্কোচে বলে, 'কিন্তু রেলগাড়ী তো যেখানে ইচ্ছে সেখানে যাবে। শুধু তো যাবে, আর যাবে, তা'হলে?'

'তা'হলে মানে? সেটাই তো মজা, সেটাই তো আমোদ। যেখানে ইচ্ছে সেখানে গিয়ে তো আর থেমে থাকবে না? আবার ঘুরে ঘুরে আসবে, আবার চলে চলে যাবে। বাক্স বিছানা বাঁধতে হবে না, এত এত সব জিনিস কিনতে হবে না, একবার উঠে পড়লেই ব্যস—সারা জীবন শুধু ঘুরে আর ঘুরে সুখে কাটিয়ে দাও। নেহাৎ জামা জুতোগুলো যখন ছোট হয়ে যাবে, তখন যা একটু অসুবিধে। তা' দিল্লী কি কাশী, কি আবার এই কলকাতাতেই একবার স্টেশনে নেমে তাড়াতাড়ি কিনে নেওয়া যায়। অনায়াসেই যায়। বড় ইষ্টিশনে গাড়ী কতোক্ষণ থামে দেখিস না?'

দাদার এই উদ্দাম মজার চিন্তাটা অবশ্য ভালই লাগে শুভোর, রেলগাড়ীর মত জিনিস আর কী আছে? আমি একটি জানলার ধারে বসে আছি আর আমার সামনে পৃথিবী ছুটছে। ছুটে ছুটে আমার চোখের কাছ দিয়ে বিছিয়ে বিছিয়ে যাচ্ছে মাঠ-বন, নদী-পাহাড়, মন্দির-বাড়ী, জল-জঙ্গল, কাশফুল, ধানক্ষেত!…ঠিক সিনেমার মত। এ মজার তুলনা হয় না।

শুভোর মামাতো দিদি ঘুন্টি অবিশ্যি একদিন বলেছিল, 'ধেৎ রেলগাড়ীতে আবার আছে কি? ও তো একশো বছরের পুরনো।'

শুনে 'হাঁ' হয়ে গিয়েছিল শুভো। পুরনো হয়ে গেছে বলে মজা থাকবে না? রাগ করে বলেছিল শুভো, ভাত তো দুশো-তিনশো হাজার বছরের পুরনো, তুই ভাত খাস না? একদিন জ্বর হলেই তো পরদিন সকাল থেকেই ভাবতে সুরু করিস কখন ভাত খাবো।'

ঘুন্টি দি' ওর রাগ দেখে হেসে গড়িয়ে পড়েছিল। আর বলেছিল, 'আহা—কী তুলনা রে! লোকে এখন চাঁদে জমি কিনে রাখবার তাল করছে বাড়ী বানাবে বলে, আর এই বোকাটা কিনা রেলগাড়ীকে ভাল বলছে! রেলগাড়ী চড়ে তুই ভারতবর্ষের বাইরে যেতে পারবি? হুঁঃ, যদি বা এরোপ্লেনকে ভাল বলতিস তাও একটু মানে হতো!'

কিন্তু শুভো তো এরোপ্লেনের মধ্যে কোনো মজা খুঁজে পায় না। বিলেত-টিলেত না হয় না গিয়েছে, দার্জিলিং তো গিয়েছিল একবার প্লেনে চড়ে? মজাটা কি হ'ল? চড়েই তো মনে হচ্ছিল নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। জানলা খুলে মুখ বাড়াবে, তার জো নেই।

তা'ছাড়া প্লেনে স্টেশনে স্টেশনে জিনিস কেনা যায়? গোলাপী রেউড়ি? চীনে বাদাম? পাকা পেয়ারা? কাটা শশা? তানসেন গুলি? যোয়ান হজমি? পুরি মেঠাই? গরম জিলিপি? গোল গাপ্ পা?

কেনা যায় না!

এরোপ্লেনে এসব সুবিধে নেই। বাড়ীতেই কি আছে ছাই? বাড়ীতে ওর একটা জিনিস কিনতে দেবেন বাবা? মোটেই না। সত্যি বলতে পৃথিবীর ওই সব সেরা খাদ্যগুলো লুকিয়েই খেতে হয় শুভো ধ্রুবকে। কারণ, দেখতে পেলে বাবা এমন হৈ-চৈ তুলবেন! উঃ! সেদিন তো দু'আনার দু'পাতা মটর-ঘুগনি ফেলাই গেল তাদের। বাবা আসছেন দেখেই দিশেহারা হয়ে জানলা দিয়ে—উপায় কি? বাবা দেখলেই এমন ভাব করবেন যেন মারাই গেছে তাঁর ছেলে দুটো, এই বিষ খেয়ে!

অথচ—?

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, অথচ—রেলে চড়লেই বাবা নিজেই হরদম 'ওলা' ডেকে চলেছেন। এই চা এই ঘুগ্ নি, এই অবাক জলপান, কিছু না হোক শুধু পান-ই। আর আরো অবিশ্বাস্য বাবা নিজেই ধ্রুব শুভোকে চা অফার করছেন, 'কি হে চলবে নাকি এক ভাঁড়? রেলগাড়ীতে মাটির ভাঁড়ের চা, বেশ একটা ঐতিহাসিক জিনিস!'

বাবা!

যে বাবা ধ্রুব শুভোকে মার কাছে বসে প্লেটে একটু চা খেতে দেখলেই বলতে সুরু করেন, 'তোমাদের এইসব আদরের কোনো মানে হয় না! চা এমন একটা কিছু অপূর্ব বস্তু নয় যে, না খেলে জীবন বৃথা হয়ে যাবে!'

নিয়ম ছাড়া কিছু খেতে দেখলেই বাবা বিরক্ত হন। আর রেলে চড়লে? রেলে চড়লে বাবা নিজেই মাকে ডেকে ডেকে বলেন, 'রেলে চড়লেই আমার এত খিদে পায় কেন বলতো? গাড়ী যত ঝাঁ ঝাঁ ছুটতে থাকে, আমার পেটও ততই খাঁ খাঁ করতে থাকে। বেশীক্ষণ গেলেই পেটের মধ্যে খাণ্ডবদাহন সুরু হয়ে যায়।'

মা বলেন, 'সত্যি, রেলে চড়লেই এত খাই খাই কর তুমি, আমি তো অবাক!'

বাবা বলে ওঠেন, 'খাই খাই খাই খাই, যত খাই, ততো চাই, পাই তবু ফের চাই; খাওয়া ছাড়া কিছু নাই!'

হাসির হুল্লোড় পড়ে যায়।

এই হলো—রেলগাড়ীর বাবার মূর্তি।

আর—কলকাতার—এই বাড়ীর বাবা?

অদ্ভুত মানুষ! বলতে কি একেবারে বিচ্ছিরী! সকাল থেকে রাত অবধি কেবল কাজ আর কাজ, ছুট আর ছুট! ধ্রুব শুভোদের সঙ্গে কথা কইবারই সময় নেই। যদি কইলেন?

'শুভো পড়তে বসনি? ধ্রুব তোমার এবারের রেজাল্টটা কেমন হবে?'

দুর! দুর!—দাদা ঠিকই বলেছে বাড়ীর চেয়ে রেলগাড়ী হাজারগুণ ভাল। যত ভাবে, ততই রেলগাড়ীর মহিমায় বিগলিত হয় শুভো। সঙ্গে সঙ্গে দাদার মহিমাতেও।

দাদার মাথাতেই তো এসেছে এটা?

বাড়ীর বদলে একটা রেলগাড়ী বানানো! নিজেদের, একেবারে নিজেদের একখানা রেলগাড়ী! একথা ভেবেই আহ্লাদে শরীরের সব লোমকূপগুলো খাড়া হয়ে যায় শুভোর!…তবু—

তবু দাদার থেকে বুদ্ধিটা তার চিরদিনই পরিপক্ব, তাই বলে ফেলে, 'চিরদিন যদি রেল গাড়ীতেই থাকা যায়, তা'হলে তো স্বর্গের ইন্দ্রই হয়ে গেলাম দাদা, তাই না? কিন্তু ভাবছি—'

'কী আবার ভাবছিস?'

'ভাবছি, রেলগাড়ীতেই সারাজীবন, এর চাইতে ভাল আর কি আছে? রেলগাড়ীতে আলো পাখা—আছেও সব, কিন্তু দোকান, বাজার, ইস্কুল?'

দোকান বাজার ইস্কুল! হায় কপাল!

ছোট ভাইয়ের এই তুচ্ছতায় অবজ্ঞায় ঠোঁট উল্টোয় ধ্রুব।

'ইস্কুলের কথা ভাবছিস তুই? দেবরাজ ইন্দ্রের সমান হয়েও ওই বাজে জিনিসটা ভুলতে পারছিস না? ইস্কুল, অফিস, এই সব জিনিসগুলো খুব ভালো না? খুব চমৎকার! হুঃ! বলে—ইস্কুলের হাত এড়াবার জন্যেই যার—যাকগে ও তোর মাথায় ঢোকানো যাবে না!'

'মাথায় ঢোকানো যাবে না?'

এই অপমানে শুভো কাঁদো-কাঁদো হয়, 'রেলগাড়ী বলে আমার প্রাণের মত! দিন-রাত্তির শুধু রেলগাড়ী চড়ছি এ ভেবে বলে আমার—'

'থাম ছিঁচ-কাঁদুনে! তা'হলে বলছিস কেন, বাজার, দোকান, হেন-তেন? বাজারের কী দরকার রে? রেলগাড়ীতে থালা সাজিয়ে খেতে দিয়ে যায় না? রেলগাড়ী থেকে রাজ্যির জিনিস কেনা যায় না?'

'সে তো যায়ই।'

'তবে?'

শুভো একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'তা'হলে কি হবে দাদা? বাবা তো সব টাকাই ওই বাড়ী-ফাড়ি করে ফুরিয়ে ফেলবেন। রেলগাড়ী বানানোর টাকা থাকবেই না!'

'থাকলেও করবেন না।' ধ্রুব ধ্রুবসত্যের স্বরে বলে, 'বুদ্ধি বলে কোনো জিনিস তো আর থাকে না বড়দের! কিসে মজা, কিসে আমোদ, কিসে শান্তি তার কিছু বোঝে বড়রা? বোঝে না, যাতে কষ্ট তাতেই মন। একধার থেকে দেখে যা তুই বড়দের, যাতে কষ্ট পাচ্ছে তাই করে চলেছে!'

শুভো একথা অস্বীকার করতে পারে না।

নিজের পক্ষেই তো দেখেছে, দেখছে। এই তো দিদিটা ছিল বাড়ীতে? বাড়ীর লোক বাড়ীতেই থাকবে। তা নয়—তাকে বিয়ে দিয়ে শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল! অথচ আবার মজাটি দেখ শ্বশুরবাড়ী পাঠানোর সময় কেঁদে কেঁদে নাক মুখ ফুলিয়েই ফেললেন মা। বাবা ও প্রায় কাঁদো কাঁদো। শুভো ধ্রুবই কি চুপি চুপি তাই করেনি? দিদির তো কথাই নেই। এত কাণ্ডর কিছুই তো হ'ত না, যদি দিদির বিয়েটি না দেওয়া হতো! কী দরকার ছিল বাপু বাড়ীর মেয়েটাকে পরের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে কেঁদে নাক ফোলানোর? বুদ্ধি থাকলে করে কেউ এমন কাজ?

সর্বদা। সর্বদাই ডেকে ঝঞ্ঝাট আনছে বড়রা। এই তো আজ সকালেই ছুটির দিন মা বাবা ছোট কাকা বেশ জমিয়ে বসে গল্প করছিলেন, শুভো ধ্রুব মোহিত হয়ে বসেছিল, হঠাৎ মা বলে বসলেন, পিসেমশাইয়ের জ্বর শুনেছিলাম, একবার দেখতে যাওয়া উচিত।

ব্যস্ হয়ে গেল।

ভেঙে গেল আড্ডা!

চললেন দু'জনে 'উচিত' করতে সেই দমদম না পাকপাড়া কোথায়! অকারণ ধ্রুবকে খুব খানিকটা শাসিয়ে গেলেন যেন ঝগড়া না করে, যেন পড়তে বসে, যেন রাস্তায় না বেরোয়।

হলটা কি শেষ পর্যন্ত?

না, মার সেই কালো মোটা গুঁফো পিসেমশাইকে একটু দেখে আসা হ'ল।

জ্বর?

সে তো ছেড়েই গেছে।

দূর দূর! শুধু কষ্ট পাবার জন্যেই! 'উচিত! উচিত!' যেন শুধু কষ্ট পাওয়াই উচিত মানুষের। যা ভাল লাগবে তা করা চলবে না! এতেও বলতে হবে বুদ্ধিমান?

না, দাদার কথাই ঠিক!

'দেখ্ শুভো'—বলল ধ্রুব, 'বাবা রেলগাড়ীর কথা শুনলে স্রেফ্ হেসে ওড়াবেন। তার চেয়ে—'

'কী দাদা?'

শুভো চোখ ড্যাবা করে।

'তার চেয়ে আমরাই বেরিয়ে পড়ি। যেখানে ইচ্ছে সেখানে চলে যাই—বাবা মা যদি খোঁজেন, যদি খুঁজে বার করতে পারেন, বলবো—'যদি আমাদের চাও তো একটা রেলগাড়ী র নাও, সারা জীবন সেই গাড়ী চড়ে আমরা শুধু চলবো আর চলবো। ঘুরে ঘুরে আসবো, আবার যাবো, চলা আর ফুরোবেই না।

একেবারে নিরুদ্দেশের মত মজা হবে। আর দেখা না হলে তো স্রেফ্ নিরুদ্দেশই! সেও মজা!'

শুভো ভয়ে ভয়ে বলে, 'তোর সাহস আছে দাদা?'

'সাহস নেই? সাহস নেই মানে? চল না দেখবি সাহস আছে কি না আছে!'

'কিন্তু টাকা?'

'টাকা! টাকা আবার কি? বলবো আমরা ছোট ছেলে টাকা কোথায় পাবো? আর কতই বা জায়গা নেবো আমরা? জিনিস নেই, পত্তর নেই!'

'তা'হলে চল্!'

তা'হলে চল!

মানে চিরকালের মত চল।

বাবা মা যদি খোঁজেন আর যদি খুঁজে পান তবেই হয়তো আবার দেখা হবে। না হলে নয়।

আজই শেষ দেখা।

শুভো খেতে বসে মায়ের মুখের দিকে তাকায়, আর হঠাৎ যেন বুকের ভেতরে কী একটা ঠেলা দিয়ে ওঠে তার। রুটি আর গলা দিয়ে নামতে চায় না। কাল সকালে আর দেখতে পাবে না মাকে। কাল না, পর্শু না, তর্শু না।...কোনোদিনও না।

হঠাৎ মা বলে ওঠেন, 'ওরকম করছিস কেন রে শুভো? রুটি মুখে দিচ্ছিস আর ফেলে দিচ্ছিস?'

শুভো কষ্টে বলে, 'পেট ব্যথা করছে!'

পেট ব্যথা!

'সর্বনাশ! খাসনি, মোটে খাসনি আর! চট্ করে শুয়ে পড়গে যা!'

বাবা বলেন, 'পেট ব্যথা করবে তার আর আশ্চয্যি কি, দেখ ক'আনার ফুচ্কা পেটে অবস্থান করছে।'

শুভো এর প্রতিবাদ করে না। বাবার মুখের দিকে তাকাতেই পারে না। বাবাকে যে এত ভালবাসতো শুভো তা তো জানত না কই?

আশ্চর্য্যি, দাদা তো বেশ পাত ফর্সা করে ফেলল। নাঃ, দাদা সত্যিই সাহসী, সত্যিই—বীর। দাদা যদি বুঝতে পারে শুভোর পেট ব্যথা করেনি, শুধু মা বাবাকে আর দেখতে পাবে না বলেই—কী লজ্জা দেবে দাদা শুভোকে!

দাদার সামনে কি করে শক্ত থাকবে, তাই ভাবতে ভাবতে শুতে যায় শুভো। তাদের নিজেদের ঘরে। যে ঘরে শুভো আর ধ্রুব শোয়।

শুয়ে শুয়ে মনে মনে বলে, 'হে ভগবান, আমাকে সাহসী করে দাও, আমাকে বীর করে দাও!'

একটু পরে ধ্রুব এসে ঢোকে।

জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

বেশ জ্যোৎস্না – জ্যোৎস্না রাত, দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মন্দ নয়। শুভো চোখ গোল করে দেখে দাদা কি যেন পকেট থেকে বার করে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে। রাত দুপুরে কী ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে দাদা?

ধড়মড় করে উঠে আসে শুভো।

চুপি চুপি বলে, 'কী ফেলছিস রে দাদা?'

ধ্রুব হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ায়।

চড়া গলায় বলে ওঠে, 'সব তাতে দরকার তোর? ফেলছিলাম রুটি! বুঝলি? রুটি, আলুর দম! হলো?'

'রুটি! আলুর দম!'

শুভো হাঁ হয়ে গিয়ে বলে ওঠে, 'পকেটে রুটি আলুর দম রেখেছিলি তুই?'

ধ্রুব আরো চড়া গলায় বলে, 'হ্যাঁ, রেখেছিলাম। কী করবি? চিরকালের মতন চলে যাচ্ছি কাল, জন্মেও আর মা বাবাকে···বসে বসে রুটি খেতে পারে মানুষ?'

চড়া গলা হঠাৎ গ'লে জল হয়ে গলার স্বরটাই বন্ধ করে দেয়! ঝপ্ করে বিছানায় শুয়ে প'ড়ে একটা চাদর নিয়ে মাথা অবধি ঢাকা দেয় ধ্রুব!

শুভোও মলিন মুখে শুয়ে পড়ে।

এবং দাদার মতই কাজ করতে থাকে সে।

অনেকক্ষণ পরে খাট-বিছানা নড়া বন্ধ হয়। শুভো আস্তে ডাকে, 'দাদা!'

দাদা নীরব।

শুভো চাদরের ওপর থেকে নাড়া দেয়, 'দাদা, ভেবে দেখছি আমরা যদি চিরকালের মতন ল যাই, তা'হলে তো সেই বড়দের মত বোকাই হলাম ! যাতে কষ্ট তাই সেধে সেধে করা হ'ল !'

ধ্রুব হঠাৎ উঠে বসে।

আন্দাজে শুভোর পেটে পিঠে কোথায় যেন একটা চড় বসিয়ে দেয়, ভাঙা ভাঙা চড়া ায় বলে ওঠে, 'জানি, জানি, তোর জন্যেই আমার নিরুদ্দেশে যাওয়া হবে না, ঠিক জানি। রু কাপুরুষ কোথাকার !'

পূজা

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

পুজোর ছুটি হয়ে গেল, সামনে এলো পূজা,
আসবে জানি মা জননী দুর্গা দশভুজা,
আসবে চড়ে সিংহ পিঠে
বাজবে সানাই, লাগবে মিঠে
গোমড়া মুখ আজ তোমরা জেনো বৃথাই হবে খোঁজা।

ওই তো ঢোলে বোল উঠেছে তাক ধিনা ধিন ধিনা।
আয়রে 'অনু' 'নূপুর' 'তনু', আয়, আয়, সোনা, মীনা,
ছুট, ছুটে চল দর দালানে
দেরী করার কি-ই বা মানে ?
কলা-বৌ, ওই ঘোমটা খোলে, মা এসেছে কিনা।

পূজা, পূজা, চলবে পূজা, চারটি দিবস জুড়ে।
হাসির বেলুন ফাটিয়ে কারা বেড়ায় পাড়া ঘুরে।
পটকা ফাটায় ওই যে কা'রা
ভুলল ভোজে ওই কাহারা
কানের তালা ঝালাপালা মাইক্রোফোনের সুরে।

পূজার ভাবনা

শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত

একটি বছর পরে আবার মায়ের পূজার ধুম,
ভোর না হতেই বাজছে ঢোলক টাক ডুমা ডুম ডুম।
সবার তিনি মা হয়েছেন কেমন করে ভাবি,
কেমন করে মেটান তিনি লক্ষ জনের দাবি।
আমারো মা, মায়েরো মা, বাবারো মা তিনি,
আরো কত জনের মা ছাই, আমি কি সব চিনি!
শুধু আমায় নিয়ে ব্যস্ত মা তো প্রায়ই বলে,
'দস্যি ছেলে, পারি না আর, এভাবে কি চলে!'
এত জনের মা হয়ে মা দুর্গা গৃহস্থালি
কেমন করে চালান জানতে ইচ্ছা করে খালি।
কেমন করে বশ করেছেন সিংহবাহনটিকে—
জানলে কিনে নিয়ে একটা যেতাম নানা দিকে।
হিমালয়ের চূড়া থেকে বেলেঘাটায় আসা—
কষ্ট খুবই, কেন একটি কেনেন না প্লেন খাসা।
সকল মোষের পেটে অমন অসুর থাকে নাকি?
সেবার কিন্তু মোষের গাড়ি চড়ে গেলাম টাকী।
শুনেছিলাম দাদার মুখে প্ল্যাস্টিক সার্জারি,
হয়না তাতে গণেশদাদার মুখে জুলফি-দাড়ি?
কার্তিকেয় ছুঁড়তে পারে মিসিল মেশিনগান?
খাবার কষ্ট কেন লক্ষ্মী যদি মা দেন ধান?
পুষি যদি হাঁস কি হব সরস্বতীর প্রিয়?
পুঁতলে কলাগাছ বাগানে পাব ইষ্ট স্বীয়?
দেখলে হুতোম ঝাঁপি, যেতে পারব না ওর কাছে,
ইঁদুর ধরা বড়ই কঠিন যতই ছুটি পাছে।
আমার জন্যে একটি ময়ুর যদি কার্তিক দাদা—
আনে তবে পুষব আমি তুলে পাড়ায় চাঁদা।
মায়ের দশটা হাত যেখানে কেন আমার দুটি।
সবাই ভালবাসে, তাই কি মা দেন এত ছুটি?

মালঞ্চ নদী ধরে দক্ষিণে চলে যাও। অনেক—অনেক দক্ষিণে, ন্দরবন এলাকায়। জায়গাটার নাম চড়কতলা। চৈত্র-সংক্রান্তিতে কের মেলা বসে এখানে, হপ্তা ভোর চলে। মেলার বড় নাম-ডাক এদেশ-সেদেশ থেকে মানুষজন দোকানপাট এসে জড় হয়।

মেলায় কাঠের জিনিষপত্রের খুব আমদানি। সেকালে নক্সাদার সব জিনিষ আসত। গল্প ছে, মেলা থেকে কোন বিয়েবাড়ি বরশয্যার খাট নিয়ে গিয়েছিল। খাটের কাছে যেতে ভয় পাচ্ছে। পায়া কুঁদে বাঘ বানানো—রঙে গড়নে এমনি নিখুঁত যে বর ভেবেছে, সুন্দরবনের াল-বেঙ্গল টাইগার ঘরে ঢুকে ওত পেতে আছে।

যে সব কারিগর নেই এখন। তাদের ছেলেপুলেদের সাদামাটা কাজ। চৌকি-তক্তপোশ ড় তারা, ঘরের দরজা-জানলা গড়ে। অঞ্চলের মধ্যে আর শৌখিন বড়লোক নেই, যারা ছিল রে গিয়ে উঠেছে। ভাল কাজকর্ম কাদের ফরমাসে হবে আর এখন, কারা কিনবে? পেট চলে বলে অনেক কারিগর রেঁদা-বাটালি ছেড়ে লাঙল ধরেছে, ক্ষেতে চাষবাস করে।

তাহলেও রেওয়াজটা রয়ে গেছে। একদিন দু'দিনের পথ থেকেও কারিগর ব্যাপারিরা কো করে মেলায় আসে। চড়কতলার ঘাটে এসে লাগে নৌকো, কোন এক গাছতল পছন্দ রে নিয়ে মালি ও হোগলা দিয়ে চাল-বেড়া বানিয়ে অস্থায়ী দোকান খোলে। সাতটা দিনের ালয়—সাত দিন পরে নৌকোয় মালপত্র তুলে নিয়ে ঘরমুখো ভেসে পড়ে দোকানিরা। জঙ্গল বার জেগে ওঠে, মেলার জায়গা জন্তুজানোয়ারের বিচরণ-ভূমি হয়। পুরো একটা বছর—বছর ন্তে আবার একদিন মানুষ এসে দা-কুড়াল নিয়ে জঙ্গল কাটতে লেগে যায়।

শীতল নামে এক কারিগর অনেক কাল ধরে দোকান দিয়ে আসছে। তক্তপোশ পিঁড়ি বারকোশ আনত আগে। বুড়ো হয়ে গিয়ে এখন খাটনির কাজ পেরে ওঠে না, কাঠের পুতুল নিয়ে আসে। নামেই পুতুল—হাত কাঁপে বলে পালিশ হয় না। অনেক ঠাহর করে বুঝতে হয় বস্তুটা গরু, অথবা হামাগুড়ি-দেওয়া শিশু। কিংবা নৌকোও হতে পারে।

তবু আসবেই শীতল প্রতি বছর। বলে, আশায় আশায় আসি। বাড়ি বসে থেকেই বা কি হবে? এমন মেলা এত বড় জমায়েত—কিছু কি আর বিক্রি হবে না? না হলেই বা কি! কত লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়, সেটা কম লাভ নয়। আর ক'টা বছরই বা—দুনিয়া থেকে একেবারেই চলে যাবো। তখন আর আসতে হবে না।

সাতদিনের মেলার তিনটে দিন কেটে গেছে। শীতলের একটা পুতুলও বিক্রি হয়নি। হাতে ছুঁয়েও দেখে না কোন খদ্দের। মন খারাপ শীতলের। রান্নাবান্না করল না, দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে শুয়ে পড়ল।

সেদিন রাত-দুপুরে বিষম বৃষ্টি। মেঘের ডাকে শীতলের ঘুম ভেঙে গেল। শীত-শীত করছে। বোঁচকা খুলে কাঁথা বের করতে গিয়ে দেখে ডিমের খোলা বোঁচকার উপর। আরও আশ্চর্য, কাঁথার ভাঁজে ছোট্ট পাখিটা—চড়ুইয়ের বানাতে গিয়েছিল, ঠিক হয়নি। এলো কি করে এখানে? রহস্যময় ঠেকে শীতলের কাছে।

পরের রাত্রেও ঠিক সেই ব্যাপার হয়েছে। সকালে দোকান সাজাতে গিয়ে ঝুড়ির মধ্যে সেই চড়ুইপাখি পায় না। গেল কোথা? খুঁজে খুঁজে অবশেষে খুঁটির আড়ালে পাওয়া গেল। পাশে ডিমের খোলা। রাত্রিবেলা ডিম পেড়ে ঠুকরে ঠুকরে ভেঙেছে মনে হয়।

ভারি মজা তো! দেখতে হবে ব্যাপারটা কি—রহস্যের উন্মোচন করতে হবে। পরের রাত্রে শীতল ঘুমাল না, জেগে বসে আছে। চোখে যখন বড্ড ঘুম জড়িয়ে আসে, তামাক সেজে নিয়ে ফড়ফড় করে টানে। কড়া তামাকের ধোঁয়ায় ঘুম পালিয়ে যায়। সারারাত বসে বসে এমনি নজর রাখে। কিছু না। যেমন পাখি তেমনি রয়েছে ঝুড়ির ভিতরে।

ভোর রাত্রে আকাশে শুকতারা। আর পারে না শীতল, শুয়ে পড়ল। ঘুমও এসে গেছে। বেড়ার ফাঁকে রোদ এসে গায়ে লাগতে ধড়মড়িয়ে উঠল। সকলের আগে ঝুড়ি হাতড়ে দেখে। পালিয়েছে চড়ুই। পালিয়ে আজ হাতবাক্সর আড়ালে গিয়ে ডিম পেড়েছে। ঠুকরে ঠুকরে ডিম ভেঙে খায়—খোলার উপর ঠোকরের স্পষ্ট চিহ্ন।

আজব পাখি! বাদাবনে জীওন-কাঠ আছে নাকি, কালেভদ্রে কেউ কেউ পেয়ে যায় জীওন-কাঠ অর্থাৎ জীবন্ত কাঠ, সে কাঠে জিনিষ গড়লে সময় সময় সেই জিনিষ জীবন পেয়ে যায়

শোনা ছিল কথাটা। শীতলও দৈবাৎ জীওন-কাঠের টুকরো একটা বুঝি পেয়েছিল, তাই দিয়ে চড়ুইপাখি গড়েছে। বড় বজ্জাত পাখি। যতক্ষণ চোখ মেলে আছ, পাখি শুধুমাত্র কাঠ। ঘুমিয়েছ কি লহমার মধ্যে জীবন্ত হয়ে ডিম পাড়বে।

শীতলের রোখ চেপে গেল কারসাজি ধরতে হবে যেমন করে হোক।

পরের রাত্রি। শীতল চোখ বুজে আছে, নাসাধ্বনি তুলছে ক্ষণে ক্ষণে। ঘুমোয়নি কিন্তু, ঘুমের ভান করে পড়ে আছে কিছুতেই ঘুমাবে না সে আজ।

নিশিরাত্রে খুট করে একটু ক্ষীণ আওয়াজ। শীতল চোখ মিটমিট করে দেখে, চড়ুই উড়ে গিয়ে ঘরের একটা কোণে গিয়ে বসেছে। ডিম পাড়ল। ডিমে ঠোঁটের ঘা দিচ্ছে। শীতল চোখ মেলে তড়াক করে উঠে পড়ল।

আর চড়ুইপাখি সঙ্গে সঙ্গে প্রাণহীন কাঠের পুতুল। হাতে তুলে দেখল, কাঠ ছাড়া কিছু নয়। ডিমটা নেড়েচেড়ে দেখে। ছোট্ট ডিম, সে তুলনায় ওজনে বেশ ভারী। একটা ছুটো ঠোকরেই খোলা ফেটে গেছে, ভিতরের কুসুম জমে গিয়ে হলদে মার্বেলের মতন হয়েছে।

মেলার শেষ, সেইদিনই রওনা। ঝুড়ি-বোঝাই পুতুল নিয়ে শীতল নৌকোয় উঠল। সবাই জিজ্ঞাসা করে, বিক্রি কি রকম হল কারিগরমশায় ?

শীতল জবাব দেয় না। কিন্তু বুঝতে কারো বাকি থাকে না। হাসাহাসি করছে : পয়সা খালামকুচি নয়, এ জিনিষ পয়সা দিয়ে কে কিনতে যাবে ?

বাড়ির উঠানে পা দিতেই বউ ছুটে আসে : কত রোজগার করে এলে ? দাও। চাল কিনতে হবে, নয়তো উপোস ও-বেলা থেকে।

কাঁধের ঝুড়ি দাওয়ায় নামিয়ে শীতল শুকনো মুখে দাঁড়াল।

বউ বলে, কিছুই বিক্রি হয় নি ?

না।

আর যাবে কোথায়! বউ ক্ষেপে গেল, যাচ্ছেতাই গালিগালাজ করছে। দু' কান পেতে শোনা যায় না।

মনের দুঃখে শীতল বেরিয়ে গেল। হঠাৎ মনে পড়ে হলদে মার্বেলটার কথা, ডিমের ভিতরে যা পাওয়া গেছে। ফতুয়ার পকেটে আছে জিনিসটা। পায়ে পায়ে সে গঞ্জের দিকে চলল।

গঞ্জের এক স্যাকরার সঙ্গে খুব জানাশোনা। তার কাছে গিয়ে জিনিষটা বের করল। হাতে নিয়ে স্যাকরার চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে : কোথায় পেলে ?

শীতল বলে, কুড়িয়ে পেলাম। জিনিষটা কি, বলে দাও।

দাঁড়াও, আন্দাজি বলব না। কষে দেখি আগে, তারপরে বলব।

কষ্টিপাথর বের করে কয়েকটা টান দিল জিনিষটা দিয়ে। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে টানের দাগগুলো দেখে। বলে, গিনি-সোনা নয়, তারও উপরে। পাকা-সোনা—নিখাদ খাঁটি জিনিষ। ভারি কপালজোর তোমার—এমন জিনিষ কুড়িয়ে পেয়েছ। বেচবে? বেচো তো আমি নিয়ে নিই।

শীতল এক কথায় রাজি। চাল কিনতে হবে। নইলে এ-বেলাটা যদিই বা চলে, ও-বেলা উপবাস।

নিক্তিতে ওজন করে স্যাকরা বিড়বিড় করে কী-একটু হিসাব করে গুণে গুণে বিরানব্বুই টাকা দিয়ে দিল। ঠকাচ্ছে বোঝা গেল, এতগুলো টাকা তবু আশার অতীত। রোদ চড়ে গেছে, ক্ষিধেয় দেহ আনচান করছে। দশ জায়গায় ঘুরে ঘুরে দর-যাচাইয়ের শক্তি নেই এখন। গরজও নেই। চড়ুই যখন ঝুড়ির মধ্যে, সোনা-ভরা ডিম কত পাওয়া যাবে!

চাল কিনে, এবং আরও নানা রকম সওদা করে মুটের মাথায় চাপিয়ে শীতল গঞ্জ থেকে বড়লোকের ঢঙে বাড়ি ফিরল। সাড়া পেয়ে বউ ঘর থেকে বেরুল। মুখ পাংশু। বিষম ভয় পেয়েছে, কণ্ঠস্বর কাঁপছে কথা বলতে গিয়ে।

বলে, এক কাণ্ড হয়েছে। তুমি চলে গেলে ঝুড়িসুদ্ধ উহুনে ঢেলে দিলাম। বিক্রি হয় না—কাঠকুটোর বোঝা রেখে কি হবে। তা বলব কি—একটা পাখি যেন কিচকিচ করে, আর পাখা ঝাপ্টায় আগুনের মধ্যে। বলি, জ্যান্ত পাখি হয়তো বা ঝুড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। জল ঢেলে তাড়াতাড়ি আগুন নেভালাম। কিছুই না। সেই থেকে বড্ড ভয় করছে আমার।

ছড়া

শ্রীবীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(১)

ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ!
রাজপুত্তুর ঘরে এলে বসতে দেবো কি?
খাট নেই, পিঁড়ি নেই, খোকনও নেই ঘরে;
চোখ পেতে বসেতে দেবো তবে কেমন
ক'রে?

(২)

হায়, হায়, হায়!
রাজকন্যে সকাল দুপুর কেবলই ঘুম যায়!
খোকন আমার কাঠের পুতুল হারিয়ে
ফেলেছে;
সোনার কাঠি রুপোর কাঠি বদলে দেবে কে?

মজার জীব—কচ্ছপ

শ্রীরাণা বসু
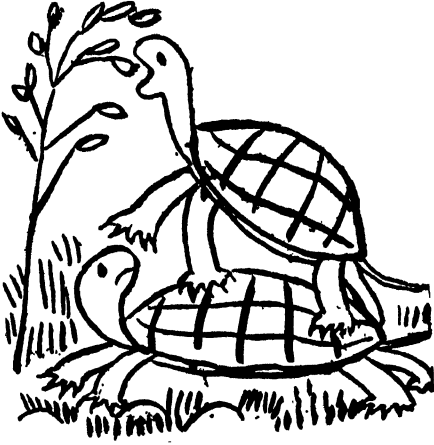
আজ তোমাদের এক মজার জীবের জীবন-কথা শোনাব। জীবটি হ'ল কচ্ছপ।

তোমাদের ভেতর প্রায় সকলেই কচ্ছপ দেখেছো। কচ্ছপ এমন একটা জীব যার গায়ে কোনো লোম নেই, পাখিদের মতন পালক নেই কিংবা মাছের গায়ে যেমন আঁশ থাকে তেমন আঁশ-জাতীয় কোনো পদার্থও নেই। নিজেকে রক্ষে করার জন্যে কচ্ছপের নরম শরীরের ওপর ও নীচেতে এক শক্ত পুরু বহিরাবরণ বা চলতি কথায় আমরা যাকে 'খোলা' বলি তাই আছে। কচ্ছপ তার সমস্ত দেহটাকে খোলার বাইরে আনতে না পারলেও সে ইচ্ছে মতন তার মাথা, াগুলো এবং ছোট্ট ছুঁচলো লেজটাকে খোলার বাইরে বের করতে বা ঢুকিয়ে রাখতে পারে। কচ্ছপ খন ঘুমোয় কিংবা ভয় পায়, তখন সে খোলার ভেতর তার মাথাটা ঢুকিয়ে চুপ করে এক জায়গায় াড়ে থাকে। খোলার মধ্যে সে তার পাগুলো এবং লেজটাকে এমনভাবে গুটিয়ে রাখে যে দেখে ঝতেই পারা যায় না—জীবটা বেঁচে আছে, না কখনো আবার পা-মাথা-লেজ বের করে চলাফেরা রবে। কচ্ছপ তার মাথা, পাগুলো এবং লেজটাকে ইচ্ছে মতন খোলার বাইরে এবং ভেতরে বের রতে ও ঢোকাতে পারে, কারণ তার দেহের খোলার নীচেকার অংশ জোড়া লাগালো।

কচ্ছপ মোটেই দৌড়তে পারে না। তার এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে নেকক্ষণ সময় লাগে। কচ্ছপ যখন হাঁটে তখন খুব ধীরে এবং সোজাসুজি হাঁটে, অর্থাৎ কচ্ছপরা ঁকেবেঁকে চলতে পারে না। কচ্ছপের দোমড়ানো পাগুলোর মাথায় নখ আছে। কচ্ছপ তার রীরটাকে মাঝ থেকে দোমড়াতে পারে না বলে যখন সে পাহাড়ের ওপর বা কোনো কাঠের দো বেয়ে ওঠে, তখন তাকে কঠোর মেহনত করতে হয়।

পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতের কচ্ছপ দেখা যায়। কচ্ছপরা জলচর জীব নয়। কচ্ছপরা মাঠে, ঝোপ-জলে থাকতে ভালোবাসে। কচ্ছপের শরীরের ওপর যে বহিরাবরণ বা খোলা আছে তা বিচিত্র রঙের র। দেখে মনে হয় যেন কোনো শিল্পী রঙ-তুলি দিয়ে কচ্ছপের বহিরাবরণ চিত্রিত করেছেন।

তোয়ো মাইল। কিন্তু বাসের সংখ্যা কম এবং বাঁধাধরা সময়ের মধ্যে এর আসা-যাওয়া। নিজের খুশিমত ঘুরে বেড়ানো চলে না ব'লে এক স্নানযাত্রীরা ছাড়া বড় একটা কেউ বাসে যায় না।

ভেরা ঘাটে এসে মার্বেল রক দেখবার জন্য নৌকায় চাপতে হয়। নৌ-বিহারের ব্যবস্থাটা সরকার থেকেই করা আছে। বারো আনা দিয়ে টিকিট কাটলে পঁয়তাল্লিশ মিনিট কাল নৌকা করে ঘুরতে পারবে নর্মদার বুকে। ছোট বড় দু'রকমের নৌকা আছে। কোনটায় আট-দশ জন চাপতে পারে—কোনটায় বা বিশ জন। নৌকার কানুনটা বেশ কড়া—বাড়তি লোক একজনকেও নেয় না। বেশী লোক না নেওয়ার কারণ—যে খাতের মধ্যে দিয়ে বহে চলেছে নর্মদা—তার দু'পাশে চার-পাঁচ তলা সমান খাড়া পাহাড়। নদীর গর্ভও পাথরে ভর্তি। একটু অসাবধান হলে পাথরে ধাক্কা লেগে বিপর্যয় ঘটতে পারে। নদী সঙ্কীর্ণ হলে কি হবে পাহাড়ে ধাক্কা লাগা জলের স্রোত খুবই প্রবল।

নদী হ'ল পাহাড়ের মেয়ে। পাহাড়ের মাথায় সঞ্চিত তুষার স্তূপ দ্রব হয়ে অনেকগুলি ফাটল দিয়ে গড়িয়ে এসে জমে এক জায়গায়। তারপর তাদের মিলিত বেগ-ধারায় জন্ম নেয় একটি নদী। এর সঙ্গে যোগ দেয় বৃষ্টির জল-ধারা। বেগবতী সেই নদী পাহাড় বেয়ে জনপদ ধরে, অবিরাম গতিতে চলতে চলতে এসে মেশে সমুদ্রে। পৃথিবীর সবচেয়ে নীচু জায়গা হ'ল সমুদ্র। জলের ধারা সর্বদাই নিম্নমুখী। সমুদ্রই তাই নদীর শেষ আশ্রয়স্থল।

নর্মদা তেমনি অমরকণ্টক পাহাড় থেকে বার হয়ে মধ্য ভারতের শত শত ক্রোশ জমিকে উর্বরা করে—দু'কূলে জনপদ, দেব মন্দির, সন্ন্যাসীর আশ্রম প্রভৃতি তৈরী করে সমুদ্রের পানে চলে গেছে। পূত:সলিলা নদী নর্মদা—গঙ্গার সঙ্গে এর গোত্রের মিল রয়েছে। গঙ্গার সঙ্গে শিবের নাম যেমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে—তেমনি নর্মদার সঙ্গে শঙ্করের নাম। শঙ্কর শিবেরই আর একটি নাম।

এখন ভেরা ঘাটে নৌকায় চাপলেই দু'পাশে যে খাড়াই পাহাড়গুলো এগিয়ে আসবে—তারা কিন্তু শ্বেতবরণ মার্বেল রক নয়। এগুলির রঙ কোথাও কালো—কোথাও ধূসর অথবা ধূমল। একটু এগিয়ে নীল রঙের একটা পাহাড়ও দেখতে পাওয়া যায়।

পাহাড়ের রন্ধ্রপথ কিন্তু মোটেই সোজা নয়। অতিশয় আঁকা-বাঁকা পথ - কোথাও আকীর্ণ —কোথাও বা অপ্রশস্ত। কোন পাহাড়কে দুটি ধারা-বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে নদী। এখানে কোন্‌টি আসল ধারা স্থির করা কঠিন। দেখতে দেখতে নদীকে মনে হবে ধারালো একখানা অস্ত্র - তার ইচ্ছামত পাহাড়কে কেটেকুটে পথ তৈরী করে চলেছে। একটা গাছ কাটতে হলে সোজাসুজি অস্ত্রের আঘাত দিয়ে যেমন তা সহজে কাটা যায় না, একটু তেরছা ভাবে কোপ বসাতে

।—পাহাড়কে ছ' টুকরো করে কাটবার সময় নর্মদাও অবিকল সেই কৌশল নিয়েছে মনে হবে। হাড়ের বশে নদী চলুক—কিংবা নদীর বশে পাহাড়—নদী-পাহাড়ের এই লুকোচুরি খেলায় ারূপ হয়ে উঠেছে জায়গাটা। নর্মদা রহস্যময়ী এবং ভয়ংকরীও বটে। চার-পাঁচ তলা খাড়া হাড়ের নীচের সঙ্কীর্ণ নদীর বুকে নৌকায় চেপে যেতে যেতে একবারও কি মনে হবে না—দৈব-া যদি পাহাড়ের গা থেকে একখানা বড় পাথর গড়িয়ে এসে নৌকার মাথায় পড়ে—তা'হলে কাখানার কি দশা হতে পারে! পাহাড়ের মাথায় ছাগলও তো চরছে, তারা লাফ দিয়ে এক থর থেকে আর একটা পাথরে যাচ্ছে ও মাঝে মাঝে তাদের পায়ের ঘায়ে পাথর খ'সে পড়া কি ম্ভব ব্যাপার! কিন্তু এসব চিন্তার অবকাশই মিলবে না—তখন কালো আর ধূসর পাথরের গায় দুধের মত শাদা পাথরগুলো ঘন হয়ে আসবে দু'ধারে। তুলোর মত শাদা স্তূপ—তুলোর ই নরম। চকচকে—মসৃণ। দেখলে মনে হবে—কোন দক্ষ কারিগর বুঝি জলের ভিতর ক পরী-কন্যাদের বাসের জন্য সাততলা দুগ্ধ-ধবল প্রাসাদ গড়ে তুলেছিল—কিন্তু কাজটা শেষ তে পারেনি। ভিত পত্তন করে সরে পড়েছে! না হলে পাথরের গায়ে এত নক্সা কেন? া ঘোড়ার আকৃতি—হাতীর আকৃতি—থাম, অলিন্দ, কার্নিসের বাহার? মাথার উপরে কাশের নীল চাঁদোয়া টাঙানো—দু'পাশে শাদা ঝক্‌ঝকে দেওয়াল—নর্মদার নিস্তরঙ্গ জলে নৌকা সে চলেছে। যেন জল-পথ বেয়ে পাতালপুরীর রাজপ্রাসাদে আমরা চলেছি নিমন্ত্রণ খেতে! চওড়া নয় বলে ভাবছ অগভীর? মাঝির কথায় বিশ্বাস করতে হলে ভাববে, পাতালপুরী া কোথায় আছে! এই শীতকালেও এখানে নর্মদা নাকি পাঁচশো ফুট গভীর। আর বর্ষাকালে া চার-পাঁচ তলা সমান উঁচু শাদা পাহাড়গুলো তলিয়ে যায় জলের তলায়, তখন?

কিন্তু বর্ষাকালে কেউ বেড়াতে আসে না এখানে। মার্বেল রক তখন ডুব দেয় জলের তলায়। া পাথর যদি দেখা না গেল নদীর মহিমা আর কতটুকু!

ওই বর্ষাকালে—মাইলটাক পথ উজিয়ে গেলে নর্মদার আর এক ভয়ংকর রূপকে প্রত্যক্ষ করা । ভয়ংকর অথচ সুন্দর রূপ। একটি সুপ্রশস্ত সুদীর্ঘ গিরি-প্রান্তর বেয়ে সগর্জনে প্রবলবেগে য় আসছে বিপুল জল-ধারা। দুর্বার বিক্রমে ছুটে এসে ঝাঁপ খেয়ে পড়ছে একশো দেড়শো ফুট চকার একটা খাদে। সে কি উদ্দাম আবেগ, ভয়ংকর গর্জন, রণরঙ্গমত্ততার আস্ফালন! চূর্ণ-র্ণ সূক্ষ্ম জলকণার ধোঁয়ায় জায়গাটা কুয়াশাচ্ছন্ন। চোখে-মুখে সর্বাঙ্গে সেই কুয়াশা জড়িয়ে ল কি ভাল যে লাগে!

আশেপাশে বিছানো পাথরের ফাটল দিয়ে যে জলের স্রোত নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে—া বিক্রমই কি কম! সেই জলে সাধ্য কি হাঁটু পর্যন্ত ডুবিয়ে তুমি স্থির হয়ে থাক!

এই হ'ল নর্মদা-প্রপাত। সর্বকালেই দর্শনীয়। শীতকালেও কম প্রচণ্ড নয়—কম উন্মাদনা জাগায় না! মাত্র মাইলটাক এগিয়ে গিরিবর্ত্মে প্রবেশ করে ক্রমশঃ শান্তমূর্তি ধরেছে নর্মদা। আরও এগিয়ে দুধ-পাথরের কোলে সেই দুরন্ত মেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। স্রোত আছে, গর্জন নেই।

নর্মদা-প্রপাত—জব্বলপুর

এই প্রপাতের মুখে নৌকা নিয়ে এগুনো যায় না। এই কারণে ভেরা ঘাটে নৌকা থেকে নেমে—আরও মাইলটাক পথ ভাঙ্গতে হবে। প্রপাত পর্যন্ত একটি যান চলনযোগ্য পাকা রাস্তা আছে।

এই পথের মাঝখানে পাহাড়ের উপরে একটি মন্দির পড়বে। চৌষট্টি যোগিনীর মন্দির। মূল মন্দিরের দেবতা উমা-মহেশ্বর। মন্দিরের নির্মাণকাল ১১৫৫ খৃঃ অব্দ। প্রতিষ্ঠাতা কালচুরি রাজবংশের কোন রাণী।

এই মন্দির আরও একবার সংস্কার করা হয়েছে। কিন্তু হলে হবে কি মূর্তিদ্বেষীদের পাল্লায় পড়ে যোগিনীমূর্তি ও তাঁদের বাহনগুলির দুর্দশার সীমা-পরিসীমা নেই।

ভেরা ঘাটে এবং নর্মদা-প্রপাতের কাছে—মেলার দিনে বহু দোকান পসার বসে। বড় বড় পর্ব-দিন ছাড়া প্রতিটি পূর্ণিমায় মেলা বসে। এদেশের কারিগরের হাতে তৈরী শাদা পাথরের নিত্য ব্যবহার্য জিনিসগুলি ভারী লোভনীয়, স্থানীয় শিল্প হিসাবে ঘরে রাখার মত।

একটা ধূপদান নিয়ে সিমেন্টের মেঝেতে ঘষলে দেখবে শাদা খড়ির মত দাগ পড়েছে। এর থেকে বুঝা যায় পাথরগুলি কি নরম! মার্বেল পাহাড়ের গায়ে নদী যে নানা শিল্প নমুনার চিহ্ন রাখতে পেরেছে—সে এই কারণেই।

মানুষের মত নদীরও শিল্প-বোধ আছে। পরম শিল্পীর নির্দেশে তরঙ্গ-তুলি বুলিয়ে সে পাথরের গায়ে অনেক ছবি আঁকে—অনেক ছবি মুছে ফেলে। ভেরা ঘাটে মার্বেল রকের প্রায় প্রতিটি দেওয়ালের গায়ে শিল্প-কীর্তির স্বাক্ষর জাজ্জ্বল্যমান। এই কীর্তি দেখার লোভেই মানুষ ছুটে আসে।

জব্বলপুরে না এলে তোমাদের ভারত-ভ্রমণ সম্পূর্ণ হবে না—এই কথাটা জানিয়ে রাখছি।

একই মিলের কবিতা

শ্রীপরিতোষকুমার চন্দ্র

[নীচে যে কয়েকটি দু' লাইনের কবিতা দেওয়া হলো সেগুলির একটু নতুনত্ব আছে। এগুলির প্রত্যেকটি ভিন্ন অর্থের একজোড়া করে একই শব্দের মিল দিয়ে লেখা।]

আমি যদি খুলে রাখি জানালার পাখি, (১)
ঘরে ঢোকে এক ঝাঁক ছোট ছোট পাখি।

থাকিস্ তো রে মেটে ঘরে খড়ে ছাওয়া চাল,
কোন্ সাহসে হেথা এসে মারিস্ এতো চাল ? (২)

দোকান থেকে আন্‌তো কিনে একটা হাঁড়ি মেটে,
তাইতে করে এবার আমি রাঁধবো পাঁটার মেটে। (৩)

আজকে জানি কামারশালে মোটেই লোহা নাই,
তবু কামার ঠক্-ঠকা-ঠক্ পিটে চলে নাই। (৪)

শোন্ শোন্ শোন্ করিস্ কিরে দুষ্টু ছেলের পাল,
এমন করে ছিঁড়িস্ কেন নতুন কেনা পাল ?

চুরির বিচার করবো পরে বল্ তো আগে নাম,
তারপরেতে গাছ থেকে তুই লাফটি দিয়ে নাম।

শুনছি সাদা পাথর কুচি মেশায় নাকি চিনিতে,
সাধ্য নেই কেউ বুঝতে পারে, পারে সেটা চিনিতে।

এমনি করে যদি তুমি কাঁকর মেশাও চালে,
পাবেই সাজা যেদিন তোমার বেঠিক হবে চালে।

দড়ি দিয়ে তোর গলাতে ঝুলছে কেন ভাঁড়,
কাজ কর্ম ছেড়ে শেষে হলি নাকি ভাঁড় ? (৫)

আগুনে চড়ালে জল জানি সেটা ফোটে,
জানি না কেমন করে ফুল গাছে ফোটে।

ভেবেছিলি দিলি গেরো, গেরো নয় ও ফাঁস,
ফাঁসটি খুলে সব কিছু তোর করে দেবো ফাঁস। (৬)

দুধ জ্বাল দিয়ে কিছু করেছিনু খোয়া, (৭)
বাড়ি ফিরে দেখি এসে সেটা গেছে খোয়া। (৮)

এমনি করে যদি তুমি ছেলেকে দাও নাই, (৯)
দেখবে পরে সে আর তোমার শাসনেতে নাই।

কায়দা করে এবার আমি ফেলেছি এ জাল,
বন্ধ এবার হবেই হবে ওষুধ করা জাল।

কানার মতো আর ছুটিস্‌নে এবার ওরে থাম,
মাথা ফেটেই মরবি যে রে সামনে যে তোর থাম।

তোমার বাহুতে আজ বেঁধে এই রাখি,
যাবো চলে অন্তরের ভাববাসা রাখি।

(১) খড়খড়ি, (২) বড়াই, (৩) মটুলি, (৪) নেহাই = বিশেষ গড়নের লৌহপিণ্ড যার ওপরে ধাতু রেখে পেটা হয়, (৫) বিদূষক, (৬) প্রকাশ, (৭) শুকনো ক্ষীর, (৮) চুরি, (৯) আশকারা।

চোর দরওয়াজা

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

ছত্রপতি শিবাজীর বুদ্ধি ছিল শানিত তরবারির মতোই তীক্ষ্ণধার, তা তোমরা হয়ত কেউ কেউ শুনে থাকবে। আর তা না হ'লে আলমগীরের মতো কুট বুদ্ধি বাদশা তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে হিমসিম খাবেন কেন?

রাজনীতি ও রণনীতিতে তাঁর মাথা যে কী রকম খেলত তার বহু গল্প আছে। আমি আজ বলছি অতি সহজ সাধারণ বুদ্ধির একটি কাহিনী।

যে লোক যখন তখন অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে দুর্গের পর দুর্গ জয় করেছে নিজে—সে জানে যে এ দুর্গতি তারও একদিন হ'তে পারে। ছত্রপতিও, বেশ কিছুটা প্রতিষ্ঠা লাভের পর নিজের জন্যে একটি নিরাপদ বাসা ঠিক করতে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন—তাতে আর আশ্চর্য কি। অবশ্য একটা বাসা ঠিক ছিলই—রাজগড়ে, সেও বেশ দুর্গম, ও দুর্ভেদ্য, তবু যেন ঠিক পছন্দ হয় না রাজার, কেমন যেন মনটা খুঁৎ খুঁৎ করে। অথচ কি করবেন, কেমন করে নিশ্চিন্ত হবেন, তাও ভেবে পান না।

এই সময় বিজাপুর দরবার তাঁর সঙ্গে একটা মিটমাট করবার ইচ্ছায় তাঁর বাবা শাহাজীকে মুক্তি দিয়ে তাঁকেই মধ্যস্থতা করার জন্য দূত হিসেবে পাঠালেন শিবাজীর কাছে। শাহাজী আগে ছেলের ওপর যতই বিরক্ত হয়ে থাকুন, ইদানীং ছেলের জয় গৌরবে বেশ একটু গর্ববোধ করতে শুরু করেছিলেন, ছেলের এক একটি অসমসাহসিক কীর্তি শুনতেন আর বুকটা তাঁর দশহাত হয়ে উঠত।

সুতরাং শাহাজীও চাইলেন তাঁর ছেলের বিপদের দিনের জন্যে একটা নিরাপদ আশ্রয় যেন ঠিক থাক। ছেলের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে অনেকগুলো জায়গা দেখলেনও—রাজগড়, পুরন্দর, লোহাগড়, রায়রী। এর মধ্যে তাঁর রায়রীটাই পছন্দ হ'ল বেশী। তাঁর অভিজ্ঞ চোখ এক চাহনি-তেই দেখে নিল এখানে দুর্গকরার সুবিধাটা। ছেলেকেও বুঝিয়ে দিলেন সেটা। সহ্যাদ্রির পশ্চিমে এক সু-উচ্চ শিখরের ওপর জায়গাটা খাড়া উঠে গিয়েছে। এমনিতেই বেয়ে ওঠা কষ্টকর, তার ওপর যদি ভাল করে কেল্লা বানিয়ে ওঠবার পথগুলো ভাল করে বন্ধ করা যায় তাহলে তো কথাই নেই।

শিবাজীও তাঁর বাবার দূর দৃষ্টির মর্ম বুঝলেন, মেনে নিলেন শাহাজীর যুক্তি। ঐখানেই নূতন একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ তৈরী করে সেখানেই টাকাকড়ি কাগজপত্র এবং নিজের পরিবার রাখা স্থির করলেন। আবাজী যানিদেব নামে এক যোগ্য স্থপতিকে ডেকে তখনই সে দুর্গ নির্মাণের ভার

দিলেন। শনিদেবের সঙ্গে বসে, বাবার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে নিজে নক্সা তৈরী করালেন—যাতে কোথাও কোন খুঁৎ না থাকে। কেল্লার নামকরণ করলেন রায়গড়। স্থির হ'ল একেবারে পাহাড়ের চূড়ায় দুর্ভেদ্য প্রাচীর প্রাকারের বেষ্টনীর মধ্যে তাঁর দপ্তরখানা, বাসকরার প্রসাদ ও চিকিৎসালয় বিদ্যালয় বিচারালয় প্রভৃতি সরকারী ভবনগুলি তৈরী হবে, এবং কিছু নীচে অথচ আর একটি চূড়ার ওপর মায়ের জন্য হবে একটি ছোট্ট বাড়ি ও মন্দির।

দুর্গ তৈরী শেষও হ'ল একসময়। শনিদেব সমস্তটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে ছত্রপতিকে বললেন, বেশ একটু গর্বের সঙ্গেই, 'এই যে রাস্তা আমি তৈরী করে দিয়েছি, যা সাতদফা ফটক এবং প্রাচীরের মধ্য দিয়ে দিয়ে উঠেছে—এ ছাড়া আর কোথাও দিয়ে কেউ প্রাসাদে ঢুকতে পারবে না। যে উঠবে তাকে আমাদের চোখের সামনে দিয়ে উঠতে হবে, এ ছাড়া একটা টিকটিকে যাবারও উপায় রইল না কোন জায়গা দিয়ে।'

শিবাজী কথাটার তখনই কোন উত্তর দিলেন না, শুধু একটু হাসলেন।

নিচে এসে আশপাশের গ্রামে ঢোলের সাহায্যে ঘোষণা ক'রে দেওয়ালেন, যদি কোন লোক এই দুর্গের সদর সরকারী রাস্তা ছাড়া অন্য কোন পথে ঐ দুর্গের পতাকাস্তম্ভে উঠিতে বা পৌছতে পারে—তাকে তিনি এক থলে মোহর এবং এক জোড়া সোনার বালা উপহার দেবেন।

এতখানি পুরস্কারের লোভে কেউ কেউ যে এ চেষ্টা করবে না, তা সম্ভব নয়। কয়েকজনই করল এবং ব্যর্থও হ'ল। শনিদেব হেসে বললেন, 'দেখলেন তো রাজাধিরাজ, বলিনি আপনাকে যে কোন মানুষের পক্ষে একাজ সম্ভব নয়।'

ছত্রপতি আবারও হাসলেন একটু।

তৃতীয় দিনের দিন স্থানীয় মাহার অধিবাসীদের মধ্যে থেকে একটি তরুণ যুবক এল। এরা এক শ্রেণীর নীচ পার্বত্য জাতি—কিন্তু খুব শক্তসমর্থ এবং কষ্টসহিষ্ণু বলে ছত্রপতিই প্রথম এদের নিজের সেনাদলে নিয়েছিলেন। মহার তরুণটি এসে একটি বিশেষ পতাকা দেখিয়ে দু'হাত জোড় ক'রে বলল, 'যদি অনুমতি দেন তো আমি আমার এই পতাকা ঐ নিশানবুরুজে লাগিয়ে দিয়ে আসি।'

'স্বচ্ছন্দে! দিলেন বকশিশ পাবে। যা আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তার নড়চড় হবে না।' আশ্বাস দিয়ে বললেন ছত্রপতি।

তরুণ বালকটি আর একবার তাঁকে প্রণাম ক'রে পাহাড়ের পিছন দিকের জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে সকলেই অবাক হয়ে চেয়ে দেখল—তার মধ্যে আবাজি শনিদেবও

একজন—যে, ছত্রপতির গেরুয়া পতাকা নয়, সেই মাহারেরই দেখিয়ে-যাওয়া পতাকা উড়ছে পৎপৎ ক'রে।

আরও ঘণ্টাখানেক পরে সে ফিরে এসে আর একবার ছত্রপতিকে সাষটাঙ্গে প্রণাম ক'রে হাতজোড় ক'রে দাঁড়াল।

শিবাজী শনিদেবের মুখের দিকে চেয়ে আর একবার হাসলেন। তারপর হুকুম দিলেন, সেই প্রতিশ্রুত এক থলে মোহর ও সোনার বালা জোড়া এনে ওকে দিতে। কিন্তু সেই সঙ্গেই বললেন, 'বাপু, কোন পথে ঠিক উঠলে সেটা আমাকে একটু দেখিয়ে দিতে হবে।'

পথ অবশ্য সেটা নয়—দুর্গম পাক্‌দণ্ডী বা পায়ে চলা রাস্তা, তাও মধ্যে মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, পাথর ধরে ধরে কিম্বা গাছের শিকড় ধরে বুকে হেঁটে উঠতে হয়—তবু শিবাজী মহারাজ সে পথও বন্ধ করলেন তার মুখে প্রকাণ্ড একটা ফটক (দুদিকে সান্ত্রীপাহারার ব্যবস্থা সুদ্ধ) বানিয়ে। সেই ফটকটিরই নাম হ'ল "চোর দরওয়াজা"।

বুঝলে—কত সহজে কাজটা হয়ে গেল ? তুমি আমি হ'লে কি করতুম ? নিজেরাই ঘুরে ফিরে দেখে গলদঘর্ম ও হয়রান হতুম !

অবশ্য, এ ছাড়াও আর একটি পথের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল—কিছুদিনের মধ্যেই।

সেও আবাজির আর একদফা পরাজয়—আর এবার এক অশিক্ষিত গ্রাম্য মেয়েছেলের কাছে।

হীরাকানি নামে এক গয়লাদের বৌ কেল্লায় আসত দুধ বেচতে। একদিন দুধ দিতে দিতে কখন বেলা চলে গেছে, সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে অত বুঝতে পারে নি। কেল্লার নিয়ম—সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ফটক বন্ধ হবে, খুলবে সেই সূর্যোদয়ের পর। হীরাকনি যখন দৌড়তে দৌড়তে ফটকের কাছে পৌছল তার কিছু আগেই তা বন্ধ হয়ে গেছে। বিস্তর কান্নাকাটি করল সে, সান্ত্রীদের হাতে পায়ে ধরল ফটক আর একটি বার খোলবার জন্যে—কিন্তু কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে যে ছত্রপতি বা পেশোয়ার হুকুম না পেলে অসময়ে ফটক খুলবে ?

কধারে হীরাকানি ঘরে বাচ্চা মেয়ে আর বুড়ী শ্বাশুড়ী ফেলে এসেছে, সে না গেলে তাদের খাওয়াই হবে না, মেয়েটা কেঁদে কেঁদে মরেই যাবে হয়ত। যেতে তাকে হবেই। সে এক দুঃসাহসিক কাজ করল। যাতায়াতের পথে একটা জায়গা তার দেখা ছিল, সেখানটায় পাহাড়ে একটু খাঁজমতো আছে, আর সেই জন্যেই একেবারে চকচকে পাথর নয়—কিছু গাছপালাও আছে। হীরাকানি সেই অন্ধকারেই ঘাস আর গাছের শেকড় ধরে ধরে পাহাড় বেয়ে সেইখান দিয়ে নামল এবং এক প্রহর উত্তীর্ণ হবার আগেই বাড়ী পৌছে গেল।

কথাটা চাপা রইল না, লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে এক সময় ছত্রপতির কানেও পৌছল। তিনি বৌটিকে ডাকিয়ে এনে ঠিক কোন্ পথে সে নেমেছিল দেখে নিলেন তার পথ সে পথও বন্ধ ক'রে সেখানটার ঠিক মুখে একটা প্রকাণ্ড মিনার বসালেন। আজও সে মিনার আছে, সে গয়লা বৌয়ের দুর্ধর্ষ সাহসের পরিচয় বহন ক'রে···'হীরাকানি মিনার' নামে। সেখানে গেলে আজও দেখতে পাবে।

ওরা হাওয়া নয়

শ্রীস্বরাজ বন্দোপাধ্যায়

যদিও কাউকে কিছু বলিনি, তবু ভয়ে আর উত্তেজনায় প্রথম রাতটা রাণার প্রায় ঘুমই এলো না। বাবা বদলী হয়ে এসেছেন বংশীচাঁপা গাঁয়ে গঙ্গাহরণপুর থেকে।

বেশী দূর তো নয়। গঙ্গাহরণপুরে চাকর হরদেও বলছিল,—বংশীচাঁপায় যাবে, একটুক সাবধানে যেও। রাণা বঁড়শীতে কেঁচো গাঁথতে গাঁথতে বললে,—কেন ?

হরদেও ওর ঘড়ঘড়ে মোটা গলা নামিয়ে বললে,—বংশীচাঁপার ও কোয়াটারে ভূত আছে।

—ভূত !

রাণা ছিপটা উঠোনে ফেলে হরদেওয়ের পিঠের কাছে এসে বসল।

তখন টা টা রোদ্দুর। ঠিক দুপুর বেলা। নির্জন প্রান্তরের দিকে মুখ করে দেয়ালের ছায়ায় পিঠ রেখে পাটের দড়ি পাকাচ্ছিল হরদেও।

—কি ভূত ?—রাণা প্যান্টুলটা ওপরের দিকে একটু তুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

বেহারী হরদেও প্রায় বাঙালী বনে গিয়েছিলো। বললে, —শাকচুন্নী। ওখানকার সড়কের চৌকিদার বলেছে। অনেক বছর আগে—

একটা ঢোঁক গিলে রাণা বললে,—অনেক বছর আগে কি ?

—অনেক বছর আগে—হরদেও দড়িটায় পাক মেরে বেশ থেমে-থিতিয়ে বলতে লাগল,—ওই কোয়াটারে এক বাবু তার বৌকে মেরে ফেলেছিলো। একদম গুম্ খুন। লাশটা নাকি বাড়ির উঠোনে পুঁতে ফেলেছিলো।

রাণা আর একটা ঢোঁক গিলে বললে,—ভাগ্, বাজে কথা !

—ওখানে গেলে দেখতে পাবে।

—আমি ও সব ভয় করি না।

রাণা আর কিছু শুনতে চায়নি। উঠোন থেকে ছিপ কুড়িয়ে নিয়ে মাছ ধরতে চলে গেল।

সত্যি সত্যি বাবা বংশীচাঁপায় বদলী হোল। রাণা সিমেণ্ট বাঁধানো উঠোনটা দেখে মনে মনে হাসল। হরদেওয়ের যত মিছে কথা। সিমেণ্ট বাঁধানো উঠোনে আবার মড়া পোঁতা যায় ! ও সব ভয় করলে আর চলে না।

একবার ভাবলো, গল্পটা মাকে বলবে। আবার চেপে গেল, সে খুব সাহসী—এমনি একটা সুনাম আছে তার সকলের কাছে। ভয়ের কথা সে কাউকে বলতে পারবে না।

প্রথম রাত্তিরে মায়ের পাশে শুয়েও ঘুম কিন্তু আসতে চাইল না। কেমন ভয়-ভয়

করতে লাগল। মাকে ডাকতে লজ্জা হোল। রাণা ভয় পেয়েছে শুনলে মা ভাববে ও ভীতু, বাবা ভাববে ভীতু। একটু একটু করে সবাই জানবে ও ভীতু। না, ভীতু হতে ও পারবে না।

ঘুমিয়ে পড়ল ঠিকই। কিন্তু একটু বেশী রাত্তিরে ঘুমটা ভেঙে গেল।

জানলাটা খোলা ছিল। একবার তাকালো। নিবিড় অন্ধকারে সামনে অনেক দূর পর্যন্ত কিছুই প্রায় দেখা যায় না। জানলাটার সামনা-সামনি একটা পুরোন ভাঙা ঘর। কেউ থাকে না। বোধহয় একসময় কেউ থাকত, এখন কাউকে দেখা যায় না।

ভাঙা ঘরটা আর দেয়ালের ভাঙা ইটগুলো যেন অন্ধকারে দাঁত বার করে হাসছে। উলটো দিকের জানলা দিয়ে দেখা যায় কালীতলার মস্ত অশথ গাছের ডালগুলো। ডাল-পাতার শব্দটা রীতিমত কোলাহলের মত—হু-হু বাতাসের সঙ্গে কানে ভেসে আসছে।

রাণা এখানে-ওখানে দু'পাশে দু'বার তাকিয়ে চোখ বুজে পড়ে রইল।

কিন্তু একি—ঝুম্—ঝুম্—ঝুমুর—ঝুম্—স্পষ্ট ঘুঙুরের শব্দ কানে আসছে। এখানে ঘুঙুর পরে বেড়াচ্ছে কে? রাণা চোখ মেলল।

হ্যাঁ, শব্দটা স্পষ্ট হচ্ছে—ঝুম—ঝুম্—ঝুমুর—ঝুম্—

এক ভাবে একটানা ঘুঙুরের শব্দ বেজে চলেছে। এত রাত্তিরে নাচছে কে? একভাবে ঠিক এক ছন্দে কে নেচে বেড়াচ্ছে?

রাণা চোখ বুজল আবার। কোন দিক থেকে আসছে শব্দটা? কান পেতে শুনতে পেলো, অশথ গাছের দিক থেকেই শব্দটা ভেসে আসছে।

ওখানে অশথ গাছের নীচে এত রাত্তিরে কে নেচে বেড়াবে? অন্ধকারটাও কিছু কম নয়, কালো জামের রঙের মত চারদিক যেন ঢেকে ফেলেছে।

কে জানে, যিনি নৃত্য করছেন, তিনি অশথ গাছ থেকে ধীরে ধীরে জানলার দিকে এগিয়ে আসবেন কিনা! এসে জানলা দিয়ে ঢুকে পড়তেও পারেন। ওঁরা তো বাতাসের মত, হাওয়ার মত। আলগোছে ঢুকে পড়ে যদি মাথার কাছে এসে নৃত্য করতে শুরু করেন।

রাণা উঠে বসল। ভয়ে গা ছম্ ছম্ করছে।

পা টিপে টিপে উঠে পড়ে জানলাটা বন্ধ করে দিলো। যাক্ ওনার আসার পথটা বন্ধ করতে পারলে কিছুটা নিশ্চিন্তি। রাম—রাম—রাম—

মনে মনে বলতে বলতে বিছানায় এসে যেমন শুয়েছে—ঠকাস্—ঠক্—ঠক্—জানালাটা

একেবারে খুলে গেল। এবারে আর রক্ষা নেই! সে নিজের হাতে জানলার ছিটকিনি লাগিয়ে এসেছে, সে জানলা কি করে খুলতে পারে!

হু—হু—করে তোড়ে বাতাস বইছে। যেন ঝড়ের মত মনে হচ্ছে।

উনি কি তবে ঘরের ভেতরে এলেন? বুকের ভেতর ধড়াস্ ধড়াস্ শব্দ শুনতে পাচ্ছে রাণা।

মাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে কান পেতে রইল। না, ঘুঙুরের আওয়াজটা আর শোনা যাচ্ছে না। তবে কি উনি নিঃশব্দে এসে মাথার কাছে বসেছেন? বালিশটা মাথার চাঁদির ওপর চেপে মাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে রইল রাণা।

কতক্ষণ এভাবে কেটেছে কে জানে—এরপর রাণা ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুম যখন ভেঙেছে, তখন রোদ উঠে গেছে।

ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই জানালাটার কাছে গেল রাণা। জানলাটা কাল দেখতে হবে, কি করে অমন হঠাৎ খুলে গেল জানলাটা।

কাছে গিয়ে দেখল, জানলার কাঠের ছোট ছিটকিনিটা ভেঙে পড়ে রয়েছে মেজের ওপর।

তবে কি বাতাসের চাপে ছিটকিনিটা ভেঙে গেছে? না কি ঘরে উনি জোর করে ঢুকতে গিয়ে ছিটকিনিটা ভেঙে ফেলেছেন? একটা কাঠের ছিটকিনি ভাঙবার মত জোর ওনাদের আছে। তবু ছিটকিনিটা হাতে করে গিয়ে ও মাকে বললে,—এই ছাখ মা।

মা চা ছাঁকতে-ছাঁকতে তাকালেন।

—কি করে ভাঙল?

—কে জানে! মিস্তিরী ডেকে সারাতে হবে। এখানে কি মিস্তিরী পাওয়া যাবে!

—রেখে দে এখন। মিস্তিরীর খোঁজ করে দেখি।

জানালাটা তাহলে ভোজবাজীতে খোলেনি। ছিটকিনি ভেঙে খুলেছে। অনেক ভয়ের ভেতর একটু যেন আশ্বস্ত হোল রাণা। সকাল থেকে আজ বেশী বেরোল না। প্রথমে নতুন জায়গা, সঙ্গী-সাথী এখনো সবাই জোটেনি, তার ওপর কাল রাত্তিরের ব্যাপারটার পরে ও বেশ একটু মুষড়ে পড়েছিলো।

তবু কালীতলায় গেল একটু বেলায়। পড়া শেষ করে ওখানে গিয়ে মন্দিরের পাশে একটা করবী গাছের শোয়ান ডালের ওপর বসে তাকাতে লাগল এদিক-ওদিক। একটা পাঁঠা এ ধারে ও ধারে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। বাচ্চা পাঁঠাটাকে ধরলে মন্দ হয় না। গাছ থেকে নামতে যাবে, হঠাৎ কানে এলো—ঝুম—ঝুম—ঝুমুর—ঝুম—

বুকটা ধড়াস করে উঠল। তবে কি দিনে-দুপুরেও উনি হাওয়ায় ভেসে নৃত্য করেন!

কান পেতে রইল। ঠিক একই ভাবে সেই ঘুঙুরের আওয়াজ বেজে চলেছে।

কালো মত একটা ছেলে একখানা কোদাল নিয়ে পায়ে-পায়ে চলা সরু পথটায় মন্দিরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল।

খুব সন্তর্পণে করবী গাছ থেকে নেমে রাণা পালাতে যাচ্ছিল। হঠাৎ থেমে বললে,—এ্যাই, শোন্। কালো ছেলেটা দাঁড়াল।

—ওই শব্দ কিসের রে?

ছেলেটা একটু কান পেতে থেকে অতি সহজ ভাবে বললে,—আ! ও তো শালিকের বাচ্চা ডাকছে! শালিকের বাচ্চার ডাক এমন স্পষ্ট ঘুঙুরের বোলের মত শোনায়!

ছেলেটা চলে গেল।

রাণা নিজের মনেই খুব খানিকটা হেসে ফেললে। কি মিথ্যে ভয়ই না পেয়েছিলো কাল রাত্তিরে!

লাফাতে লাফাতে বাড়ি চলে এলো।

ভয়-ডর সব বাজে। বংশীচাঁপায় ভয় নেই আর।

সেদিন বিকালেই কিছু সঙ্গীর সঙ্গে ভাব জমালো। গাছের ডালে কিছু খেলা হোল। দৌড় আর লাফালাফি করে ঘেমে ক্লান্ত হয়ে বাসায় ফিরে, সন্ধ্যে বেলা হাত পা ধুয়ে পড়তে বসলো।

পড়তে একটু হবেই। নইলে মা ছাড়বেন না। আজ যদিও একেবারে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছিল না ওর, তবু মা বিরক্ত হবেন ভেবে ব্যাকরণ খুলে সন্ধি মুখস্থ করতে লেগে গেল।

মাঝে মাঝে ঝিমুনী আসছে। না, পড়া আজ আর কিছুতেই ভাল লাগছে না।

চৌকির ওপর হারিকেন জ্বালিয়ে খোলা বইয়ের পাতা থেকে মুখ তুলে জানলার বাইরে তাকাল। হঠাৎ মনে হোল শাড়ী-পরা একটা মেয়েলোক দাঁড়িয়ে রয়েছে তার দিকে তাকিয়ে।

কিন্তু ওখানে কেন? সেই মাঠের মধ্যিখানে ভাঙা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

অন্ধকারে মুখ দেখা যাচ্ছে না। মাথায় ঘোমটা। একটুও নড়ছে না কেন? কি দেখছে দিকে?

হঠাৎ দেখল মেয়েলোকটা ভাঙা ঘরের দেয়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অন্ধকার মাঠের মধ্যে তার চেয়েও কালো ছায়ার মত ভাঙা ঘরটা তেমনি চোখের সামনে রয়েছে। মেয়েলোকটা নেই।

ভারী অদ্ভুত তো! মেয়েলোকটা ওখানে দাঁড়িয়েই বা ছিল কেন? গেলই বা কোথায়?

তবে সকালে সে ছেলেটা তাকে মিছে-কথা বললে! শালিকের বাচ্চার ডাক ওই ঘুঙুরের আওয়াজ! হতে পারে না। নিশ্চয় তাকে মিথ্যে কথা বলে গেছে।

হয়তো যিনি একটু আগে দেখা দিয়েছিলেন, তিনিই রাত্তিরে নেচে বেড়ান

এই মাত্র সে নিজে চোখে দেখতে পেল। উনি ওই অন্ধকার পোড়ো ঘরের দেয়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন, কি করে সে অবিশ্বাস করবে এমন জলজ্যান্ত দৃশ্যকে।

ভয়ে ভয়ে হারিকেনটা আরও বাড়িয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে পড়া শুরু করলো রাণা।

হঠাৎ দেখলো শাড়ী-পরা মেয়েলোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল—

খানিকটা চেঁচিয়ে পড়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও জানলার বাইরে চোখ মেলেই দেখে, উনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। হ্যাঁ, নিশ্চল নিথর ছায়ার মত। রাণা একটু সময় তাকিয়ে থাকতে-থাকতেই আবার সেই ভাঙা দেয়ালের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

তাজ্জব ব্যাপার! রাণার চোখ দুটো গোল হয়ে উঠল। উনি দ্বিতীয় স্পষ্ট দেখা দিচ্ছেন। বেছে বেছে রাণাকেই বা কেন? মা-কে বাবা-কে দেখা দিলেই তো হয়।

ওনার ওপর চটল রাণা। ভয়ে রাগে গুম হয়ে রইল।

পরের দিন সকাল থেকে রাণা একটি গুলতি বানাতে লেগে গেল। ডাল চেঁছে, রবার লাগিয়ে, মোটা সুতো দিয়ে বেঁধে বেশ কড়া একটি গুলতি বানিয়ে নিতে দুপুর হয়ে গেল।

আজ আর ছাড়বে না রাণা। উনি হাওয়াই হোন আর বাতাসই হোন, গোটাকতক বেশ জুতসই পাথরের ঢেলা মারবেই আজ। যা হবার হয়ে যাবে! ওনার সঙ্গে একটা হেস্তনেস্ত যা হবার হয়ে যাক আজ।

সন্ধ্যের পরে হারিকেন জ্বালিয়ে পড়তে বসল রাণা—গুলতিটা কোলে নিয়ে। বেশ চেঁচিয়ে পড়া শুরু করলো আর বার বার দেখতে লাগল জানলার বাইরে।

না। আজ তো তাঁকে আর দেখা যাচ্ছে না। কি হোল, তবে কি আজ অন্য চত্বরে নাচতে গেলেন নাকি?

পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়ে একটু ঝিমুনীর মত এলো। হঠাৎ ঢলে পড়তে গিয়ে চমকে উঠে জানলার বাইরে তাকাতেই দেখে—এসেছেন।

রাণা খুব সন্তর্পণে গুলতিটি নিয়ে উঠল। জানলার পাশে দাঁড়িয়ে একটি কালো জামের মত সাইজের পাথর নিয়ে বেশ ভাল করে ছুঁড়ল।

—উরে বাপ্ রে—মেরে ফেলেচে গো—

একি হাউ-মাউ করে কথা বলে ফেলেছেন! জানলার গরাদের কাছে এসে রাণা দেখলে উনি তাদের ঘরটার দিকে এসে চিৎকার শুরু করে দিয়েছেন।

মা চলে এলো—কি করে কে চেঁচাচ্ছে?

রাণা হতভম্ব হয়ে বললো—ভূত!

—দূর বোকা, ভূত আবার চেঁচায়!

বাইরের দিকের দোর খুলে মা বেরোলেন। পিছন পিছন রাণা।

নোংরা শাড়ী পরনে একটা কালো রোগা মেয়েমানুষ। শাড়ীর আঁচলটা রক্তে ভেসে গেছে।

মাকে দেখেই সে হাউমাউ করে উঠল—ওগো মা গো—ও আমায় মেরেচে গো—

—তুমি কে? মা জিজ্ঞাসা করলেন।

—দিনের বেলা ভিক্ষে করি, রেতে উই ভাঙা ঘরটায় থাকি। তুমার-ই ছেলের মত আমার একটি ছেলে ছিল গো, সিটি ভগবান নিয়ে নিয়েছে। তাই তুমার ছেলেটাকে দেখছিলুম। সে আমাকে মেরেছে!

—ইস্! কপালটা কেটে গেছে! যা রাণা, আইডিনের শিশি আর তুলো নিয়ে আয়।

রাণা মেয়েলোকটার দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো। মুখখানা কালো হয়ে উঠল।

এমন যে হবে সে তো ভাবেনি! নিজের ছেলে মরে গেছে, তাই তাকে ও দেখছিলো, আর সে এমন করে মেরে বসল!

রাণা ঘরে ঢুকে চোখের জল মুছল। তুলো আর আইডিনের শিশিটা নিয়ে আরও একবার হাতের তালুর উল্টো পিঠে চোখ দুটো ভলে মুছে ফেলল।

জলসার সন্দেশ

শ্রীপতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

নোন্‌তা-মিষ্টি ক্লাবের সেদিন বসেছে মিলন মেলা—
নাচ গান বক্তৃতা আবৃত্তি হাত-সাফাইয়ের খেলা।
বিনা পয়সায় ছত্রিশ মজা যে যাকে দেখাতে পারে ;
তিল ধারণের ঠাঁই নাই আর বিরাট সে থিয়েটারে !
শ্রীক্ষীরমোহন ক্ষেত্রী এবং শ্রীরাতাবী রাজগুরু
দুই জনে বেদ মন্ত্র আউড়ে সভা করলেন শুরু।
নিম্‌কি নন্দী, বরফি বরাট, কচুরী কাপুর সনে—
জিলিপি জালান, লেডিকেনী লোধ গাইল উদ্বোধনে ;
সঙ্গত করে হালুয়া হড় আর গজা গুঁই, বোঁদে বোস।
বালুসাই বরা, রাবড়ী রাহার গীটারেতে মালকোষ।
সিঙ্গাড়া সাধুখাঁ, পান্তুয়া পাল আর সীতাভোগ সাহা
শুধু টুস্‌কিতে গান যা গাইলো, শুনে সবে বলে—আহা
রাধাবল্লভী রেজের সঙ্গে দানাদার দেবনাথ
কমিক মেশানো ম্যাজিক দেখিয়ে সভা করে দিল মাৎ !
আবৃত্তি করে কালাকাঁদ কর, চানাচুর চণ্ডার,
মালাই মাইতি, মনোহরা মাল, দরবেশ দাস আর।
শ্রীশোন্‌পাপড়ী সেন, দই দাম ও রসগোল্লা রায়
ডিগ্‌বাজী নাচ নাচতেই সভা হেসে ফেটে বুঝি যায়।
শেষে শুরু রাজভোগ রুদ্রের নাটক 'পকেটমার' ;
অভিনয় কালে বিজলী গলদ, সকলই অন্ধকার।
তারপর শুধু চেঁচামেচি—'ওরে গেছিরে, বাপরে বাপ'—
দুড়দাড় করে বেরোয় সবাই, কারো বা পকেট সাফ্‌।

বাগেশ্রী
চণ্ডী লাহিড়ী
হালুম!
তোকে খাবো
তাহলে, মরবার আগে
তোমায় একটা গান
শোনাই
বাঃ চমৎকার!

(সমালোচনার জন্য দু'খানি বই পাঠাবেন।)

মজার মজার খেলা—শ্রীসৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩-১-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৩.০০

'মজার মজার খেলা' বইখানি শুধু খেলার নয়, খেলার ছলে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রাথমিক সহজ উপায়গুলি এমন সুন্দর ভাবে লেখক তাঁর সহজ ভাষায় ও ছবির সাহায্যে এই বইখানির মধ্যে বুঝিয়ে দিয়েছেন যা পড়লে শুধু ছেলেরা কেন, বড়রাও এ-থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবেন।

এই বইটিতে ছোটদের উপযোগী এমন কতকগুলি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয় আছে, যা তাদের কাছে ম্যাজিকের মত আশ্চর্য ও উপভোগ্য হবে। এই ধরনের বই প্রত্যেক ছেলেমেয়ের হাতে তুলে দেওয়া উচিত এবং স্কুলেও অতিরিক্ত পাঠ্য করলে তারা উপকৃত হবে। এতে প্রচুর ছবি আছে এবং উপরের প্রচ্ছদপটটিও আকর্ষণীয়।

মনীষী আশুতোষ—শ্রীঅমরনাথ রায়। বিদ্যাভারতী, ৮সি, ট্যামার লেন, কলিকাতা ৯ হইতে শ্রীঅধীরচন্দ্র পাল কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ২.০০

বাংলার অন্যতম মনীষী স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এই বইখানি প্রকাশিত হয়েছে। বাংলার 'বাঘ' নামে খ্যাত আশুতোষের জীবন-কথা ছোটদের জন্য এমন সুন্দর করে আর লেখা হয়েছে কিনা সন্দেহ। বাংলার গৌরব এই মহান্ কর্মযোগীর জীবনের আরম্ভ থেকে সমূহ ঘটনাবলী চিত্র-সহযোগে বইখানির মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। সর্বশেষ পরিচ্ছেদটিতে আশুতোষের চরিত্রের বিশেষ দিকগুলি স্বতন্ত্র ভাবে দেখান হয়েছে এবং বর্ষানুক্রমে একটি জীবন-পঞ্জীও দেওয়া হয়েছে। এই জীবনী পাঠ করলে প্রত্যেক ছেলেমেয়েই উপকৃত হবে।

দোয়েল ফিঙ্গে চন্দনা—শ্রীশ্যামাপ্রসাদ সরকার। এভারেষ্ট বুক হাউস, এ ১২ এ, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। মূল্য ১.৫০

সাধারণতঃ যে ধরনের গল্প ছেলেমেয়েরা ভালবাসে, ঠিক সেই ধরনের সহজ মিষ্টি ভাষায় লেখা বারোটি গল্প এই বইখানিতে ধরে দিয়েছেন লেখক। প্রত্যেকটি গল্পের মধ্যেই যেমন নতুনত্ব আছে, তেমনি গল্পের সঙ্গে আঁকা ছবিগুলির মধ্যেও আছে রেখার বৈচিত্র্য। আমরা গল্পগুলি পড়ে যেমন মুগ্ধ হয়েছি, তেমনি ছোটরাও এগুলি পড়ে নিশ্চয়ই খুশি হবে। ছবি, ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই—সব দিক থেকেই বইখানি আকর্ষণীয়। বিশেষ ভাবে এই গ্রন্থের লেখকের সঙ্গে শিল্পীকেও আমরা ধন্যবাদ জানাই।

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত
ও তৎকর্তৃক প্রভু প্রেস ৩০ বিধান সরণী কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত। মূল্য ০.৪৫

চিড়িয়াখানার একটি দৃশ্য

✻ ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র ✻

৪৫শ বর্ষ] কার্তিক—১৩৭১ [৭ম সংখ্যা

মেয়ে-ভোলানো ছড়া

বীরভদ্র

পুতুল দেবো, শাড়ী দেবো,
গয়না দেবো, গাড়ী দেবো,
আটমহলা বাড়ী দেবো,
কান্না থামাও মেয়ে।

ভালো ঘরে বিয়ে দেবো
লাল রবারের টিয়ে দেবো
একশো চাকর ঝি'ও দেবো
দেখবে লোকে চেয়ে।

কান্না থামাও, কান্না থামাও,
কান্না থামাও খুকি,
কান্না শুনে মিনি বেড়াল
মারছে উঁকিঝুঁকি।

বর আসছে পাল্কী ক'রে
সাত বেহারার মাথায় চ'ড়ে
নিয়ে যাবে তোমায় ঘরে
অচিন-দেশের ছেলে।

রূপ যেন তার ঠিক্‌রে পড়ে
বাঘের সাথে লড়াই করে
গায়ের জোরে কেউ না পারে,
কে তুমি ভাই এলে?
কোন্‌খানেতে খুকুমণির
ঠিকানাটা পেলে?

রাজপুত্তুর তুমি বুঝি? রূপ দেখে তাই ভাবি,
ওর আঁচলে বেঁধে দেবে, তোমার ঘরের চাবি?
কান্না থামা খুকু ওরে, ওর সাথে তুই যাবি।
খুকুর মুখে ফুটলো হাসি,
মুক্তো-ঝরা হাসি।

রাজপুত্তুর দিয়েছে কি গয়না রাশি রাশি?
শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছে খুকু, বলছে, 'এবার আসি।'
খুকুর মুখে ফুটলো হাসি,
মুক্তো-ঝরা হাসি।

সুসঙ্গের বনে-পাহাড়ে দেখা অভিনব জীব

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ (সুসঙ্গ)

'দাঁত থাকতে দাঁতের কদর বোঝা যায় না'—এটা মর্মে মর্মে বুঝতে পারি যখন পুরনো দিনের কথা মনে হয়। দেশে যাওয়া আর সম্ভব হবে না -আর বয়সের অনিবার্য অক্ষমতায় গারো পাহাড়ে বেড়ানোও আর সম্ভবপর হবে না। ফলে, সেখানকার দেখা কত কথাই মনে হয়, আর ইচ্ছা হয় অসম্পূর্ণ দেখা জিনিসগুলো যদি আর একবার দেখবার সুযোগ পেতাম! কিন্তু জানি, সে সুযোগ আমার কাছে আর ফিরে আসবে না।

আমার আগেকার অনেক প্রবন্ধেও লিখেছি—সোমেশ্বরী নদী ব'য়ে চলেছে গারো পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে। যেখানে নদীটি পাথরের উপর নেমে পড়ে পাথরের বাধা ঠেলে গর্জন করতে করতে ফেনিল উচ্ছ্বাসে বেগে নেমে যাচ্ছে দিনের পর দিন উজিয়ে, সেই পর্যন্ত এসে আমরা একবার নৌকো থামালাম—বেশ ক'দিন মিস্রিদানার মত বালুর চরে তাঁবু খাটিয়ে বিশ্রাম নেব ব'লে। আমরা যখনকার কথা বলছি, তখন গারো পাহাড়ের জায়গায় জায়গায় আদিবাসী কয়েকঘর লোক ছাড়া দুনিয়ার আর কারোই দেখা পাওয়া যেত না। নিবিড় পাহাড়ের বুকে এসব জায়গা ছিল এক অনাবিল শান্তির রাজ্য। তাই আমরা যখন হঠাৎ এসব জায়গায় এসে উপস্থিত হতাম, তখন প্রকৃতির এই স্বাভাবিক শান্ত পরিবেশ কিছু অপ্রাকৃত আলোড়নে অশান্ত হয়ে উঠতো। কি স্নিগ্ধ অলস আবেশে ভরা শান্ত সেই দিনগুলি! সেদিনের কথা আজ শান্তিনিকেতনে ঝোড়ো হাওয়ার অন্ধকার সন্ধ্যায় বসে একে একে মনে ভিড় জমাচ্ছে। এখানেও অদূরে সাঁওতালদের মাদলের বাদ্য ভেসে আসছে - কিন্তু বাড়ীর সামনে দিয়ে চোখ-ঝলসান আলো জ্বালিয়ে মাল বোঝাই লরী বিকট রবে বাড়ী-ঘর কাঁপিয়ে ছুটে চলেছে—আর সাইকেল-রিক্সার প্যাঁক্ প্যাঁক্—এসব মিলে সন্ধ্যার শান্তি সুদূরে পালিয়েছে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে অবিশ্রান্ত বিদ্যুতের চম্‌কানি আর মেঘের গুরু গুরু ডাক এখানেও মনকে উদাস করে তোলে সত্য, কিন্তু এই পরিবেশ আর সেদিনের গারো পাহাড়ের সন্ধ্যার পরিবেশে পার্থক্য অনেক। এখানের মাদলের বাজনায় গারো পাহাড়ের 'পাবনের' মাদল আর শিঙ্গার সেই মাধুর্য যেন পাই না। সোমেশ্বরীর 'ঘারাই' (rapids)-এর অবিশ্রান্ত গর্জন, ধনেশ পাখীর বিকট রব, হাতীর বৃংহণ, বাঘের হুংকার, হগ্‌রা হরিণের ভয়াবহ ডাক; আবার ভোর ও সন্ধ্যায় শ্যামা, ভিমরাজ, হারোয়া, দামা, কস্তুরা, আরেরাজ, গোলাপ চসেম—আরও কত নাম-না-জানা মধুর-বোলা পাখীর গান। এসবই যেন সেখানকার প্রকৃতির রূপকে আরও মোহময় করে তুলতো— হর এবং গৌরীর এই অপূর্ব মিলনমাধুর্য সেখানে রাত্রি-দিন, পাহাড়ে-জঙ্গলে, লতায়-পাতায়, আকাশে-বাতাসে জলে-স্থলে—সমস্ত আবহাওয়ায় যেন পরিপূর্ণ হ'য়ে থাকতো। বীরভূমের এই অঞ্চল ভৈরব এবং রুদ্রাণীর

লীলাভূমি। সুসঙ্গের এমন পরিপূর্ণ স্নিগ্ধ শান্তির পরিবেশ আমি আর কোথায় পাইনি তাই সব সময় –'তারই বাঁশী, তারই বাঁশী বাজে হিয়া ভরি।'

আলুঘাট থেকে সিজু,—সোমেশ্বরী নদী পাথরের উপর আছ্ড়ে আছ্ড়ে যেন নেমে আসছে। সিজু পর্যন্ত নৌকোয় যাওয়া যায়, তারপর একটানা নৌকোতে যাওয়া অসম্ভব। আমরা সেবার কয়েকটা 'পান্‌সী' নৌকো আর কয়েকটা 'কোঁদা' (dug out) সঙ্গে নিয়ে সদলবলে চলেছি। আলুঘাটে এসে মনে হয় নদী বুঝি এখানেই শেষ হয়ে গেছে। পাহাড় এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যে কিছুদূর থেকে দেখে বোঝা যায় না—নদী কোথা দিয়ে গেল। এই পর্যন্ত এসে এক জায়গায় 'ঘারাই'-এর (rapids) উপর দিয়ে অতি কষ্টে একটার পর একটা নৌকোকে ঠেলে উজিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। স্রোতের এমন টান যে হঠাৎ যদি কোন রকমে মাঝির হাত ফসকে যায়, তবে পাথরের গায়ে ধাক্কা লেগে নৌকো তো ডুববেই—কাউকেই এই স্রোতে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কোঁদা নৌকোর গারো মাঝি হঠাৎ এরই মধ্যে উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠলো—'মাচ্ছা মাচ্ছা!' (অর্থাৎ বাঘ)। ডান পাশের পাহাড় খাড়া উঠে গেছে—তার দেওয়ালে আকাশচুম্বী গাছের সারি। বাঁ দিকের পাহাড়টা কিছু ঢালু, তার নদীর দিকের অংশটি পাথরে ঢাকা এবং খানিক দূর পর্যন্ত খাড়াই। এদিকেও ঘন গাছে পাহাড় ঢাকা – সম্মুখে নীল পাহাড় দেখা যাচ্ছে—আর গড়িয়ে আসছে ফেনিলোজ্জ্বল নদী। এই অবস্থায় 'বাঘ' 'বাঘ' শব্দ কানে যেতেই বন্দুকে কার্তুজ পুরে নৌকোর সম্মুখে ঠিক হয়ে দাঁড়ালাম। ভাল করে লক্ষ্য করে দেখি আমাদের নৌকোর মাত্র ২০ গজ সামনে দিয়ে প্রবল স্রোতের মধ্যে কুকুরের মত কেবলমাত্র মাথা ভাসিয়ে একটি জন্তু বাঁ দিকের পাহাড়ে সোজা সাঁতরে পাড়ি দিচ্ছে! দেখা মাত্র পর পর দুটো গুলি করলাম, কিন্তু ব্যর্থ হলো; তার গায়ে লাগলো না। আবার কার্তুজ ভরে নিলাম। এবার জন্তুটা সবে মাত্র বাঁ দিকের পাহাড়ে উঠে এগুচ্ছে। এই অবস্থায় গুলি করা মাত্র সে নিহত হলো।

জন্তুটাকে দেখে মনে হলো ওটা এক ধরনের বাঘ হবে। কিন্তু এরকম বাঘ আমি দেখিনি, সঙ্গের আর কেউও কখন দেখেন নি। বয়স্কদের মধ্যে ৬০।৬৫ বৎসরের অভিজ্ঞ বৃদ্ধও ছিলেন। বাঘটাকে তখনই মাপা হলো। যতদূর মনে আছে, নাকের ডগা থেকে লেজের শেষ পর্যন্ত কাঠি পুঁতে লম্বায় প্রায় পাঁচ ফিট। মুখ আর মাথা মিলে গড়ন লেপার্ডের থেকেও কিছুটা লম্বাটে। শরীরের তুলনায় লেজ বেশ লম্বা—লেপার্ডের থেকে এর লেজ মোটা। এর বৈশিষ্ট্য হ'ল রং-এ। ঘোর বাদামী রঙের জমির উপর ফ্যাকাশে কালো গুল এবং কয়েকটা লম্বাটে চক্র। এ ধরনের বাঘ গারোরাও কখনও চোখে দেখেনি বললো। এরা নাকি অতি দুষ্প্রাপ্য জন্তু।

এরা নিশাচর—আসামের পাহাড়ের গভীর জঙ্গলে মাঝে মাঝে এদের দেখা পাওয়া যায়।'

প্রকাশ্য দিবালোকে বাঘটি প্রায় আত্মহত্যা করবার জন্যই যেন আমাদের সামনে এসে পড়েছিল। হয়তো বুনো কুকুরের ভয়ে এভাবে নদী পার হবার চেষ্টা করছিলো। ফলে, ইক মাছের মত তপ্ত কড়াই থেকে একেবারে আগুনে পড়ার অবস্থা! বুনো কুকুর গো-বাঘের (Royal tiger) মত জন্তুরও ভীতির কারণ হতে পারে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায়, গভর্নমেণ্টের রিজার্ভ জঙ্গলে বুনো কুকুরের উৎপাতে হরিণ প্রভৃতির সংখ্যা অত্যন্ত কমেছে। এ উৎপাত বন্ধ করতে হলে এদের মারা দরকার। কিন্তু এদের মারার দিকে কারোই কোন আগ্রহ নেই। কারণ, এ খাওয়াও যায় না বা এদের চামড়াও সংগ্রহ করে রাখবার মত নয়। কাজেই কোন শিকারীই এদের মারেন না। যাই হোক, সে যাত্রায় সেই অভিনব বাঘের চামড়াটা ছাড়িয়ে এনে আমার এক পরম শ্রদ্ধেয় আত্মীয়কে উপহার দিয়েছিলাম মনে আছে।

শিকারে গিয়ে সুসঙ্গের সমতটের জঙ্গলে দু'দিন বড় প্রজাপতির মত বিচিত্র রং-এর চামচিকা দেখেছি। এক জায়গায় দু'টি এবং আর এক জায়গায় একটি মাত্র। গাঢ় কমলার রং ডানার উপর হলদে টান দেয়া অতি বিচিত্র উজ্জ্বল রং-এর ছোট ছোট চামচিকে তিনটি মাত্র দেখেছি। নলখাগ বনের নীচে স্যাঁৎস্যাঁতে জায়গায় যে সব লতা গাছ উঠেছে, তেমন জায়গা থেকেই এদের উড়ে বেরুতে দেখেছি। এমন বিচিত্র চামচিকের বিষয় যাঁদের জানা আছে, তাঁদের এ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে লিখতে অনুরোধ করি।

একবার উল্লুকের মত বড়, কিন্তু মুখটা ছুঁচলো একটা জন্তুকে লম্বা লেজ নিয়ে উঁচু গাছের মগ্-ডালে জড়িয়ে ঝুলতে ঝুলতে আর এক গাছে ছিটকে পালাতে দেখেছি। এরই একটাকে এক গারো মেরে এনেছিল। যতদূর মনে পড়ে এদের নখগুলো ভালুকের মত। চিড়িয়াখানায় কিংবা কোনও ছবিতে এই জন্তু দেখেছি বলে মনে পড়ে না। গারো পাহাড় বাঘমারা রিজার্ভে বাদামবাড়ী বড়লোনার (Saltdick)-এর কাছে আমি একটাকে দেখেছি।

তাছাড়া, স্থানীয় ভাষায় "যজ্ঞ শূয়োর" নামে এক বিচিত্র জন্তুকে সমতটের এক গ্রামবাসী গর্ত থেকে ধরে আনতে দেখেছি। কিছুটা Pangolin-এর মত মুখ হলেও আঁষের বর্ম নেই, আর শরীরটা Tapir-এর মত অতিশয় মাংসাল। এ ধরনের জানোয়ারও কোথাও দেখিনি। এ ক'টা জন্তুর কথা লেখার উদ্দেশ্য অনুসন্ধিৎসুর দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করা।

১। এই ঘটনার বহু বৎসর পর 'Statesman' পত্রিকায় প্রখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিশারদ শ্রীগী মহাশয় "Brown Leopard" শিরোনামায় এক প্রবন্ধ ব র করেন। রাত্রিতে আসামের গভীর জঙ্গলে পাহাড়ের ফাঁদে এদের ধরবার খবর তিনি পেয়েছেন। এই বিবরণ পড়ে মনে হ'ল, আমার সেদিনকার মারা বাঘ "Brown Leopard" পর্যায়ভুক্ত দুষ্প্রাপ্য জন্তু।

উল্টোরাজার দেশে

শ্রীগৌর মোদক

কালকে আমি গিয়েছিলাম উল্টোরাজার দেশে,
তেরো নদীর ঘাট পেরিয়ে সাত সাগরের শেষে।
গোবরগণেশ রাজা সেথায় মন্ত্রী হাঁদারাম,
রাজা যোগায় প্রজায় সেথা খাজনা অবিরাম।

জিনিসপত্তর বেচে সেথায় পয়সা দিয়ে লোকে,
ওষুধ কভু খায় না তারা পাছে রোগে ভোগে।
হাঁটতে গেলে টিকিট লাগে, কাশতে গেলে ট্যাক্স,
দিনের বেলায় জ্বালায় লোকে হাজার পেট্রোম্যাক্স।

সারা বছর বন্ধ সেথায় অফিস-আদালত,
পুলিশকে চোর খুঁজে বেড়ায় চোরেরা সব সৎ।
করলে চুরি হয়না সাজা—সাধুরা যায় জেলে,
সেথা, যায় না ছেলে স্কুলেতে, বেড়ায় শুধুই খেলে।

গণ্ডগোলে প্রথম হলে, সেথা মেলে পুরস্কার,
করলে পড়া ছেলেরা খায় বেদম কেবল মার।
উল্টো দেশে উল্টো ব্যাপার চলছে দিনরাত,
দেখতে পাবে তুমিও ভাই মুদলে আঁখিপাত!

আষাঢ়ে কাহিনী

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

"পাজি, ছুঁচো, শয়তান! তোকে মেরে—না, না, মারে তোর মতো ছেলের কিস্যু হবে না। পুলিশে দেবো।" ধাড়া মশাই পুকুরঘাটে দাঁড়িয়ে বেশ গলা ছেড়ে কথাগুলো বলছিলেন আর ছেলেটার নড়া ধরে মাঝে মাঝে ঝাঁকি দিচ্ছিলেন।

ছেলেটা নির্বিকারচিত্তে মুখের পেয়ারার অভুক্ত অংশ চিবুচ্ছে আর হাতে টিনের কৌটোটার দিকে তাকাচ্ছে।

ধাড়া মশাই আবার বললেন, "বল্, কেন এ কাজ করেছিস্? কার ছেলে তুই? অমন উচু পাঁচিল টপ্‌কালি কি করে, বল্? না বললে"—আবার ছেলেটার নড়া ধরে জোর ঝাঁকি দিলেন।

পুকুরটার তিন দিকে দশ ফুট উচু পাঁচিল, একদিকে ধাড়া মশাইয়ের দোতলা বাড়ি। পুকুরের পাড় ঘিরে কয়েকটা পেয়ারা, গন্ধরাজ ও কাগজি লেবুর গাছ। এককোণে শসা ও কুমড়ো মাচা, আর এককোণে কয়েকটা নারকোল আর ঘাটের কাছাকাছি একটা তাল গাছ। ভরা বর্ষা। যেমন পুকুরে জল থৈ থৈ করছে, তেমনি সব গাছে ফল।

"দেখি কৌটো—" বলে ধাড়ামশাই ছেলেটার হাত থেকে কৌটোটা কাড়বার চেষ্টা করতেই সে খপ্ করে সেটা উপুড় করে দিল। অমনি কয়েকটা ল্যাটা ও পুঁটি ঘাসের ওপর পড়েই দু' তিন লাফে জলে নেমে, কোনটা একটু চিৎ হয়ে থেকে, কোনটা লজে লজে তলিয়ে গেল।

"ওরে শয়তান! এতগুলো মাছ এই আক্রা-গণ্ডার দিনে চুরি করেছিলি? আবার পেয়ারাও চুরি করেছিস্? লোকে যেমন করে গরু খোঁয়াড়ে দেয় তোকেও আজ তেমনি করে থানায়—বল্, কার ছেলে তুই?"

"মহিমের।"

"কোথায় থাকে সে?"

"সগ্‌গে।"

"পাজি! আবার ইয়ারকি?"

"মিছে বলছি নে। মা বলে বাবা সগ্‌গে গিয়ে বেঁচেছে। বিশেস না হয় নিজে গিয়ে দেখে আসুন।"

"ব-টে! ধাড়ামশাই বুঝলেন, ছেলেটার বাবা মহিম নামক ব্যক্তিটি মারা গেছে। আর যার এরকম গুণময় ছেলে সে যে মরে বেঁচেছে এতে সন্দেহ করবার কিছু নেই।

জিগ্যেস করলেন, "তোর নাম কি?"

"পলান।"

"মানে?"

"জানি নে।"

"কেন জানিস্ নে? ছেলেবেলা থেকেই পালাচ্ছিস্ বলে তোর বাপ-মা ঐ নাম রেখেছে?"

"আমি এখনও ছেলেমানুষ। আপনার মতো বুড়ো-হাবড়া নই। পালাই না।"

"তবে তোর নাম পলান কেন?"

"আমার বাবার কাছে গিয়ে জিগ্যেস করে আসুন। হাত ছাড়ুন। লাগছে।"

"ছাড়বার জন্যে ধরেছি? তোকে পুলিশে দেবো। কোথায় থাকিস?"

"ঐ দিকে?

"কোন্ দিকে?"

"দুই দিকে!"

ধাড়াবাবু হাঁকলেন, "ভোলানাথ? এই ভোলা। এই তো—"

বেশ ষণ্ডাগোছের একটা লোক এসে দাঁড়ালো। তার মুখে-চোখে বিরক্তি ও কাঁচা ঘুম থেকে উঠে আসার চিহ্ন।

ধাড়াবাবু বললেন, "একে চিনিস্?"

ভোলা বললে, "ছোটবাবুর স্যাঙাৎ।"

"ব—টে! এই সব ছেলের সঙ্গে মেশা হয়, তাই আজকাল পড়াশুনোয় মন নেই। ডাক্ তো তাকে।"

পলান বললে, "হাত ছাড়ুন।" বলে এক টানে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পুকুর পাড় দিয়ে দৌড়।

ধাড়াবাবু একে মোটা, তার ওপর বুড়ো মানুষ। তার পিছু নিলেন না। "ধর্—ধর্" বলে হাঁক দিতে লাগলেন।

ভোলানাথ অনিচ্ছাসত্ত্বেও মনিবের খাতির রাখতে পলানের পিছু নিল। কিন্তু পলান খরগোশের মতো লাফে লাফে ছুটে কাঠবেড়ালীর মতো বড় পেয়ারা গাছটায় উঠে তার ডাল ধরে পাঁচিলের মাথায় নেমে এক লাফে ওধারে পড়লো। এমন ব্যাপারে ধাড়াবাবু ও ভোলানাথ উভয়েই হতভম্ব!

ধাড়াবাবু হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, "ধরতে পারলি না, বোকা গঙ্গারাম!"

ভোলা বললে, "আজ্ঞে যে আপনার হাত ছাড়িয়ে পালায় তারে ধরে কার সাধ্যি!"

"কার সাধ্যি!" বলে ধাড়াবাবু তাকে ভ্যাঙচালেন। "দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে।"

"আজ্ঞে তাই চললাম।"

ধাড়াবাবু গুটি-গুটি পেয়ারা গাছটার ধারে গিয়ে গাছটার দিকে তাকিয়েই আঁৎকে উঠলেন।
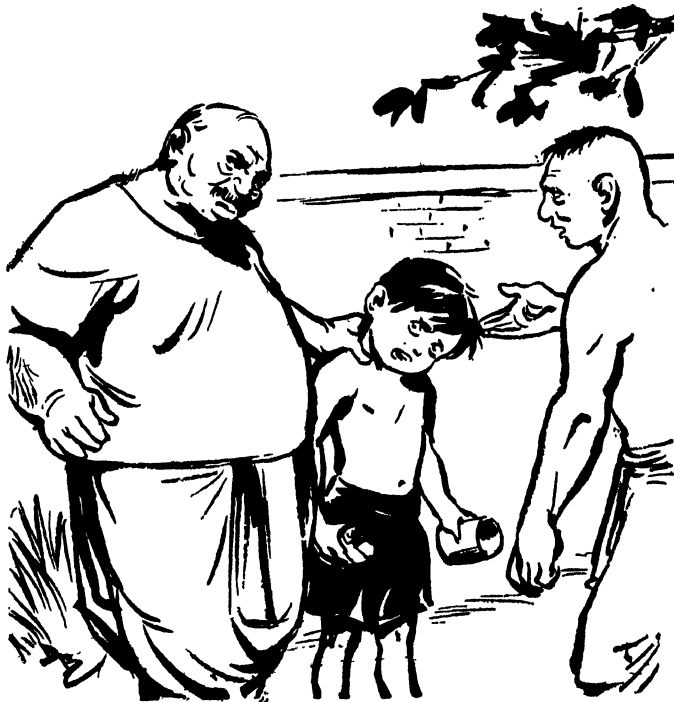
ভোলা বললে, "ছোটবাবুর সাঙাৎ।"

"অ্যা! গাছটা একদম ফাঁকা! সব পেয়ারা পেড়ে নিয়েছে? উস্‌কো শির লেগা! য়তান! পাজি! চোর!" বলতে বলতে গন্ধরাজ লেবুর গাছটার কাছে গিয়ে দেখেন, সাটিতেও একটিও লেবু নেই! বড় শখের গাছ। ঘোলের শরবৎ, মিছরির জল, চিড়ে-ভিজে, মাছের ঝালে—ঐ লেবুর গন্ধে যে মেতে ওঠে! হৃতভাগাটা কিনা—কিন্তু পরক্ষণেই ধাড়াবাবুর মনে

হোল, ঐ ছোঁড়াটাই যদি পেড়ে নিয়ে থাকে তাহলে পেয়ারা আর লেবুগুলো গেল কোথায়? ওর কাছে তো দেখতে পাওয়া গেল না! ছোঁড়াটার পরণে আধ-ময়লা হাফপ্যাণ্ট, গায়ে জামাও নেই। 'প্যাণ্টের দু' পকেটে আর কত ধরে? এই চুরির মধ্যে গভীর রহস্য আছে। ধাড়াবাবু ভাবতে ভাবতে পলানের পরিত্যক্ত কঞ্চির ছিপগাছটি হাতে তুলে নিলেন। বঁড়শিতে তখনও আধ-খাওয়া কেঁচোর টোপ গাঁথা।

ইতিমধ্যে ভোলানাথ পাঁচিলের মাথা থেকে নেমে এসে বললে, "বাবু পাঁচ-ছ'টা ছোঁড়া ছুটে পালাচ্ছে দেখলাম! ওদের মধ্যে ছোটবাবুও রয়েছে মনে হোল।"

"ঠিক দেখেছিস্।"

"তাই তো মনে হোল। আমায় দিকে ফিরে একবার মুখে আঙুল দিলেন। তারপর ঘুষি দেখালেন।"

"আর সেই পলানটাও দলে আছে?"

"সে থাকবে না? ঐ তো পালের গোদা!"

"ব - টে! দেখ্ছি।"

ধাড়াবাবু রাগে, দুঃখে, হতাশায় ফুঁসতে ফুঁসতে বৈঠকখানায় ঢুকতে যাবেন অমনি সামনে দেখেন, ছোটবাবু শ্রীমান গোপালকৃষ্ণ।

ধাড়াবাবু হুঙ্কার দিলেন, "দুপুরে কোথায় বেরিয়েছিলি?"

"এই তো—ঐ তো—এখানেই ছিলাম। মাধবরা তাস খেলছে, দেখছিলাম। ঐ যে তেলে-ভাজা উড়ের দোকানের বারান্দায় ওরা খেল্ছে।"

ধাড়াবাবু দেখলেন, সত্য বটে, কয়েকটা লোক গামছা গায়ে দিয়ে গোল হয়ে বসে কি করছে। তবু বললেন, "তাহলে ভোলা মিথ্যে কথা বলছে?"

"ভোলা? কোন্ ভোলা? ঐটে? ওর সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি। কাকে দেখতে কাকে দেখেছে, অমনি আমার নাম বলে দিল।" বলে গোপালকৃষ্ণ এমনভাবে ভোলানাথের দিকে তাকালো যার অর্থ স্বয়ং ভোলানাথ বুঝে একটু শঙ্কিত হোল। ছোটবাবুর দলটি বড় কম নয়!

ধাড়াবাবু কিছুক্ষণ পূর্বের ঘটনাবলী শ্রীমানের কাছে বর্ণনা করে জিগ্যেস করলেন, "পলানকে চেন?"

"পরাণ?"

"পরাণ নয়, পরাণ নয়, পলান, পলান—পলায়ন।"

শ্রীমান ফিক্ করে হেসে ফেলেই বললে, "পলায়ন-ফলায়ন নামে কাউকে চিনি না।" এবং আর না দাঁড়িয়ে ওপরে উঠে গেল।

পরদিন। রথের মেলা বসেছে বড় রাস্তার দু'টি পাশ জুড়ে। কত রকমের খেলনা-পুতুল, কাঠ-কুটরি, ধামা-কুলো, ফল-ফুলুরি, তেলেভাজা-কাঠখোলা তাজার দোকান! ভেঁপু বাজে, বাজে খোল-করতাল, আর বাজে ডুগডুগি। ঘুরছে নাগর-দোলা, ঘোড়-চরকি। তাঁবুর মধ্যে খেলা হচ্ছে ভানুমতীর। সোঁদরবনের বাঘটা ডেকে ডেকে সারা। চারধারে লোকের সোরগোল, হাঁকাহাঁকি। কিন্তু রথ মোটে একখানি। তবে একতলা-সমান উঁচু।

ধাড়াবাবু ভোলানাথকে সঙ্গে নিয়ে নাতির হাত ধরে এসেছেন মেলায়। ভোলানাথের কাঁধে ধামা, হাতে কুলো। ধামায় গোটা দুই আনারস, গোটা পাঁচেক ফজলি আম।

নাতি বায়না ধরলে, "পেয়ারা খাবো"। তারপরই বললে, "ঐ যে ছোটকাকু, পলানকাকু।"

"কৈ—কৈ ?" বলে ধাড়াবাবু চারধারে তাকাতে লাগলেন।

নাতিটি বললে, "ঐ যে পেয়ারা বেচ্ছে।"

"পেয়ারা বেচ্ছে। বলিস্ কী ?"

ঠিক তখনই সামনের ভিড়টা একটু পাতলা হলো। ধাড়াবাবু দেখলেন, সত্যি তো! একখানা চটে পেয়ারা, গন্ধরাজ লেবু, কাগজি লেবু সাজিয়ে ওরা দু'জনে বসেছে। আর ওদের পছনে চার-পাঁচটা ছেলে দাঁড়িয়ে হাঁকছে, "পেয়ারা—পেয়ারা। ডাঁশা-পাকা—পাকা-ডাঁশা।" রার হি হি করে হাসছে। কেউ কেউ কিনছেও।

দেখেই ধাড়াবাবুর সর্বশরীর জ্বলে উঠলো। তাঁর গাছের পেয়ারা আর লেবু এসেছে রথের তলায়! তবে কাজটা গোপালেরই ? না হলে ঐ রোগা-পটকা পলায়নের ক্ষমতা কি তাঁর বাগানে ঢোকে! তিনি হাতের মোটা লাঠি উঁচিয়ে হুঙ্কার দিয়ে তাদের দিকে তেড়ে যেতেই তারাও তাঁকে দেখেই দোকান গুটিয়ে ভিড়ে মিশে গেলো। দর্শকেরা হাঁ হয়ে রইলো। কেউ কেউ গল্প ফাঁদতে লাগলো।

ধাড়াবাবু রাগে ফুলতে ফুলতে বাড়ি ফিরলেন। সন্ধ্যায় একটা লোহার দাঁড়ে একটা সাহেব-বুলবুলি নিয়ে শ্রীমান্ গোপালকৃষ্ণ বাড়ি এলো।

ধাড়াবাবু তাকে দেখেই বলে উঠলেন, "বেরিয়ে যা বাড়ি থেকে। বেরো—বেরো। তোর মতো ছেলে দরকার নেই।"

গোপালকৃষ্ণ যেন আকাশ থেকে পড়লো। বললে, "আমি কি করেছি ?"

"কি করেছো? গাছের পেয়ারা-লেবু চুরি করে রথের মেলায় বেচতে বসেছিলে?"

"আমি?"

"হাঁ - হাঁ। তুমি আর পলায়ন। আর চার-পাঁচটা ছেলে।"

"কে দেখেছে?'

"আমি স্বচক্ষে। সঙ্গে ছিল মিন্তু আর ভোলা।"

"ও! সে আমাদের দোকান নয়। দোকানটা হচ্ছে—"

"আবার মিছে কথা! গোল্লায় গেছ!" রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, "কি মতলবে এমন নোংরা কাজ কর্‌লি? বল্। আজ তোকে মেরেই ফেলবো।"

ধাড়াবাবুর হুঙ্কারে-গর্জনে বাড়ির সকলে এসে দরজায় জড় হোল।

ধাড়াবাবু হাঁকলেন, "কে তোকে মতলব দিয়েছে? বুলবুলি কিনেছিস্, পয়সা পেলি কোথায়? চুরি করতেও শিখেছিস? এত নোংরার মধ্যে নেমেছিস্?" বলতে বলতে ধাড়াবাবুর গলার স্বর বন্ধ হোল, দু'চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো।

অমনি গোপালকৃষ্ণেরও চোখ দু'টি জলে ভরে উঠলো। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। কেন কাঁদলো তা সে বলতে পারে না। আমরাও বলতে পারবো না। তবে সে কাঁদতে লাগলো।

ধাড়াবাবু আর কিছু বললেন না, বলবার মতো কিছু খুঁজেও পেলেন না, স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। শ্রীমান্ গোপালকৃষ্ণ আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তাকে স্পর্শ করতেও কারো প্রবৃত্তি হোল না। কেবল তার মা তার হাতখানি চেপে ধরে কাছে টেনে নেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সে হাতখানি সরিয়ে তার মুখের দিকে জল-ভরা চোখ দু'টি একবার তুলে বেরিয়ে গেল।

তবে সে কোথাও গেল না, যাবার উপায়ও ছিল না। দিন-চারেক আগে পথে ইটে হোঁচট লেগে পায়ের আঙুল কেটে গিয়েছিল। তারই তাড়সে মাথা টিপ্ টিপ্ করতে করতে সন্ধ্যার পরই জ্বর এলো।

ডাক্তার এলেন, ওষুধ দিলেন। কিন্তু শ্রীমান্ গোপালকৃষ্ণ সেই রাত থেকে কয়টি কথা বার বার বলতে লাগলো, "এত নোংরা! এত নোংরায় নেমেছিস?"

এবং জীবনের শেষ নিঃশ্বাসটি পর্যন্ত ঐ কথা কয়টি বলতে বলতে চলে গেল। কাকে বলে গেল? নিজেকে অথবা বন্ধু-বান্ধবদের?

অ্যালসেশিয়ান রাখা, না হাতী-পোষা

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

মিস্টার রায়ের চাকুরীতে পদোন্নতি হয়েছে তাই যে নূতন কোয়াটার বা বাসাবাটি পেয়েছেন, তার চারপাশেই একালের সাহেবদের বাস। সবাই বড় চাকুরে—সবারই মোটরগাড়ি আছে, ফোন্ আছে—আর আছে কুকুর। শ্রীমতী রায়েরই কেবল কুকুর নেই তাছাড়া সবই আছে। মিসেস্ অ্যালভার আছে ডালমেশিয়ান- গায়ে ছোপ, দেখলে মনে হয় কে যেন নানা রঙের কালির দোয়াত ছুড়ে মেরেছে; মিসেস্ দ্বিবেদীর আছে ডাক্সহুন্ড—কান লোটা, লোম-ভরা দেহ, বেঁটেখাটো জীবটি; মিসেস্ চৌধুরীর আছে একটা লোমশ কুকুর—তার লোম গাছের পাতার মত কেয়ারি করে কাটা; কী বীভৎস দেখতে! কিন্তু তিনি মনে করেন তাতে তার রূপ ফুটেছে! মিসেস্ রায় দেখেন রোজই তাঁদের পাড়ার প্রায় সব বাড়ি থেকেই চাকর বা বেয়ারারা শিকলে-আঁটা নানা আকারের ও নানা রূপের কুকুর নিয়ে বেড়াতে বের হয় - কেবল তাঁরই ঘর অন্ধকার। চাকরটার কাজ থাকে না বিকালে—তাই সে পাড়ার বেয়রা-বাট্‌লারদের বেকার ছেলেদের সঙ্গে মার্বেল খেলে। শ্রীমতী রায়ের সাধ চাকরটা খাঁকি উর্দি পরে বিকালে কুকুর নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। সম্প্রতি শ্রীমতী রায় নূতন মোটর গাড়ি কিনেছেন। গবর্নমেণ্টের কাছে বহু বৎসরের দরবারের পর একটা খাস্ বিলাতী গাড়ি কিনতে পেরেছেন। তাঁর ইচ্ছা সেই গাড়িতে চড়ে অ্যালসেশিয়ান্ নিয়ে মিসেস্ কিম্পিনের বাড়ি ঘুরে আসেন। মিসেস্ কিম্পিনের সঙ্গে দেখা হলেই তিনি কুকুরের গুণগানে পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন। বাপ-মায়েরা প্রতিবেশীর সঙ্গে দেখা হলেই নিজেদের ছেলে-মেয়েদের গুণপনার ব্যাখ্যা করতে ভালবাসেন; কিন্তু মিসেস্ কিম্পিনের মুখ তাঁর অ্যালসেশিয়ানের গুণগানে ভরা! সে কথা শুনতে শুনতে মিসেস্ রায়ের ঐ রকম একটা কুকুর পাবার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠতে থাকে।

কিছুকাল থেকে মিঃ রায় 'স্টেটস্‌ম্যান' নিচ্ছেন—এতকাল বাংলা পত্রিকা পড়তেন; শ্রীমতী রায়ের অভিযোগ যে বাংলা কাগজে কেনেল বা কুকুরের বিজ্ঞাপন থাকে না। 'স্টেটসম্যানে' কুকুরের বিজ্ঞাপন দেখলেই স্বামীকে বলেন, 'শুনছো।' রায় বলেন, 'শুনেছি।' শ্রীমতী রায় বলেন, "কি শুনেছ।' উত্তরে মিঃ রায় বলেন, 'তুমি তো বলবে বিজ্ঞাপন দেখেছ - কুকুরের।' মিঃ রায় ছোটবেলা থেকেই কুকুর ভালবাসতেন; রাস্তার কুকুর তাকে দেখলেই যেন চিনতে পারতো—সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে এসে উঠতো। তখন তাদের জন্য রুটি, বিস্কুট, মুড়ি উজাড় করে দিত। তার ভাইরা তাকে বলতো, 'বাপ্পা, তুই বড় হয়ে একটা সারমেয় আশ্রম বা কুকুরের পিঁজরাপোল খুলিস—দেশের যত ভবঘুরে হ্যাংলা, রুগ্ন কুকুরদের আশ্রয় দিস।' বাপ্পা এখন বড় চাকুরে; এখনো পথ থেকে কুকুর ডেকে আনে, খাবার দেয়, বাল্যকালের অভ্যাসটা যেতে সময় লাগে। শ্রীমতী রায় সেটাকে অপব্যয়

বাড়াবাড়ি মনে করতেন ; বলতেন 'দেখছো তো চালের দাম! গমের দাম ও তো বাড়তির মুখে। এরকম করে রাস্তার কেলো, ভুলো, খেঁকি কোম্পানীদের রোজ ভাত দেওয়া সম্ভব?' কথাটা সত্য ; মিঃ রায় বুঝদার মানুষ, বললেন, 'ঠিক কথা – যে কাল পড়েছে!'

'স্টেটসম্যানে' একটা ভালো জাতের কুকুরের বিজ্ঞাপন দেখে শ্রীমতী রায় স্বামীকে বললেন, 'এটা দেখে আসলে হয় না?' মিঃ রায় বললেন, 'বিজ্ঞাপন দেখে কুকুর কিনলে অনেক সময়ে ঠকতে হয় ; আচ্ছা সমর সেনকে আমি এ বিষয়ে বলবো।' শ্রীমতী রায় বলে উঠলেন, 'তোমার সব কাজেই সমর সেন, সমর সেন! গাড়ি কিন্‌বে সমর সেন, টাই কিন্‌বে সমর সেন! -- দেখনা কাগজটা উলটে।' মিঃ রায় বললেন, 'কুকুর কেনার কাহিনী শুনবে? আমাদের এক শিক্ষক ছিলেন আদর্শবাদী, অতি ভদ্রলোক। তাঁর একটা গোশালা ছিল ; তাঁর ইচ্ছা একটা ভাল কুকুর পেলে গরু চরানোর সময়ে কাজে লাগতে পারে —যেদিক্-সেদিক্ পালিয়ে যেতেও পারবে না গরুগুলো। বিজ্ঞাপন দেখে কলকাতা থেকে এক কুকুর কিনে তো আনলেন। কুকুরের মালিক বলে, 'কিনুন, একটা পাহারাওয়ালার কাজ করবে মশায়, দেখে নেবেন!' আমাদের গ্রামে বিলাতী কুকুরের বাচ্চা এলো! সকলেই দেখতে আসে, দূর থেকে তারিফ করে, বলাবলি করে, 'ইঃ এটা বড় হলে একটা ডালকুত্তা হবে।' কেউ বলে, 'না গ্রেট্‌ডেন হবে।' কুকুর যে পয়সা দিয়ে কিনতে হয়, একথা আমরা গাঁয়ের ছেলেরা তখন জানতাম না। কারও বাড়ির আঁদাড়ে-পাঁদাড়ে যেটি যখন বাচ্চা দিত তখন সেগুলো নেবার জন্য সকলেই উৎসুক। যেমন বাচ্চাদের চোখ ফুটলো, মায়ের দুধ ছাড়লো অমনি পাড়ার ছেলেরা বাচ্চাগুলোর গলায় ফালি বেঁধে টানতে-টানতে নিয়ে গেলো। মাস্টার মশায়ের বিলাতী কুকুরের কী যত্ন! কিন্তু হায়, কয়েক মাস যেতে-না-যেতে কলকাতার 'বিলাতী' কুকুরের 'রূপ' খুলতে সুরু করে দিল! আমাদের গাঁয়ের নেড়ি-কুত্তাদের বাচ্চার মতোই হাল নেই কান খাড়া, খরখরে গায়ের চামড়া— নেই পাড়া-কাঁপানো ঘেউ ঘেউ ডাক কারণে-অকারণে। মাস্টার মশায় বললেন, 'বাব্বা, লোকটা ঠকালো! বল্‌লে জাত্ স্প্যানিয়েল!'

এই গল্পটুকু বলে মিঃ রায় চুপ করলেন, ভাবলেন, শ্রীমতী বিজ্ঞাপন দেখে কুকুর কেনা নিরাপদ না এটা বুঝেছেন। কিন্তু তিনি বললেন, 'দেখই না—বিজ্ঞাপনে ঠিকানা রয়েছে তো।' তিনি আরও বললেন, 'দামটা দেখেছ? এক জোড়া কুকুরের দাম আড়াই শ' টাকা বয়স তো চার সপ্তাহ মাত্র।' দামটা শুনে শ্রীমতী রায় দমে গেলেন।

দিন যায় এইভাবে। একদিন বন্ধু সমর সেন এলেন সস্ত্রীক—বিরাট পন্‌টিয়াক চড়ে সঙ্গে এক অ্যালসেশিয়ান্। এই রকমই তো চান শ্রীমতী রায়! কুকুর দেখে তো মুগ্ধ। মিসেস্ সেন খুব গল্পে - বাড়িতে একা থাকেন—সঙ্গী একমাত্র কুকুর। তাই বন্ধু-বান্ধবীর সঙ্গে দেখা হলে গল্প জমাতে

ভালবাসেন। বললেন, 'মিসেস রায়, একটা অ্যালসেশিয়ান যদি রাখেন তো, একটা দারবান র খার কাজ সে করবে। মিঃ সেন তো আজ দার্জিলিং চা-বাগিচায়, কাল ডিব্রুগড়, পরশু দিল্লী করে বেড়ান। চীবি (কুকুরের নাম) আছে বলেই তো আমি নিশ্চিন্ত। সারা রাত জেগে পাহারা দেয়। এমন শেখানো হয়েছে যে, কারও হাতে কিছু খাবে না; বিষ খাইয়ে যে মারবে তা সম্ভব নয়। জানেন তো—চোর এসেই কুকুরের সামনে বিষ দেওয়া মাংস ফেলে দেয়।'

গল্প শুনতে শুনতে মিসেস রায়ের একটা অ্যালসেশিয়ান পাবার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠলো। শুধোলেন, 'কি রকম খরচ পড়ে?' মিসেস্ সেন বললেন, 'একটা দ্বারবান রাখা থেকে অনেক কম।...এই ধরুন মাসে গোটা ষাট টাকা পড়ে খাবার খরচ। তবে এই সব কুকুর বড় সৌখীন—অসুখ-বিসুখ সহজেই হয় প্রায়ই ভেটেরিনারি ডাক্তার ডাকতে হয় ব'লে আমি তাঁর মাস-মাহিনা করে দিয়েছি।' কত মাস-মাহিনা লাগে সেটা জিজ্ঞাসা করতে শ্রীমতী রায়ের সাহস হলো না।

হঠাৎ একদিন শ্রীমতী রায় চিঠি পেলেন শাশুড়ীর কাছ থেকে—'বউ মা, কয়েকদিন আগে তোমার শ্বশুরমশাই কোথায় গিয়েছিলেন বক্তৃতা করতে। উঠেছিলেন এক বড় আফিসারের বাড়িতে। শুনলেন, গৃহকর্তার অ্যালসেশিয়ান-দম্পতী ছ'টা বাচ্চা দিয়েছে। ওঁর কি খেয়াল হলো বললেন, 'একটা পেলে হতো।' গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রী তখনই রাজী হয়ে গেলেন—অতগুলো জীবকে পোষা তো সোজা কথা নয়! সেদিন সন্ধ্যার সময় উনি সেই কুকুর ছানা নিয়ে মোটরে এসে হাজির। একটা ঝুড়ির মধ্যে ছোট একটা বাচ্চা—কয়েক দিন আগে চোখ ফুটেছে, মায়ের দুধ ছেড়েছে মাত্র। আমি তো প্রমাদ গুণলাম; বাড়ির কথা তোমার মনে আছে কি? লাট্টু আছে—লোকে বলে, 'বিলাতী কুকুর'—তার কোন্ পুরুষ যে বিলাতে ছিল জানি না। তিনি আছেন—তার সেবা করতে হয়। তাছাড়া একপাল মুরগী, এক ঝাঁক পায়রা, গোটা আট দশ হাঁস। এ সবের জ্বালায় অস্থির; তার উপর এই বাচ্চা কুকুরের ধকল সামলানো কি সোজা কথা! বাপ্পা তো ছোটবেলায় কুকুর ভালবাসতো—ওকে শুধিয়ে জানাবে তোমাদের কি ইচ্ছা।'...

মিসেস্ রায় শাশুড়ীর পত্রখানা পড়ে প্রায় লাফাতে-লাফাতে মিঃ রায়ের কাছে হাজির; 'ওগো, এতদিনে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। মা কি লিখেছেন পড়ো। বাবা কোথা থেকে এক অ্যালসেশিয়ান বাচ্চা পেয়েছেন, সেটা আমাদের দিতে চান। তুমি মত দিলে আমি লিখে দিই। না না, একটা টেলিগ্রাম করে দাও—যদি আবার কাউকে দিয়ে দেন!'

মিঃ রায় গম্ভীরভাবে বললেন, 'সেদিন তো শুনলে সমরের স্ত্রীর কাছ থেকে কী হাঙ্গামা অ্যালসেশিয়ান পোষা—হাতী পোষা।' শ্রীমতী রায় বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তোমার ঐ এক কথা!

খরচ খরচ খরচ! কতদিন থেকে একটা অ্যালসেশিয়ান পোষার সখ্—হাতের কাছে বিনা-পয়সায় এসে গেল এখন বলছো কিনা খরচয়ে কথা, হাঙ্গামার কথা!'

টেলিগ্রাম ও পত্র পেয়ে এক সপ্তাহ পরে শাশুড়ী এসে গেলেন—শ্বশুরও; কলকাতায় তাঁর কোথায় নাকি বক্তৃতা আছে। মিঃ রায়ের বৃদ্ধ পিতা বললেন, 'বাপ্পা, ছোট বেলায় তুমি কুকুর ভালবাসতে বলে ভাবলাম ওটা তোমাকেই দেবো। কিন্তু তোমার মা এই কয় সপ্তাহ আহ্লাদ দিয়ে কুকুর ছানাটার মাথা খেয়ে দিয়েছেন—এখন তোমাদের সামলাতে বেশ বেগ পেতে হবে।'

এই কথা শুনে বাপ্পার মা বললেন, 'হাঁ আহ্লাদ আমি একাই দিয়েছি; আহ্লাদ দিয়েছে সকলেই, হ্যাপা সামলিয়েছি আমি একা। প্রথম যে রাতে এলো—সে কী কান্না 'মা মা' করে! আমি কোলের মধ্যে নিয়ে রাখি। সেই থেকে ও আমাকেই চিনলো আব্দার, উৎপাত সবই আমাকে নিয়ে।'

হ্যাপাটা যে কি তা মিঃ ও মিসেস্ রায়ের কারও জানা ছিল না। পথের কুকুরকে খাওয়া-দেওয়া ও ঘরে অ্যালসেশিয়ান পোষা এক জিনিস নয়। চব্বিশ ঘণ্টা যেতে-না-যেতে অ্যালসেশিয়ান নন্দিনীর আসল রূপটি প্রকাশ পেলো। মার্বেল পাথরের মত চকচকে মোজাইক মেঝের উপর ছোট-বড় সকল রকম অপকর্ম নির্লজ্জভাবে করে তিনি বেড়াতে লাগলেন। শ্রীমতী রায়ের এই দিকটার কথা মনেই হয়নি। যাই হোক,—কি করা যায়, কি করা যায়—ব'লে যখন সকলেই ব্যস্ত, বাপ্পার মা সমস্ত সাফ করে এসে বললেন, 'আমার এই কয়দিনে অভ্যাস হয়ে গিয়েছে।'

সেদিন সন্ধ্যায় মজলিশ বসলো—এর একটা নামকরণ করতে হবে। নামাবলী তৈরী হলো—অবশেষে সর্বসম্মতিক্রমে নাম দেওয়া হলো 'অ্যালসি'। কলকাতায় আসার পর অ্যালসিকে শিকল দিয়ে বাঁধা হলো, বাপ্পা নিউ মার্কেট থেকে 'বডি বাক্‌লস্' কিনে আনলেন; গলায় বকলস্ দেওয়া উচিত নয় ব'লে এই নূতন সজ্জা কিনে আনা।

একদিন মিঃ রায় সমর সেনের পরামর্শে তাদের বন্ধু মিঃ সান্থু মিত্রের বাড়ি গেলেন। সান্থু মিত্র সে-পাড়ার সারমেয়-আচার্য! বড় সাহেবী অফিসের বড় চাকুরে—কুকুর পোষাটা তাঁর সৌখীন সখ। বাড়িতে একপাল কুকুর গ্রেট ডেন্ থেকে পুডুল পর্যন্ত। এদের নিয়ে তাঁর অবসর সময় কাটে। কলকাতার ডগ-শো বা কুকুর-প্রদর্শনীতে সেরা সেরা প্রাইজগুলো সান্থু মিত্রের কুকুরদের জন্য যেন একচেটিয়া।

সান্থু মিত্রের সঙ্গে বাচ্চা অ্যালসেশিয়ান তদারক করার নিয়ম সম্বন্ধে কথাবার্তা কয়ে বাপ্পা এসে স্ত্রীকে বললেন, 'শুনেছ, সান্থু মিত্র বললেন, প্রথম ছ'মাস অ্যালসিকে ছেড়ে রাখতে হবে—যেমন শিশু থাকে বাড়িতে। ওকে বাঁধা চলবে না। ধমক দেওয়া, চেঁচিয়ে কথা বলা নিষেধ।'

অ্যালসি মুক্ত হলো শিকল-বন্ধন থেকে। মুহূর্তের মধ্যে শোনা গেল ড্রয়িং রুম থেকে হুড়মুড় শব্দ—কি একটা ভারী জিনিস যেন পড়লো, ও খান্‌খান্‌ হয়ে গেল! সকলে ছুটে ঘরে গেল। গিয়ে দেখল মনিপ্ল্যাণ্ট ছিল একটা ভাল টবে—সেটা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে ও অ্যালসি মন দিয়ে মনিপ্ল্যানণ্টের পাতা-লতা চিবচ্ছে! ধর-ধর-ধর । কে কাকে ধরে! রান্নাঘরে গিয়ে বালতির মধ্যে দুই পা ডুবিয়ে জল খেয়ে নিচ্ছে! সর্বনাশ, এই জলটা নিচের কল থেকে আনা—অন্য সব জল উপরের ট্যাংক থেকে আসে! ঐ ভাল জলটা কুঁজোয় ঢালার জন্য আনা হয়েছিল। জলটা খেয়েই অ্যালসি উধাও।

অ্যালসেশিয়ানটা মনিপ্ল্যান্টের লতা-পাতা চিবোচ্ছে!

রাঁধুনী চীৎকার করে শুধোয়, 'মেমসাহেব, বেগুনের তরকারি করতে বললেন—অথচ বেগুন বের করে দিলেন না!' মিসেস্‌ রায় বললেন, 'কেন, এই তো বেগুন, আলু সব গুণে-গেঁথে রেখে এলাম—যাবে কোথায়?' হঠাৎ বেয়ারাটা বললে, 'মেমসাহেব, দেখুন আপনার অ্যালসির কাণ্ড!'. সকলে গিয়ে দেখেন অ্যালসি বেগুনটা তার দুই থাবা দিয়ে ধরে কামড়ে খাবার চেষ্টা করছে।… ধর-ধর-ধর…কিন্তু কে কাকে ধরে! ড্রয়িং রুমে কৌচের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে—ওকে বাঁধবে

না, ধরবে না, বাধা দেবে না বলেছেন—সাহু মিত্র। মিসেস্ রায় বলেন আপন মনে, 'সমর সেন ও সাহু মিত্র যা বলবে তাই ওঁর কাছে বেদবাক্য!'

একদিন সকালে শ্রীমতী রায় বারান্দায় বসে গভীর মনসংযোগ করে ছেলের কোর-গণিতের সামস্যা পুরণ চেষ্টা করছেন, এমন সময়ে পিছন থেকে মাথার চুলে ভীষণ টান—চেঁচিয়ে উঠে বললেন, 'ওগো শীগগির এসো, এসো, গেলাম! অ্যালসি কী করছে—বাঁচাও আমাকে।' মিঃ রায় এসে দেখেন, অ্যালসি শ্রীমতী রায়ের যে সূক্ষ্ম বেণীটুকু চেয়ারের পিছনে লম্বমান ছিল, সেইটা প্রাণপণে টানছে। ভাবছে, কয়দিন পূর্বে গিন্নীমার চুল থেকে টেনে যেমন ফিঁতেটা বের করে নিয়েছিল, আজও তাই করবে; কিন্তু আজ ফিঁতে নয়, আজ মূলে টান পড়েছিল—বেণীর সঙ্গে মাথা যাবার মতো হয়েছিল। মিঃ রায় এসেই একটা বল্ ছুঁড়ে দিলেন—অ্যালসি চুল ছেড়ে বল-এর দিকে ছুটলো। ইতিমধ্যে ছ'টা বল্ চিবিয়ে ফুটো করেছে—ঢ্যাপ্ ঢেপে বল পছন্দ হয় না—লাফানো বল্ চাই তার।

দিন যাচ্ছে এই ভাবে। বাড়িটাতে সবাই তটস্থ, কখন কী কাণ্ড করে বসে অ্যালসি। একদিন দেখা গেল মিসেস্ রায়ের 'গীতবিতান' খানা খুলেছে—উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই গান করা নয় পাতা ছেঁড়ার মতলব—বেয়ারা এসে বইটাকে উদ্ধার করে কোন রকমে। বই নিলে, বেশ—তবে মাদুরটা ছিঁড়বো! মাদুরও কেড়ে নিল—আচ্ছা অত জোড়া জুতো কোথায় রাখবে? ভেলভেটের স্যানডেলের একপাটি নিয়ে খোকনের বিছানার উপর বসে তার স্বাদ গ্রহণের চেষ্টা চলছে। ধর-ধর-ধর কে কাকে ধরে!

বিকালে রায় সাহেব অফিস থেকে এসে চা খাচ্ছেন—শ্রীমতী রায় অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে এসে বললেন, 'এ তো হাতী পোষা শুধু নয়—একটা নেকড়ে বাঘ ঘরের মধ্যে ছেড়ে রাখা কি সহজ ব্যাপার! সব তচনচ করে দিল! অমন প্রবালগুলো মিঃ আপ্তে দিয়েছিলেন আন্দামান থেকে এনে—সেগুলো চিবিয়ে গুঁড়ো করে রেখেছে! দেখেছো একবার? মা তো গতিয়ে দিয়ে নিষ্কৃতি পেয়েছেন—সাহু মিত্র ফতোয়া দিলেন—বাঁধবে না, ধরবে না, মারবে না! এখন সামলাও!' যেন সামলাবার দায় মিঃ রায় নিয়েছিলেন, আর অ্যালসিকে আনবার জন্য যেন তিনিই দায়ী! মিঃ রায় চুপচাপ মানুষ—সারা দিনের অফিসের হাড়ভাঙা খাটুনীর পর চা'টার স্বাদ একেবারে বিস্বাদ হয়ে গেল। হঠাৎ ড্রয়িং রুমে কিসের দুম-দাম শব্দ। মিসেস্ রায় ছুটে গেলেন ঘরের মধ্যে; একটু পরেই ফিরে এসে বললেন, 'রাগও হচ্ছে, হাসিও পাচ্ছে—কাণ্ডখানা দেখবে চলো! তোমার সেই লেডী পামার আর বিগনভেলীয়া যা সযত্নে পালন করছিলে সেই গাছ ছিঁড়ে-কেটে একাকার করেছে! আর তো পারা যায় না!'

মিঃ রায় ধীরভাবে বললেন, 'তা'হলে বাবাকে লিখে দাও, ফিরিয়ে নেবার জন্যে—তাঁর যাকে খুশি দিতে পারেন।'

পড়ার ঘর থেকে ছেলে সেই কথা শুনে উঠে এলে ; বললে, 'খুব ভাল কথা। দাদাই-এর কাছেই পাঠিয়ে দাও। আমিও তো তাঁর কাছে থেকেই কলেজে পড়বো। সেখানে সাইকেলে বেড়াবার কত জায়গা - কত রকমের গাছ—আম, কাঠাল, কুল, জাম, আতা, পেয়ারা। আমি, বুলটুন, অ্যালসি ও বলু - চারজনে খেলা করবো মাঠে। দাদাই-এর কাছে ফেরত পাঠাও - সেটাই ভালো হবে।'

মিঃ রায় বললেন, 'আজ অ্যালসিকে 'ভেট্'-এর কাছে নিয়ে যেতে হবে। তিনি ওকে পরীক্ষা করে দেখবেন।' মিসেস্ রায় শুধোল, 'ঐ গো-বদ্যির ফী কতো ?' মিঃ রায় বললেন, 'বারো টাকা, তাঁর ক্লিনিকে নিয়ে গেলে—আর ঘরে আনলে সতেরো টাকা। তবে সমর বলেছে, একটা মাসিক ব্যবস্থা হতে পারে।'

মিসেস্ রায় বললেন, 'তাই নাকি ? এ তো দেখছি সত্যিই হাতী পোষা !'…

খেলাঘরের রাজ্যে

শিল্পী : শ্রীসীতেশ রায়
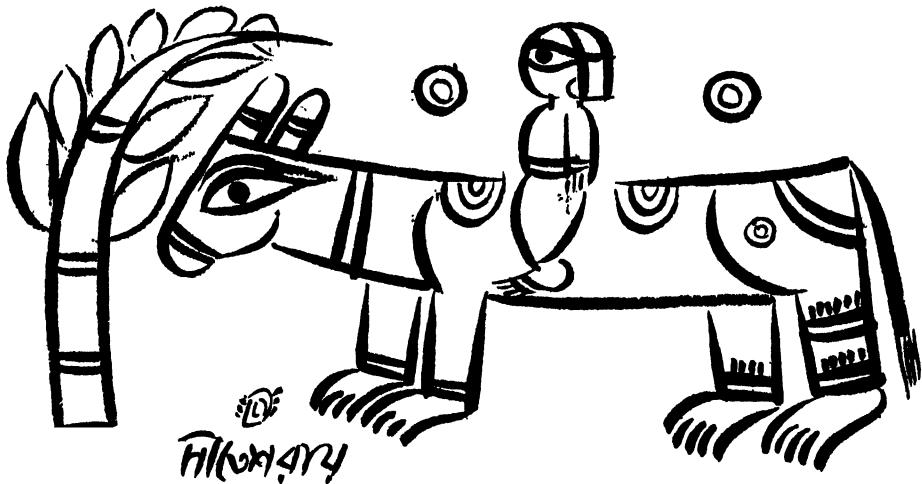
একটি বাড়ীর কথা

শ্রীসুপর্ণা মুখোপাধ্যায়

আমি একটি পুরাতন বাড়ী। নিজের কথা সবার সামনে তুলে ধরবার আগে মনে হলো—এ বোধ হয় আমার স্পর্ধা। আমার মতো প্রাচীনের কথা তোমরা নবীন—তোমাদের কেন ভাল লাগবে? কিন্তু তবু আমার মন থেকে দুর্বার কামনাকে বিতাড়িত করতে পারলুম না। মনকে কত বোঝাবার চেষ্টা করলুম,—এসব তোমার স্পর্ধা…কেন তুমি তোমার অহংকার দেখাচ্ছ?—কি আছে তোমার? সত্যই আজ আমার যে দশা সেই দশা, দেখলে কেউ বিরক্তি প্রকাশ করেন, আবার কেউ সমবেদনা জানান।

আমার পাশেই উঠেছে নতুন একটা ফ্ল্যাট বাড়ী। সেই ফ্ল্যাট বাড়ী আমার দিকে ঝকঝকে চেহারা নিয়ে বিদ্রূপ ভরে তাকিয়ে আছে। মনে হয় সব সময় যেন সে আমাকে বিদ্রূপের বাণে বিদ্ধ করছে! দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি চোখ অন্য দিকে ফেরাই। আমার চুন-বালি-খসা, ইট বার করা দেহের দিকে তাকিয়ে রাগ হয়। কিন্তু ভগবানের ওপর তো আর হাত নেই…তাই অগত্যা চুপ করে থাকি।

আমি আছি একটি গলির মধ্যে। আমার চারিদিকে অনেক নূতন-পুরাতন বাড়ীর সারি ও মাঝে মাঝে কয়েকটা ছোটখাট দোকান। আমার পায়ের কাছে একটা পানের দোকান। ক'বছর আগে সামান্য কিছু সিগারেট, দেশলাই আর পানের সরঞ্জাম নিয়ে দোকানী এসে বসেছিল আমার রকের উপর। তারপর ধীরে ধীরে বহু পরিশ্রমে গড়ে তুলেছে এমন সুন্দর ঝকঝকে দোকানটি। দোকানের কতই না পরিচর্যা…কতই না আদর। আমার এই ভগ্নদশার মধ্যে তার চেহারা সহজেই মানুষকে আকর্ষণ করে। আমার মালিক থাকেন কাছেই একটা বাড়ীতে।

আমার এই জীর্ণ বুকে বাস করেন এক মধ্যবিত্ত পরিবার। তাঁরা প্রায় পঁচিশ বৎসর আছেন এখানেই। স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-পুত্রবধূ ও একমাত্র পৌত্রী। সুন্দর পরিবার—এমন শান্তি-কামী পরিবারের দেখা সহজে মেলে না। শিল্পীর, স্রষ্টার বাসভূমি হলাম আমি। কারণ গৃহস্বামী একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। আমার এই জীর্ণ দশায় আমার মনে হয় এঁরাই আমার মস্ত সহায়। আমার বুকে আমি এক অদ্ভুত আনন্দ অনুভব করি।

এই বিশ্ব-সংসারে কোন কিছুই চিরদিনের নয়—সবই একদিন সৃষ্টি হয়, আবার আরেক দিন কোথায় বিলীন হয়ে যায়। যখনই উন্নতি হয়, তখনই জানা থাকে যে পতন আছে,—সংযোগ সাধন

হলেই বিয়োগের আশঙ্কা দেখা দেয়। আবার জন্ম নিলেই মনে হয়, মৃত্যু আছে। আনন্দ যখন মনের মধ্যে তীব্রভাবে জেগে ওঠে, তখন মনে হয় এই আনন্দও চিরদিনের নয়। পৃথিবীর অন্য সকল সুখের মতো এই আনন্দও ক্ষণস্থায়ী। বৃথা শ্রম করে একে বাধা দেওয়া যায় না। যা যাবার, যাবেই—যা হবার হবেই।

তেমনি আমার জীবনেও সুখের সময় বেশীদিন স্থায়ী হলো না। যাদের বুকে নিয়ে আমি পরম সুখে আমার দুঃখের কথা—আমার এই শোচনীয় পরিণতির কথা ভোলবার চেষ্টায় ছিলাম, মাত্র কয়েকমাস আগে তা ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

গৃহস্বামীর আদরিণী পৌত্রী সুমিত্রা জন্মগ্রহণ করেছে আমারই কোলে। তাই তার ওপর আমার একটা স্নেহ-ভালবাসা জেগে উঠেছিল। আজ বিশ বৎসর তাঁর সঙ্গে আমি যেন এক গাঢ় আত্মীয়তার বন্ধনে জড়িয়ে পড়েছিলাম।

যেদিন তাঁরা আমায় ছেড়ে চলে গেলেন, সেদিন আমি অসীম নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললুম। মনে মনে বললুম, এ কী করলে ভগবান! যাঁদের উপর নির্ভর করে আমি এই জগৎ-সংসারে অন্যান্যদের মতো দাঁড়িয়েছিলাম, তাঁদের আমার কাছ থেকে তুমি কোথায় সরিয়ে দিলে? তাঁরা আমার মালিক নন···আমার সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক নেই। তবু আমার তাঁদের প্রতি ছিল একটা অস্বাভাবিক টান।

আমার বেশ মনে আছে যেদিন ওরা চলে যাচ্ছেন সেদিনের কথা। সকাল থেকেই আমার সামনে পথে লরী দাঁড়িয়ে। একের পর এক মালপত্র তোলা হচ্ছে। সুমিত্রা তত্ত্বাবধান করছে নীচে দাঁড়িয়ে তার বাবার সঙ্গে। গৃহিণী আর সুমিত্রার মা অন্যান্য মালপত্র বাঁধার কার্যে লিপ্ত। আমি তাকিয়ে আছি তাঁদের দিকে অনিমেষ নয়নে। কেবল মনে হচ্ছে আর মাত্র কয়েক মুহূর্ত আছেন এঁরা আমার সঙ্গে। তারপরে চলে যাবেন—কোথায় কোন অজানা ঠিকানায়!

অবশেষে সেই যাবার মুহূর্ত এসে গেল। সুমিত্রা আর পারলে না নিজেকে সামলে রাখতে। তার বিশ বৎসরের স্মৃতি চোখের সামনে একের পর এক ফুটে উঠতে লাগলো। তার মনে হচ্ছিল, সমস্ত ইট-কাঠ, কড়ি-বরগা, দরজা-জানালা তার নিজের আর কারো অধিকার নেই তাতে। গৃহিণীও আর পারলেন না তাঁর মনের ভাব চেপে রাখতে। ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো তাঁর চোখ থেকে। এই বাড়ীর সঙ্গে তাঁর কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে···কত মধুর স্মৃতি! সেইসব স্মৃতিকে ভুলে যাওয়া কি কখনো সম্ভব? কেউ কি পারে তাদের সহজেই ভুলে যেতে? নিজের হাতে তিনি বাগানে লাগিয়েছিলেন—পেয়ারা, আতা, চামেলী, গন্ধরাজ প্রভৃতি কত ফুলফলের গাছ। তাদের ছেড়ে যাওয়াও আমাকে ছেড়ে যাওয়ার মতই তাঁর কাছে বেদনাময় মনে হতে লাগলো।

রাত্রি আটটার সময় সবাই চলে গেলেন আমাকে ছেড়ে—কিন্তু হায়, কেউ কি তখন জানতে পেরেছিলেন যে, মূক প্রাণহীন জড় পদার্থ ইট-কাঠ, কড়ি-বারান্দা একটা বাড়ীও তাঁদের জন্য চোখের জল ফেলছে—তাঁদের জন্য বেদনা অনুভব করছে! কেউ পারেন নি সে কথা ভাবতে! সবাই মনে করেন যে আমার মতো প্রাণহীন পদার্থের আবার অনুভূতি আছে নাকি? কিন্তু হ্যাঁ, আমারও সকলের মতন ভাববার মন রয়েছে। সে মন এতো সূক্ষ্ম যে সাধারণের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না!

অভিনব দৃশ্য

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

কাল দুপুরে অঙ্ক যখন করছিলাম এক রোখে
দেখলাম যা দৃশ্য ভজা, বলব কি আর তোকে?
ম্যাজিক, ম্যাজিক! হঠাৎ কখন পড়ার ঘরে এসে
মিষ্টি রেখে গেছে কে রে একটি থালা ঠেসে!
চুলোয় যাক এই সরল করা; প্রথম গবাগব—
চালান করি পেটের ভিতর একটা করে সব।
প্যান্তো-প্যাঁড়া-রসগোল্লা খাবার কত কি যে—
তোকে কি আর বলবো, ভজা, দেখছিস্ তো নিজে।
হ্যাংলা-হুতোম তুই সেখানে ঠিক ছিলি ওত পেতে
রসগোল্লা প্রথম যেন দেখলি জীবনেতে।
কাজে কাজেই একটু ভেঙে শেষেরটা থেকেই
দিলাম তোকে; নেমকহারাম, এখন মনে নেই?
চক্ষু দুটি বুজে আমি দেখলাম যা কাল—
দু'চোখ মেলেও তোর কাছে তার মিলবে না নাগাল।

টপ সিক্রেট

বিক্রমাদিত্য

এ লেখা সত্যি ঘটনা—বাড়িয়ে বলছি না।

ফ্রান্সের রাজধানী পারীতে খুব ধুমধাম সুরু হয়েছে। আজ বাদে কাল মস্তো বড়ো কনফারেন্স হবে। আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড এবং রাশিয়ার বড়ো কর্তারা এই কনফারেন্সে যোগ দিতে এসেছেন। আইসেনহাওয়ার ম্যাকমীলান এবং ক্রুশ্চেভ। পুলিশ কর্তৃপক্ষ সতর্ক হয়ে আছেন। সব দিকেই তীক্ষ্ণ নজর। হুঁসিয়ার না থাকলে বিপদ ঘটতে পারে। সাংবাদিকরা এই কনফারেন্স নিয়ে অনেক গবেষণা করছেন। এ তো চাট্টিখানি কথা নয়! একেবারে 'সামিট কনফারেন্স'।

বছর এবং তারিখ উল্লেখযোগ্য ১৯৫৮ খৃঃ, বারোই মে।

কিন্তু কনফারেন্স শুরু হবার আগে ক্রুশ্চেভ বলে বসলেন। বললেন, আমেরিকা এবং আইসেনহাওয়ার যদি তার কাছে ক্ষমা না চায় তবে তিনি এই সামিট কনফারেন্সে যোগ দেবেন না।

চারদিক সোরগোল পড়ে গেলো। কী ব্যাপার—ক্রুশ্চেভ এমন দাবী করলেন কেন। আইসেনহাওয়ার নীরব। ম্যাকমীলান সাহেব ছুটোছুটি শুরু করলেন। সামিট কনফারেন্স ভেঙে যাওয়া তো চাট্টিখানি কথা নয়। সাংবাদিকরা সংবাদের লোভে চতুর্দিকে ঘুরতে লাগলেন। সবার মুখে এক কথা ক্রুশ্চেভ এমন দাবী করছেন কেন।

কিছুক্ষণ বাদে খবরটা আরো স্পষ্ট করে খুলে বললেন ক্রুশ্চেভ। তিনদিন আগে রুশ দেশের বুকের উপর দিয়ে আমেরিকার গুপ্তচর বিভাগের একটি প্লেন উড়ে গিয়েছে। কিন্তু প্লেনের যন্ত্র হঠাৎ বিগড়ে যাওয়ায় পাইলট বাধ্য হয়ে নেমে পড়ে। রাশিয়ার মিলিটারী ঘাটিগুলোর ফটো নিতে যাচ্ছিলো এই প্লেন, কিন্তু এ-যাত্রায় ফটো নেয়া তার হয়নি। পাইলট রুশ দেশের পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে যে, সে আমেরিকার স্পাই।

ব্যস আর কথা নেই। ক্রুশ্চেভ বললেন যে, আমেরিকা তার দেশের ভেতর স্পাই পাঠাচ্ছেন। তাদের কাজ হচ্ছে সামরিক ঘাটির ফটো তোলা। বহুদিন ধরে এই স্পাই-এর কাজ চলছে। এই স্পাইং বন্ধ করতে হবে এবং আইসেনহাওয়ারকে ক্ষমা চাইতে হবে।

আইসেনহাওয়ার স্বীকার করলেন যে আমেরিকার গুপ্তচর বিভাগ সেণ্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সী রাশিয়ার ভেতর প্লেন পাঠাচ্ছে. কিন্তু তার জন্যে দুঃখ প্রকাশ তিনি কখনই করবেন না। অতএব সামিট কনফারেন্স ভেঙে গেলো। নেতারা যে-যার দেশে ফিরে গেলেন। এই হলো বিখ্যাত স্পাইং প্লেন ইউ-টুর কাহিনী।

এবার প্লেন ও সেই স্পাইং-এর বিস্তারিত কাহিনী। কিন্তু এ-কাহিনী শোনাবার আগে একটু অতীতের কাহিনী বলার দরকার।

বেশ কিছুদিন আমেরিকার এয়ার ফোর্স এবং সামরিক বিভাগের কর্তারা একটু বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। অতো বড়ো রাশিয়া তার কোথায় কোন সামরিক ঘাটি আছে কিছুই তাদের জানা নেই। কোথায় সামরিক অস্ত্র বানাবার কারখানা, কোথায় কোন যন্ত্রপাতি বসানো আছে সবই তাদের অজ্ঞাত। যুদ্ধ লাগলে রুশ দেশে প্লেন নিয়ে হানা দেবার কোন সম্ভাবনা নেই। আমেরিকার কর্তারা ভাবনায় যখন ব্যাকুল, তখন আমেরিকার এয়ার প্লেন বানাবার বিখ্যাত লকহেড কোম্পানী খবর দিলে যে, তারা এমনি এক প্লেন আবিষ্কার করেছে যা আকাশে প্রায় একলাখ ফুট উঁচু অবধি উঠতে পারে। এতো উঁচু থেকে মাটির গায়ে যে সব জিনিস আছে সব কিছুরই ফটো তোলা যায়। শুধু একটা বোতাম টিপে দিলেই হলো। চমৎকার ফটো উঠে আসবে। এমনকি পিঁপড়ের ছবিও এতো উঁচু থেকে নেয়া যায়। এই প্লেনের নাম হলো ইউটিলিটি টু বা সংক্ষেপে 'ইউ টু'।

ভারী চমৎকার প্লেন ইউ-টু। এ প্লেনে টারবো জেট ইঞ্জিন - কেরোসিন তেল দিয়ে চালান হয়। প্লেনের সবই ভালো ছিলো শুধু মাঝে মাঝে আকাশের বুকে এর কল বিগড়ে যায় এবং ইঞ্জিনের ভেতর বন্ধ হয়ে যায়! অবশ্যি এতে ভাবনার বিশেষ কিছুই নেই। কারণ যখনই এই বিপদ ঘটে, তক্ষুনি ত্রিশ হাজার ফুট নীচে নেমে আসতে হয়। তারপর ইঞ্জিন চালু করে দিলে আর কোন ভাবনা থাকে না। সাধারণতঃ নব্বুই হাজার বা একলাখ ফুটে উঠলে এই বিপদ দেখা দিতে পারে। এই যে ইঞ্জিন বিগড়ে যাওয়া, একে বলা হয় ফ্লেম আউট। সাধারণতঃ অক্সিজেনের অভাবে এই ফ্লেম আউট হয়। আর এই ফ্লেম আউটকে ভিত্তি করেই আজকের গল্প।

* * *

আমেরিকার সৈন্য বিভাগের কর্তারা এই প্লেনের খবর পেয়ে তো মহা খুশি। এবার আর কোন ভাবনা নেই। কারণ এখন থেকে নিশ্চিন্ত মনে রুশ দেশের গুপ্ত সামরিক ঘাটি এবং কলকারখানার ছবি তোলা যাবে। এক লাখ ফুট উঁচুতে গিয়ে রুশ ফাইটার প্লেন ধাওয়া করতে পারবে না। কারণ, অতো উঁচুতে কোন ফাইটার প্লেন যেতে পারে না। তারপর এ্যান্টি-এয়ার-ক্রাফটের গুলী পৌঁছবারও কোন সম্ভাবনা নেই। এবার 'ইউ টু'কে রোখে কে?

'ইউ টু' প্লেন আবিষ্কারের কথা ক্রমে ক্রমে আমেরিকার সেণ্ট্রাল ইনটেলিজেন্সের কর্তা এ্যালান ডালেসের কানে গেলো। এ্যালান ডালেস হলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ফষ্টার ডালেসের ভাই —আমেরিকার গুপ্তচর বিভাগের সর্বময় কর্তা। এ্যালান ডালেস ঠিক করলেন যে, এই ইউ টু দিয়ে

সমস্ত বড়ো বড়ো সামরিক ঘাটি এবং নৌবন্দরগুলোর ফটো তুলতে হবে। যেমনি ভাবা অমনি কাজ সুরু হয়ে গেলো।

* • *

তোমরা জানো নিশ্চয়, যে পৃথিবীর বহু জায়গায় আমেরিকার সামরিক ঘাটি আছে। এদের মধ্যে তুর্কীর ইন্‌সিরলিক এবং পাকিস্থানের পেশোয়ারের ঘাটি উল্লেখযোগ্য। কারণ আজকের ঘটনা এই দুই সামরিক ঘাটিকে নিয়ে। প্লেন তো আবিষ্কার হলো এবার পাইলট চাই। কিন্তু সবাইকে বলা যায় না যে কাজটা হলো স্পাইং। তাই কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়া হলো, যে আকাশে বায়ুর স্তর নিয়ে গবেষণা করার জন্যে পাইলট চাই। এই যে বায়ুমণ্ডলী এই দিয়ে আমেরিকার ন্যাশনাল এ্যাডভাইসরী কমিটি ফর এরোনটিক্সের কর্তারা বিস্তর গবেষণা করেন। সেই কাজের জন্যে পাইলটের দরকার স্পাইং র ভাগায় এ কাজকে বলা হয় 'কভার'। অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলী পরীক্ষার ভান করে উঁচু আকাশে উঠে সামরিক ঘাটির ছবি তুলে নেওয়াই হলো আসল কাজ।

এ কাজের জন্যে বিস্তর পাইলট মিলে গেলো। কিন্তু কাউকে বলা হলো না যে আসল কাজটা কী। সবাইকেই একটা ম্যাপ দিয়ে বলা হতো যে, অমুক রাস্তা দিয়ে প্লেন নিয়ে যাও আর অমুক অমুক জায়গায় প্লেনের একটা বিশেষ বোতাম টিপে দাও। প্রতিটি প্লেনের নীচে আটটি করে ক্যামেরা বসানো থাকতো। এই সব ক্যামেরা দিয়ে সমস্ত সামরিক ঘাটির ফটো তোলা হতো। কিন্তু এই সব পাইলটের মধ্যে একজনের নাম উল্লেখযোগ্য এবং আজকের এই কাহিনীর নায়ক হলো সেই পাইলট। তার নাম হলো—গাই পাওয়ার।

* * *

গাই পাওয়ার কিন্তু অতি সামান্য ঘরের ছেলে। বিস্তর পয়সা খরচ করে তার বাবা তাকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। তার বাবার বড্ডো আশা ছিলো যে পাওয়ার বড়ো হয়ে ডাক্তার হবে। কিন্তু পাওয়ার হলো প্লেনের পাইলট। প্রথমে এয়ার ফোর্সে যোগে দিলে পাওয়ার। কিন্তু কিছুদিন বাদেই সেই চাকুরী ছেড়ে দিলে। তার আকাঙ্ক্ষা আরো উঁচু। আরো বড়ো হবে গাই পাওয়ার। সবেমাত্র পাওয়ার বিয়ে করেছে। তাই পয়সার প্রয়োজন। এমন সময় গাই পাওয়ার কাগজে বিজ্ঞাপন দেখতে পেলো যে আকাশের বুকে উঠে বায়ুমণ্ডলী নিয়ে পরীক্ষা করার জন্যে ন্যাশনাল এডভাইসরী কমিটি ফর এরোনটিক্সদের কার্তারা পাইলট খুঁজছেন। বিস্তর মাইনে—মাসে আড়াই হাজার ডলার। মানে, মাসে প্রায় বারো হাজার টাকা। টাকার লোভ সামলাতে পারল না গাই পাওয়ার। এই চাকুরীর জন্যে দরখাস্ত করলে। দরখাস্ত পেশ করার সঙ্গে সঙ্গে চাকরী মিলে গেলো।

আসল কাজটা যে স্পাইং এ-কথা কিন্তু গাই পাওয়ার প্রথমে জানতো না। শুধু সতর্ক করে দেয়া হলো যে, কেউকেই এ কাজের কথা যেন না বলে। এইসঙ্গে আরও জানানো হলো যে, তার কাজের ঘাটি হবে ইন্‌সিরলিক বিমান বন্দরে। সেইখানে গেলো পাওয়ার, প্রতিদিনই ইউ টু প্লেন নিয়ে আকাশের বুকে ওঠে গাই পাওয়ার আর বায়ুমণ্ডলীর সম্বন্ধে বিস্তর খবর নিয়ে আসে। কয়েক দিন বাদে পাওয়ারের স্ত্রী এসে ইন্‌সিরলিক বিমান বন্দরের কাছে একটা বাড়ী নিয়ে সংসার পাতলেন। এমনি করে প্রায় দু'বছর কেটে গেলো। উল্লেখযোগ্য এমন কিছুই ঘটলো না। সবাই জানে যে পাওয়ার বায়ুমণ্ডলীর গবেষণার কাজে ব্যস্ত। পাওয়ার যে সেণ্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সীর গুপ্তচরের কাজ করছেন একথা কেউ জানতো না।

* * *

১৯৬০ সালের ২৭শে এপ্রিল।

বিকেল সন্ধ্যা ছ'টার সময় পাওয়ার এসে স্ত্রীকে বললো যে, তার জন্যে বেশ ভাল লাঞ্চ তৈরী করতে। ভাল লাঞ্চ তৈরী করতে বলার মানেই হলো, পাওয়ার দু'দিনের জন্যে আবার গবেষণার কাজে বেরুবে।

সেদিন রাত্রে পাওয়ার আমেরিকান এয়ার ফোর্সের ট্রান্সপোর্ট প্লেনে করে পেশোয়ারে চলে এলো। তার সঙ্গে সি-আই-এর কর্তা কর্নেল শেলটনও ছিলেন। লকহেড কোম্পানীর এক বিশেষ পাইলট 'ইউ টু' প্লেন নিয়ে পেশোয়ারে চলে গেলো।

গাই পাওয়ার কিন্তু তখনও টের পাননি যে, স্পাইং-এর কাজে কয়েক দিনের মধ্যেই তাকে রাশিয়ার বুকের উপর দিয়ে 'ইউ টু' প্লেন নিয়ে যেতে হবে।

পেশোয়ারে বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেলো নিশ্চিন্ত মনে। প্লেন নিয়ে উঠবার কোন আয়োজনই হয়নি। হঠাৎ একদিন ওয়াশিংটন থেকে ডালেস সাহেব খবর পাঠালেন যে, রাশিয়ার আবহাওয়া চমৎকার 'ইউ টু'র কাজ আরম্ভ করা হোক।

কর্নেল শেলটন গাই পাওয়ারকে ডেকে পাঠালেন। এবার তাকে সমস্ত কাজের কথা খুলে বলা হলো। বলা হলো যে, ইউ টু প্লেন নিয়ে তাকে রাশিয়ার বুকের উপর দিয়ে যেতে হবে। ম্যাপে দেখানো হলো আরচাঞ্জেল এবং মুরমানস্ক শহর। তারই বুকের উপর দিয়ে পোওয়ারকে যেতে হবে। সেইখানে রুশ দেশের দুটো বড়ো সামরিক ঘাটি আছে। সেই সব ঘাটির ফটো তোলা চাই। অবশ্যি পাওয়ারের গন্তব্যস্থল হলো নরওয়ের বোদে বিমানঘাটি। সেইখানে আমেরিকার বিমান-ঘাটি আছে। কর্নেল শেলটন এবার পাওয়ারকে পিস্তল, কার্তুজ, রুবল (টাকা) ইত্যাদি দিলেন। বললেন, কখন বিপদ ঘটে বলা তো যায় না। প্রয়োজন হলে এগুলো ব্যবহার করো। শুধু তাই নয়,

পাওয়ারকে একটা বিষ মেশানো সূঁচ দেয়া হলো। বলা হলো, বিপদ দেখলে বা ধরা পড়লে ব্যবহার করা হয় যেন। অবশ্য প্লেন ধ্বংস করার আর একটা উপায় ছিলো। সেটা হলো ইজেকসন সিট, অর্থাৎ এই বোতাম টেপার সঙ্গে সঙ্গে একটা বোমার বিস্ফোরণে প্লেন দু' টুকরো হয়ে যাবে। কিন্তু এই বোমার কথা পাওয়ার জানতো না।

মে মাসের পয়লা তারিখে ভোর সাড়ে চারটার সময় পাওয়ার পেশোয়ার বিমান বন্দর থেকে রওনা হলো রুশ দেশের দিকে। পাওয়ারকে বলা হয়েছিলো যে, তার সঙ্গে সদাসর্বদাই রেডিও এবং রাডারের মারফৎ পেশোয়ার এবং বোদে বিমান বন্দর যোগাযোগ রাখবে।

পেশোয়ার থেকে তিন শো মাইল পাওয়ার বেশ নির্বিঘ্নেই উড়ে গেলো। ভোর সাড়ে চারটের সময় পাওয়ার আফগানিস্থানের সীমা অতিক্রম করে রাশিয়ার বুকে ঢুকলো। ব্যস্, সেই সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ান সৈন্য-বিভাগের রাডারে পাওয়ারের নিশানা পাওয়া গেলো। 'এ্যান্টি-এয়ারক্রাফট' এবং ফাইটার প্লেনকে সতর্ক করে দিলে রুশ কর্তৃপক্ষ। উরাল অঞ্চলের কাছে এসে হঠাৎ পাওয়ারের প্লেন তীব্র ঝাকুনি দিলে। পাওয়ারের বুঝতে অসুবিধা হলো না যে, ইউ-টু'র ফ্লেম আউট হয়েছে অর্থাৎ ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে। এখন বাঁচার একমাত্র উপায় নীচে নেমে আসা। পাওয়ার নীচে নেমে এলো। ভাবলে এবার হয়তো প্লেনের ইঞ্জিন চালু হবে। কিন্তু দূর ছাই। ইঞ্জিন চালু হলো না। এবার পাওয়ার রেডিওতে বিমান বন্দর বোদেকে জানালে যে সে বিপদে পড়েছে। তার প্লেনের ইঞ্জিন বিগড়ে গেছে।

কর্নেল শেলটন কিন্তু প্রথমেই পাওয়ারকে সতর্ক করেছিলেন। বলেছিলেন, বিপদ দেখলে প্লেন ধ্বংস করো। ইউ টু প্লেনের এই প্রথম বিপদ নয়। সবাই বিপদে পড়ে নিজেকে ধ্বংস করেছে। কিন্তু পাওয়ার ঠিক তার উল্টো কাজ করলে। প্লেন যখন প্রায় ১৪,০০০ ফিট নেমে এলো, পাওয়ার তখন প্যারাসুট খুলে প্লেন থেকে ঝাপিয়ে পড়লো।

রাশিয়ান এ্যান্টি-এয়ারক্রাফট ইউনিটের নেতা মেজর ভরোনব কিন্তু সদাসর্বদাই ইউ টু'র গতিবিধি লক্ষ্য করছিলেন। তিনি ইউ টু'কে দ্রুতগতিতে নীচে নামাতে দেখে এ্যান্টি-এয়ারক্রাফট থেকে গুলী ছুড়তে লাগলেন। একটা গুলী গিয়ে প্লেনে লাগলো, কিন্তু ততোক্ষণে পাওয়ার নীচে ঝাপিয়ে পড়েছে।

শেরদলোস্ক নামে একটা গ্রামের কাছে এসে পাওয়ার নামলো। নামবার সময় তাকে বেশ বিপদে পড়তে হয়েছিলো। কারণ যে মাঠে পাওয়ার নেমেছিলো, তার কাছেই ছিলো ইলেকট্রীসিটির বড়ো তার। কিন্তু বিপদের ফাঁড়া কাটিয়ে পাওয়ার এক খালি মাঠে নামলো।

পাওয়ারকে আকাশ থেকে নামতে দেখে চারপাশ থেকে গ্রামবাসীরা দৌড়ে ছুটে এলো।

পাওযার প্যারাস্যুটে নামছে।

নাম, ধাম জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু ইংরেজী ছাড়া কোন ভাষাই পাওয়ার জানতো না। কিছুক্ষণ বাদে গ্রামবাসীরা টের পেলে যে, পাওয়ার হলো আমেরিকান স্পাই। অমনি তাকে বিশেষ গাড়ী করে মস্কো নিয়ে যাওয়া হলো।

* * *

মে মাসের প্রথম তারিখ মস্কোতে উৎসবের দিন। শ্রমিক দিবস। রেড স্কোয়ারে মিলিটারী প্যারেড হচ্ছে। ক্রুশেভ এসেছেন। রাষ্ট্রপতি ভরোশিলভ আছেন, কিন্তু ডিফেন্স মিনিষ্টার ম্যালেনভস্কির দেখা নেই।

একটু বাদে হন্তদন্ত হয়ে ম্যালিনভস্কি ছুটে এলেন। ক্রুশ্চেভকে বললেন: 'ইউ টু' প্লেনের পাইলটকে পাকড়াও করা হয়েছে। লোকটার নাম পাওয়ার। স্বীকার করেছে সে আমেরিকান সেণ্ট্রাল ইনটেলিজেন্সের স্পাই।

পাওয়ারের আমেরিকার সামরিক বিমান বন্দর বোদে। বিমান বন্দরের কর্মচারীরা বুঝতে পারলে যে, পাওয়ার বিপদে পড়েছে। কিন্তু তবু চট করে ওয়াশিংটনে কোন খবর দিলে না। কারণ দুপুর পর্যন্ত 'ইউ টু'র' তেলের রসদ আছে। তারপর তেল ফুরিয়ে যাবে। এর মধ্যে প্লেন ফেরার সম্ভবনা আছে। এর আগে ওয়াশিংটনে খবর দেয়া সমীচীন হবে না।

দুপুরের পর অবশ্যি ওয়াশিংটনে খবর গেলে যে পাওয়ারের কোন খোঁজ-খবর পাওয়া যাচ্ছে না। আশঙ্কা করা হলো যে ধরা পড়েছে। দিনটা ছিলো রবিবার ছুটির দিন। ওয়াশিংটনে বড়োকর্তারা শহরের বাইরে গিয়েছিলেন। টেলিফোনে ডালেস এবং অন্যান্য কর্মচারীদের সমস্ত ঘটনা খুলে বলা হলো। কর্তারা ঠিক করলেন যে, আরো কয়েকটা দিন অপেক্ষা কার যাক। কে জানে ব্যাপারটা কতোদূর গড়ায়!

দুই তারিখ ভোর সাড়ে পাঁচটার সময় মেসেস বারবারা পাওয়ারকে ঘুম থকে তোলা হলো। বলা হলো যে তার স্বামী বিপদে পড়েছে। ফিরে আসার কোন সম্ভবনাই নেই। খবর শুনে মিসেস পাওয়ার অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। কিছুদিন বাদে তাকে আমেরিকায় ফেরত পাঠানো হলো।

এর পর রাশিয়া এবং আমেরিকার ভেতর পাওয়ারকে নিয়ে দাবা খেলা শুরু হলো।

প্রথমতঃ ক্রুশ্চেভ ঘোষণা করলেন যে, রুশ সরকার একটি ইউ টু প্লেনকে গুলী করে মাটিতে নামিয়েছেন। অবিশ্যি পাইলট জীবিত না মৃত সেই সম্বন্ধে কিছু বললেন না। ক্রুশ্চেভ স্পষ্টই জানালেন যে, আমেরিকান সরকারের স্পাইং-এর কাজ তিনি কোন প্রকারেই বরদাস্ত করবেন না। আমেরিকান ষ্টেট ডিপার্টমেণ্ট ক্রুশ্চেভের উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করে। বলা হলো যে, 'ইউ টু' প্লেন
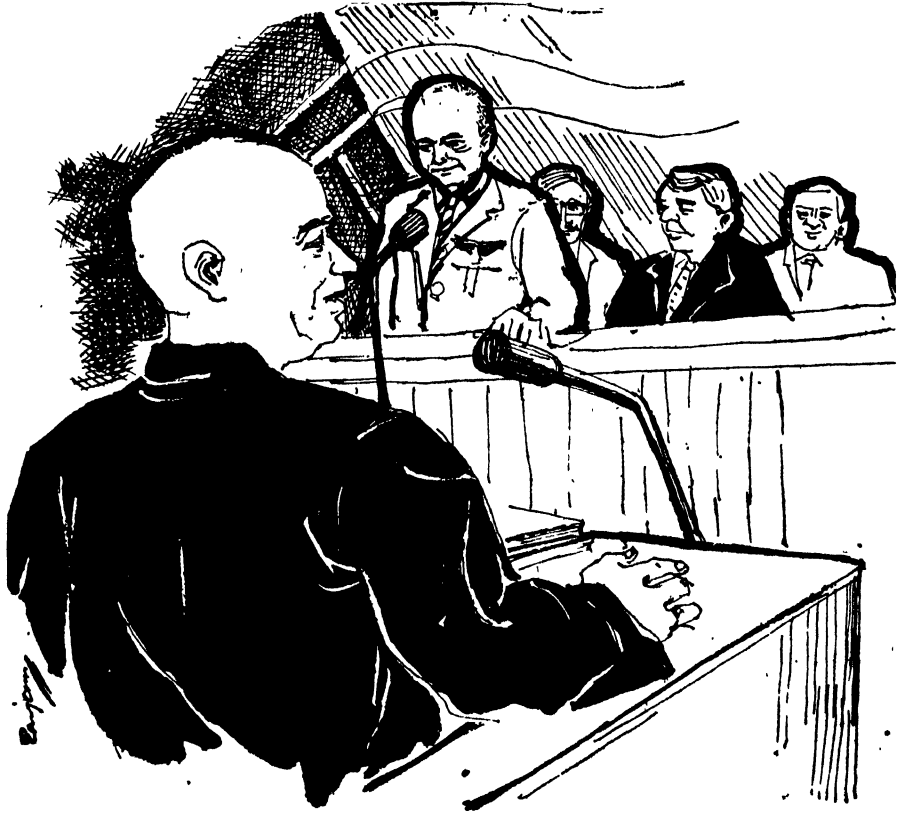
স্পাইং-এর কাজে যায়নি। আবহাওয়া নিয়ে গবেষণা করতে গিয়েছে। কিন্তু ষ্টেট ডিপার্টমেণ্টের বিবৃতিতে মারাত্মক ভুল ছিলো। কারণ ষ্টেট ডিপার্টমেণ্ট জানতেন না যে পাওয়ার জীবিত আছে। শুধু জীবিত নয়, পাওয়ার যে স্বীকার করেছে সে আমেরিকান স্পাই—একথাও তাদের অজ্ঞাত ছিলো।

মে মাসের পাঁচ তারিখ এক ককটেল পার্টিতে আমেরিকান রাজদূত জানতে পারলেন যে,

পাওয়ার বেশ বহাল তবিয়তেই বেঁচে আছে। এই খবর শুনে ষ্টেট ডিপার্টমেণ্টের কর্তারা বেশ আতঙ্কিত হলেন। এর পর আর অস্বীকার করা যায় না যে ইউ টু স্পাইং প্লেন নয়।

বাধ্য হয়ে এবার আমেরিকান সরকার স্বীকার করলে যে, খবর-সংগ্রহের জন্যে ইউ টু'কে রাশিয়ার ভেতর ফটো তুলে আনার জন্যে পাঠানো হয়েছিলো। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার বললেন যে, তিনি ইউ টু'র কার্যকলাপের কথা জানতেন এবং তার সম্মতি নিয়েই এই কাজ করা হয়েছে। ব্যস, সমস্ত পৃথিবীময় ·ই নিয়ে তুমুল সোরগোল শুরু হয়ে গেলো।

তারপর এলো পারীর সামিট কনফারেন্স। কিন্তু কনফারেন্স হবার আগেই ক্রুশ্চেভ দাবী করলেন যে আমেরিকা এবং প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার স্পাইং-এর কাজ করার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করবে। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট ক্রুশ্চেভের কথা মতো দুঃখ প্রকাশ করতে অস্বীকার করলেন। সামিট কনফারেন্স ভেঙ্গে গেলো।

* * *

পাওয়ারের কাহিনী কিন্তু এখনও শেষ হয়নি। রুশ সরকার এবার ঠিক করলেন যে, প্রকাশ্যে পাওয়ারের বিচার করা হবে। পৃথিবীশুদ্ধ সবাই যেন স্পাইং এর কাহিনী জানতে পারে। বিচার শুরু হলো। পাওয়ার স্বীকার করলে যে, স্পাইং-এর উদ্দেশ্য নিয়ে সে রুশ দেশে ঢুকেছিলো। বিচারে পাওয়ারের চোদ্দ বছরের জেল হলো। পাওয়ার আশঙ্কা করেছিলো যে বিচারে হয়তো তার প্রাণদণ্ড হবে। তাই চোদ্দ বছরের জেলের রায় শুনে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে। এর পরবর্তী কাহিনী কিন্তু সংক্ষিপ্ত। কিছুদিন আগে তোমাদের বিখ্যাত রাশিয়ান স্পাই আবেলের গল্প বলেছি। স্পাইং-এর অভিযোগে আমেরিকায় আবেলের ত্রিশ বছর কারাদণ্ড হয়েছিলো। আবেলের উকীল ডনোভান এবার প্রেসিডেণ্ট কেনেডির কাছে আবেদন করলেন যে, আবেলকে মুক্তি দেয়া হোক। এর পরিবর্তে রুশ সরকারের কাছে আবেদন করা হবে পাওয়ারের মুক্তির জন্যে। প্রেসিডেণ্ট কেনেডি এ প্রস্তাবে আপত্তি করেন নি। ক্রুশ্চেভের কাছে অনুরোধ করা হলো আবেলের পরিবর্তে পাওয়ারের মুক্তি চাই। ক্রুশ্চেভ রাজী হলেন।

* * *

কিছুদিন বাদে বার্লিনে—এক গভীর রাত্রে। পশ্চিম বার্লিন থেকে পূর্ব বার্লিনের পটস্ড্যামে যাবার জন্যে একটি ব্রিজ আছে। ব্রিজের দুই প্রান্তে কয়েকজন লোক দু'জন বন্দীকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটু বাদেই দুই বন্দীকে ছেড়ে দেয়া হলো। একজন পূর্ব বার্লিন থেকে পশ্চিম বার্লিনে এলেন। তিনি হলেন গাই পাওয়ার। অপর জন পশ্চিম বার্লিন থেকে পটস্ড্যাম শহরে গেলেন। তিনি হলেন রুশ স্পাই আবেল।

সেইদিন থেকে এই ব্রিজের নামকরণ হলো—ব্রিজ অব ইউনিটি।*

---

* এই সিরিজ কাহিনীর প্রথম অংশ গত বৎসরের ফাল্গুন মাসের 'মৌচাকে' প্রকাশিত হয় এবং গ্রাহক-গ্রাহিকা ও পাঠক-পাঠিকা মহলে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে।

(উপন্যাস)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

৯

ফ্যাক্টরীর ভোঁ বাজলে কারিগরের দল যেমন দিগ্‌বিদিকের জ্ঞান হারিয়ে ফ্যাক্টরীর ফটকের দিকে ছোটে,—যেমন করে হোক ঐ ভোঁ থামবার আগেই ফটকের মধ্যে ঢুকতে হবে, না হলে ফ্যাক্টরীর ফটক বন্ধ হলে আর ঢোকা চলবে না—ঠিক সেই ভাবেই পান্না সকালে ঘুম থেকে উঠেই কোনমতে মুখ হাত ধুয়ে কোনদিন দুধ জলখাবার খেয়ে, কোনদিন বা না খেয়েই নাট্য-সমিতিতে ছোটে—সেখানে নানা সুরে নানা ভঙ্গীতে রিহার্সাল দেয়। ন্যাকী-কান্না থেকে শুরু করে বীরত্বের হুঙ্কার—নাট্যাচার্যের যেমন হুকুম হয়, সেইভাবে সে চলে। বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ বাড়ী ফেরে, তারপর স্নানাহার সেরে পিসীমাকে দেখিয়ে কতগুলো বই খুলে বসে,—হাত-পা নেড়ে এ্যাকটিং-এর ভঙ্গী কসরত করে। পিসীমা ভাবেন, ভাইপো নিবিষ্ট মনে লেখাপড়া করছে তারপর বেলা চারটে বাজতে-না-বাজতে জলখাবার খেয়েই ছোটে নাট্য-সমিতির উদ্দেশে। সেখানে রিহার্সাল দিয়ে বাড়ী ফেরে সাড়ে ন'টা—পৌনে দশটা নাগাদ।

পাঁচ-সাত দিন তার এই রুটীন দেখে পিসীমা বল্লেন,—হ্যাঁ বাবা, তোমার পরীক্ষা—তুমি পড়াশুনা করছো না, সব সময় বাইরে-বাইরে ঘোর,—এর মানে?

একটা ঢোঁক্ গিলে পান্না বল্লে,—ভারী সুবিধা হয়েছে পিসীমা। আমাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয় তিনকড়ি—সে এসেছে রাঁচীতে তার রুগ্ন মাকে নিয়ে চেঞ্জে। তার সঙ্গে হঠাৎ দেখা। সে বল্লে,—দু'জনে একসঙ্গে পড়বো। তাই তার কাছে দু'বেলা যাই পড়াশুনা করতে। পড়া যা হয়, দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়ার পর সেগুলো রপ্ত করি।

পিসীমা জানেন না ভাইপোর নাড়ী-নক্ষত্র। একথা শুনে তিনি অবিশ্বাস করতে পারলেন না। কাজেই পান্নার রিহার্সাল চলতে লাগলো ও-বাড়ীতে পুরো দমে।

একদিন এক বিভ্রাট··পাঁচটার সময় রিহার্সাল দিতে নাট্য-সমিতিতে ঢুকবে, সমিতির ফটকের সামনে দেখা ছকুর সঙ্গে। ছকু তার সাইকেলে চড়ে যাচ্ছিল ওদিকে কোথায় তার এক বন্ধুর বাড়ী। পান্নাকে দেখে সে বল্লে,—এ বাড়ীতে কার কাছে যাচ্ছ?

পান্নার গলা শুকিয়ে কাঠ! কোন মতে দম নিয়ে পান্না বল্লে—এই যে, এই যে, এই যে আমাদের বেলেঘাটা স্কুলের তিনকড়ি···সে এসেছে এ বাড়ীতে তার মাকে নিয়ে চেঞ্জে। তার সঙ্গে মিলে পড়ি।

হয়তো এখানেই এ ব্যাপারের মীমাংসা হয়ে যেত, কিন্তু পান্নার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সেক্রেটারী মৃত্যুঞ্জয় ওদিক থেকে এসে হাজির। ছকুকে দেখে মৃত্যুঞ্জয় বল্লে—জানো ছকু, এবার আমাদের নতুন নাটকে হিরো সাজছেন পান্নাবাবু—রোজ বেশ regularly রিহার্সাল দিতে আসছেন।···সঙ্গে সঙ্গে পান্নার দিকে চেয়ে মৃত্যুঞ্জয় বল্লে,—জানেন পান্নাবাবু, আপনার ঐ থার্ড সিনটা রি-রাইট করা হয়েছে। ওটা তেমন জমছিল না, তাই ডি, এল, রায়ের ক'খানা নাটক থেকে গোটাকতক মোক্ষম মোক্ষম কথা জুড়ে দেওয়া হয়েছে। আজ ঐ সিনটার রিহার্সাল। চলুন।

একথা বলে মৃত্যুঞ্জয় ঢুকলো ফটকের মধ্যে। ছকু বল্লে পান্নাকে,—রিহার্সাল! বলে সে সাইকেলে চড়ে চলে গেল। আর পান্না! তার মনে হলো তার পায়ের নীচে সারা পৃথিবী যেন ভূমিকম্পের দোলায় দুলছে! তার মাথা ঘুরছিল, সে কোন মতে ফটকের সামনে রোয়াকে বসে পড়লো।

সেদিন রাত্রে সাড়ে ন'টার সময় কম্পিত পায়ে বাড়ী ফিরতেই পিসীমার সঙ্গে দেখা। পিসীমা বল্লেন,—তুমি ঐ ধনঞ্জয় বাগচীর বাড়ীতে রোজ যাও। ধনঞ্জয় বাগচী মারা গিয়েছে তার ঐ তিনটে ছেলে—বখা, হৈ-হল্লা আর থিয়েটার করে বেড়ায়। ওদের ওখানে তুমি যাও থিয়েটার করবে বলে!

পান্নার মুখে জবাব নেই। সে স্ট্যাচুর মত নিষ্কম্প দাঁড়িয়ে রইলো।

পিসীমা বল্লেন,—ছকুর সঙ্গে তোমার দেখা বাগচীদের বাড়ীর সামনে। সেখানে বাগচীর বড়

ছেলে মৃত্যুঞ্জয় এই কথা ওকে বলেছে। শুনে ছকু খুবই রাগ করছিল। তোমার পিসেমশাই একথা শুনলে ভয়ানক রাগ করবেন—তিনি এ কথা যাতে না শোনেন—আমি ছকুকে বলেছি, একথা যেন তিনি জানতে না পারেন। তা যেন হলো বাবা, কিন্তু পড়াশুনা ছেড়ে আমার কাছে এসে তুমি যদি এখানে থিয়েটার করে বেড়াও…কাকাবাবু আর তোমার মা…তাদের কাছে আমি কী জবাব দেব?

এ কথার উত্তর পান্না দিতে পারলো না। তার তখন ন যযৌ ন-তস্থৌ ভাব।

নিঃশ্বাস ফেলে পিসীমা বললেন,—এসো মুখ হাত ধুয়ে খাবে এসো। আর কাল থেকে ওখানে যাওয়া বন্ধ করো বাড়ীতে পড়াশুনা করো। আজই কলেজ থেকে ফিরে তোমার পিসেমশাই বল্লেন,—সকালে আর সন্ধ্যার পর বাড়ীতে তোমার দেখা পান না—দু'দিন পরে পরীক্ষা—পড়াশুনার কী হচ্ছে?

তারপর পিসীমা তাকে এনে খেতে বসালেন। খাওয়াদাওয়ার পর পান্নার ঘরে এসে আর এক প্রস্থ পিসীমার উপদেশ-বর্ষণ। পান্না নিরুত্তরে সে সব উপদেশ শুনলো। তারপর পিসীমা উঠলেন। যাবার সময় বলে গেলেন,—কাল সকালে বাড়ী থেকে বেরুনো নয়,—বাড়ীতে বসে লেখাপড়া। ছকু-লকু এরা তোমায় টিটকিরি দেবে আমার প্রাণে তা সহ্য হবে না। ওদের সঙ্গে তোমায় আমি তফাৎ দেখি না। তোমার নিন্দা যেন আমাকে শুনতে না হয়।

শুয়ে শুয়ে পান্না ভাবতে লাগলো, তাই তো, এতো বড় চান্স (chance) সব ভেস্তে যাবে? ঐ ছকুদা' আমার চেয়ে মোটে তো ছ'মাসের বড়ো…ও-পথে ওর যাবার কী এমন প্রয়োজন ছিল? গেলেও, ঐ তিনকড়ির নাম দিয়ে নির্বিঘ্নে তার রিহার্সাল দেওয়া চলছিলো…হঠাৎ ঐ মৃত্যুঞ্জয় ও সময় এসে…কী সর্বনাশ ঘটে গেল!

নিঃশ্বাস ফেলে পান্না ভাবতে লাগলো আকাশ-পাতাল কতো ভাবনা…কী হচ্ছিল কী হতে পারতো—আর কী হয়ে গেল!…

এমনি ভাবতে ভাবতে ঘড়িতে চারটে বাজতে শুনলো।

তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, জানে না। ঘুম ভাঙলো ঘড়িতে আটটা বাজার শব্দে। গায়ের কম্বল ফেলে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো। ঘরের শার্সি ভেদ করে কুয়াশা-ভাঙ্গা খানিকটা মলিন রৌদ্র ঘরে এসে পড়েছে।

সেদিন রবিবার। ঘুম ভেঙে বিছানায় বসে পান্না ভাবছে, আটটা বেজে গেল, ওদিকে…

পিসীমা এসে ডাকলেন, উঠেছ—মুখ হাত ধুয়ে খাবে এসো।

মুখ হাত ধুয়ে জলখাবার খেতে বসতে হলো। পিসীমা পরম স্নেহে কাছে বসে ভাইপোকে খাওয়ালেন। তারপর খাওয়া শেষ হলে বললেন, আজ আর বেরুবে না। যাও, তোমার ছকুদা'র ছুটি আছে, ওর কাছে গিয়ে পড়াশুনা করো। ওকে আমি বলে দিয়েছি তোমার পড়াশুনা দেখতে।

পান্নার বুকখানা যেন ফেটে চৌচির হবে। সে ভাবলো একবার শেষ চেষ্টা। সকাতরে বল্লে,—কিন্তু পিসীমা ওদের একবার বলে আসা উচিত নয় কী? আমার উপর ওরা এতোখানি ভরসা করে আছে!

পিসীমা বললেন,—সে ছকু গিয়ে বলে আসবে। ওই মৃত্যুঞ্জয়ের মেজ ভাই জন্মেজয় ছকুর সঙ্গে পড়তো—ওদের ছকু ভালো করেই জানে।

পান্না নিরুপায়ের নিঃশ্বাস ফেল্লো।

তারপর সারাদিন তার মনে দুশ্চিন্তার কাঁটা! শেষে সে ভাবলো, যদি অতবড় চান্স মাটিই হয়ে গেল, তা'হলে এখানে থেকে আর লাভ কী! ওদের ওখানে যা হোক একটা কিছু বলে ইজ্জত বাঁচিয়ে রাঁচী ত্যাগ করাই শ্রেয়।

পিসীমাকে নানাভাবে অনুনয়-বিনয় করে পান্না গেল সন্ধ্যার আগে নাট্য-সমিতিতে। সেখানে গিয়ে বল্লে,—মহা বিপদ! কোলকাতা থেকে চিঠি এসেছে—কোলকাতায় আমার মা'র খুব অসুখ। আজ আর ট্রেন নেই—কাল আমায় কোলকাতায় চলে যেতে হবে।

কথা শুনে মৃত্যুঞ্জয় চটে আগুন। সে বল্লে,—ইরেসপ্‌নসিবেল ক্যাড্‌!

নাট্যকার বল্লে,—আমাদের এমন করে ডুবিয়ে দিয়ে···ডিসেম্বরের সেকেণ্ড উইকে আমাদের প্লে···এখন কোথায় পাবো আমাদের হিরো?

মৃত্যুঞ্জয়ের মেজ ভাই জন্মেজয় বল্লে, বিশ্বাস করো কেন—ও সব ক্যালকেসিয়ান চাল! ভালো ছেলে ছকু কাল তোমার সঙ্গে দেখা, না দাদা?···সে নিশ্চয় অন্তর্টিপ নি দিয়েছে!

কাতর কণ্ঠে পান্না বল্লে,—বিশ্বাস করুন মশাই। সেখানে আমার মা'র খুব অসুখ আজ চিঠি এসেছে।

জন্মেজয় বল্লে—দেখাতে পারেন সে চিঠি?

নিঃশ্বাস ফেলে পান্না বল্লে,—সে তো আমার পিসেমশাইকে লেখা চিঠি, আমি কী করে আনবো?

মৃত্যুঞ্জয় বলে উঠলো,—থাক থাক কুছ পরোয়া নেই!

এক রাজা যাবে, পুনঃ অন্য রাজা হবে
বাঙলার সিংহাসন কভু শূন্য নাহি রবে···

আমি সাজবো হিরো।

জন্মেজয় তবু একটু কুটুস-কামড় দিতে ছাড়লো না। সে বল্লে,—কাল আপনি রাঁচী ছেড়ে যান কিনা আমি স্টেশনে যাবো দেখতে।

এর পর! পান্নাকে পরের দিন রাঁচী ত্যাগ করতে হলো। (ক্রমশঃ)

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

[শতবর্ষের শ্রদ্ধা নিবেদন]

শ্রীমনোরম গুহ ঠাকুরতা

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়টা ভারত তথা বাংলার পক্ষে এক অতি গৌরবময় যুগ। এই সময়ে বাংলায় যেসব মনীষী জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, দর্শনে, জনসেবা, দেশ-সেবা ও সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁরা এক গৌরবময় ঐতিহ্য সৃষ্টি করে গেছেন। আজও আমরা সেই ঐতিহ্যের অনুসরণ করেই দেশকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছি।

এঁদের মধ্যে অনেকেরই জন্ম-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে, এবং যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে দেশের সর্বত্র প্রতিপালিত হয়েছে। আর একজন মনীষীর কথা তোমাদের কাছে আজ বলছি। এঁর জন্ম-শতবার্ষিকীও বিগত ৫ই ভাদ্র যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে দেশের সর্বত্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইনি হচ্ছেন আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ্ এবং দেশপ্রেমিক রূপে তিনি সে যুগে দেশের মানুষের কাছে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করেছিলেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নাম অতি অবশ্যই তোমরা শুনে থাকবে। বাংলা-সাহিত্যের গবেষণা ও অনুশীলনের উদ্দেশ্য নিয়ে, এই পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পরিষদ প্রতিষ্ঠা ও এর উন্নতির মূলে যাঁদের অবদান বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর তাঁদের অন্যতম। এঁদের চেষ্টার ফলেই পরিষদ বাংলা ভাষার গবেষণার ক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জন করে। আজ আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার জেমো নামক এক গ্রামে ১২৭১ সালের ৫ই ভাদ্র আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর

এক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এই পরিবার জিঘোতিয়া ব্রাহ্মণ বংশ নামে পরিচিত। মুঘল সম্রাট আকবর যখন ভারতের সিংহাসনে, তখন বিদ্রোহী বাংলাকে দমন করবার জন্য মুঘল সেনাপতি রাজা মানসিংহ বাংলা দেশে এক অভিযান চালান। এই সময়ে জিঘোতি বা বুন্দেলখণ্ড থেকে কয়েকঘর ব্রাহ্মণ বাংলায় এসে মুর্শিদাবাদ জেলায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে সুরু করেন। এঁরা রাজা মানসিংহের কাছ থেকে এই জেলায় জায়গীর লাভ করেছিলেন। মূলতঃ এই পরিবার বাঙ্গালী না হলেও বাংলা দেশে বাস করবার ফলে, এঁরা মনে-প্রাণে বাঙ্গালী হয়ে গিয়েছিলেন। এই বংশে বহু পণ্ডিত ও সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করেন। রামেন্দ্রসুন্দরের পিতা গোবিন্দসুন্দর সে কুলের একজন সুপরিচিত সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি 'বাঁহ বালা' নামে একখানা উপন্যাস এবং 'দ্রৌপদী নিগ্রহ' নামে একখানা নাটক রচনা করেন। পিতার এই সাহিত্যিক গুণ উত্তরাধিকার সূত্রে রামেন্দ্রসুন্দরও পেয়েছিলেন।

ছাত্র হিসেবে রামেন্দ্রসুন্দর পাঠশালা থেকে সুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা এম. এ. ও প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পর্যন্ত সব পরীক্ষায়ই বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

বিজ্ঞান শাস্ত্রে এম. এ. পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে রিপন কলেজে (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) যোগ দেন। এই পদে বিশেষ যোগ্যতা প্রদর্শন করে অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। এই কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবেও তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে নানা ভাবে কলেজের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করেন।

ছাত্রদের পরিচালনার ব্যাপারে তিনি এক অভিনব উপায় অবলম্বন করেছিলেন। কলেজের প্রত্যেকটি ছাত্রের গুণের যাতে বিকশ সাধিত হতে পারে এজন্য যথাসম্ভব প্রত্যেকটি ছাত্রের সঙ্গেই যোগাযোগ রক্ষা করতে তিনি চেষ্টা করতেন। অধ্যাপকদের কাজেও তিনি তাঁদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা স্বীকার করে নিয়ে, তাদের অধ্যাপনার কাজে বিকাশ-সাধনের সুযোগ দিতেন। ছাত্রদের সঙ্গেও যাতে অধ্যাপকেরা প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন এজন্যও তিনি তাঁদের বিশেষ ভাবে উৎসাহ দিতেন। ঐ সময়ের রিপন কলেজের ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই জনসমাজের বিবিধ ক্ষেত্রে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

কৃতিত্বের সঙ্গে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পরে বাংলা সরকার তাঁকে ভালো ভালো সরকারী চাকুরী গ্রহণের প্রস্তাব দেন। সরকারী চাকুরীতে কলকাতা ছেড়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে ভেবে তিনি আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেও এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন; কারণ কলকাতা ছেড়ে গেল তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা—সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চা বিঘ্নিত হবে। এমনি আকর্ষণ ও প্রেম ছিলো তাঁর বাংলা সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রতি। রামেন্দ্রসুন্দর ছেলেবেলা থেকেই সাহিত্যচর্চা

সুরু করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি অতি নিষ্ঠা সহকারে বৈজ্ঞানিক-সাহিত্য রচনায় বিশেষ ভাবে মনোনিবেশ করেন।

তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, দেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে দেশের মানুষকে বিজ্ঞান-শিক্ষার সাহায্যে বিজ্ঞান-মনা করে তুলতে হবে। বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করতে হলে মাতৃভাষার মাধ্যমেই তা করা একমাত্র সম্ভব। এই উদ্দেশ্য নিয়ই তিনি বৈজ্ঞানিক-সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। রামেন্দ্রসুন্দরের স্বদেশ প্রেমের এ-ও একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত।

তাঁর লেখা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের মধ্যে 'প্রকৃতি', 'জিজ্ঞাসা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সমসাময়িক পত্রেও তাঁর বহু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কেও তাঁর বহু গবেষণামূলক রচনা রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরকে বিশেষ ভাবে শ্রদ্ধা করতেন। জালিয়ান-ওয়ালা বাগে ইংরেজ সরকারের অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ সরকার প্রদত্ত 'স্যার' উপাধি পরিত্যাগ করেন। এই উপলক্ষে তিনি ভারতের বড়লাটকে এক স্মরণীয় পত্র লেখেন। রামেন্দ্রসুন্দর এই সময় মৃত্যুশয্যায়। তিনি সংবাদপত্রে এই কাহিনী পাঠ করে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে তাঁকে এক পত্র লেখেন। রবীন্দ্রনাথ এসে রামেন্দ্রসুন্দরকে প্রতিবাদে তিনি ভারত সরকারকে যে পত্র লিখেছিলেন তা পড়ে শুনিয়ে যান। বোধহয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের জন্যই তিনি পরলোক যাত্রার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এই সাক্ষাতের অল্প সময় পরেই তাঁর মৃত্যু হয়।

১৩২৫ সালের ২৩শে জ্যৈষ্ঠ রামেন্দ্রসুন্দর পরলোক গমন করেন।

রামেন্দ্রসুন্দর সাহিত্যিক ছিলেন, বৈজ্ঞানিক ছিলেন, এসবই সত্য, কিন্তু সর্বোপরি তিনি ছিলেন আদর্শ-চরিত্র শিক্ষক এবং দেশে আদর্শ-চরিত্র মানুষ তৈরীর কর্মশালার তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি আজীবন নিরভিমানী উচ্চ চিন্তা এবং অনাড়ম্বর জীবন-যাপনের আদর্শ অনুসরণ করে গিয়েছেন।

রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনের আদর্শ যুগ যুগ ধরে বাঙলার ছাত্রছাত্রীদের অনুপ্রাণিত করুক তাঁর জন্ম-শতবর্ষে আমরা এই কামনাই করি।

জানোয়ারী কাণ্ড

শ্রীসৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

আরেকবার ভারী মজার কাণ্ড ঘটেছিল জার্মানীর সুপ্রসিদ্ধ লেইপ্‌জিগ্‌ (Leipzig) শহরে।

বড়দিনের মরশুমে শহরে সেবার নামজাদা এক সার্কাস কোম্পানী এসে রঙচঙে বিরাট তাঁবু খাটিয়ে নানা রকম কসরতীর খেলা দেখাতে সুরু করেছিল। সার্কাসের দলে পাকা-ওস্তাদ খেলোয়াড়, বাজীকর, সঙ, নাচিয়ে আর বাজিয়ে ছাড়াও, হাতী, ঘোড়া, কুকুর, বাঁদর, ভাল্লুক—এ সব জন্তু জানোয়ার তো ছিলই, উপরন্তু বাঘ-সিংহের সংখ্যাও নেহাৎ অল্প ছিল না। মহা ধুমধামে আজব-কসরতীর নানান্ খেলা দেখিয়ে মুঠো-মুঠো পয়সা আর তারিফ্ লুটে সার্কাস-কোম্পানী শেষে একদিন লেইপ্‌জিগ্ থেকে তল্পী-তল্পা গুটিয়ে রওনা হলো জার্মানীরই অন্য আরেক শহরের দিকে।

তখনও শীতের আমেজ কাটেনি…সারাক্ষণই ঝির্‌ঝির্ করে বর্ষার বৃষ্টিধারার মতো বরফের কুচি ঝরছে…কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস…চারিদিক ঘন-কুয়াশায় আচ্ছন্ন—দিনের বেলাতেই বাইরে পথে ছু'হাত দূরের মানুষকে ঠিক মতো ঠাওর করা যায় না, এমনই বিশ্রী-বেয়াড়া ঝাপ্‌সা-ধোঁয়াটে আবহাওয়ায় ভরে রয়েছে সারা শহর। সার্কস-কোম্পানী সদলবলে মালপত্তর, তাঁবু, খেলার সাজ-সরঞ্জাম, বাজনা-বাদ্যি, জন্তু-জানোয়ারদের খাঁচা সব কিছু লটবহর-তল্পীতল্পা গুটিয়ে নিয়ে নতুন শহরের পথে পাড়ি জমালো।

দেড়মাস ধরে এক-নাগাড়ে রোজ বিকাল আর সন্ধ্যায় ছু'বার করে নানান্ কস্‌রতীর খেলা দেখিয়ে আর স্থানান্তরে যাত্রার দিনে হৈ-চৈ-হাঙ্গামার মাঝে জিনিসপত্র গোছগাছ, জন্তু-জানোয়ারদের তদ্বির-তদারক করার প্রাণান্ত-পরিশ্রমে সার্কাসের লোকজন সবাই একেবারে বেদম-হয়রান ও ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। তাই লেইপ্‌জিগ্ শহর ছেড়ে যাবার সময় তারা কোনমতে সার্কাস-কোম্পানীর বড়-বড় লরী আর ভ্যানের উপর মালপত্র সব ঠেসে বোঝাই করে, যে-যার নির্দিষ্ট যান-বাহনে উঠে, অবসন্ন দেহ-ভার এলিয়ে দিয়ে, কন্‌কনে শীতের দিনে গরম কম্বলের আশ্রয়ে আপাদ-মস্তক ঢেকে, পরম নিশ্চিন্ত-আরামে বিশ্রাম-সুখ উপভোগের চিন্তায় বিভোর হয়েছিল।

সবাই যখন প্রচণ্ড শীতের দাপটে কাবু হয়ে লরী আর ভ্যানে সার্কাসের দলের মালপত্র বোঝাই করতে ব্যস্ত, তখন এদিকে তাড়াহুড়ো আর হট্টগোলের মধ্যে আচম্‌কা কেমন করে কিসের যেন ধাক্কা লেগে বিরাট একটা জানোয়ারের খাঁচার দরজার খানিকটা অংশ লরীর পাটাতনের খোঁচা লেগে ভেঙ্গে গিয়েছিল। গাঢ়-কুয়াশার অন্ধকারে মালপত্র বোঝাইয়ের হৈ-হট্টগোল-বিশৃঙ্খলার মধ্যে এ ঘটনাটুকু আর সার্কাসের লোকজনের কারো বিশেষ নজরে পড়েনি…সকলেই তখন

গাড়ীতে যে-যার নিজের আসনে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে-বসে ভিন্‌-শহরে যাত্রার অবসরটুকুর মাঝে দু'দণ্ড দম ফেলে জিরিয়ে নেবার ফিকিরে মশগুল…কোথা কোন্‌ জানোয়ারের খাঁচার কপাট মালপত্র টানাটানির হিড়িকে অচম্‌কা চিড়্‌ খেয়ে ভেঙ্গেছে, সেদিকে খোঁজ-খেয়াল রাখার হুঁশ বা ফুরশৎ ছিল না কারো এতটুকু! কাজেই এ বিষয়ে কেউ আর বিশেষ তেমন মাথা ঘামলো না তখন।

কিন্তু, সেই যে কপাট-ভাঙ্গা জানোয়ারের খাঁচা…তারই দু'টি পাশাপাশি কুঠরির মধ্যে বন্দী হয়েছিল ইয়া কেঁদো চেহারার দু'জোড়া বাঘ আর বাঘিনী!

মালপত্র, লোকজন আর জন্তু-জানোয়রের খাঁচা বোঝাই সার্কাস-কোম্পানীর লরী ও ভ্যান্‌-গাড়ী সারি দিয়ে লেইপ্‌জিগ্‌ শহরের রাস্তা মাড়িয়ে খানিক দূরে এগিয়ে চলতেই যাত্রার উত্তেজনা কোলাহল মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কপাট-ভাঙা খাঁচায় বন্দী সেই দু'জোড়া বাঘ আর বাঘিনী হঠাৎ লক্ষ্য করলো যে, তাদের লোহার গরাদে ঘেরা খাঁচার দরজাটি সম্পূর্ণ অর্গল-মুক্ত, এবং চোখের সামনেই পড়ে রয়েছে অবাধমুক্তির খোলা রাস্তা!…খাঁচায়-বন্দী বাঘ আর বাঘিনীদের কাছে বাইরে পথে বেরিয়ে স্বাধীনভাবে স্বচ্ছন্দ্য-বিচরণের এই দুর্বার-লোভ সামলানো বাস্তবিকই খুব দুঃসাধ্য ব্যাপার। কাজেই আর তিলমাত্র দ্বিধা-বিলম্ব না করে, নিঃশব্দে খাঁচার ভাঙা-কপাটের উন্মুক্ত-ফোকরের মধ্য দিয়ে একে-একে লাফ্‌ মেরে গ'লে বেরিয়ে এসে তারা নামলো নৈশালোকিত শহরের রাজপথে। সার্কাস কোম্পানীর লোকজনেরা তখন সারাদিনের খাটাখাটুনি আর মেহ-নতের ফলে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে বিশ্রাম-সুখ উপভোগে এমনই মত্ত যে, জলজ্যান্ত চার-চারটি কেঁদো বাঘ আব বাঘিনী যে এ ভাবে তাদের চোখে ধুলো দিয়ে আচম্‌কা ভাঙা খাঁচা ছেড়ে চোঁ-চা চম্পট দিয়েছে, সেদিকে কারো কোনো হুঁশই নেই…তারা সবাই দিব্যি নিশ্চিন্ত আরামে কন্‌কনে শীতের রাতে পথ-চলতি লরী আর ভ্যান্‌-গাড়ীর কোণে আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে কুকুর-কুণ্ডলী অবস্থায় মনের সুখে ঝিমুতে সুরু করেছে!

ওদিকে সার্কাসের দল ছেড়ে পালিয়ে এসে বাঘ আর বাঘিনীরা কিন্তু অবাধ-মুক্তির আনন্দ যতখানি মধুর হয়ে উঠবে বলে গোড়ায় ধারণা করেছিল, শহরের পথে নেমে পড়ে দেখলে—ব্যাপারটা ঠিক তার উল্টো! অর্থাৎ, তারা ভেবেছিল—এতকাল লোহার গরাদে-ঘেরা খাঁচায় বন্দী হয়ে রয়েছি, এবার হয়তো সে দুর্ভোগ-যাতনা থেকে রেহাই মিলবে…আবার সেই বন-জঙ্গলের দিনগুলোর মতো পুরানো স্বাধীন-জীবন ফিরে পেয়ে আরামে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবো! নিত্য-দিন তাঁবু-ভর্তি ছেলে-বুড়ো দর্শকদের সামনে নিয়ম-মাফিক কসরতী-দেখানোর হাঙ্গামা নেই… সার্কাসওয়ালার সদর্প চাবুক-হাঁক্‌রানো আর হুম্‌কি-আস্ফালনের দাপট নেই…দিব্যি মজাসে

বেপরোয়া নিজের খেয়াল মতো পথে-ঘাটে ঘুরবো-ফিরবো·· খুশি মতো শিকার ধরবো আর খাবো···কেউ কোন শাসন-বারণ করতে তেড়ে আসার সাহসটুকু পর্যন্ত পাবে না আর !···এই ভেবে অবাধ-মুক্তির আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে সার্কাসের দলের ইয়া-কেঁদো চার-চারটি সদ্য-পলাতক বাঘ আর বাঘিনী রীতিমত বেপরোয়াভাবে শহরের পথে-পথে ঘুরে বেড়াতে সুরু করলে !

রাত তখনও নিশুতি হয়নি···পথে লোকজনের ভিড়···যান-বাহন চলাচলও নিতান্ত মন্দ নয় ! আচম্কা সবাই লক্ষ্য করলে—শহরের চৌমাথার মোড়ে চার-চারটি ইয়া-কেঁদো বাঘ আর বাঘিনী সদর্পে হুঙ্কার তুলে পরম নিশ্চিন্ত মনে দিব্যি সহজ-স্বচ্ছন্দ্যগতিতে বাঁধন-হারা অবস্থায় এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে !

শহরের পথে একসঙ্গে এতগুলি বাঘ-বাঘিনীর অতর্কিত আবির্ভাবে লোকজন সবাই গোড়ার দিকে ব্যাপারটা ঠিক ঠাওর করতে না পেরে কল্পনাতীত বিস্ময়ে রীতিমত হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু যখনই তারা বুঝতে পারলো যে জলজ্যান্ত ভয়ংকর বাঘ আর বাঘিনীরা দল বেঁধে তাদের আশপাশে যত্রতত্র অবাধে বেপরোয়াভাবে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে, তখনি ভয়ে-আতঙ্কে শিউরে দিশেহারা হয়ে, তিল-মুহূর্ত বিলম্ব না করে, যে যেদিকে পারলো চোঁ-চা চম্পট দিয়ে পালিয়ে বুনো-জানোয়ারের কবল থেকে প্রাণ-বাঁচানোর আশায় দোকান-পাট, বাড়ী-ঘর, কল-কারখান, আপিস-আদালত, ঘোড়ার আস্তাবল, সরাইখানা, থিয়েটার, সিনেমা, হাসপাতাল, পাগলা-গারদ, এমন কি নিরালা পার্কের আর গোরস্থানের ঝোপঝাড়ের আড়ালে আত্মগোপন করে বিপদ-ত্রাণের অপেক্ষায় নিঃশব্দে বসে ঠকঠকিয়ে কাঁপতে লাগলো ! যেন কোন মায়াবী-যাত্নকরের ভোজবাজীর মন্তরে চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই নিমেষের মধ্যে শহরের পথঘাট সব একেবারে মরুভূমির মতো নির্জন হয়ে গেল···বাড়ী-ঘর, দোকান-পাটের সবাই হুদ্দাড় দরজা-জানলায় খিল-এঁটে দিলে !

শহরের চারদিকে হঠাৎ এমন সোরগোল আর বিদ্যুৎ-বেগে লোকজন-গাড়ীঘোড়া সব অদৃশ্য হয়ে যাওয়া দেখে বাঘ-বাঘিনীরা তো অবাক ! তারা ভাবলো—বাঃ !···বেশ তো লোকজন সবাই এ শহরের !·· রোজ তো বিকাল-সন্ধ্যায় আমাদের কসরত-খেলা দেখবার আগ্রহে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সার্কাসের তাঁবুর সামনে ভিড় জমিয়ে টিকিট কেনার জন্য নিজেদের মধ্যে হাতাহাতি, মারামারি করে জামা-জুতো ছিঁড়ে, নাক-কান হারিয়ে মজা লুটতে আসে···আর আজ হঠাৎ আমরা ক'জন যেই সার্কাসের দল ছেড়ে নিজেরা শহরের পথে এসে হাজির হলুম, ওদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় জমাতে, অমনি সবাই যে-যেদিকে পারে চম্পট দিলে ভোঁ-ভাঁ ! খাশা ভব্যতা-জ্ঞান, দেখছি তো এ শহরের বাসিন্দাদের !···

কিন্তু উপায় নেই! কাজেই বাঘ-বাঘিনীরা শেষ পর্যন্ত মনের দুঃখে নিজেরাই একজোট হয়ে জনহীন শহরের পথে-পথে এদিক-ওদিক পায়চারী করে ঘুরে বেড়াতে সুরু করলো।

এমনি ভাবে শহরের নিস্তব্ধ পথে ঘুরে বেড়ানোর সময়, হঠাৎ তারা শুনতে পেলো—দূর থেকে সোঁ-সোঁ করে কি যেন একটা কলকব্জা-যন্ত্র-চলার অদ্ভুত শব্দ ক্রমেই তাদের দিকে ভেসে আসছে। শব্দটা কানে যেতেই অজানা কৌতূহল-ভরে বাঘ-বাঘিনীরা পথের মোড়েই থমকে দাঁড়ালো।

খানিক বাদেই সশব্দে হুড়মুড় করে পথের ওদিক থেকে তাদের সামনে হাজির হলো—একরাশ যাত্রী-বোঝাই বিরাট একখানা দোতলা মোটর-বাস! শহরের চৌমাথার মোড়ে যাত্রীদের নামানোর উদ্দেশ্যে বাসখানা সবেমাত্র দাঁড়িয়েছে…এমন সময় ইয়া-কেঁদো এক ছোকরা-বাঘের কি জানি খেয়াল হলো…আশপাশে কোন দিকে না চেয়ে প্রচণ্ড একটি হুঙ্কার দিয়েই সে তড়াক্ করে লাফিয়ে সটান্ চড়ে বসলো সেই পথ-চল্‌তি দোতলা বাসের মাথায়।

এমন আচমকা, জলজ্যান্ত কেঁদো বাঘকে সদর্পে দোতলা-বাসে উঠে আসতে দেখেই বাসের যাত্রীরা মায় উর্দিধারী কণ্ডাক্টার পর্যন্ত আতঙ্কে শিউরে চীৎকার করে উঠলো।

বাঘের গর্জন আর তাদের আর্তনাদ শুনে বাসের ড্রাইভার প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেও, সামনে পথের মোড়ে আরো তিন-তিনটি ইয়া-প্রকাণ্ড বাঘ-বাঘিনীকে একদৃষ্টে তার পানে তাকিয়ে থাকতে দেখেই বেচারীর প্রাণ তো খাঁচাছাড়া হবার জো! মারাত্মক বিপদের মাঝে হঠাৎ তার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল…সে আর তিল মাত্র বিলম্ব না করে, তাড়াতাড়ি কল টিপে গাড়ীর গতি দ্রুত করে দিলে…সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের বেগে যাত্রী-বোঝাই মোটর-বাস ছুটে চললো নিশুতি শহরের পথ মাড়িয়ে। গাড়ীর ভিতরে যাত্রীরা সব ভয়ে কাঁটা…এই বুঝি বাঘের মুখে বেঘোরে প্রাণটুকু যায়!

বাসের সওয়ারী বাঘের কিন্তু সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই…সে তখন গাড়ীর দোতলায় সুমুখের আসনটিতে বসে দিব্যি মজাসে শহরের দৃশ্য দেখার নেশায় মশগুল। বরং অপরিসর আসনে বসে দেখার অসুবিধা হচ্ছিল বলে, সে শেষ পর্যন্ত মানুষের ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের মতো কৌতূহলীভাবে মোটর-বাসের দোতলায় সামনের জানলার কিনারে সরে এসে দাঁড়ালো…সেখান থেকে আরো ভালভাবে নৈশ-শহরের দৃশ্য-শোভা উপভোগ করবে বলে।

ওদিকে পথের মোড়ে বাকী যে তিনটি বাঘ আর বাঘিনী তাদের সঙ্গীর দলে ফিরে আসার অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল, তারাও শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে আবার বেরিয়ে পড়ল শহর-প্রদক্ষিণ করতে। এ-পথ, সে-পথ, অনেক পথ মাড়িয়ে তারা তিনটিতে এসে হাজির হলো শহরের এক

বিরাট সৌখিন হোটেলের সামনে। হোটেল তখন লোকজনের ভিড়ে রীতিমত শরগরম···খানার টেবিলে নানান্ রকম পান-ভোজনের ব্যবস্থা···সুসজ্জিত হল-কামরায়, নাচ-গান-বাজনার আসর··· চারিদিকে রঙীন আলোর জলুস···বিচিত্র ঝাড়-বাতি-লণ্ঠন-ফানুসের বাহার···যেন স্বর্গের ইন্দ্রপুরীর আনন্দ-মজলিস!

রঙচঙে আলোর সাজসজ্জায় সাজানো সৌখিন-হোটেলের সামনে এসে বাঘ-বাঘিনীরা ভাবলো—কেন আর মিছে বাইরে পথে-পথে কুয়াশার মধ্যে ঘুরে বেড়ানো···জনপ্রাণী নেই···নিস্তব্ধ পথ···তার চেয়ে বরং এবার সেঁধুনো যাক্ ঐ জমকালো হোটেলের 'হলের' ভিতরে আনন্দ-আসরে! ওখানে কত সব লোকজনের সঙ্গে ভাব-সাব আলাপ পরিচয় হবে···দিব্যি আরামে খানা-পিনা, নাচ-গান-বাজনা আর মজা উপভোগ করা যাবে···চমৎকার কাটবে সময়টা!···নতুন একটা অভিজ্ঞতা লাভ হবে তো!

এই ভেবে তিন-তিনটি বাঘ আর বাঘিনী সটান গিয়ে হাজির হলো শহরের সৌখিন হোটেলের

দরজায়। চোখের সামনে আচম্কা একসঙ্গে এতগুলি জলজ্যান্ত বাঘ-বাঘিনীকে স্বাধীনভাবে হোটেলের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে, ঝকঝকে-পোশাক-পরা দরোয়ান, বেয়ারা, খানসামা সবাই

রীতিমত হকচকিয়ে গেল···দরজায় খিল এঁটে আগন্তুক-জানোয়ারদের বাধা দেওয়া তো দূরের কথা, হোটেলের লোকজন-খরিদ্দার যে-যেখানে ছিল, চোখের পলকে চোঁ-চা চম্পট দিয়ে যেদিকে যে পারলো পালিয়ে প্রাণ বাঁচাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলো। কেউ গিয়ে লুকোলো রান্নাঘরের উনুনের আড়ালে, কেউ বা বাসনের কাঁড়ির পিছনে, কেউ বা ছাদের-বারান্দার কার্নিশের কোণে, কেউ বা খিড়কীর উঠানে জড়ো-করে-রাখা কয়লার গাদার কন্দরে, কেউ বা পিয়ানোর ডালার নীচে, কেউ বা বাথরুমের, চৌবাচ্চার ভিতরে, কেউ ভাঁড়ার-ঘরে ডাঁই করে রাখা বস্তার পিছনে··· চারিদিকেই ছুটো-পাটি···যেন দক্ষযজ্ঞের পালা···সবাই আতঙ্কে অস্থির···কোনো মতো প্রাণটুকু বাঁচানো...এই শুধু চিন্তা! অমন জমজমাট মজলিস···ফুশ্-মন্তরে যেন সব মিলিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল! অত বড় সৌখিন হোটেলের চত্বর নিমেষের মধ্যেই সব একেবারে ফাঁকা···জনহীন···কোথাও কারো টুঁ শব্দটি পর্যন্ত নেই!

হোটেলের লোকজনের আজব কাণ্ড-কারখানা দেখে বাঘ-বাঘিনীরা তাজ্জব বনে গেল··· ভাবলো—খাশা বরাত যা হোক! কথায় বলে,—অভাগা যেখানেই যায়, সেখানেই নাকি সাগর শুকায়!···ব্যাপারটা দেখছি, ঠিক তাই হলো!···পথে আমাদের দেখেই লোকজন তো সবাই পালিয়ে অদৃশ্য হলো···তাই পথে ছেড়ে এলুম হোটেলে···এখানেও তো দেখি, সেই একই ঘটনা!··· নাঃ, এ শহরের বাসিন্দারা বাস্তবিকই বড় বেরসিক! এতদিন তাদের শহরে বাস করে কত কসরতীর খেলা দেখিয়ে খুশি করলুম···তার বদলে দোস্ত হিসাবে কোথায় আমাদের তারিফ করে আদর-আপ্যায়ন করবে...তা না, যে যেদিকে পারে চোঁ-চা চম্পট দিয়ে পালালো!...সত্যি বাপু···শহুরে সুসভ্য লোকজনদের আদবকায়দাই আলাদা...বুনো-জংলী হলেও, এমনটি কিন্তু আমরা কস্মিনকালে কল্পনাই করতে পারতুম না!···

এমনি সাত-পাঁচ ভেবে বাঘ আর বাঘিনীরা শেষে এগিয়ে এলো হোটেলের খানা-টেবিলের পাশে। হরেক রকম সৌখিন খাবারদাবার আর রঙীন পানীয় থরে থরে সাজানো টেবিলে। ভেড়ার মাংস, হাঁসের মাংস, মুরগীর মাংস, আর কত সব বিচিত্র-সুস্বাদু ভোজ্য···সুগন্ধে জিভে জল আসে, লোভ সামলানো দায়! তাছাড়া সারাক্ষণ পথে-পথে ঘুরে বাঘ-বাঘিনীদের খিদেও পেয়েছিল প্রবল। চোখের সামনে এমন ভূরিভোজনের এলাহি-ব্যবস্থা দেখে তারা আর রসনা-তৃপ্তির লোভ সংবরণ করতে পারলো না···উল্লাসের হুঙ্কার তুলে সোৎসাহে লাফ্ দিয়ে উঠলো সটান্ ভোজ্য-পানীয় সম্ভারে ভরপুর খানা-টেবিলের উপরে!

তারপর···

খাবারদাবার, মাংস···যা কিছু ডাঁই করে ছিল সাজানো সেই খানা-টেবিলের উপর... সবই প্রাণভরে উদরসৎ করতে সুরু করলো!

এদিকে সারা শহরে জুড়ে ততক্ষণে জেগেছে দারুণ আতঙ্ক-উত্তেজনা…মহা হুলুস্থুল কাণ্ড… রীতিমত বিভীষিকা! দমকা ঝোড়ো-বাতাসের মুখে খড়কুটোর মতো তীব্রগতিতে শহরের চারিদিকে খবর রটে গেল যে পথে জোড়া-জোড়া ইয়া কেঁদো জলজ্যান্ত-বুনো বাঘ আর বাঘিনী সদর্পে উন্মুক্ত অবস্থায় অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে! ওদিকে ভিন্-শহরের যাত্রী সার্কাসওয়ালাদের কিন্তু তখনও কোনো হুঁশ নেই, যে তাদের পলাতক-জানোয়ারগুলি সারা শহরে এতখানি বিভ্রাট বাধিয়ে বসেছে…নিশ্চিন্ত-আরামে পরমানন্দে তারা তখন সদলে পাড়ি দিয়ে চলেছে নতুন শহরের পথে!

লেইপ্‌জিগ্‌ শহরের অবস্থা কিন্তু রীতিমত সঙ্গীন…লোকজন সবাই উৎকণ্ঠায় আকুল…কেমন করে, কি উপায়ে এ বিপদ থেকে উদ্ধার মিলবে…এই চিন্তাই শুধু সকলের মনে!

গুজব ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই লোকের মুখে খবর পেয়ে থানার পুলিশ, কেল্লার ফৌজ, আর শহরের মাতব্বর শিকারীরা যে যেখানে ছিল, বন্দুক-পিস্তল, লাঠি-শড়কী, ঢাল-তলোয়ার হাতে নিয়ে দল বেঁধে বেরিয়ে পড়লো রাস্তায়-রাস্তায়। আরেক দল লোক ছুটলো সার্কাসওয়ালার সন্ধানে—সঙ্গে সরকারী পরোয়ানা…দলবল-সমেত তাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করে আনতে—শহরের পথে এতগুলো জলজ্যান্ত বাঘ-বাঘিনী ছেড়ে রেখে দিয়ে এমন বেহুঁশিয়ারী বিপজ্জনক-বিভ্রাট বাধিয়ে তোলার অপরাধে উচিত শাস্তিদানের ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে!

যাই হোক্, সারা রাত সবাই মিলে শহরময় টহল দিয়ে তন্ন-তন্ন করে খোঁজাখুঁজির পর, অবশেষে হোটেলের বিরাট হলঘরের এক কোণে সন্ধান মিললো সার্কাসওয়ালার সেই তিনটি বাঘ আর বাঘিনীর। পেট পুরে ভূরিভোজন সেরে, তারা তিনজন তখন সবেমাত্র দামী কার্পেট-মোড়া বারান্দার নিরালাপ্রান্তে শ্রান্তদেহভার এলিয়ে পরম নিশ্চিন্তে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করছিল। পুলিশ, ফৌজ আর শিকারীদের অতর্কিত-আবির্ভাবের সোরগোলে নিমেষই তাদের তন্দ্রা গেল ছুটে…চোখ মেলে চেয়েই দেখলো—চারিদিকে লোকজনের ভিড়…বন্দুক-পিস্তল, লাঠি-শড়কী-তলোয়ার উঁচিয়ে সবাই তাদের আক্রমণ করতে তেড়ে আসছে! ব্যাপারটা ঠিক ঠাওর করবার আগেই, আশপাশের বন্দুক-পিস্তল থেকে সশব্দে ছুটে বেরিয়ে এলো একরাশ চোখ-ঝলসানো তীব্র-আলোর তীর…সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড আর্তনাদ-হুঙ্কার তুলে, হোটেলের রঙীন-সৌখিন কার্পেট-মোড়া ঝকঝকে মার্বেল-পাথরের মেঝের উপর একের পর এক ছটফট করে লুটিয়ে পড়লো ইয়া-কেঁদো তিন-তিনটি বাঘ আর বাঘিনীর প্রাণহীন দেহ! অব্যর্থ হাতের টিপ! কারো বুক কারো মাথা, কারো পেট ফুঁড়ে সোজা গিয়ে বিঁধেছে শিকারীদের বন্দুক-পিস্তলের গুলি!

এই তিনটি পলাতক-প্রাণীর সঙ্গী যে বাঘটি দোতলা মোটর-বাসে চড়ে পরমানন্দে শহর-

প্রদক্ষিণে বেরিয়েছিল, তার সন্ধান মিললো অবশেষে—সরকারী-গ্যারাজের ডবল-কুলুপ-আঁটা কুটরীর অন্দরে। বাসের ড্রাইভার আর কণ্ডাক্টার বুদ্ধি খাটিয়ে বাসটিকে সটান্ গ্যারাজের মধ্যে হাজির করে, নিঃশব্দে শহরের দৃশ্য-শোভার স্মৃতি-মন্থনে মশ্গুল বাঘ-বাবাজীকে দোতলার জানালার ধারে স্বপ্ন-বিভোর অবস্থাতেই একা ফেলে রেখে পালিয়ে এসে চারিদিকে উঁচু পাচিল-ঘেরা কুটরীর দরজায় ডবল কুলুপ এঁটে দিয়েছিল বলেই সে যাত্রায় হাঙ্গামা মিটলো সহজে...নয় তো আরো কী দুর্ভোগ সইতে হতো—কে জানে!

যাই হোক, ফেরারী-আসামীর সন্ধান পেতেই শহরের লোকজনের সহায়তায় বহু কায়দা-কশরতের পর, সার্কাসওয়ালারা শেষ পর্যন্ত দোতলা মোটর-বাসের সওয়ারী তাদের সেই জলজ্যান্ত কেঁদো-বাঘটিকে ধরে-বেঁধে গ্রেপ্তার ক'রে আনলো মোটা-মোটা লোহার গরাদ-আঁটা মজবুত-খাঁচার কন্দরে...পলাতক-বাঘকে তার মধ্যে বন্দী করে রেখে, খাঁচার আষ্টেপৃষ্ঠে শক্ত করে জড়িয়ে বেঁধে দিলে মজবুত জাহাজী-শিকল—যাতে চোখে ধূলো দিয়ে খাঁচা ছেড়ে আর না বাইরে পালাতে পারে কোনদিন!

দুরন্ত বাঘ বন্দী হলো বটে, কিন্তু সার্কাসওয়ালার রেহাই মিললো না! হাঙ্গামা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ আর শহরের লোকজন মিলে সার্কাসওয়ালাকে দলবল সমেত সোজা টেনে নিয়ে চললো সরকারী থানার দিকে—বেহুঁশিয়ার হয়ে লোকালয়ে মারাত্মক দুর্ভোগ-সৃষ্টির অপরাধে উচিত-শাস্তির ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে!

হাসবো না কাঁদবো ?

শ্রীদিনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

শোনো বলি কাণ্ড যা ঘটেছিল কালকে
ভোর বেলা কোন কাজে যেতে হল শাল্‌খে।
ফিরতেও দেরি হলো, দিনটাও বাদলা,
পকেটেও কানাকড়ি নেই এক আধলা,
মেসেও হেঁসেল ফাঁকা, ভাত নেই কপালে
লাভও কিছু হবেনাকো ঠাকুরকে জপালে।
তার চেয়ে ঘরে বসে রেঁধে খাই খিচুড়ি
আলমারী খুলে দেখি হয়ে গেছে ঘি চুরি :
থাক্‌গে যা হয়ে গেছে, তেলেতেই রাঁধবো
ওমা দেখি তেলও নেই, হাঁসবো না কাঁদবো ?

অলিম্পিক হকি

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার

ভারতের একাদশ হকি খেলোয়াড় টোকিও অলিম্পিকের ফাইন্যালে (২৩শে অক্টোবর, ১৯৬৪) পাকিস্তানকে ১-০ গোলে পরাজিত করে হৃত সম্মান পুনরুদ্ধার করেছেন। আমস্টারডাম, লস এঞ্জেলস, বার্লিন, লণ্ডন, হেলসিঙ্কি, মেলবোর্ন—এই ৬টি অলিম্পিকে পর পর হকির ৬টি স্বর্ণপদক পাবার পর রোম অলিম্পিকের ফাইন্যালে পাকিস্তানের কাছে ভারতকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়।

১৯২৮ সালের অলিম্পিক হকিতে অংশগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ভারত এই খেলায় বিশ্বজয়ী হয়। ৩টি অলিম্পিকে পর পর জয়ের পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য দু'টি অলিম্পিক স্থগিত না থাকলে ভারত উপর্যুপরি ৮টি অলিম্পিকে বিজয়ী হ'তে পারতো।

সংক্ষেপে—

সাল	অলিম্পিক	বিজয়ী
১৯২৮	আমস্টারডাম	ভারত
১৯৩২	লস এঞ্জেলস	
১৯৩৬	বার্লিন	ভারত
১৯৪৮	লণ্ডন	ভারত
১৯৫২	হেলসিংকি	ভারত
১৯৫৬	মেলবোর্ন	ভারত
১৯৬০	রোম	পাকিস্তান
১৯৬৪	টোকিও	ভারত

এবারের অলিম্পিক হকি খেলায় ভারত যেভাবে খেলে জয়লাভ করেছিল তার তালিকা নীচে দেওয়া হল—

ভারত—২		বেলজিয়াম—০
ভারত—১		জার্মানী—১
ভারত—১		জাপান—১
ভারত—৬		হংকং—০
ভারত—৩		মালয়েশিয়া—১
ভারত—৩		ক্যানাডা—০
ভারত—২		হল্যাণ্ড—১
ভারত—৩	—সেমি ফাইন্যাল—	অস্ট্রেলিয়া—১
ভারত—১	—ফাইন্যাল—	পাকিস্তান—০

ভারতের খেলোয়াড়রা ছিলেন—চরঞ্জিত সিং, গোলকিপার—শঙ্কর লক্ষ্মণ, হাফ ব্যাক—মহীন্দার লাল, রাইট আউট—যোগীন্দার সিং, সেণ্টার ফরোয়ার্ড—হরবিন্দার সিং, ইনসাইড লেফ্‌ট—হরিপাল কৌশিক, লেফ্‌ট ব্যাক—ধরম সিং, রাইট ব্যাক—পৃথ্বীপাল সিং, ব্যাক ও হাফ ব্যাক—গুরুবক্স সিং, রাইট ইন—ভিক্টর জন পিটার এবং লেফ্‌ট আউট—দর্শন সিং।

ফাইন্যাল অর্থাৎ শেষ খেলা খুব প্রতিযোগিতামূলক হয়েছিল। শুধু প্রতিযোগিতামূলক নয়, দুই দলে বেশ একটা রেষারেষির ভাব এসে যাওয়াতে গায়ের জোর দেখানোর জন্য যেন দুই দলই একটু ব্যস্ত ছিল। কিন্তু রেফারীদের বিশেষ নিরপেক্ষতার জন্য শেষ পর্যন্ত খেলা ভালো-ভাবেই শেষ হয়েছিল।

আকাশ সেদিন মেঘাচ্ছন্ন ছিল, খেলার গ্রাউণ্ডে কিছুক্ষণ আগে হকির সেমি-ফাইন্যাল প্রতিযোগিতায় অস্ট্রেলিয়া ও স্পেনের মধ্যে খেলা হয়েছিল। এইজন্য গ্রাউণ্ডে কাদার সৃষ্টি হওয়ায় ভালো খেলা সম্ভবপর হয়নি। বেলা ৩টায় যখন খেলা চলছিল তখন একেবারে অন্ধকার হয়ে আসাতে, ইলেকট্রিক আলো জেলে খেলা শেষ করতে হয়।

ভারত অবশ্য সবচেয়ে ভালো খেলেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু ভালো খেলার জন্য আমরা পাকিস্তানকেও অভিনন্দিত করতে পারি।

ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট খেলা

ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট প্রতিযোগিতার কথা তোমরা সবাই জানো। ক্রিকেটের মধ্যে এই খেলাই সবচেয়ে প্রাচীন। তারপর অনেক দল এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছে। এরা কিন্তু সবাই কমনওয়েলথের সভ্য—যেমন, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ, ভারত, পাকিস্তান, নিউজিল্যাণ্ড। এই দলে দক্ষিণ আফ্রিকাও ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে এরা প্রায় দলছাড়া হয়েছে, কারণ কমনওয়েলথ ত্যাগ করায় এরা হয়ত আর এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবে না। ভারত

তো আর দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ক্রিকেট খেলবেই না, কারণ এই দুই দেশের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

এ বছরে দু'টি সবচেয়ে পুরাতন দল ইংল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ম্যাচ খেলা ইংল্যাণ্ডে হয়ে গেছে।

স্বদেশে ফিরবার মুখে এরা ভারতের সঙ্গে তিনটি টেস্ট ম্যাচ খেলে গেছে—মাদ্রাজে, বোম্বাইয়ে ও কলকাতায়। এই তিনটি খেলার ফলাফল এইরূপ—

মাদ্রাজে অস্ট্রেলিয়া এবং বোম্বাইতে ভারত জয়লাভ করেছে, আর কলকাতায় দু'দিন খেলার পর বৃষ্টির জন্য খেলা বন্ধ করতে হয়েছিল। সেইজন্য এই খেলাকে 'ড্র' বলেই গণ্য করা হয়েছে। অতএব বলতে পারা যায়, দুই দেশের সম্মান সমান সমান থেকে গেছে।

এই তিনটি খেলায় ভারতের ক্যাপ্টেন ছিলেন পতৌদির নবাব। ইনি ক্রিকেটে বিশ্ববিখ্যাত পতৌদির নবাবের পুত্র। পিতা বিলাতেই ক্রিকেট খেলায় শিক্ষিত হন এবং সেইখানেই বেশী গৌরব অর্জ্জন করেন।

১৯৫৯-১৯৬০ সালে রিচি বেনোর অধীনে অস্ট্রেলিয়ার একটি দল ভারতবর্ষে খেলতে এসেছিল। এই দল দু'টি টেস্টে জয়লাভ করে এবং একটি টেস্টে হারে এবং আরও দু'টি টেস্ট 'ড্র' হয়। অতএব বলা যেতে পারে, এই সিরিজে অস্ট্রেলিয়াই জয়লাভ করেছিল। এর আগে ১৯৪৭-৪৮ সালে ভারত অস্ট্রেলিয়ায় ক্রিকেট খেলতে যায়। এখানে ব্র্যাডম্যানের অধীনে ৪টি টেস্টে অস্ট্রেলিয়া জয়লাভ করে এবং একটি টেস্ট 'ড্র' হয়। যে তিনজন ভারতবাসী খেলোয়াড় ইংল্যাণ্ডের হয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলেছিল, তাঁদের মধ্যে ওঁর পিতা পতৌদির নবাব ছিলেন একজন। আরো আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই তিনজন খেলোয়াড়—রঞ্জিৎ সিংজী, দলীপ সিংজী ও পতৌদির নবাব—প্রত্যেকেই তাঁদের প্রথম টেস্ট খেলাতেই খেলাতে ১০০-র উপর রান করেছিলেন।

পতৌদির উপযুক্ত পুত্র বর্ত্তমান পতৌদির নবাব বিলাতেই ক্রিকেট খেলা শিখেছেন। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন 'ব্লু' ও ক্যাপ্টেন ছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে বর্ত্তমান ৩টি খেলার ২টিতে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। মাদ্রাজের টেস্ট খেলায় তিনি একটি সেঞ্চুরিও করেছিলেন।

অস্ট্রেলিয়ার ক্যাপটেন ববি সিম্পসনও একজন দুর্ধর্ষ খেলোয়াড়। তিনি ইংল্যাণ্ডের একটি টেস্ট খেলায় দু' ইনিংসে ৩০০-র উপর রান করেছিলেন। ভারতে ৩টি খেলাতেও তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বৃষ্টির জন্য কলকাতায় খেলা পরিত্যক্ত না হ'লে দুই দলের তিনটি খেলার হারজিতের একটা প্রকৃত হিসাব পাওয়া যেত।
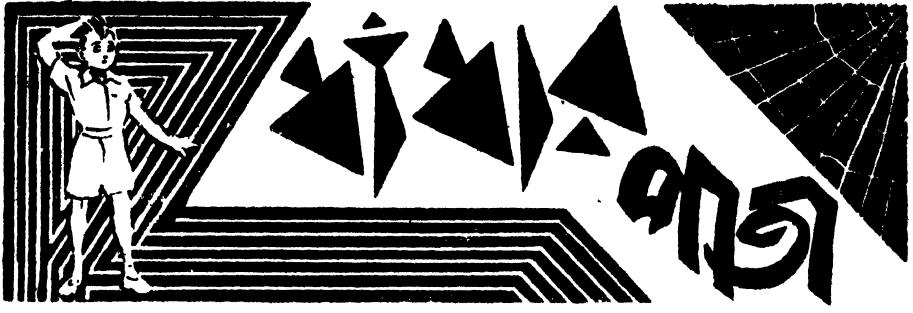
অ. দে.

আধুনিক শিল্পী

যুগ এটা অতি আধুনিক
শিল্পীর মাথাটাও বেজায় বেঠিক।
কি জানি কি এঁকেছে কিম্ভূতকিমাকার
জিগ্যাসিলে বলে, ওটা ছবি মোর আত্মার।
একটি তো চোখ শুধু ভূমিতলে পড়ে হায়,
বাকী সব হিজিবিজি কিছু বুঝা নাহি যায়।
বদ্ধ পাগল ঐ শিল্পীর খেয়ালে
চলবে না আমাদের নিজেদের জড়ালে।
চোখটার পাশে ঐ রয়েছে যে তীর—
ঐ রেখা-পথ ধরে চলো অতি ধীর—
এদিক-ওদিক যেন হারায় না পথ
কোন সংখ্যায় শেষ দাও দেখি মত।

বুদ্ধি নিয়ে খেলা

শ্রীননাগোপাল চক্রবর্তী

১। পিতা ও পুত্র উভয়ে যাত্রা করেছে। চলতে আরম্ভ করেছে তারা প্রথমে বাঁ-পা চালিয়ে। পিতা যখন তিন পা যান, পুত্র যায় দুই পা। কখন তারা এক সঙ্গে ডান-পা ফেলবে?

২। কোন্ দেশকে বলে ?

(ক) উদীয়মান সূর্যের দেশ। (খ) মধ্য-রাত্রিতে সূর্যের দেশ। (গ) হাজার-হ্রদের দেশ। (ঘ) দুই নদীর মাঝখানের দেশ।

৩। 'প' ও 'ম' র ঠিক মাঝখানের অক্ষরটি কি ?

৪। চলতি হলেও সত্যি নয়, অর্থাৎ নামে বা প্রচলিত কথায় চলে আসছে, আসলে কিন্তু তা নয়। কতকগুলি উদাহরণ দাও তো ?

৫। নীচের কুড়িটি শব্দের মধ্যে দুটি-দুটি করে এমন শব্দ বেছে সংযুক্ত কর, যার একটা অর্থ হয়। যথা—

FAT, COCK, LEG, DAM, CAR, RED, HEM, EAR, PET, DEN, WAR, COT, HAT, ANT, END, TALL, HER, END, PEN, TON.

৬। মইয়ের একেবারে নীচের ধাপে আমি দাঁড়িয়ে। আর পাঁচ ধাপ উঠলে মইয়ের ঠিকমাঝ ধাপে পৌঁছাব। মইতে কয়টি ধাপ আছে বল তো ?

৭। একটি আয়ত ক্ষেত্রের মধ্যে লম্বালম্বি ও খাড়া ভাবে তিন-তিনটি লাইন টেনে ক্ষেত্রটিকে মোট ষোলভাগ করা হ'ল। এর কোন্ ঘরে ১—১৬ মধ্যে কোন্ সংখ্যা লিখলে যে দিক থেকেই যোগ করা যাক্ সংখ্যাগুলির যোগফল হবে ৩৪ ?

স্নেক-ল্যাডার খেলা
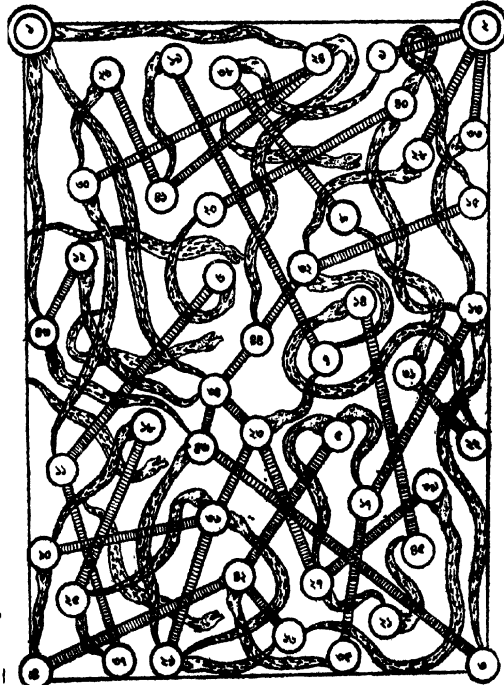
স্নেক-ল্যাডার খেলেছ তো ঘুঁটি ছক নিয়ে
এ ধাঁধার সমাধান হবে চোখ দিয়ে।
সাপ, মই, সংখ্যায় নক্সাটি আঁকা
চলো খুব সাবধানে পথ বড় বাঁকা।
পথে যদি সাপ দেখো মুখ হাতে ল্যাজে
নেমে এসো থেমো নাকো বাধা পেলে মাঝে,
ওপরের দিকে শুধু যাবে মই পেলে
পথে বাঁক নিও নাকো আধা সিঁড়ি ফেলে।
কোন কোন সংখ্যায় ছুঁয়ে পর পর
বল যাবে ১ থেকে ২ আঁকা ঘর।

পুজো শেষ হয়ে গেল। চারিদিকে এত দুঃখ-দৈন্যের মাঝে এই আনন্দের দিন ক'টি কেটে গেল কোন রকমে। যার যা আছে তাই দিয়ে পূজার দিনগুলি সব ভুলে গিয়ে আনন্দ পাবার নিশ্চয়ই চেষ্টা করেছ সবাই।

শরতের স্নিগ্ধতায় দেবী দুর্গা মর্ত্যে আসেন। মর্ত্যের অধিবাসীরা মায়ের আগমনের পথে তাকিয়ে থাকে,—মহাশক্তির আরাধনায় নিজেদের মনের শক্তি পাবার আশায়। সব কিছু বিঘ্ন-বিপদ দূর করে আবার নতুন আশায় বুক বেঁধে দাঁড়াবে মানুষ মা আসার জন্যে।

আগের দিনে শরৎকালে রাজারা যেতেন দিগ্বিজয়ে, ফিরে আসতেন পূর্ণ-গৌরবে। আজ তোমাদের শারদীয় বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে সে কথাই বলি—তোমরা দিগ্বিজয়ী হও, মহাশক্তি লাভ কর।

মহাজীবন থেকে—

স্বচ্ছসলিলা গোদাবরী। তারই তীরে প্রাচীন প্রতিষ্ঠান নগর। আজ থেকে পাঁচশো বছর আগের কথা। প্রতিষ্ঠান নগরের খ্যাতি তখন বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। বহু ধনবান লোকের বাসভূমি বলে নয়, বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র বলেই তখন প্রতিষ্ঠানের প্রসিদ্ধি।

জনবহুল নগরের এক প্রান্তে নদীর ধারে ছোট একখানি কুটীর। তাতে আভিজাত্যের কোনো চিহ্নই নেই, বিলাস-বাহুল্য তো দূরের কথা। খড়ে ছাওয়া মাটির দেয়াল-ঘেরা কুটীর। কিন্তু তার সর্বত্র নিখুঁত পারিপাট্যের পরিচয়। পরিষ্কার ঝকঝকে প্রাঙ্গণ, তার একধারে ফুলের বাগান, সৌখিন মরশুমী ফুল নয়—সাধারণ, কিন্তু বহু দেবভোগ্য ফুল ফুটে রয়েছে স্তরের পর স্তরে। বাতাসে ভেসে আসে তার মিষ্টি গন্ধ। নদীর কলতান আর ফুলের গন্ধ মিলে সৃষ্টি করে এক পরম তৃপ্তির পরিবেশ। অঙ্গনের অপর প্রান্তে তুলসী গাছ। প্রতিদিন সন্ধ্যার ছায়া নামার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে জেগে ওঠে ভীরু বিনম্র একটি দীপশিখা। তারপর শুরু হয় মধুর ভাববিহ্বল কণ্ঠে অপূর্ব নাম-কীর্তন। ভগবানের আরাধনায় মুখরিত হয়ে ওঠে কুটীরের প্রাঙ্গণ। দলে দলে নর-নারী এসে যোগ দেন সেই কীর্তন সভায়। মুখে তাদের তৃপ্তির প্রসন্নতা। চোখের কোণে আনন্দের জলধারা।

সেদিন বিকাল হতে না হতেই আকাশ ঘিরে শুরু হলো বর্ষণোদ্যও মেঘের আনাগোনা। বাতাসের বুকে জেগে উঠলো মত্ততার দাপাদাপি। সন্ধ্যার ছায়া ঘন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বেড়ে চললো মেঘ-হাওয়ার মাতামাতি—তবু প্রতি দিনকার মত তুলসীমঞ্চের জমাট অন্ধকার ভেদ করে ফুটে উঠলো নিটোল দীপের শিখা। ক্ষণকালের মধ্যেই ভেসে এলো ভক্তকণ্ঠ থেকে উৎসারিত সুরের লহরী—মেঘের দলের মধ্যেও যেন দেখা গেল নিশ্চল জড়তার লক্ষণ।

যথাসময়ে কীর্তন-সভার অধিবেশন শেষ হলো। সমবেত ভক্তরা তাদের শেষ প্রণাম নিবেদন করে ফিরে গেলেন নিজ নিজ ঘরে। তারপর থেকে শুরু হলো অবিরাম ধারায় বৃষ্টিপাত—আকাশের বুক চিরে নেমে এলো অশান্ত প্লাবন—ভেসে গেল নীচের মাটি। কুল ছাপিয়ে খরস্রোতে ধেয়ে এলো গোদাবরীর জলধারা। পরদিন সকালেও বিরাম হলো না বৃষ্টির। দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা এলো—তখনও চলছে একটানা বৃষ্টির ছপাছপ শব্দ। তবু সেদিনও তুলসীমঞ্চ ক্ষণেকের জন্ম উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো প্রদীপের আলোয়। কুটীরের মুক্তদ্বার থেকে প্রবাহিত হলো সঙ্গীতের সুর লহরী। আজ ভক্তসমাগম কম, কিন্তু ভক্তির স্রোতে নেই কোনো ভাঁটা।

রাত্রির দ্বিপ্রহরে কীর্তন সাঙ্গ হলো। কুটীরবাসী দু'টি মাত্র প্রাণী সেদিন অনাহারেই কাটালেন। প্রাঙ্গণ ঘিরে থৈ থৈ জল; শুকনো কাঠ-খড়ও ভিজে একাকার। উনান জ্বালানো সম্ভব নয়, তাই সেদিন বিগ্রহের পাদোদক সেবন করেই তাঁরা ক্ষুন্নিবৃত্তি করলেন।

গভীর রাত্রে কুটীরের বাইরে শোনা গেল ছপ ছপ পায়ের শব্দ—মানুষের কণ্ঠস্বর! উৎকর্ণ হলেন গৃহস্বামী। তারপর পদশব্দ যখন কুটীর লক্ষ্য করে ক্রমশঃ এগিয়ে এলো, দ্বারমুক্ত করে আলো হাতে তিনি দাঁড়ালেন—দেখলেন, ভিন্ন দেশী তিনটি ব্রাহ্মণ সিক্তবস্ত্রে দাঁড়ায়ে তার গৃহে আশ্রয় ও আতিথ্য কামনায়। গৃহস্বামী তাদের জানালেন আন্তরিক অভ্যর্থনা—নারায়ণ জ্ঞানে অতিথিদের নিয়ে এলেন তাদের একটি মাত্র শয়নগৃহে। অতিথিরা বহু চেষ্টা করেও কোথাও আশ্রয় পাননি, তাই শেষ পর্যন্ত এখানে এসেছেন আতিথ্যলাভের আকাঙ্ক্ষায়। সে আকাঙ্ক্ষা তাদের পূরণ হলো। প্রথমেই তাদের সিক্তবস্ত্র পরিবর্তন করার ব্যবস্থা করলেন গৃহস্বামী, তারপর সহধর্মিণীর সঙ্গে একটুক্ষণ কী যেন পরামর্শ করলেন।

শয়নগৃহে ছিল একটি মাত্র পালঙ্ক—গৃহস্বামী সেই পালঙ্কটা বারান্দায় বার করে তার কাঠ থেকে সংগ্রহ করলেন জ্বালানী। গৃহকর্ত্রী সেই জ্বালানীর সাহায্যে জল গরম করে অতিথিদের স্নানের ব্যবস্থা করলেন। তারপর পরম যত্নে তাদের জন্ম প্রস্তুত করলেন আহার্য। অতিথিরা এই অভাবিতপূর্ব সেবাযত্ন পেয়ে সেদিন যতখানি বিব্রত বোধ করেছিলেন তার চেয়ে বেশী বোধ করেছিলেন পরিতৃপ্তি।

দরিদ্র কুটীরবাসী যে মহাত্মা সেদিন অতিথির মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন নারায়ণ, মনের মধ্যে দেখেছিলেন জনার্দন—তিনি মহারাষ্ট্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান ধর্মগুরু একনাথ।

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত
ও তৎকর্তৃক প্রভু প্রেস ৩০ বিধান সরণী কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত। মূল্য ০'৪৫

আমাদের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু

(১৪ই নভেম্বর জন্মদিন স্মরণে)

* ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র *

৪৫শ বর্ষ] অগ্রহায়ণ—১৩৭১ [৮ম সংখ্যা

মৌমাছি

শ্রীরামকৃষ্ণ কর

মৌমাছি, মৌ এনে রচে 'মৌচাক'।
হইহই করে নাকো বাজায় না ঢাক ॥
যেখানেতে যত ফুল, সেথা যেতে মশগুল
মধু পিয়ে মধু নিয়ে যায় লাখে লাখ।
মৌমাছি, মৌ এনে রচে মৌচাক ॥

হোক্ সে ক্ষুদ্র প্রাণী, কাজ যে মহৎ।
সৎ কাজ করে শুধু, করে না অসৎ ॥

মধুর অনেক গুণ, নহে শুধু ফাঁকা তূণ
গাহে গান গুন্‌গুন্, তোলে কি যে গৎ।
হোক্ সে ক্ষুদ্র প্রাণী, কাজ যে মহৎ ॥

তোমরা ছেলের দল—দুরন্ত চঞ্চল।
ঢিল ছুঁড়ে ভাঙ চাক নিয়ে দল্‌বল্ ॥
মধু নিতে হয় ভুল, মৌমাছি ফোটায় হুল—
বেদনা-কাতর হও খেয়ে হলাহল।
তোমরা ছেলের দল—দুরন্ত চঞ্চল ॥

ভালবাসা-মধু যত করি সবে পান।
জ্ঞানী ও গুণীজনের কর জয়-গান ॥
মধুপের পথ ধরো মধু দিয়ে হিয়া ভরো
কর সবে কাজ এবে—কর মধু দান।
দেশের দশের হও, কৃতী সন্তান ॥

যে মাছি গরল ঢালে, তার মত হায়।
হয়োনাকো কভু ভাই, এই বসুধায় ॥
মানুষের মহা-অরি, তারে সবে ভয় করি
ছুঁলে রোগ বাড়ে শোক, এই দুনিয়ায়।
মধুপের মধু খেলে পরাণ জুড়ায় ॥

মধুপের মউ যাচি ভরো সবে 'চাক'।
আনন্দে বাজাও সবে আজি জয়-ঢাক ॥
আনো মধু আনো মধু, ওরে শ্যাম ওরে যদু—
খাবে খুকু, খোকা দাদু, লাগিয়ে দে' তাক্।
সেরে যাবে আধি-ব্যাধি, পুরে যাবে ফাঁক্ ॥

ব্যাঙ্‌ বাবাজী

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু

(১)

দু' ঠ্যাঙ ভেঙ্গে ব্যাঙের মতন উবু হয়ে, বোকনচন্দর পেছন ফিরে বসেছিল। তার মান বাঁচাবার অন্য পথ জানা ছিল না।

পিঁপড়েরা প্যাণ্টের ভেতরে ঢুকে, দাঁতে কামড়ে, তাকে ন্যাংটো করে ছেড়েছে। এম্নি অসভ্য!

ওরা একরত্তি হ'লে কি হয়। খাবারের গন্ধে দল-ভর্তি আসে। এসে কুকীর্তি করে। কোথায় ঢোকা মানা, তা মানে না। বে-আবরু করে দেয়!

মোয়া, নাড়ু, পায়েস নিজের ঘরে আয়েস করে খেতে বোকনের হাত গলে না হয় খানিক প্যাণ্টের তলায় গিয়েছিল। তাতে গলা বাড়িয়ে কিল্‌বিল করে পিঁপড়েদের আসার কোনও অধিকার ছিল না। কিন্তু তারা সেকেলে জুলুমবাজ লেঠেলের মত বেদখল করতে এসেছিল। এ ভাল কথা নয়। এ যেন, যার শিল যার নোড়া তারই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া!

বোকন ভাবছিল, পিঁপড়েদের এমনতর পাপ সইবে না। কিন্তু তা যেমন-তেমন, তাকেও ভুগতে হচ্ছে কম নয়। তার কোমর-খসা প্যাণ্টে তখনো রাজ্যের পিঁপড়ে চড়ে চড়ে মিষ্টি খাচ্ছে। সে প্যাণ্ট পরা চলে না। অথচ তার মত ঢ্যাঙ্গা ছেলে ল্যাঙ্গা হয়ে দোস্‌রা প্যাণ্টের খোঁজে অন্য ঘরে যেতে পারে না। চার পাশের টিকটিকি, আরশুলা, চড়ুই, পোকামাকড় দেখে দুয়ো দেবে।

মা ঘর শূন্যি করে গঙ্গাচানের পুণ্যিতে গেছেন।—ফেরার নামটি নেই। কাকে দিয়েই বা ও-ঘর থেকে একটা প্যাণ্ট জোঠান যায়?

সে গলা ছেড়ে হাঁকল, "মা, অমা।"

বাইরে থপথপ শব্দ হ'ল, আর কড়ড়-কড়ড় গলার খ্যাকারি। খোকন ভাবল মা ফিরেছেন। সে খুসী হয়ে বলল, "মা এসেছ? একটা প্যাণ্ট দাও তো। পিঁপড়েরা আমায় ন্যাংটো করে দিয়েছে। একলা ছেলেমানুষ পেয়ে জুলুম করেছে। অঁ্যা অঁ্যা।" তার গলা থেকে কান্না ফুটে বেরুল।

(২)

থপথপ শব্দ এগিয়ে এল, সঙ্গে কড়ড়-কড়ড় আওয়াজ। মায়ের কাছে তো আর লজ্জা নেই। তার কোলে সে ন্যাংটো এসোছল।

একটা বড়সড় জবড়জঙ্ কোলাব্যাঙ !...

সে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়। কিন্তু দেখে, ও মাগো, এ তো তার মা নয়। একটা বড়সড় জবড়জঙ্ কোলাব্যাঙ! সে ছু' ঠ্যাঙ জুড়ে ব'সে, ড্যাবডেবে চোখে তার দিকে চাইছে। তারপর মা ডাক শুনে যদি কোল পেতে তাকে টেনে নেয়, তা'হলেই হয়েছে আর কি!

ভয়ে আঁৎকে উঠে বোকন সরে যায়। মনে মনে বলে, ভিক্ষা চাই না গো, কুকুর সামলাও। লক্ষ্মী, সোনা। মিঠে কথা শুনে ব্যাঙটা এবার মিঠে শব্দ করল, ক্কড়ড়। অর্থাৎ, কিছু ভয় নেই বোকনমণি।

কিন্তু ভয় নেই বললেই তো আর সর সর বলে ভয়কে সরান যায় না। ভীতু মনে তা দুধের সঙ্গে সরের মত জুড়ে থাকে।

এত বড় ব্যাঙ এত কাছে থেকে বোকন কক্ষনো দেখেনি। সে দূর থেকে তার ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর গানই শুধু শুনেছে। তার ঘাড় নেই, গলা নেই,—চ্যাপ্টা মাথা গোত্তা মেরে বুক পিঠ পেটে লেপটে আছে,—নিস্কন্ধা ভূতের মত,—সে কথা সে জানত না।

ব্যাঙটা স্রেফ ন্যাংটো। কিন্তু তাতে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। সে ড্যাবডেবে চোখে দিব্বি ইতিউতি চায়। তারপর তার অনুমতির অপেক্ষা না করে, কুট কুট করে পিঁপড়ে খেতে থাকে। মেঝে যা ছিল খুটে খুটে খেয়ে, সে প্যান্টের গুলোও খায়।

বোকন অবাক হয়ে দেখে। যে পিঁপড়ে তাকে কামড়ে ন্যাংটো করে ছেড়েছে, ব্যাঙটা অনায়াসে তা সাবাড় করে। তারপর তার দিকে চেয়ে শব্দ করে, ক্রড়ড়।

টেলিগ্রাফের টরে-টক্কার মত আওয়াজ। বোকন বোঝে সে বলছে, হ'ল তো! তোমার শত্রু উজোড় করলেম, এবার ধাঁই কুড় কুড় ব'লে নাচ দিকি। আমরা মিতা হয়ে গেলাম। আর আমরা দু'জনেই যখন ন্যাংটো, এসো গলা ধরে গালগল্প করি।

হিসেব করে দেখলে তাতে বাধা নেই। কিন্তু তবু মনের ধাঁধা থেকে যায়।

বোকন বলে, "ব্যাঙ মানুষের ইষ্টি কুটুম ভাই-বেরেদার (ব্রাদার) নয়। তার সঙ্গে গলাগলি,—ছ্যাঃ!"

ব্যাঙটা গালে হাত দিয়ে ক্রড়ড় করে ওঠে। অর্থাৎ ব্যঙ্গ করে বলে, "আহা রে, গোমর দেখে আর বাঁচি নে। আর জন্মে আমরা মানুষ ছিলেম তাও জান না? তখন অনেক ফুটানী, গেরোম্বারি করেছি। পোলাও, মাংস, মিষ্টান্ন, আম, কাঁটাল আঙ্গুর, বেদানা,—জলসা, সিনেমা, ঝুমুর নাচ—।

সে কোমর বাঁকিয়ে নাচ দেখায়।

বোকন ঠাট্টা করে বলে, "ব্যাঙ ছিল মানুষ! আমি বুঝি জানিনে। অনেক কসরৎ করে ব্যাঙ, গিরগিটি হয় মানুষ, কিন্তু মানুষ হয় দেবতা। কক্ষনো ব্যাঙ হয় না। রাম বল!"

(৩)

ব্যাঙ রেগেমেগে মুখটা ভ্যাংচাল। ক্রড়ড়-ক্রড়ড় শব্দ করল। অর্থাৎ, তুমি আস্ত রামছাগল, তাই কিস্‌স্যু জান না। অনেক দেমাকে আমরাও তখন জানতেম না। ভাবতেম, সৃষ্টির সেরা করে ভগবান মানুষ গড়েছেন,—যা খুসী কর, স্বর্গ তো তার হাতের মোয়া। চুরি-চামারি, জাল-জোচ্চুরি, খুন-খারাপি ও নানা কুকাজ শুরু হ'ল। কিন্তু মৃত্যুর পর যম হিড়হিড় করে ভগবানের কাছে বিচারের জন্য টেনে নিলেন। তখন শ্রীভগবান বিশ্বকর্মা আর চিত্রগুপ্তকে বললেন, দেখ্ তো ওরা নাক, কান, চোখ, মন নিয়ে ফিরেছে কিনা।

তারা পরখ করে জানালেন, না প্রভু, কু'কাজ করে সব খুইয়ে এসেছে।

ভগবান চটেমটে বললেন, "কী, আমি দিলেম, আর ওরা খুইয়ে এল! সব ক'টাকে জুতিয়ে ব্যাঙ করে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দাও। খুঁজে বার করুক। ভাল কাজ করলে তা জুড়ে তবে ফের মানুষ হবে।" যেই বলা, বিশ্বকর্মা পটাপট জুতো পেটা শুরু করলেন। আর আমরা ব্যাঙ হয়ে গেলাম। নাক নেই, কান নেই, চোখ নেই, কাঁধ নেই,—একেবারে জবুথবু চেহারা।

আমরা কেঁদে বললেম, "প্রভু, চোখ ছাড়া খুঁজব কি করে, আর ঘাড় ছাড়া ইতিউতি দেখব কি করে?"—জুৎসই কথায় ভগবানের খুঁৎখুঁতি দূর হ'ল, তিনি জুতো মারা বন্ধ করলেন।

বিশ্বকর্মাকে বললেন, "ওহে একজোড়া ড্যাবডেবে চোখ দিয়ে দাও। কিন্তু ঘাড় নয়। যখন পরের বোঝা নিজের ঘাড়ে বইবার মত সুবুদ্ধি হবে তখন দিও।"

আমরা হাত-জুড়ে বললেম, "প্রভু, খোঁজাখুঁজির মেহন্নত তো কম নয়। মাংস, পোলাও, মোণ্ডামেঠাই খাবার ধাত। দিনরাত খাই খাই। ব্যাঙ হয়ে কি খাব?"

ভগবান বললেন, "কচু।"

শুনে গলা চড়্ চড়্ করে উঠল। শাকালু বলে ওলকচু খেয়ে দেখেছি তো। হাত কচলে বললেম, "গলা ধরে যে।"

ভগবান বললেন, "তা'হলে পোকা-মাকড়, পিঁপড়ে-টিপড়ে খাবে। কিন্তু দুষ্টুমী করলে সাপের পেটে যাবে।"

ভেব্ড়ে গিয়ে বুদ্ধি খাটিয়ে বললেম, "প্রভু, ব্যাঙ বড্ড ন্যাংটো নাম। তাতে বাবাজী জুড়ে সভ্য করে দিন।"

ভগবান চালাকী ধরে ফেললেন। বললেন, "ভেবেছ অহিংস বাবাজী নামে হিংসুক সাপকে এড়াবে? আচ্ছা, সত্যিকার বাবাজী হতে পারলে রেহাই পাবে।"—

তখন ভরসা পেয়ে জানালেম, "প্রভু, স্কুল-কাছারি-আপিসে প্রমোশনের রেওয়াজ আছে। আমাদের বেলা নেই?"

ভগবান বললেন, "আলবৎ আছে। ভাল কাজ কর, ব্যাঙ থেকে ভেক, ভেক থেকে মণ্ডুক, মণ্ডুক থেকে দাদুরী হয়ে যাবে। কবিরা তোমাদের নিয়ে কবিতা লিখবে—মণ্ডুক ছন্দে।"—

—'আদুরে ভাদর মাসে ডাকে দাদুরী'···

এর পর আর আবদার করা চলে না। আমরা ঘাটে-মাঠে, খানা-খন্দে নিস্কন্ধা ব্যাঙ হয়ে খোয়া-যাওয়া নাক কান খুঁজে খোনা সুরে বলাবলি শুরু করলেম,—

ভাই সব!

কি?

পেয়েছেন?

না।···

তোমরা বুঝি ভাব, আমরা মজা করে সুর ভাঁজি। উঁহু, আমরা কাঁদি। কিন্তু চ্যাংড়া ছোঁড়ারা আমাদের গায়ে ঢিল ছোঁড়ে আর ছড়া কাটে,—

ব্যাঙ বাবাজী, ঠ্যাঙে গরম পিঁয়াজী
টাটকা ভাজি মজা করে খেতে কে রাজী ?—

এখানে কেউ রাজী নয় ব'লে হয়ত ব্যাঙ-খেকোদের ডাকে।

প্যাণ্ট পিঁপড়ে-মুক্ত করায় বোকন তার ওপর খুসী হয়েছিল। বলল, "এক কাজ কর, ঘুড়ির সুতোয় একটা চিঠি বেঁধে ভগবানকে নালিশ পাঠাও। ওরা পাতি-ব্যাঙ হয়ে যাবে।"

কিন্তু ব্যাঙ বাবাজী তাতে রাজী নয়। কারণ পাজি ছোঁড়ারা ব্যাঙের সঙ্গে মিঠে বাবাজী নাম জুড়ে দিয়েছে। তারা তো বন্ধু লোক।

যারা কান মলে দেয় মিহিদানা—
মিতে তারা, কে জানে না ?···

(৪)

ব্যাঙ্‌ বাবাজী কড়ড়্‌ শব্দ করল। তার অর্থ, মেরে ফেলার জন্য তো আর ঢিল মারেনি। আসলে ওরা হাত সই করছিল। ওরা তো আর ব্যাঙ্‌ খায় না। সাপ তাড়াচ্ছিল। সাপের চেহারা নয় অথচ সাপ, অন্য দেশ থেকেও এখানে ব্যাঙ্‌ ধরতে আসে। ধরে রোষ্ট্‌ করে খায়।

বোকন বলে, "রোষ্ট কি ?"

কড়্‌ড়্‌—ব্যাঙ জানায়, ভাজা।

বোকন অবাক হয়ে বলে, "ব্যাঙ্‌ ভাজা খায় ? ওয়াক্‌ থু।" ব্যাঙ্‌ কড়্‌ড়্‌-কড়ড়্‌ শব্দ করে। অর্থাৎ, ব্যাঙ্‌ ভাজা তো ভাল। ওরা কি না খায় ? তেলাপোকা, ইঁদুর, টিকটিকি, গিরগিটি ! যেখানে-সেখানে হাত বাড়িয়ে জোটায় ! সেই পাপে ওদের কুঁৎকুতে চোখ, খাঁদা নাক। বড় হতে পারেনি, বর্বর হয়ে আছে। বোকন ঘাব্‌ড়ে গিয়ে বলে, "ঘরের সাপ, বাইরের সাপ,—সাট করেছে বুঝি ? ব্যাঙ খেয়ে লোভ হয়ে যদি মানুষ ভাজা খায় ?"

কড়্‌ড়-কড়্‌ড়্‌-কড়ড়্‌—। ব্যাঙ্‌ বাবাজী ধিতং করে বলে, রুখ্‌তে না পারলে খাবে। আমরা কিন্তু রোখার 'পেট্টিস' (প্রেকটিস—কসরৎ) করছি। পোকা-মাকড়-কেঁচো থেকে সাপ খাওয়া ধরেছি। সাপ-খেকো ব্যাঙের কথা কাগজে পড়নি ?

বোকন 'কথামালা' বই-ই পড়েনি, খবরের কাগজ তো দূরের কথা। তবু মান বাঁচাবার জন্য মিছে করে বলে, "হুঁ। ব্যাঙেরা সাপ খাচ্ছে বলে 'গোলমরিচ' আর 'শাঁখের করাত' সাপেরা বাপ বাপ করে পাহাড়-জঙ্গল পেরিয়ে পালাচ্ছে।"

ক্কড়ড়্ শব্দে শুধরে ব্যাঙ্ বাবাজী বলে, "শাঁখের করাত নয়,—শঙ্খিনী, আর গোলমরিচ নয়, দারাচ সাপ।"

বোকন লজ্জিত না হয়ে বলে, "খায় যখন নিচ্চয় মিষ্টি সোয়াদ। তার যে নামই বলো কিস্‌স্যু না। পিঁপড়ে খেয়ে তাগদ দেখালে,—এখন সাপ খেয়ে তাক লাগাও। তোমাকে ডবল প্রমোশন দোব,—ব্যাঙ্ বাবাজী থেকে ব্যাঙ্ মহারাজ!"

বাবাজীর চেয়ে মহারাজার অনেক মান। ব্যাঙ্ বাবাজীর মন আনচান্ করে ওঠে। মহারাজার দর্শনের জন্য লোকে প্রাণপণ ছোটে, কানা-চোখে পিট্‌পিট্ করে চায়।

ব্যাঙ্ বাবাজী চোখ মট্‌কে শব্দ করে, ক্কড়ড়্-ক্কড়ড়্। অর্থাৎ ডাক সাপকে। এক্ষুনি তাকে চট্‌কে খেয়ে চটক দেখাচ্ছি।

বোকন সাপকে বেজায় ভয় পায়। কিন্তু সাপ-খেকো জলজ্যান্ত ব্যাঙ্ বাবাজী কাছে রয়েছে। ভয়টা কিসের? সে এখন গলা ছেড়ে বল্‌তে পারে,—

ভূত আমার পুত, শাঁকচুন্নি আমার ঝি,
রাম-লক্ষ্মণ বুকে আছে, ভয়টা আমার কি?

বিনি পয়সায় সাপুড়ের খেল্ দেখা যাবে।

সে তু তু ক'রে সাপকে ডাক্‌ল। তারপর শুধ্‌রে বলল, "আয় হিস্ হিস্।"

(৫)

বোকন তন্ত্র জানে না, মন্ত্র জানে না। সে বেদে নয়, সাপুড়ে নয়। কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার! বাইরে থেকে সরাত্ করে একটা বড়সড় সাপ ঘরে ঢুক্‌ল। তারপর হিস্ হিস্ শব্দ করে চাইল। অর্থাৎ,—

আমায় কেন ডাকলে হিস্‌হিস্,
এই তো এলাম, দিতে হবে ফিস্।

ওরে বাব্বা, জিভ বার করে ফিস্ চাইছে যে। বোকন ভয়ে কেঁদে ফেল্‌ল। ব্যাঙ্ বাবাজীও কেঁচো হয়ে গেল। গলা থেকে কাঁচিয়ে-কুঁচিয়ে আর কড়্ড শব্দ বরুল না। একেবারে স্পীকটি নট্। সে তাড়াতাড়ি প্যাণ্টটার ভেতরে লুকিয়ে পড়ল। ন্যাংটো বলে নয়, পৈতৃক প্রাণটা বাঁচাতে। নিজে বাঁচলে তবে বাবাজী আর মহারাজ নাম!

সাপটা ফোঁস্ ফোঁস্ করে রকেটের মত প্যাণ্টটায় ছোঁবল মারল্। কিন্তু ততক্ষণে তুখোড় ফুট্‌বল খেলোয়াড়ের মত ব্যাঙ্ বাবাজী প্যাণ্ট্ থেকে লাফিয়ে বোকনের মাথায় সরে গেছে। বোকনের

প্যাণ্টের পকেটে একটা খেলার ব্যাঙ্ ছিল। চাপ দিলে তা ব্যাঙের ডাক ডাকে। সাপের ধাক্কা লেগে তা কড়্ড়-কড়ড়্ শব্দ করল। আর সাপ ভাব্‌ল সেটা ব্যাঙ্। কিন্তু পাশেই একটা মানুষ রয়েছে। হয়ত তার পোষা ব্যাঙ্। সেটাকে ধর্‌লে ঠেঙিয়ে দেবে। কাজেই ঠ্যাং খুঁজে ব্যাঙ্ ধরার বদলে সে গোটা প্যাণ্ট মুখে করে চট্‌পট্ পালাল। আড়ালে-আবডালে নিশ্চিন্তে ব্যাঙ্‌টা খাবে। তার কাতরানি গ্রাহ্য কর্‌বে না।···

বোকনের সখের প্যাণ্ট। তার পকেটে থাকা খেলার ব্যাঙ্‌টা আরও বেশী। রবারের হলে কি হয়, টিপ্‌লে চোখ ড্যাব্‌ড্যাব্ করে, ব্যাঙের ডাক ডাকে। তার শীত-বর্ষা নেই। ভরসা করে সে তা হাতছাড়া করে না। যখের মত আগ্‌লে থাকে। তা খোয়া যাওয়া কি সোজা ?

কিন্তু এম্নি ভয় তাকে ভর করেছিল যে, সাপটাকে সে ধর ধর করে আটকাতে পারল না। গলা থেকে স্বর বার হ'ল না, শরীর কাঁপল থরথর করে। ব্যাঙ্ বাবাজী যে মাথার ওপর চুড়ো হয়ে বসেছে, সে তা টের পেল না।

হঠাৎ মাথার তালুর কাছে কড়ড়্ কড়ড়্ শব্দ শুনে সে ধড়ফড় করে উঠ্‌ল। ব্যাঙ্ বাবাজীর গরব-করা স্বর,—আমার কেরামতি দেখলে ? বাবাজী তো, সাপ খাবার আগে সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে নিতে হয়। চোখ বুজে খালি জপতপ শুরু করেছি. ভীরু সজারুর মত সাপটা দে ছুট্!···

যা দেখেছে তাই ঢের! ব্যাঙের সাপ খাওয়া দেখার সখ বোকনের উপে গেছে। সাপ তো নয়, বাপ রে, কালো কুচ্‌কুচে ল্যাজওয়ালা একটা প্রেত! ভাগ্যিস্ ব্যাঙ্ বাবাজীর ভয়ে পালাল!

কিন্তু বাইরে আবার ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ হ'ল। বোকন কাঁপা-গলায় বলল, "ব্যাঙ্ বাবাজী!"

ব্যাঙ বাবাজী মিহি শব্দ করল কড়্ড়। বোকন ভাব্‌ল সে বল্‌ছে, এবার এলে নির্ঘাৎ ধরে খাব। কিন্তু আসলে সে কাত্‌রাচ্ছিল,—এই সেরেছে! প্যাণ্টে খুঁজে না পেয়ে ফিরে আস্‌ছে যে! পালাই। ভয়ে সে বোকনের মাথায় অপকর্ম করে ফেলল। তারপর লাফ মেরে জানালা গলে উল্টো দিকের জঙ্গলে লুকাল।—

বোকন কাতর স্বরে বলল, "যেও না ব্যাঙ্ বাবাজী। পায়ে পড়ি। কিন্তু পড়ি-কি-মরি সে একটা গর্তে পাড়ি জমাল। সেখান থেকে কড়ড় শব্দ করল। অর্থাৎ, তোমার মাথায় বিষ্ঠা ও মূত্র রেখে এসেছি বোকন। সে গন্ধে সাপ কাছে ঘেঁষবে না। ল্যাংটো সাপ তোমার প্যাণ্ট নিয়ে ক্ষতি করেছে। কিন্তু তা পরে সভ্য হলে ক্ষতি পূরণ হয়ে যাবে। দুঃখ করো না হে!—

বোকন মনে মনে ব্যাঙ্ বাবাজীকে বলে, থ্যাঙ্কু (ধন্যবাদ)!···

গণ্ডগোল

শ্রীউমা দেবী

"তালপাতারই টোকনা পেয়ে তবলা বাজায় ব্যাঙের পো,
রোদ্দুরে ঐ বুড়ীর বড়ি কাগেরা সব মারছে ছোঁ।
ছ্যাঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ ছিঃ,
হচ্ছে এটা কি!
দিলদরিয়ার দেদার টাকা চাইলে পরেই বলছে "No"—
পড়ুয়া সব স্কুল পালিয়ে সুযোগ পেলেই বেবাক বোঁ।—

টিকটিকিরা নাড়ু পাকায় দিচ্ছে নাকো ডিমে তা,
কুকুরগুলো দুলিয়ে মাথা গাইছে তাইরে নাইরে না"—
—"ছোঃ ছোঃ ছোঃ ছ্যাঃ—
কি করবি তুই—য্যাঃ—
যা খুশি তাই করবে সবাই সহ্যি না হয় বাইরে যা,
বগল বাজা ঠ্যাং নাচিয়ে, ঘুঘনিদানা চাট্নি খা।"—

"বাবু দাদু মামু কাকু—সবার মাথাই গণ্ডগোল,
ধমধমিয়ে তবলা পিটোয় ভুলে গেছে তালের বোল,
ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছোঃ—
বাক্যিবাগীশকো
কান ধরে তুই 'লে আও' টেনে পা ধরে সব শিকেয় তোল,
ট্যাঁ শুনলেই সবাই মিলে চেঁচিয়ে উঠে দে হরিবোল!"

নূপুর

শ্রীসমর চট্টোপাধ্যায়

[হান্‌স্ ক্রীশ্চান এণ্ডারসন্ কয়েক যুগ বিশ্ব-সাহিত্যের সাম্রাজ্যে সম্রাট হয়ে রয়েছেন। কোপেন হেগেন-এ আমরা তাঁর প্রতিমূর্তি, তাঁর নামের বুলভার্ড (রাস্তা) দেখে এসেছি। 'শিশু রংমহল'-এর দল ১০৭ বছরের পুরোনো থিয়েটারে—যেখানে এ্যাণ্ডারসনের নাটক অভিনয় হ'ত, সেখানে অভিনয় করে এসেছে।

সেখানকার লোকেরা শুধিয়েছিল, "তোমরা কি হান্‌সের গল্প কখনো অভিনয় করেছ? করিনি তো!"

হান্‌সের গল্প—"রেড শু।" লাল জুতো। "Red Shoe" পড়েছ কিনা জানি না। না পড়লে একবারটি পড়বে নিশ্চয়ই।

ঐ "Red Shoe"-কে অবলম্বন করে 'শিশু রংমহল'-এর—"নূপুর"। জুতো পরে, অর্থাৎ Ballet Shoe পরে ভারতীয়েরা নাচে না; কিন্তু সুন্দর পায়ে একজোড়া নূপুর পরে যে ঝংকার তোলা যায়—তা আর কোথাও পৃথিবীতে কেউ দেখি না। "নূপুর" হান্‌সের গল্প হলেও, ভারতীয় পরিবেশে আমাদের একান্ত নিজস্ব। পৃথিবীর সমস্ত গল্প ভালো করে পড়ে দেখলে বুঝবে, যে মানুষে মানুষে একটুও তফাত নেই। সেই "নূপুরের" গল্পটি তোমাদের উপহার দিচ্ছি। পড়ে যদি ভালো লাগে এবারকার শীতকালের ফেস্টিভালে নূপুরের অভিনয় দেখে যেও।]

১ম দৃশ্য

সে অনেক দিনের কথা। একটি দক্ষিণী-মন্দরের গোপুরম। সামনে মন্দিরে ঢোকবার বৃহৎ সিংদরজা। পথ চলে গেছে দুটি দু'দিকে—আর একটি রাস্তা এসে শেষ হয়েছে মন্দিরের গোপুরমের দরজায়।

রাস্তার সামনে একটি চত্বর। সেখানে একটি ছোট্ট সুন্দর বিপণি। এখানে একটি ভারী সুন্দর আধ-বুড়ো লোক দোকানে বসে বসে চমৎকার নূপুর তৈরী করছে। কি চমৎকার তার দেহটি, যেন পাথর কুঁদে তৈরী। লোকজন পথ দিয়ে চলাফেরা করছে। ছোট ছেলেমেয়ে দেখলেই সে কাজ থামিয়ে তাদের দেখছে—পায়ের দিকে, মুখখানার দিকে। তারপর মাথা নেড়ে আবার নূপুরের ছোট ছোট দানাগুলি রেশমের সুতো দিয়ে বুনছে।

দোকানের যে সুন্দর ঝাঁপটি বসানো তাতে অনেকগুলি নূপুর সাজানো। সবার ওপরে একটি জোড়া লাল রেশমের ওপর বোনা চমৎকার দুটি নূপুর। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। একটু নড়লেই যেন বীণার আওয়াজ।

দোকানী কাজ করতে করতে গুন্‌গুন্ করে গান গাইছে—

"গড়ে যাই আমার নূপুর
সর্‌গম্ দানা দিয়ে।
কবে সে উঠবে বেজে
কাহার পায়ের ছোঁয়া নিয়ে।
যে সুরে নূপুর বাঁধা
সে সুরেই সাধা চরণ
তালে তার উঠ্‌বে ধ্বনি
ঝুরিবে সুরের ঝরণ।
এ নূপুর তারেই সাজে
সুরেলা-হৃদয় আছে—
দেবো তাকে আমার নূপুর
শুধু তার হাসি নিয়ে—
গড়ে যাই আমার নূপুর
সরগম দানা দিয়ে।

"ওগো নূপুরওলা, এক জোড়া নূপুর দেবে?"

একটি মেয়ে নাচতে নাচতে এল তাঁর কাছে।

"নূপুর চাই? দেখি দেখি তোমার পা দু'খানা?"

ঘাঘরাটি একটু তুলে মেয়েটি তার পা দু'খানা তুলে দেখাল। ছোট্ট পা দুটি কিন্তু—

"না ভাই, তোমার পায়ে দেবার মত নূপুর আমার নেই।"

"নেই?" হতাশার সুর বাজল মেয়েটির প্রাণে।

"কোথা রে ঝুম্‌কি? ওমা এইখানে কি কচ্ছিস?" বলল মেয়েটির মা।

"হ্যাঁ মা, নূপুর নেবো—কিন্তু ও বলছে আমার পায়ে দেবার মত নূপুর নেই—"

"না আছে নেই নেই! নূপুর?—নূপুর দিয়ে হবেটা কি—চল্ চল্।"

মেয়েটিকে নিয়ে মুখ-ঝাম্‌টা দিয়ে চলে যাবেন মা।

নূপুরওলা মুখ না তুলেই গান গাইছে—

"এ নূপুর তারেই সাজে
চরণে যার ছন্দ আছে
দেবো তাকে আমার নূপুর
শুধু তার হাসি নিয়ে।"

"ওগো ও নূপুরওলা—তোমার নূপুর আমার পায়ে বাজছে না।" এল একটি ছেলে।

"বাজছে না?"

"না গো। কত সাধলুম—কেমন যেন বোদা আওয়াজ—"

"দেখি দেখি!" হাতে নিতেই ঝুম্‌ঝুম্ করে উঠলো নূপুর যুগল।

চমকে উঠলো নূপুরওলা।

"এই তো বাজছে—"

"তাই তো! আমার পায়ে বাজেনি কেন?"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নূপুরওলা তার দিকে তাকাল। তারপর—

"যা যা যা চলে যা।
এ নূপুর বাজবে না তোর পায়ে—
বাজবে না॥"

ভয় পেয়ে ছেলেটি পিছনে গেল। গাইল নূপুরওলা—

"তুই গুরুকে হেলা করেছিস
অবজ্ঞা করেছিস্—
তোর পায়ে কি নূপুর বাজে—
যা যা যা চলে যা—
এ নূপুর বাজবে না তোর পায়ে
বাজবে না॥"

ভয় পেয়ে ছেলেটি এক পা দু'পা করে সরে গেল।

নূপুরওলা নিজের মনেই বলতে লাগল—

"নাচের ছন্দ মহেশ্বরের পায়ের ছন্দ।
নটরাজের হৃদয়স্পন্দন। সবার
গুরু যে নটরাজ তার অংশ রয়েছে যে

নৃত্য-শিক্ষকের অন্তরে। তিনি নাচালে
তাই তো নাচিস্। তাকে হেলাফেলা!
পাষণ্ড! তোর পায়ে নূপুর বাজবে?"

হৈ হৈ করে ঢুকলো একদল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে—

সবাই ॥ "ও নূপুরওলা চট্‌পট্‌ নূপুর চাই—"

নূঃ ॥ "ব্যাপার কি? এতো তাগিদ?"

২য় ॥ "হবে না; মা-সরস্বতীর প্রাঙ্গণে
আমাদের নাচ হবে যে—।"

নূঃ ॥ "বটে! তবে তো নূপুর পায়ে দিতেই হবে।"

৩য় ॥ "হবেই তো, আমাদের সবাইকে।"

৪র্থ ॥ "নাচবার জন্য পা নাচছে যে—।"

নূঃ ॥ "ও! নাচবার জন্য পা নাচছে?"

নূপুরওলা তার প্যাটরা থেকে ছোট ছোট নূপুর বার করে বাচ্চাদের পায়ে পরিয়ে দিল। তারাও নাচতে নাচতে চলে গেল।

"আচ্ছা নূপুরওলা, ঐ যে লাল রেশমের ওপর বসানো নূপুর ঐটি আমায় দাও।"

চম্‌কে উঠলো নূপুরওলা—

তাকিয়ে দেখলো মেয়েটির দিকে—

তারপর বলল— "না গো দিদি না—
ও তোমার জন্য নয়।"

মেয়েটি বলল— "নয় কেন? দেখ দেখ
আমার কি সুন্দর পা—"

নূপুরওলা বলল— "তোমার পা দুটি ভারী সুন্দর
সেজন্যই তো এ নূপুরটি তোমায় দিলুম"—

ব'লে ঝাঁপ থেকে হলুদে রেশমে গাঁথা একটি জোড়া নূপুর তুলে তার পায়ে পরিয়ে দিল।

মেয়েটি ঠোঁট উলটে বলল—

"ঐ লাল রেশমের নূপুর পায়ে দেবার মত বুঝি আমার পা সুন্দর নয়?"

একদৃষ্টে নূপুরওলা তার দিকে তাকিয়ে রইল—তারপর আপন মনেই যেন বলল—

"দিদি গো
ও নূপুর পায়ে দেবার মত
দু'খানি পা খুঁজে পেলাম না—
আমি হেথায় বসে আছি
কবে অমনি দু'টি চরণপদ্ম পাব—।
তার পায়ে লাল রেশমের
নূপুরটি পরিয়ে দিয়েই আমার ছুটি।"

মেয়েটি রেগে উঠে বলল—"আচ্ছা গো আচ্ছা—যে দিন অমনি চরণপদ্ম পাবে—একটু জানিও। তার পায়ের চন্নামেত্ত নিয়ে জীবন সার্থক করে যাব।"—বলেই মেয়েটি হলদে রঙের নূপুর জোড়া পা থেকে খুলে ফেলে দিয়ে চলে গেল।

নূপুরওলা সযত্নে তা তুলে রাখতে গিয়ে কি মনে করে একটু হেসে আবার তা বাইরেই রাখল।

সময় হয়েছে—এখন ঝাঁপ বন্ধ করে তাকে ঘরে যেতে হবে। সে অনেক দূর। দোকান বন্ধ করতে করতে সে গাইতে লাগল—

"মোর হৃদয়ের ভক্তি দিয়ে
গড়েছি মা রঙিন নূপুর—
(মাগো) কার পায়ে মা পরাব বল
কোথায় বা সে কোন সে সুদূর!
মুক্তি আমার মিলবে যে মা
রক্ত-নূপুর পরিয়ে দিয়ে—
চরণে যার ছন্দ আছে
তার চরণের ছন্দ নিয়ে।"

বলতে বলতে দোকানী তার ঝাঁপ বন্ধ করল। সেই লাল রেশমে গাঁথা নূপুরটি ঝাঁপের আড়ালেও যেন দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলতে লাগল। দোকানী চলে গেল। আস্তে আস্তে অন্য দিক দিয়ে এল সেই মেয়েটি।

"ওঃ চলে গেছে। কেন আমায় লাল নূপুর দিল না ও। আশ্চর্য! বন্ধ ঝাঁপের ভেতর থেকে লাল আলো বেরুচ্ছে। কে পরবে গো ওই নূপুর?

আহা হলদে নূপুরটাও—
ওমা এই তো রেখে গেছে ঝাঁপের বাইরে।"

মেয়েটি নূপুরটি পায়ে যত্ন করে পরল।
এও বেশ সুন্দর—তাই না। বেশ মানিয়েছে।
তাকিয়ে রইল নিজের পায়ের দিকে—
দৃশ্যটি মিলিয়ে গেল।

২য় দৃশ্য

নগরের প্রান্তে একটি ছোট্ট কুটীর, তার সামনে একটি সুন্দর উঠোন। পাঁচ-ছ'টি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে একটি আট বছরের মধ্যমণি মেয়েকে ঘিরে খেলছে বা নাচছে। নাম তার নূপুর—

"মোদের পায়ে চলন লেগেছে
(আহা) নাচন লেগেছে
আজ প্রভাতে কাহার পায়ের
ছোঁয়া লেগেছে
আহা নাচন লেগেছে।
আলোর রঙে উঠছে ধ্বনি
বাজছে মধুর বীণা
ঢেউ দিয়ে কয় সুরের বোঝা
আমায় চিনিস্ কিনা?
সাদা মেঘ হাতছানি দেয়
চমক লেগেছে
আহা নাচন লেগেছে।"

নাচতে নাচতে ছেলেমেয়েরা থেমে গেছে—কিন্তু নাচছে নূপুর। আর তার দিকে তাকিয়ে আছে সবাই। পায়ে যেন ফুল ফুটছে—কোন দিকে নূপুরের লক্ষ্য নেই। আপন মনেই নেচে চলেছে।

দাওয়ার ওপরে দাঁড়িয়ে বাবা, মা ও প্রতিবেশী কয়েকজন—ওদের নাচ দেখছেন।

নূপুর নাচছে আর গাইছে—

"ঢেউ দিয়ে যায় কাশের বোঝা
আমায় চিনিস্ কিনা?"

এমনি সময়ে এল সেই মেয়েটি যে কিছুক্ষণ আগে হলদে নূপুর কিনে এনেছে। নাম তার কাঁকন। পায়ে তার হলদে নূপুর। তার পায়েও আজ নাচন লেগেছে। হলদে নূপুরটি যেন বলছে—

"নাচ নাচ নাচ কাঁকন নাচরে
তোর পায়ে দিলেম ছন্দ
কাঁকন নাচ রে
ও তুই নাচ নাচ নাচ !"

কাঁকন নাচছে—আর ছেলেমেয়েরা অবাক হয়ে দেখছে। কাঁকন এত ছন্দ পায়ে ওঠাল কবে থেকে ? নাচ থামলে নূপুর শুধালো—

নূপুর : ও কাঁকনমালা
তুই নাচলি না তোর নাচল নূপুর ?

সবাই : ও তুই কোথায় পেলি হলদে নূপুর ঘুঙুর ?

নূপুর : ও তুই নাচলি না তোর নাচল নূপুর ?
"ভিন দেশী এক নূপুরওলা সেথায় এসেছে।
ঠাকুরঘরের দুয়ার যেথায় পথে মিশেছে।
ছোট্ট বিপণি !
(সেথায়) জোড়ায় জোড়ায় নূপুর তোলে
সুরের কিংকিণী।
আমি চেয়েছিলাম রক্ত-নূপুর !
একটু হেসে সে
বললে, "বাছা হলদে নূপুর—
এই যে রয়েছে—
আমি তাই পরেছি পায়ে
নানান ঢঙে ছন্দ আমার পায়ে উঠেছে
ভিন দেশী এক নূপুরওলা সেথায় এসেছে।"

নূপুর : রক্ত-নূপুর ?

কাঁকন : আহা ! রক্ত-নূপুর !
"রক্ত গোলাপ পাপড়ি
তাতে সোনার নূপুর দানা
তাকিয়ে যেন বলছে—
তফাত ! আমায় ছুঁয়োনা না।"

আর নূপুরওলা বলছে—

"আমি তবেই পাব ছুটি
যোগ্য পায়ে পরাবো সে
কোথায় চরণ দু'টি ?"

আমিও বলে এসেছি—"নূপুরওলা—

যেদিন তোমার মিলবে চরণ দু'টি
আমায় তুমি জানিয়ে দিও
আসব আমি ছুটি
যতন করে যুগল চরণ ধুইয়ে দেব জলে
তোমার হবে ছুটি।"

হঠাৎ কাঁকন বললে—

নূপুর !
ও রক্ত-নূপুর তোমার পায়ের জন্য নয় তো ?

ছেলেমেয়েরা : নূপুর—ও তোমারই।
চল সেই নূপুরওলার দোকানে—

কাঁকন : কিন্তু ভাই সে তো এখন দোকান খুলবে না—

সবাই : তবে ?

কাঁকন : কাল ভোরে যখন মন্দিরের ঘণ্টা প্রথম প্রভাতি সুর বাজবে—তখন নূপুরওলা মন্দির প্রদক্ষিণ করে—গোপুরমের চত্বরে তার দোকান খুলবে—

নূপুর : বেশ কাল যাব তোমার ঐ রক্ত-নূপুরের খোঁজে—
"মোদের পায়ে চলন লেগেছে—"

নাচতে নাচতে ছেলেমেয়েরা চলে গেল।

নূপুরের মা : গুরুজীকে শুধোলেন—

"ঐ আমার মেয়ে ওকে আপনি শিক্ষা করে নিন।"

"না মা ! আমায় ক্ষমা কর—ওর শিক্ষার ভার নেওয়া আমার সম্ভব নয়—"

"তবে কি ওর গুরু মিলবে না ?"

"ভেব না মা ! স্বয়ং নটরাজ যার গুরু সে কন্যাকে শেখাবার স্পর্ধা আমার নেই।" বলে গুরু চলে গেলেন। মা স্তব্ধ হয়ে রইলেন—বাবা নির্বাক।

(ক্রমশঃ)

রাত্রির অন্ধকার। আসামের পাহাড়ী অঞ্চল। মণিপুরের প্রায় বিশ মাইল দূরে গভীর জঙ্গলাকীর্ণ পার্বত্যভূমি। একটি টিলার মাথায় বড় বড় খুঁটির উপর ছোট একখানি ঘর। ঘরের সামনে এক ফালি ঝুল বারান্দা। সেই বারান্দায় বেতের দু'খানি চেয়ারে চুপ করে বসে আছে রণজিৎ ও বিশ্বনাথ। রণজিৎ এখানকার ফরেষ্টার আর বিশ্বনাথ মিলিটারী রক্ষী। দুজনেরই হাতের কাছে দুটি বন্দুক, দেয়ালের গায় দাঁড় করানো আছে। রণজিতের কোলের উপর একটি বাইনোকিউলার। রণজিতের এখন কাজ হলো, দিনে-রাতে লক্ষ্য রাখা, কোথাও মশাল জ্বললে, বা নাগাদের কোনরকম সন্দেহজনক গতিবিধির সংবাদ পেলেই ইম্‌ফলের হেড কোয়ার্টারে খবর দেওয়া। নাগা বিদ্রোহীরা এই অঞ্চলে বহু উৎপাত করে গেছে, ভারত সরকার তার প্রতিকার করতে চান।

মাত্র কয়েকদিন রণজিৎ এখানে এসেছে, এর মধ্যেই এই কাজ তার দুঃসহ হয়ে উঠেছে। পাঁচ বছর ছিল বাদামী পাহাড়ে। সেখানে রাতে আলো জ্বালার বাধা ছিল না। ওঁরাওদের সঙ্গে বসে বসে গল্প করা চলতো, কোন সময়েই একটা শংকিত ভাব নিয়ে চলতে হতো না। আর এখানে সদাই শঙ্কা, রাতে আলো জ্বালতে ভয় করে। আলো লক্ষ্য করে দূর থেকে গুলি চালানোর

সুবিধা। গাঁয়ে গিয়ে নাগাদের সঙ্গে আলাপ করার সুবিধা নেই, তাদের কথা বোঝা যায় না। বিশ্বনাথ ছাড়া দ্বিতীয় সঙ্গী নেই।

দিনের চেয়ে রাতে ভয় বেশী, তাই রাত্রেই যতটা সম্ভব জেগে কাটায়, তারপর দু'জনে পালা করে জাগে। তাও জাগা বললেই জাগা, সব সময় কানের পাশে মশা বোঁ বোঁ করছে। সর্বাঙ্গ ঢেকে বসে থাকতে হবে। হাত পা কোনখানে এতটুকু ফাঁক রাখার জো নেই, নাইলনের বড় রুমাল দিয়ে মাথা থেকে ঢেকে রাখে গলা অবধি। তাতে দেখতে কোন বাধা হয় না। এভাবে রাতের পর রাত বসে থাকা যে কি কষ্ট, তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বোঝে না।

সেদিন গরমটা একটু বেশী পড়েছিল। সহজে ঘুম আসার কথা নয়, তবু রণজিৎ বিশ্বনাথকে বললো—তুমি এখন একটু ঘুমিয়ে নাও, রাত দুটো নাগাদ আমি তোমাকে তুলে দেবো'খন।

সেইখানেই একখানি চাটাই বিছিয়ে বিশ্বনাথ সর্বাঙ্গে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লো। রণজিৎ অকারণেই বাইনোকিউলারটা চোখে ধরে অন্ধকার জঙ্গলের পানে তাকিয়ে রইল। ইতিমধ্যে নবমীর চাঁদ দেখা দিল গাছের মাথায়। চাঁদের আলোয় বনভূমির ভয়াল অন্ধকার স্নিগ্ধ ছায়াময় হয়ে উঠলো। চাঁদের পানে তাকিয়ে রণজিৎ কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলো।

কোন এক সময় রণজিতের মনে হলো নীচে বনভূমির মধ্যে কালো মত কি যেন একটা নড়ছে। ভালুক বেরুলো নাকি? কিন্তু ভালুক চলাফেরা করলে অমনভাবে তো চোখে পড়বে না। ছায়াটা যেন খুব বড় বলে মনে হয়। কোন হাতী দল থেকে ছিট্‌কে এলো নাকি? রণজিৎ ভালো করে তাকালো, বাইনোকিউলারটি চোখে লাগালো কিন্তু ভালো করে কিছুই ঠাহর করতে পারলো না।

—কোই হ্যায়? একটা অস্ফুট কণ্ঠ শোনা গেল।

রণজিত কান খাড়া করলো।

—ঘরমে কোই হ্যায়?

—কে? কেয়া মাংতা?

—খাবার আছে—খাবার?

—কে তুমি? কাছে এসো।

রণজিৎ তাকে কাছে ডাকলো বটে, কিন্তু নিজে উঠে বারান্দার ধারে এসে দাঁড়ালো না। কে লোক কিছু তো জানা নেই, সামনে পেলে যদি গুলি চালায়। এমন ঘটনা এখানে ঘটেছে। গোড়া থেকেই সাবধান হওয়া ভাল।

—কাছে, না না, বেশী কাছে আমি যাব না।

—কেন, কাছে আসতে ভয় কি ?

—কাছে এলে তুমি ভয় পাবে।

—ভয় পাব ?

—হ্যাঁ, ভয় পাবে। আমায় কিছু খাবার দাও, আমি চলে যাই। আমার বড় খিদে পেয়েছে।

—বেশ তো খাবার তোমাকে দিচ্ছি, কিন্তু তুমি কে ? কাছে না এলে খাবার নেবে কি করে ?

—এই জঙ্গলের দিকে ছুড়ে দাও, আমি কুড়িয়ে নেবো। রুটি দাও, রুটি।

বিশ্বনাথের ঘুম ভেঙে গেল, বললো কি হয়েছে ?

—কে একজন এসে খাবার চাইছে।

—কে ?

—অন্ধকারে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

বিশ্বনাথ ধড়মড় করে উঠে পড়লো, টর্চটা তুলে নিয়ে আলো ফেললো, সামনের জঙ্গলে। ভালো করে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলো, কিন্তু কাউকেই দেখা গেল না। বললো—কেউ কোথাও তো নেই।

—আমি এখানে আছি, খাবার দিয়ে দাও, আমি চলে যাই।

বিশ্বনাথ চমকে উঠলো।

রণজিৎ বললো—তুমি ওখানে আছ ?

—আছি, খাবার দাও।

—বিশ্বনাথ একখানা রুটি এনে দাও তো, একটু মাখনও দিও।

—কেউ কোথাও নেই কাকে রুটি-মাখন দেবো,—বিশ্বনাথ প্রতিবাদ তুললো।

—তুমি দাও না, দেখি—

ঘরের ভিতর থেকে বিশ্বনাথ রুটি মাখন নিয়ে এলো। এক পাউণ্ড রুটি আর দু-আউন্স মাখন কাগজে জড়িয়ে রণজিৎ ছুঁড়ে দিল সামনের গাছগুলির নীচে। বললো—এই নাও, রুটি আর মাখন।

—মাখন ? ওঃ! অনেক দিন মাখন খাইনি, তোমাকে ধন্যবাদ!

ঠিক সেই সময় বিশ্বনাথ আবার টর্চের আলো ফেললো সামনের বনভূমির মধ্যে। কোথাও কেউ নেই! এবার সে ঘরের নীচে আলো ফেললো, মেঝেতে কয়েকটা ফুটো করা ছিল, বললো—দেখুন তো নীচে কেউ আছে কিনা।

রণজিৎ ফুটোয় চোখ রেখে নীচে তাকালো, আলোর আভাবে কাউকে চোখে পড়লো না। বিশ্বনাথ বললো—কেউ কোথাও নেই, এ জিন্, রাতে ভয় দেখাচ্ছে।

—জিন নয়, জিন নয়, আমি মানুষ, আমি আছি এখানে।

—তা'হলে তোমায় দেখতে পাচ্ছি না কেন?—রণজিৎ বললো।

—দেখতে পেয়েছ, কিন্তু চিনতে পারনি।

—তার মানে?

—আলো নিভিয়ে দাও, সব বলছি। আগে রুটি আর মাখনটুকু নিয়ে নিই।

—আলোয় এসেই নাও না?

—না, আমায় দেখলে তোমরা ভয় পাবে। আলো নিভিয়ে দাও।

রণজিৎ বিশ্বনাথকে ইশারা করলো; বিশ্বনাথ আলো নিভিয়ে দিল।

গাছের ছায়ায় ছায়ায় বনভূমি অন্ধকার। তবু চাঁদের আলোর অস্ফুট আভাষে দেখা গেল, একটা প্রকাণ্ড ছায়ামূর্তি বনভূমির কিনারায় এগিয়ে এলো, কুড়িয়ে নিল রুটি-মাখনের মোড়কটা। বিশ্বনাথ ভয়ে কেঁপে উঠলো, ফিস্ ফিস্ করে বললো—দেখছেন বাবু জিন!

ছায়ামূর্তি সরে গেল বনের কিনারায়।

—কই চলে যাচ্ছ যে, কিছু বললে না? রণজিৎ হাঁক দিল।

—কি বলবো?

—তুমি কে? কোথা থেকে আসছ?

—আমি আজাদ হিন্দের সৈনিক। আমার নাম তুকারাম, পুনায় আমার বাড়ী, রেঙ্গুনে গিয়েছিলাম ব্যবসা করতে।

—তা এখন তো দেশে ফিরে গেলেই পার। কবে লড়াই শেষ হয়ে গেছে।

—দেশে ফেরার আর উপায় নেই। যতদিন বাঁচবো এই বনেই আমাকে থাকতে হবে।

—কেন ব্যাপারটা কি বলত?

—শুনলে কি বিশ্বাস করবে?

—আহা, বলই না।

—তবে শোনো। আমি আজাদ-হিন্দ ফৌজে ছিলাম। লড়তে এসেছিলাম মণিপুরে। কয়েকখানি গ্রাম দখল করে যখন আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, তখন তো লড়াই গেল থেমে। তখন ধরা পড়লে আমাদের বিচার হবে, জেল হবে, নয়তো গুলি খেয়ে মরতে হবে, এই সব ভেবে আমরা জঙ্গলের মধ্যে গা-ঢাকা দিলাম। এক সঙ্গে দলবদ্ধ হয়ে থাকলে সহজেই শত্রুপক্ষের চোখে পড়ার

সম্ভাবনা, তাই আমরা দু'জন একজন করে ছড়িয়ে পড়লাম। আমরা দু'জনে ছিলাম একসঙ্গে; আমি আর আমার বন্ধু দীনদায়াল। একাদিক্রমে সাতদিন জঙ্গলে ঘোরার পর আমরা শেষে একটি গুহা পেলাম। বেশ প্রশস্ত গুহা, সামনে কয়েকটা ফলের গাছ। কাছেই একটা ঝরণা আছে। আমরা স্থির করলাম ওইখানেই আমরা কিছু-কাল গা-ঢাকা দিয়ে থাকবো! ফল ও জলের তো কোন অভাব হবে না।

সেইখানেই আমরা রয়ে গেলাম। স্থানটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাসোপযোগী করে নিলাম। ফল ও জলের কোন অভাব ছিল না। আমরা বেশ স্বচ্ছন্দ্যেই রয়ে গেলাম সেখানে। দিন পনেরো অতিবাহিত হবার পর হঠাৎ একটা অভাবিত উপসর্গ দেখা দিল। হাত-পা চুলকাতে সুরু করলো। প্রথমে কিছু মনে করিনি। সাত-আট দিনের মধ্যে দেখি হাত-পায়ের লোমগুলি সবুজ হয়ে যাচ্ছে। অবাক হয়ে গেলেম। কিন্তু সেই বিস্ময়ের ভাবটুকু কাটিয়ে ওঠার আগেই দেখি আমাদের মাথার চুল অবধি সবুজ হয়ে গেছে। এবার আমরা ভয় পেলাম। কিন্তু আজাদ-হিন্দের পলাতক সৈনিক আমরা, সেই নিরাপদ গুহা ছেড়ে বাইরে বেরুতে সাহস পেলাম না। এদিকে ধীরে ধীরে আমাদের পায়ের লোমগুলি মোটা মোটা হয়ে ঘাসের মত হয়ে উঠলো। দেখতে দেখতে আমাদের সর্বাঙ্গসবুজ ঘাসে ঢাকা পড়ে গেল! আমরা যে মানুষ, এ কথা এখন আমাদের পানে তাকালে আর বোঝা যায় না। আমরা যদি মাঠের মাঝে চুপ করে শুয়ে থাকি, তাহলে আমাদের ঘাস ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না।

—তোমরা নগরে গিয়ে চিকিৎসা করালে তো পার।

—এর কোন চিকিৎসা হয় না। আমরা পরস্পরের গা থেকে এক-একটি লোম ছিঁড়ে ছিঁড়ে

ফেলে দিয়েছি, সারা দিন ধরে শুধু গা পরিষ্কার করেছি, কিন্তু মূলগ্রন্থিগুলো তো আর উপ্‌ড়ে ফেলতে পারিনি, ধীরে ধীরে আবার সেইখানে ঘাস গজিয়ে উঠেছে। এর কোন প্রতিকার বা চিকিৎসা হয় বলে আমাদের মনে হয় না। এ এক অভাবনীয় রোগ, 'ক্লোরোফিল' রোগ। গাছ-পাতার ক্লোরোফিল গায়ে এসে জমছে।

—এমন ব্যাপার তো শোনা যায় না।

—এই অঞ্চলে যখন মানুষ বাস করবে, তখন হয়তো এই রোগ ধীরে ধীরে ছড়াবে, তখন ওষুধও বেরুবে, এখন আমাদের নীরবে ভোগা ছাড়া আর কোন পথ নেই। এই রকম চেহারা নিয়ে যদি আমরা লোকালয়ে যাই, তারা আমাদের জানোয়ার মনে করে মেরে ফেলবে। তাই আমরা এখানেই আছি। তবে একটা ভাল হয়েছে, খিদে-তেষ্টা আমাদের আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে। একটা ফল আর এক আঁজলা জল খেলেই আমাদের এখন দিন কেটে যায়। হঠাৎ বন্ধুর সখ হলো রুটি খাবার, তাই তোমাদের কাছে এলাম। তুমি রুটি দিয়েছ এজন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

—আমার গাড়ী আছে, তোমরা যদি শহরে যেতে চাও চিকিৎসার জন্য, সে ব্যবস্থা আমি করতে পারি।

—না থাক্‌! ধন্যবাদ!

বিশ্বনাথ চুপ করে এতক্ষণ শুনছিল এবার সহসা সে টর্চের আলো ফেললো। দেখা গেল, একটা সবুজ রঙের প্রকাণ্ড ছায়া দ্রুত বনের মধ্যে চলে যাচ্ছে। যেন একটা গাছ চলছে। অত লম্বা মানুষ হয় না। বিশ্বনাথ বললো—ও মানুষ নয়, বাবু, জিন!

—তাই হবে হয়তো!

পরদিন সকালে ভিজে মাটির উপর বড় বড় পায়ের দাগ দেখা গেল। এক একখানি পা প্রায় আঠারো ইঞ্চি লম্বা। তার ফটো দেখে খবরের কাগজওলারা লিখলো—এ সেই হিমালয়ের তুষার-মানবের পদচিহ্ন!

রণজিৎ সে খবর পড়লো, কিন্তু কোন বিবৃতি বা বাদ-প্রতিবাদে সে লিপ্ত হলো না।

ক'দিন পরে আবার এক রাতে ঠিক সেই সময় সেই কণ্ঠ শোনা গেল—কর্তা, জেগে আছেন? হ্যালো—হ্যালো—

—কে? রণজিৎ সাড়া দিল।

—আমি আবার এসেছি, কিছু খাবার দেবেন? রুটি?

—দাঁড়ান, দেখছি।

—বিশ্বনাথকে ইঙ্গিত করতে সে ভিতরের ঘর থেকে রুটি নিয়ে এলো, বললো—মাখন নেই।

কাগজে মুড়ে রুটিখানি রণজিৎ বনের কিনারায় ছুঁড়ে দিল, বললো—এই নিন আজ আর মাখন নেই।

—ধন্যবাদ অজস্র ধন্যবাদ, আপনাকে এভাবে বার বার বিরক্ত করছি বলে আমি লজ্জিত।

—কিন্তু একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, এভাবে আপনারা আর কতদিন চালাবেন, লড়াই তো অনেক কাল থেমে গেছে, আপনারা ফিরে চলুন না।

—বলেছি তো যাবার উপায় নেই। এক-গা ঘাস নিয়ে কি কোথাও যাওয়া যায়?

—ওটা তো রোগ, চিকিৎসা করলেই সেরে যাবে।

—এ মৃত্যুরোগ, এর কোন চিকিৎসা হয় না।

—চিকিৎসা হয় কি হয় না, সেটা কোন ডাক্তারের সঙ্গে সরামর্শ না করে কি করে বুঝছেন?

—আমার সঙ্গীটিই যে ডাক্তার এল-এম-এফ।

—এবার যেদিন আসবেন, তাঁকেও সঙ্গে করে আনবেন, আমি কথা বলবো।

—সে যে চলতে পারে না, তার পায়ের অসুখ। আচ্ছা, আমি তাহলে আসি, জয় হিন্দ!

বনের মধ্যে ছায়াটি অদৃশ্য হয়ে গেল। সেদিন বোধ হয় পূর্ণিমা ছিল, চাঁদের আলোয় তাকে ভালই দেখা গেল, কিন্তু কিছুই বোঝা গেল না।

রণজিৎ বললো—বিশ্বনাথ, লোকটার অনুসরণ করে দেখলে কেমন হয়।

—এতো রাত্রে, এই বনের মধ্যে? আপনি যান, আমি তো যাবো না।

—বন্দুক তো রয়েছে।

—দুটো বন্দুকে কি হবে? যদি দুশো লোক আমাদের ঘিরে ধরে, কি একটা হাতীর পাল এসে পড়ে? এখানে যা কিছু করতে হবে দিনে-দিনে।

কথাটা অযৌক্তিক নয়। রণজিৎ বললো—বেশ, কাল সকালে একবার ওদিকটা ঘুরে দেখতে হবে।

পরদিন সকালে বিশ্বনাথকে সঙ্গে নিয়ে রণজিৎ বেরিয়ে পড়লো।

সামনে বন্ধুর পার্বত্য বনভূমি। কোথাও এতটুকু জায়গা বোধ হয় সমতল নেই, উঁচু-নীচু ঘোর-ফের অনেক। তারপর আবার ঘন গাছের সারি। বিশ হাত দূরে বিশজন মানুষ যদি লুকিয়ে থাকে তো বোঝা যাবে না। একবার সে বনভূমির মধ্যে প্রবেশ করলে পথ ঠিক রেখে বেরিয়ে আসা কঠিন। এর মধ্যে কোথায় যে সেই লোক দুটি আছে, কে বলবে!

কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করার পর বিশ্বনাথ বললো—এখানে কাকে খুঁজবেন বাবু, কোথায় খুঁজবেন?

রণজিৎ ফরেষ্টার, বনে-জঙ্গলে ঘোরা তার অভ্যাস আছে। বললো—একবার ভাল করে চারিপাশটা দেখে যাই, লোকটা নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও থাকে।

অনেক কষ্টে গাছপালাকে পাশ কাটিয়ে রণজিৎ আরো কিছুটা অগ্রসর হলো। সামনেই একপাশে একটি টিলা। রণজিৎ গিয়ে উঠলো সেই টিলার মাথায়। টিলার পিছনেই একটি গুহা দেখা গেল, পাশেই একটি ঝরণা। বিশ্বনাথ ও রণজিৎ সেই টিলা থেকে নেমে সেই গুহার মধ্যে ঢুকলো।

গুহার মধ্যে ঢুকেই দু'জনে চমকে উঠলো। দুটি লোক গুহার মধ্যে শুয়ে আছে। রণজিৎ চীৎকার করে উঠলো—হ্যালো! হ্যালো!

কিন্তু মানুষ দুটির কাছ থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

আরো কাছে গিয়ে রণজিৎ অবাক হয়ে গেল! এদের মানুষ বলে মনে হয় বটে, কিন্তু এরা তো মানুষ নয়, ঠিক মানুষের আকারে দুটো উইয়ের ঢিপি। ঢিপির উপর মাটির পলি পড়েছে, ছোট ছোট ঘাস জন্মে গেছে। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, দুটো মানুষকে উইয়ে খেয়েছে। তবু নিজের চোখকে রণজিৎ পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারলো না, হাতের লাঠিগাছটা দিয়ে একটু নাড়া দিতে গেল। লাঠিগাছটি যেখানে লাগলো, উইয়ের ঢিবির মাটির গুঁড়ো ঝুরঝুর করে ঝরে পড়লো। ব্যাপারটা কি হলো? রণজিৎ জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো বিশ্বনাথের পানে। বিশ্বনাথ বললো—বাবুজী আর দরকার নেই, ফিরে চলুন। আমি তো বলেছি মানুষ নয় জিন্।

রণজিৎ জীবনে এমন অবস্থার সম্মুখীন হয়নি। কিছুটা সে ভয় পেয়েছিল সত্য, তবু মনের সেই শঙ্কাটুকু চাপা দেবার জন্য বললো—এরা বোধ হয় আই-এন-এ'র কোন সৈন্য হবে, এখানে মারা গেছে, তারপর উই ধরেছে।

—মরে গেছে, তাহলে আপনার কাছে রুটি চাইতে গেছে কে?

এ একটা রহস্য। তবু রণজিৎ বললো যাই হোক এদের একটা সৎকারের ব্যবস্থা করতে হবে।

বনের মাঝেই ক্রোশখানেক দূরে একখানি গ্রাম ছিল। পরদিন সকালে রণজিৎ সেখান থেকে জন বারো লোককে ধরে আনলো, একটা গাছ কেটে ওই উইয়ের ঢিবিগুলির সে অগ্নিসৎকার করবে। কিন্তু সেই গুহার মধ্যে ঢুকে সে অবাক হয়ে গেল, গুহাটি শূন্য। কোথাও কিছু নেই, গতকাল লাঠির আঘাতে উইয়ের ঢিবির যে গুঁড়া মাটিগুলি ঝরে পড়েছিল, তাও নেই! রণজিৎ অবাক হয়ে তাকালো বিশ্বনাথের মুখের পানে। বিশ্বনাথ মাথা নেড়ে বললো—আমি তো বলেছিলাম বাবু, ওরা জিন!

রহস্য রহস্যই রয়ে গেল, তারা ফিরে এলো। তবে, তারপর আর কোন রাত্রে আর কোন লোক খাবার চাইতে আসেনি।

ভস্মের টিপ

শ্রীঅদ্রীশকুমার বর্ধন

বাবা ছিলেন সরকারী ডাক্তার। প্রায় তিনি বদলি হোতেন—আর তাঁর সঙ্গে আমি আর আমার বোন মিলুও বদলি হোতাম। কিন্তু যখন আমার বয়েস হোল বারো বছর, তখন বাবা বললেন—"আর না, পিলু এবার থেকে স্কুলে লেখাপড়া করুক।" এতদিন বাড়ীতেই পড়া চলছিল। এবার জীবনে প্রথম স্কুলের আস্বাদ পেলাম। তখন আমরা বিহারের একটা ছোট্ট শহরে। ধরা যাক, শহরটির নাম রাজপুর। সেখানকারই একটা হাই-স্কুলে একদিন বাবা নিয়ে গেলেন। হেডমাষ্টার মশায় পরীক্ষা করলেন। ক্লাস সিক্সে হলাম ভর্তি। হেডমাষ্টার মশায় দরোয়ানকে দিয়ে ক্লাসে পাঠিয়ে দিলেন।

এইভাবে আমার স্কুল-জীবন হোলো সুরু। বহু বন্ধু পেলাম। এতদিন বন্ধু বলতে মিনুই ছিল সব। এখন অনেক বন্ধু হ'ল। আস্তে আস্তে একমাস কেটে গেল। চিরকালই আমি দুরন্ত। চুপচাপ ঘরে বসে থাকা আমার কোষ্ঠীতে লেখেনি। আমার এই ডানপিটে স্বভাব নতুন বন্ধুদের সঙ্গ পেয়ে আরো বেড়ে উঠল। লোকজনকে অকারণে উত্যক্ত করতে পেলে আর কিছু চাইতাম না।

শহরটি ছোট ছিল বটে, এবং অনেক কিছুরই অভাব ছিল—কিন্তু অভাব ছিল না সাধু-সন্ন্যাসীর। প্রায় রাস্তার ধারে দেখা যেত ধুনীর সামনে বসে আছে সারা গায়ে ছাই মাখা একজন সাধু—মাথায় জটা আর সঙ্গে ঝোলা আর চিমটে। কারও কারও সঙ্গে থাকতো শিষ্য দু'একজন। মাঝে মাঝে কোন গৃহস্থের বাড়ী ঢুকতো—চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় পেট-পূজা করে সরে পড়তো।

সেদিন ছিল রবিবার। স্কুলের ছুটি। বাইরের ঘরে বসে বসে মিলুর সঙ্গে ক্যারম খেলছি, এমন সময়ে বাইরের উঠোনে গুরুগম্ভীর বিলাপ শোনা গেল—"হর হর ব্যোম, হর হর ব্যোম।"

ব্যাপার কি বুঝতে দেরি হোল না। মুখ বাড়িয়ে দেখি এক বিশালবপু সাধু। চিমটা আর ঝুলি হাতে উঠানের ঠিক মাঝখানটাতে দাঁড়িয়ে। বিরাট শরীর—যেমন লম্বা আর তেমনি চওড়া। সাধুর মুখ বড় ভয়ংকর। সমস্ত গায়ে ছাই মাখা, মুখেও। মুখের চামড়াগুলোয় ভাঁজ-পড়া। ওপরের ঠোঁট আর কান, এর মধ্যে একটা লম্বা কাটা দাগ। বড় বড় হলদে দাঁত। আর সবচেয়ে ভীষণ তার চোখ দুটো—ছোট ছোট লাল। কুটিল সাপের মত উঠানের এ'দিক থেকে ওদিকে পিছলে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ আমার দিকে দৃষ্টি পড়লো—কয়েক মুহূর্ত আটকে রইল। কি বিশ্রী চাউনি—

ভেতরটা শিউরে ওঠে। ভীষণ অস্বস্তি লাগল—হঠাৎ মা এসে উঠানে দাঁড়াতে সেই বিশ্রী দৃষ্টি থেকে অব্যাহতি পেলাম।

মা'র সঙ্গে যা কথা হোল—তাতে বুঝলাম, সাধুবাবাজী রাতের মত এখানে থাকতে চায়—কাল ভোরে চলে যাবে। মা বাবার মত জিগ্যেস করলেন। বাবা একটু কিন্তু-মিন্তু করেও ওই ভয়ানক চেহারা দেখে অবশেষে রাজী হলেন।

কিন্তু সন্ন্যাসীটিকে আমার মোটেই ভাল লাগলো না। কি বিশ্রী চোখ আর চাউনি, কি ভয়ংকর!

—"পিলু, ও পিলু, একবার বাজারে যাও। কিছু মিষ্টি কিনে আনো।" বিকেল বেলা বেড়াতে যাচ্ছি, এমন সময় মা'র কণ্ঠস্বর শুনলাম। বিরক্তি লাগল।

—"না আমি পারবো না মা।" আমার তখন খেলবার তাড়া, কে তখন ঐ সন্ন্যেসী ঠাকুরের ভূরিভোজনের ব্যবস্থা করে!

—"অবাধ্য হয়ো না পিলু, এ সন্ন্যাসী ঠাকুরের সেবার কাজ। যাও এখুনি!"

ধুত্তোর, সন্ন্যাসী ঠাকুরের নিকুচি করেছে। কিন্তু কি আর করি, আনতেই হোলো খাবার; এই মিষ্টির মধ্যে কয়েকটা বড় বড় কড়া পাকের সন্দেশ ছিল। মা খাবার দেখে খুব খুশী হলেন। বললেন—"এই তো লক্ষ্মীছেলের মত কাজ। দেখবি, সন্ন্যাসী ঠাকুর তোকে কত আশীর্বাদ করবেন।"

হুঁ, আশীর্বাদই করবেন বটে! মনে মনেই বলে খেলতে চলে গেলাম।

সন্ধ্যাবেলা বাড়ী এলাম। আমি আর মিলু পড়তে বসলাম। কিন্তু মনটা খালি উস্‌খুস্ করছে। কেবল রান্নাঘরে উঁকি মেরে দেখছি, সন্ন্যাসী ঠাকুরের ভোজন-প্রস্তুতি কদ্দুর এগোলো। কতক্ষণ আর চুপ করে থাকা যায়। পেটের মধ্যে সব গজ গজ করছে। শেষে থাকতে না পেরে মিলুকেই সব বলে ফেললাম। খেলার সময়ে মিষ্টি আনতে বলায় রেগে যাওয়ার কথা, ভাবতে ভাবতে গেলাম কিভাবে ওই সন্ন্যেসীটাকে জব্দ করতে হ'বে, তারপর কেমন করে কড়াপাকের গোল গোল সন্দেশ ভেঙ্গে আধখানা করলাম, কেমন করে খাবারের দোকানে কাঁচের ওপর থেকে অনায়াসে কয়েকটা মাছি ধরে সন্দেশের মধ্যে রেখে আবার সন্দেশ দিলাম জুড়ে। কেমন করে কাঠি দিয়ে সন্দেশের মাঝ-বরাবর গর্ত করে দিলাম হাওয়া চলাচলের জন্যে, যাতে মাছিগুলো শেষ অবধি জ্যান্ত থাকে। এও বুঝিয়ে দিলাম, জ্যান্ত মাছি পেটে গেলে কি অবস্থা হয় অর্থাৎ বমির পর বমিতে বাছাধনের অবস্থা কাহিল করে দেবে। মিলু তো সব শুনে মহা খুশী।—"বেশ হবে, দাদা, বেশ হবে। খুব মজা হবে।" মিলুর আর আনন্দ ধরে না। আমারও খুব মজা লাগছে। খুব রগড় হবে আজ একটা।

তখন কে জানতো, নিভৃতে মজা করার পরিণাম এতদূর গড়াবে।

—"মিলু মা, এদিকে এসো।" রান্নাঘর থেকে মা ডাক দিলেন।

—"তাড়াতাড়ি যা, তোকেই খাবার সাজাতে হবে।"

মিলু গেল রান্নাঘরে, আমিও উঠে গেলাম বাইরের ঘরে। সন্ন্যাসীর ঠাঁই এখানেই হয়েছে। বাবা ছিলেন, আসতে দেখেই ধমকে উঠলেন—"কি চাই তোমার এখানে? যাও, পড়তে যাও।"

—"নেহি নেহি উস্‌কো রহনে দেও।" সহসা ভারী গলায় সন্ন্যাসী ঠাকুর বলে উঠলো। "বেটা তুমহারা হাত দেখলাও।" হাত দেখাবার ইচ্ছে মোটেই ছিল না, কিন্তু সন্ন্যাসীর চোখ দুটো কি বিশ্রী; অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাত এগিয়ে গেল। মোটা মোটা হাত দিয়ে কিছুক্ষণ হাত দুটো নাড়াচাড়া করে, সন্ন্যাসী যা জানালে তার সারমর্ম এই যে, এই ছেলে খুবই সুলক্ষণযুক্ত, পয়মন্ত। দেবতার অনুগ্রহে লাগলে সবার মঙ্গল। দেবতার অনুগ্রহটা কি, বাবা সেইটাই জিগ্যেস করলেন। উত্তরে একটু অদ্ভুতভাবে হেসে সন্ন্যাসী চুপ করে গেলো। ইতিমধ্যে খাবারের থালা এসে গেল। মা থালা, বাটি সাজিয়ে দিতে লাগলেন।

খাওয়ার বর্ণনা দিয়ে আর সময় নষ্ট করবো না। তবে বেশ পরিপাটি ভাবেই ভোজন-পর্ব সমাধা হোল। আমি আর মিলু মাঝে মাঝে মুখ-টেপাটেপি করে হাসছিলাম। সন্ন্যাসী কিন্তু থেকে থেকে এমন বিচ্ছিরিভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছে যে, আমার রীতিমত অস্বস্তি ঠেকছিল। ইস্পাতের মত ধারালো সে দৃষ্টি—চর্ম ভেদ করে একেবারে মর্মে পৌঁচচ্ছে।

তারপর এল সেই চরম মুহূর্ত। সন্ন্যাসী ঠাকুর সন্দেশ ক'টা পরপর বিরাট মুখব্যাদন করে চালান করে দিলেন। একটু বাদে একটু উস্‌খুস্ করতে লাগলেন, তারপরেই আচম্বিতে ওয়াক্, ওয়াক্, হেউ… !

সে একটা কাণ্ড হোলো। পাত-ফাত ভেসে যাবার যোগাড়। আমি আর মিলি তো হেসেই গড়িয়ে পড়লাম। হাসতে হাসতে হঠাৎ মিলির মুখ থেকে বেরিয়ে গেল—"দাদা, কি বুদ্ধিই খাটিয়েছিলে!"

বাবা তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলেন একটা কিছু করেছি আমি। একটু চাপ দিতেই মিলি দিলে সব ফাঁস করে। এদিকে সন্ন্যাসীপ্রবর ততক্ষণে একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠেছেন। সব কথা শুনে, ধীরে ধীরে ঝোলাটা কাঁধে ফেলে চিমটেটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, রাঙা টকটকে দৃষ্টি কয়েক মুহূর্ত আমার ওপর রইল আটকে, তার মধ্যে সাপের ক্রুরতা, বাঘের হিংস্রতা আছে লুকিয়ে—তারপর নিঃশব্দে বাইরের অন্ধকারে গেলো মিলিয়ে।…

ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি হোল, বাবা মা কোন কথা বলবারই সময় পেলেন না।

"একটু বাদে একটু উসখুস করতে লাগলো। তার পরেই আচম্বিতে ওয়াক্ ওয়াক্ হেউ।"...(পৃঃ ৩৯৯)

সে রাত্রিতে বাবা আমায় একটু বিশেষভাবে শাসন করেছিলেন।

এতক্ষণ গেল আমার কাহিনীর ভূমিকা, এবার আসছি আসল কাহিনীতে। যেমন অদ্ভুত তেমনি ভয়াবহ এই ঘটনা -বিংশ শতাব্দীতে এই রকম অবিশ্বাস্য ব্যাপার যে ঘটতে পারে—এই কাহিনীই তার প্রমাণ।

পরদিন বিকেলবেলা খেলাধূলা করে ফিরছি। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। ঝোড়ো মেঘ আর ভিজে হাওয়া তাই জানাচ্ছে। হু হু করে কাল মেঘ ভেসে চলেছে। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া গাছগুলোর মধ্যে বাতাসের মৃদু শিস শোনা যাচ্ছে।

একটু তাড়াতাড়ি পা চালাচ্ছি। পথে আর কেউ কোথাও নেই। তাড়াতাড়ি হবে বলে একটা সোজা পথে চলেছি—এ পথে সাধারণতঃ আসি না। কিছু দূরে পাথর ওপর কয়েকটা বড় বড় গাছ জড়াজড়ি করে ঝুঁকে পড়েছে। কাজেই সে জায়গাটা একেবারে অন্ধকার হয়ে গেছে। তারও ও-পাশে জ্বলছে হরিশ মুদীর কেরোসিনের ডিবে।

ঝুপসি গাছের বিষম অন্ধকারটা যেমন ঠেলে বাইরে এসেছি, আচম্বিতে শুনলাম বজ্রনির্ঘোষ—"তিষ্ঠ!"

শিরদাঁড়া দিয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। কিন্তু এত সহজে ভড়কে যাবার ছেলেই নই আমি। ওরকম বাজের মত কে চেঁচিয়ে উঠলো দেখবার জন্যে পিছু ফিরতে গেলাম। কিন্তু একি!

আমি নড়তে পারলাম না! এক পা এগোতে গেলাম, পারলাম না। মাটিতে পেরেক-ঠোকা হয়ে আটকে গেছি। এইবার ভীষণ ভয় পেলাম। মনে হোলো যেন ঘেমে উঠছি। হাত পা নাড়াতে না পারলেও জ্ঞানটা তখন টনটনে ছিল। কানে পেছন থেকে একটা পদ-শব্দ এগিয়ে আসছে। শব্দটা আমার পাশ দিয়ে সামনে এগিয়ে গেল— তারপর একটা বিরাট ছায়ামূর্তি আমার সামনে সিধে হয়ে দাঁড়াল।

যেটুকু সাহস ছিল, স্পিরিটের মত সেটুকুও গেল উবে। সামনের ছায়ামূর্তি সেই ভীষণ সন্ন্যাসী!

কিছুক্ষণ চুপচাপ। আমার অসহায় অবস্থাটা যেন সে উপভোগ করে নিলে। তারপর একটা বাজের মত অট্টহাসিতে রাত্রের নিস্তব্ধতা খান্ খান্ হয়ে ভেঙ্গে গেল। মাঠের ওপর দিয়ে হাসির স্রোত ভরিয়ে গেল দূরে, অনেক দূরে। আকাশের তারাগুলোসুদ্ধ যেন চমকে উঠলো। ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হয়ে আসতে লাগলাম—চোখের সামনে এক বিশাল ছায়ামূর্তি আর কানে আসছে কান ফাটা বিকট হাসি—চারপাশের জগৎ মিলিয়ে গেল। হঠাৎ ছায়ামূর্তি একটা হাত সামনে বাড়িয়ে দিলে, আমার কপাল স্পর্শ করলে। তারপর আর কিছু মনে নেই।...

হঠাৎ জ্ঞান ফিরে এল। ঝোড়ো হাওয়ায় জামাকাপড় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে—কালো টুকরো টুকরো মেঘগুলো হু হু করে ভেসে চলেছে, একটা মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছি, দূরে মাঠের প্রান্তে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া গাছগুলো নুয়ে পড়েছে ঝড়ে—চারিদিক অন্ধকার হলেও দৃষ্টি চলে সমানে —যেখানে এগিয়ে চলেছে একটা বিশাল মূর্তি। বিড়বিড় করে মূর্তি কি বলতে বলতে এগিয়ে যাচ্ছে। পেছনে আমি চলেছি, যেন চুম্বক টেনে নিয়ে যাচ্ছে লোহাকে। সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেছে। পা দুটোতে বড় শ্রান্তি।

এ কোথায় চলেছি? নিজের মনেই চিন্তা করলাম। বুঝতে পারলাম, সন্ন্যাসীর মন্ত্রের জোরে এতদূর এসে পড়েছি। এখন পালাতে হবে। কি করে পালাই?

মাঠের মধ্যে এখানে-ওখানে গাদা করা খড। একবার দেখে নিলাম, সন্ন্যাসী একবারও পেছন ফিরে দেখছে না—বিড়বিড় করতে করতে সিধে এগিয়ে চলেছে। চট্ করে একটা খড়ের গাদার আড়ালে লুকিয়ে পড়লাম।

সন্ন্যাসী কিছু দূর সিধে চলে গেল। তারপর বোধহয় আমার পায়ের আওয়াজ না শুনতে পেয়ে ফিরে দাঁড়াল। আমাকে দেখতে না পেয়ে জোরে জোরে মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে এদিক-ওদিক খুঁজতে লাগল। আর আমিও গাদার পাশে পাশে ঘুরতে লাগলাম। কিন্তু যে মন্ত্রে এতদূর অজ্ঞান হয়ে এসেছি, সেই মন্ত্র কেন যে এখন আমার ওপর কাজ করছে না, সেইটা বুঝতে পারলাম না। এ রহস্য পরে বুঝেছিলাম।

"অবশেষে সন্ন্যাসী ব্যর্থ হয়ে চলে গেল"

অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করেও সন্ন্যাসী আমাকে দেখতে পেলে না। সন্ন্যাসী যখন ওপাশে, আমি তখন গাদার এপাশে। অবশেষে সন্ন্যাসী ব্যর্থ হয়ে চলে গেল। মাঠের ওপাশে গাছপালার মধ্যে অন্ধকারে তার সুদীর্ঘ দেহ মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি লাফ দিয়ে উঠলাম। যেদিক থেকে এসেছিলাম, সেই দিকেই উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলাম।

বহুক্ষণ একটানা দৌড়াবার পর মাঠ পেরিয়ে একটা গ্রামে এসে পড়লাম।

তারপর কি করে ঘুমন্ত গ্রামবাসী কয়েকজনকে তুললাম, কিভাবে তাদের নিজের কাহিনী জানালাম—সে বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। শুধু এইটুকু বলি, আমাদের শহর থেকে ছয় মাইল উত্তরে চলে এসেছি, আর কিছু দূর গেলেই গয়দা পাহাড়ের সানুদেশ।

পরদিন বাড়ী ফিরলাম গ্রামবাসীদের সাহায্যে। বাড়ীতে একবার হৈহৈ ব্যাপার পড়ে গেল। আমার কাহিনী শুনতে অনেকেই ভিড় করে এল। কিন্তু কেন যে সন্ন্যাসীর মন্ত্র আমার ওপর শেষে খাটল না, এইটাই বোঝাতে পারলাম না।

—"হ্যাঁ বাবা, তোমার জামার আস্তিনে ওটা কিসের দাগ?" একটি বৃদ্ধ জিগ্যেস করলেন। দেখলাম, সাদাজামার আস্তিনে একটা দাগ লেগে, ঠিক যেন ছাইমোছা হয়েছে।

—"তুমি কি ঘেমেছেলে?" বৃদ্ধটি আমায় জিগ্যেস করলেন।

—"ছ' মাইল হেঁটেছি, ঘামবো না।" বললাম আমি।

—"বুঝেছি। তোমায় কিভাবে বশ করা হয়েছিল—আর কেনই বা শেষে মন্ত্র তোমার ওপর খাটল না—তাও বুঝলাম।" বাবা ব্যগ্র হয়ে জিগ্যেস করলেন, "কারণটা কি?"

—"শুনুন"—বৃদ্ধটি বলতে আরম্ভ করলেন, "সন্ন্যাসী ওকে হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করেছিল—তখনই ওর কপালে টেনে দিয়েছিলো মন্ত্রপূত ভস্মের রেখা। যার স্পর্শ মাত্রই ও চৈতন্য হারায়। তারপর মাঠের মধ্যে ও ঘেমেছিলো! অচৈতন্য হলেও ঘাম মুছবার জন্যে অজ্ঞাতে হাত দিয়ে কপাল মোছে—পরিণামে ভস্মের টিপ যায় মুছে। সঙ্গে সঙ্গে ও নিজের জ্ঞান ফিরে পায়। টিপ মুছে যাওয়ার ফলে সন্ন্যাসীর মন্ত্র ওর ওপর আর কাজ করেনি।"

—"আশ্চর্য! আচ্ছা, ওকে ধরে নিয়ে যাওয়ার অর্থ কি?" বাবা জিগ্যেস করেন।

—"আপনিই তো বললেন, সন্ন্যাসী বলেছিল ছেলেটি দেবতার অনুগ্রহে লাগলে সবার মঙ্গল। বুঝতে পারছেন না এখন দেবতার অনুগ্রহটা কি? আর কিছুদূর গেলেই গয়দা পাহাড়ে সে পৌঁছোত—তারপরেই যা হোত!—তার হাত থেকে ঈশ্বরের দয়ায় আজ আপনার ছেলেকে ফিরে পেয়েছেন!"

তারপর বারো বছর কেটে গেছে। ছেলেবেলার দুরন্ত পিলু আমি আর নেই। টেবিল ল্যাম্পের মৃদু আলোয় তোমাদের জন্যে লিখছি এই কাহিনী। কিন্তু আজও শিউরে উঠছি সেই ভয়ংকর রাতের কথা মনে পড়লে। ঝোড়ো বাতাস জামা-কাপড় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। হুহু করে কাল মেঘের দল ভেসে চলেছে, দূরে মাঠের প্রান্তে ঝাঁকড়া-মাথা গাছগুলো নুয়ে পড়ছে—সামনে অন্ধকারের মধ্যে, অন্ধকার দিয়ে গড়া এক মূর্তিমান আতঙ্ক এগিয়ে চলেছে বিড়বিড় করে মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে।

হব আমি কি

শ্রীবিবেকানন্দ কোনার

আমার মনে আমিই জানি হব আমি কি?
সবাই জানে পড়ব আমি ডাক্তারী।
আমি ভাবি হব আমি গায়ক
আবার ভাবি হব বড় লেখক।

ভাবি আমি হব বা এক কবি,
আঁকব মনের নানারকম ছবি।
হব আমি বৈজ্ঞানিকের মতন
সবার সেবায় করব জীবন পণ।

আবার ভাবি হব বা এক জোয়ান,
দেশের লাগি করব জীবন দান॥

সমাজ সেবার আদর্শ

শ্রীসতীকুমার নাগ

'সমাজ সেবা' কথাটা আজকের দিন নূতন নয়। পুরোনো দিনেও ছিল। তখনকার দিনে সমাজ সেবা শেখার জন্যে কোন শিক্ষণ-কেন্দ্র ছিল না। কিন্তু আজকের দিনে সমাজ সেবা শিক্ষণীয় কেন্দ্র গড়ে ওঠেছে। সেখানে ছেলেমেয়েরা সমাজ সেবার আদর্শ, তার নিয়ম-পদ্ধতি সব শিখতে যায়। তার জন্য আবার তারা প্রশংসাপত্রও পায়। ঐ প্রশংসাপত্র হলো তার পরিচয়পত্র—সে একজন সমাজ সেবক বা সমাজ সেবিকা ব'লে।

আগের কালে সমাজ সেবকরা বাড়ী থেকেই সমাজ সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। আপন গৃহ-পরিবেশই তাঁদের গড়ে তুলেছে সমাজ সেবক। তাঁরা প্রথম শিক্ষা পেয়েছেন পিতামাতার কাছে। বিদ্যাসাগর, রামমোহন, কেশবচন্দ্র, দ্বারিকানাথ ঠাকুর, রামতনু লাহিড়ী, বিবেকানন্দপ্রমুখ মহাপুরুষের যুগে কোন 'সমাজ শিক্ষণ কেন্দ্র' ছিল না, সমাজ শিবিরও ছিল না। এসব প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ চিরকাল দশের ও দেশের কাছে বরণীয় ও স্মরণীয়—তাঁদের সমাজ সেবার কাজের জন্যে। তাঁরা যে পথ ধরে এগিয়ে গিয়েছেন, সে পথ ধরে আমরাও কাজ করে, স্মরণীয়, বরণীয় হতে পারি।

আমরা যারা শহরে থাকি, সেখানে প্রাণের যোগ নেই বললেই চলে, পরস্পরের। একই ফ্ল্যাটে থাকি অথচ পাশের ঘরে কে বা কারা আছে তাও জানি না। একের বিপদে, অপরের সহানুভূতি নেই। এমন কি দু'টো মৌখিক কথাও নেই এমনি ধরণের পরিচয়, আলাপন। যদিও কিছু থাকে, সেখানে অন্তরের টান নেই। যা আছে তা শুধু বাহ্যিক, কৃত্রিম। কাজেই এ পরিবেশে, আবহাওয়ায় কি করে সমাজ সেবক গড়ে উঠতে পারে? এরি প্রভাবে মনকে করে তোলে ছোট, সংকীর্ণ। কিন্তু সত্যিকার সমাজ সেবক যিনি তাঁর মন উদার, সংস্কারমুক্ত। তিনি অনায়াসে, সহজেই পরকে আপন করে নিতে পারেন। এ আপন করার কাজে টাকাকড়ির দরকার পড়ে না। চাই সত্যিকার দরদ, ভালবাসা। বই পড়ে, বক্তৃতা শুনে সত্যিকার সমাজ সেবক হওয়া যায় না।

গ্রামের কথাই বলছি। গ্রামের দিকে তাকিয়ে দেখলে চোখে পড়ে—যারা বার মাস রোদে পুড়ে, জলে ভিজে মাঠে হাল চষে, বীজ বুনে ফসল ফলায়, যারা রক্ত ঢেলে সমাজের অভিজাতদের ভোগবিলাস জুটিয়ে দেয়, তাদের দিকে তাকিয়ে দেখে না কেউ; ভাবেও না একটিবার। এ সব-হারারাই সমাজের বন্ধু। তারা বিলিয়ে দিয়েছে যা-কিছু তাদের সম্বল আছে। তার বিনিময়ে কিছুই পায়নি। আর তারা দাবী তো করে না। দুঃখ সহাটিই যেন ওদের চিরন্তন ধর্ম হয়ে

গেছে। একটু সামান্য কিছু পেলেই তারা মহাখুশী। তছাড়া, তাদের দাবী দাওয়াই বা কি? একটু আশ্রয়, মোটা ভাত, মোটা কাপড়। তাও তাদের জোটে না। এমনি এ গরীব দেশ! এ দেশের কল্যাণ কি করে আসবে?

দেশের জনসাধারণ তো ঐ পল্লীর নিরীহ কৃষক, চাষী, তাঁতী, কুমোর, ছুতোর, মজদুর —এরা সব।

সমাজে আজ তারা অজ্ঞ, মূর্খ; পিছিয়ে রয়েছে সব কিছুতে তারা। তারা তো আমাদেরই ভাই, আমাদেরই বোন! তাদের অজ্ঞতা, তাদের মূর্খতাকে দূর করতে হবে। যে লিখতে-পড়তে জানে না, তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে দিতে হবে। তা নইলে, চিরকাল তারা আঁধারে থাকবে ডুবে। তারা লেখাপড়া শিখলে দেশ জাগবে। তাদের সামনে আলো জ্বালাতে হবে, মশাল ধরতে হবে। অন্ধকার কুসংস্কারাচ্ছন্নকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে সেখানে নূতন আলোর শিখা জ্বালাতে হবে তাদের মনের মধ্যে। জরাজীর্ণ ঘুণে-ধরা সমাজকে ভেঙেচুরে, সেখানে গড়ে তুলতে হবে সমাজের নূতন ভিত্তি।

নূতন আলোর প্রদীপ হাতে করে একাজে সবাইকে এগিয়ে যেতে হবে।

সমাজ সেবার যা কাজ, এ কাজকেই বুঝায়। এই সমাজ সেবার মত এত বড় ধর্মমূলক আর কোন কাজ নেই।

সমাজ সেবা যিনি করেন, তিনি অপার আনন্দ লাভ করেন। এই আনন্দলাভই ধর্মের একটি সোপান। ঈশ্বরকে জানার একটি সহজতম পন্থা এই সমাজ সেবা।

সমাজ সেবার কাজ বড় কঠিন। সহজে সমাজ সেবক হওয়া যায় না। সকলেই তা হতে পারে না। অনেকে তা হতেও চায় না। নিঃস্বার্থভাবে নিজের সব সত্ত্বাকে উজাড় করে দিয়ে সমাজের একজনকেও যদি ভালবাসতে পারি, তবে তোমার, আমার, সমাজ সেবার কাজ সার্থক।

এ ভালবাসার মধ্যে কেনা-বেচা নেই। যেখানে ভালবাসার বিনিময়ে মানুষ কিছু পাবার আশা করে, সে ভালবাসা দোকানদারী, পেশাদারী। যেখানে এ কেনাবেচার কথা, বিনিময়ের প্রথা, সেখানে ভালবাসা নেই। ভালবাসা, সে চিরকালই দান করে, সে চিরকালই দাতা। সে দানের প্রতিদান কোন দিনই চায় না। সমাজ সেবার নিঃস্বার্থ ভালবাসায় জীবন ধন্য হয়ে উঠে। এটাই হলো সমাজ সেবার একটি বড় আদর্শ!

সংবাদ-বিচিত্রা

যন্ত্রে জন্মানো ঘাস

যে যন্ত্রে ডিম ফোটানো হয়, তাকে বলে ইনকুবেটার। যন্ত্রটি অনেকেই হয়ত দেখেছ বা সে সম্বন্ধে শুনেছ। কিন্তু যদি বলি যন্ত্রে ঘাস জন্মাচ্ছে, তবে নিশ্চয়ই গাঁজাখুরি বলে উড়িয়ে দেবে, নয় কি? কারণ এরকম যন্ত্র আগে কেউ দেখেনি কিংবা শোনেনি। ঘাস জন্মাবার এই অভিনব যন্ত্রটির নাম অটোম্যাট এবং এর উদ্ভাবক আরজেনটিনার এক চাষী ও পশ্চিম জার্মানীর একজন ওস্তাদ তালার কারিগর। তাদের দুজনে মিলে দু'বছর ধরে বিস্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বহুলোকের বহু ঠাট্টা সয়ে এই যন্ত্র আবিষ্কার করে। তাদের অটোম্যাট যন্ত্রে জন্মানো প্রথম নধর ঘাসের আঁটি তারা কলোনের গরু ও শুয়রদের মুখে তুলে ধরেছিল এবং ঐ অবলা জীবগুলি মানুষের তৈরী সেই ঘাস গপাগপ সেটে দিতে মোটেই কার্পণ্য করেনি। অটোম্যাট যন্ত্রের গোপন রহস্য হচ্ছে—দস্তার কয়েকটি পাত্র, যেগুলি ঘাসের বীজে ভরে ইনকুবেটার যন্ত্রের মধ্যে রাখা হয়। প্রয়োজনীয় তাপ, আর্দ্রতা, কৃত্রিম আলো ও আবশ্যকীয় লবণ, মৌলিক পদার্থ, বিভিন্ন ভিটামিন ও হর্মোন সরবরাহ করে অটোম্যাট। এবার বিজলী ও জলের বন্দোবস্ত করলেই ঘাস জন্মাতে শুরু করে। এক একর জমিতে যত ঘাস হয়, একটি সবচেয়ে ছোট অটোম্যাট যন্ত্রে ততটা ঘাস জন্মানো যায়। এতে একেবারেই মাটি লাগে না।

হেগেনবেক চিড়িয়াখানায় চাঞ্চল্য

হেগেনবেক চিড়িয়াখানায় ভারতীয় গণ্ডার-দম্পতির একটি বাচ্চা হয়েছে। যতদূর জানা যায় বন্দীদশায় গণ্ডারের বাচ্চা হয়েছে পৃথিবীতে মাত্র তিনবার, কিন্তু জর্মানীর চিড়িয়াখানায় এই প্রথমবার। জন্মের পঁচিশ মিনিট পরেই ১০০ পাউণ্ড ওজনের বাচ্চা গৌধাত্তি উঠে দাঁড়িয়ে দুধ খাবার চেষ্টা শুরু ক'রে দিয়েছিল। গৌধাত্তির মায়ের নাম "নেপালী", আর বাবার নাম "গদাধর"। ভারতীয় গণ্ডারের বংশ আজ প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে। একমাত্র আসাম ও নেপালের জঙ্গলে এখন মাত্র মুষ্টিমেয় গণ্ডার দেখতে পাওয়া যায়। তাই এখন একটি গণ্ডারের প্রচুর দাম। হামবুর্গের চিড়িয়াখানায় নবজাত গৌধাত্তির দাম উঠেছে প্রায় লাখটাকার কাছাকাছি।

ক্যাটারপিলার রোলার স্কেট্‌স

পশ্চিম জার্মানীর গাইজলিংগেন শহরের ব্যবসাদার জোসেফ কাইজার এমন একটি ক্যাটার-পিলার ট্রাক আবিষ্কার করেছেন, যেটি পায়ে বাঁধা স্কেট্‌সে লাগিয়ে বন-বাদাড়, মাঠ-ঘাট, বালি, পাথুরে বা কাদা জমির ওপর দিয়ে গড়গড়িয়ে যাওয়া যায়। এর নাম দেওয়া হয়েছে "রোলকা"। এই ক্যাটারপিলার ট্রাক একরকম ইলাস্টিক ব্যাণ্ড, যেটি যে-কোন অসমতল জমির সঙ্গে মানিয়ে নেয়। এতে আরও এমন ব্যবস্থা আছে, যাতে হড়কে না যায়। এটি স্কি কিংবা রোলার স্কেটসে লাগানো যায়। যেখানে পাকা রাস্তা নেই, সেখানে এরকম স্কেট্‌স পায়ে লাগিয়ে যত্রতত্র যাওয়া চলে। এই স্কেট্‌স ব্যবহারের জন্যে দরকার শুধু পাহাড়ে চড়ার উপযুক্ত একজোড়া হাল্কা কিন্তু মজবুত বুট জুতো, যাতে স্কেট্‌স পায়ে ঠিক ফিট হয়ে বসে। অনেক ভেবেচিন্তে বছর ছয়েক মাথা খাটিয়ে কাইজার সায়েব তাঁর "রোলকা" আবিষ্কার করেছেন এবং খুব শীগগির পেটেণ্ট করিয়ে নিয়ে গাদা গাদা "রোলকা" বাজারে ছাড়ার ব্যবস্থা করছেন।

সাদা অ্যালশেসিয়ান প্রজনন

যারা সারমেয় বিশেষজ্ঞ তারা জানেন যে, নেকড়ে বাঘের বংশধর জার্মানীর বিখ্যাত অ্যালশেসিয়ান কুকুর ধূসর হয়, বাদামী হয়, কালো হয় কিন্তু সাদারঙের কখন হয় না। কিন্তু সেই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। পশ্চিম জার্মানীর বুয়ের গ্রামের হ্যারী কিরফেসের ঘরে একটি আসল সাদা অ্যালশেসিয়ান জন্মেছে! প্রতি দশ বছরে একটা দুটো সাদা অ্যালশেসিয়ান যে জন্মায় না তা নয়, কিন্তু আসলে সেগুলো সাদা নয়, শ্বেতি-রোগবিশিষ্ট বলা চলে। তাদের লোমে একটা বিশেষ বর্ণের অভাবে সেগুলো সাদা দেখায়, মুখটা হয় গোলাপী ও চোখ দুটো হয় লাল। সে দিক দিয়ে হ্যারী কিরফেস ভাগ্যবান। তার অ্যালশেসিয়ানটা সত্যিই সাদা, নাকটা কালো ও চোখ দুটো বাদামী রঙের। হ্যারী সাহেবের সাদা অ্যালশেসিয়ানটি দেখার জন্যে বহু কুকুর-প্রিয় লোক বুয়ের গ্রামে এসে ঘুরে গেছে।

উত্তরসাগরে শামুকের চাষ

য়ুরোপ আমেরিকায় অয়েষ্টার জাতীয় শামুক অতি উপাদেয় খাদ্য। এই অয়েস্টার য়ুরোপের সবদেশে ভালো জন্মায় না বলে সে সব দেশের সরকারী মৎস্য-বিভাগ থেকে কৃত্রিম উপায়ে তার চাষ করার ব্যবস্থা হয়। পশ্চিম জার্মানীও এই অয়েস্টার থেকে বঞ্চিত। সুতরাং সরকারী প্রচেষ্টায় পর্তুগাল থেকে অয়েস্টার এনে চাষ করার ব্যবস্থা হয়। পর্তুগাল থেকে পনের টন অর্থাৎ প্রায় তিন

লক্ষ অয়েস্টার এনে উত্তরসাগরের অগভীর জলে ছেড়ে দেওয়া হয়। উত্তরসাগরের জলে প্ল্যাঙ্কটন নামে একরকম সামুদ্রিক শেওলা জন্মায়। এই প্ল্যাঙ্কটন খেয়ে ঐ পনের টন অয়েস্টার পাঁচমাসের মধ্যে আড়াইশো গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং তাদের আসল স্বাদ ও রঙেরও কোন পরিবর্তন হয়নি। তবে উত্তরসাগরের হিমশীতল জলে এরা কতদিন টিকতে পারবে তা বলা যায় না, কারণ বছর পঞ্চাশেক আগে এই উত্তরসাগরে একবার অয়েস্টার চাষ করা হয়েছিল এবং সে সময় কৃত্রিম প্রজননের ফলে একজাতের ভিন্ন অয়েস্টার জন্মেছিল। সেগুলো উত্তরসাগরের ঠাণ্ডা জলে বহুকাল বেঁচেছিল বটে, কিন্তু তারাও আজ লুপ্ত হয়ে গেছে। বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে জার্মান জেলেরা এখন আরেকবার চেষ্টা করছে যাতে উত্তরসাগরের জলে জার্মানদের মুখরোচক অয়েস্টার জন্মাতে পারে।

ডলফিনের মত বিমান

আজ মানুষ যখন রকেটে চেপে চাঁদে অভিযান করার জন্যে তৈরী হচ্ছে, আমাদের বেসামরিক বিমানগুলির অবস্থার উন্নতি কিন্তু সেই অনুপাতে অতি মন্থর বলতে হবে। আজ বিশ বছর হ'ল জানা গেছে যে, বিমানের ছিপছিপে চেহারা আকাশে ওড়ার পক্ষে খুব সুবিধের নয়। সম্প্রতি এমনি একটি বিমান তৈরীর কাজ সবেমাত্র শুরু হয়েছে, যেটি চলতি বিমানের মত দেখতে না হলেও, আকাশগামী হয়ে ওড়ায় নাকি অনেক ভালো। বেশ কয়েক বছর আগে পশ্চিম জার্মান বিমান নির্মাতা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হাইনরিষ হের্টেল প্রথম এমন একটি যাত্রিবাহী জেট বিমান তৈরী করেন যেটি সোজাসোজি উড়তে পারে। ঐ বিমানের গড়ন ও ডানা দুটির চেহারা অন্যরকম ছিল।

অধ্যাপক হের্টেলের মতে একালের ছিপছিপে লম্বাটে গড়নের বিমান প্রকৃতির সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না। তরল রকেট আবিষ্কার ও বিমানে জেট টারবাইন ব্যবহার করাতেও তিনি পথিকৃত। এ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে, প্রকৃতি যখন সবচেয়ে কর্মশক্তি ও পদার্থ ব্যবহার ক'রে নিজের কাজ চালিয়ে যায়, তখন যন্ত্রবিজ্ঞান কেন যে ঐ সব বিষয়ে এতো অপব্যয় করে তা' তিনি বুঝতে অক্ষম। তাই তিনি সামুদ্রিক জীব ডলফিনের আকৃতিতে সোজাসোজি উড়তে সক্ষম বিমান তৈরী করতে মনস্থ করেছেন। এই বিমান এখানকার বিমানের যত লম্বায় সমান থাকলেও চওড়ায় দ্বিগুণ হবে। এই ব্যবস্থায় ঐ বিমান যেমন দ্বিগুণ যাত্রী বহন করতে পারবে, তেমনি বিমানের গেটের দিকটাও খোলা-বন্ধ করা যাবে। কোলাপ্‌সিবল্‌। পিস্টন ইঞ্জিন লাগানো যাবে।

অধ্যাপক হের্টেলের সঙ্গে বিমান সংক্রান্ত অন্যান্য সমস্যা সমাধানের জন্যে কাজ করেছেন বিমান বিজ্ঞানী অধ্যাপক রয়েসগের।

—মধুর চেয়েও মধুর—

শ্রীমিত্রেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়

নবীনের বাড়ী বীরভূমে। আমেদপুর স্টেশনে নেমে মাইল পাঁচেক গেলেই নবীনদের গ্রাম। এবারে বাৎসরিক পরীক্ষার পর কলকাতা থেকে গিয়েছিলুম আমি নবীনদের বাড়ী। নবীন আমার স্কুলের সবচেয়ে সেরা বন্ধু। তাই সে যখন আমায় নিমন্ত্রণ করে বসল, আমার বাবা-মা কারুই আপত্তি হ'ল না তার সঙ্গে আমায় ছেড়ে দিতে। পরীক্ষা শেষ করে, পৌষ মাসের গোড়ায়, রেজাল্ট বেরবার আগেই দু'জনে চলে গেলুম। বীরভূম কখনও দেখিনি, পাড়াগাঁও আমার একরকম অচেনা। সবই তাই আমার চোখে নতুন লাগল, সবই ভাল লাগল।

নবীনদের বাড়ী গ্রামের এক পাশে। বেশ বড় বাড়ী—অনেক দিনের পুরানো, ভিতর মহল, বাহির মহল, চণ্ডীমণ্ডপ—আগেকার দিনের মত সবই আছে।

সবে ভোর হচ্ছে, সেই সময় আমরা ওদের গ্রামে এসে উপস্থিত হলুম। নবীনদের চণ্ডীমণ্ডপে বুড়ো মত একটি লোক বসেছিল। মাথায় তার একটা ময়লা সাদা গামছা জড়ানো। পাশে মস্ত একটা মাটির কলসী। আমরা ঢুকতেই নবীন বলে উঠল—"কি হারাধন, এই সকাল-বেলা এখানে?"

বুঝলুম, সেই বুড়ো লোকটির নাম হারাধন। হারাধন বলল—"এজ্ঞে, কর্তাবাবু এখনও ওঠেন নি, তাই বসে আছি। আজ প্রথম রস নামালুম কিনা। তা আপনারা এক-পাত্র খাবেন নাকি?"

নবীন বলল—"কি রে অনিল, খাবি নাকি?"

আমি বললুম—"কি খাব? কিসের রস?"

—"ওঃ, তুই হ'লি শহুরে ছেলে, এসব জানিস্ না। খেজুর-রসের নাম শুনেছিস্? টাটকা খেজুর-রস। হারাধন আমাদের পুরানো প্রজা। ওর কাছে আমাদের একশো খেজুর গাছ জমা দেওয়া আছে। আজ বোধহয় প্রথম রস উঠল, তাই প্রথম রস বাবাকে নিবেদন করে যাবে। খাবি নাকি এক-পাত্র? টাটকা খেজুর-রস শরীরের পক্ষে খুব উপকারী।"

খেজুর-রস সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই ছিল না। একটা নতুন জিনিস চাখবার-লোভে বললুম—"খেয়ে দেখতে পারি।"

হারাধন কলসীটাকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে একটা মাটির বড় ভাঁড়ে আস্তে আস্তে রস ঢালতে লাগল—খুব সাবধানে, যাতে একটুও চল্‌কে না পড়ে।

'আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলুম—তোবড়ান গাল, খোঁচা খোঁচা দাড়ি।'

আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলুম—তোবড়ানো গাল, খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। হাসছে না, তবু মনে হয় ঠোঁটের দু'পাশে যেন হাসি লেগে রয়েছে। মুখের গহ্বরে বোধহয় কোন দাঁত নেই—তার সেই নির্দন্তের হাসিটা যেন শিশুর হাসির মত। আর তার চোখ—তাতেও যেন কেমন ছেলে-মানুষের অসহায় দৃষ্টি।

রস খেতে ভারী চমৎকার লাগল। নবীনকে জিজ্ঞেস করলুম—"হ্যাঁ রে, তোদের হারাধনের বয়স কত?"

নবীন বলল—"হারাধনকে জিজ্ঞেস করলে ও বলে, ওর বয়স একশো পঞ্চাশ।"

আমি বললুম—"তুই বিশ্বাস করিস্?"

নবীন বলল—"বিশ্বাস হয় না বটে, কিন্তু কি জানিস্, ও যখন বলে দেড়শো বছর আগে এ অঞ্চলে কোন খেজুর গাছ ছিল না, ও নাকি নিজের চক্ষে এখানে খেজুর গাছ জন্মাতে দেখেছে, তারপর কত গাছ হতে দেখেছে, মরতে দেখেছে—এ সব কথা এমন করে বলে যে তখন একটু একটু বিশ্বাসও হয়। খেজুর-গাছ বলতে হারাধন পাগল—এ ছাড়া ওর আর কোন সখ নেই। তাছাড়া এই গ্রামেই কেমন করে লবাৎ আবিষ্কার হ'ল, তার ইতিহাস বলতে হারাধন বড় ভালবাসে।"

আমি বললুম—"লবাৎ আবার কি?"

নবীন বলল—"ওঃ, তাও জানিস্ না? ও হারাধন, এই দেখ কলকাতার এই বাবু লবাৎ-ও চেনে না। লবাৎ করে বাবুকে একবার খাইয়ে দিও তো। কবে করবে?"

হারাধন বলল—"করব বই কি। উত্তুরে হাওয়া বইবে আর ক'দিন পরে, সেই সময় লবাৎ জমবে ভালো। ওই মাঠে মরা-পুকুর-পাড়ে এসো বাবুরা, লবাৎ করা দেখবে, গরম গরম লবাৎ খাবে—তবে তো?"

সেই সময় নবীনের বাবা এসে ঢুকলেন। আমাকে দেখতে পেয়ে নবীনকে বললেন—"একে দাঁড় করিয়ে রেখেছিস্ কেন? যা, বাড়ীর ভিতর নিয়ে যা।"

নবীন তার গেলাসের রসটা চোঁ করে শেষ করে দিয়ে আমাকে নিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকল।

আমি বললুম—"দেখ্ নবীন, আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে হারাধনের বয়স দেড়শো বছর হতেও পারে। দেখিস্ না ওর চেহারার মধ্যে কেমন একটা ছেলেমানুষের ভাব। হয়তো ওর যখন একশো বছর বয়স হয়েছিল, তখন ওকে খুব বুড়ো দেখাতো। তারপর আরও যত বড় হচ্ছে, ততই ওর বয়স কম দেখাচ্ছে। এমন হতে পারে তো?"

নবীন বলল—"নিশ্চয় হতে পারে। দেড়শো বছর বাঁচলে মানুষের চেহারা কেমন হয়, তা তো আর কারো জানা নেই।"

আমি বললুম—"কিন্তু লবাৎ কি, তা তো বল্‌লি না।"

—"দেখবি দেখবি, হারাধনই দেখাবে। সেই সঙ্গে গল্পও শুনবি লবাতের। এ দেশে লবাৎ কেমন করে এল, সে ইতিহাস বলতে হারাধন খুব ভালবাসে।"

*		*		*		*

পরদিন ভোরবেলা উঠে নবীনকে ঠেলে তুললুম। বললুম—"চল্ না হারাধনের কাছে গিয়ে জেনে আসি লবাতের ব্যাপারটা।"

নবীন বলল—"যাবি? চ'।"

হারাধনের ঘর নবীনদের বাড়ী থেকে পাঁচ মিনিটের পথ। সেখানে গিয়ে দেখি, মস্ত একটা কড়াই নিয়ে হারাধন বসে আছে। তার দুই নাতি গাছ থেকে পেড়ে ছোট ছোট হাঁড়ির রস বড় কড়াই-এ ঢালছে। হারাধনের ছেলে নেই—বুড়ো হয়ে মারা গেছে কবে। নাতিরই চুলে পাক ধরেছে।

আমি বললুম—"ও হারাধন, লবাৎ খাওয়াবে বলেছিলে যে?"

হারাধন গালে হাত দিয়ে বলল—"ও খোকাবাবু, এখন লবাৎ কোথা? এই তো সবে রস, এর থেকে গুড় হবে, তার থেকে হবে লবাৎ। ওই দেখ, কালকের রস থেকে গুড় করে রেখে দিয়েছি। গুড় জমুক, উত্তুরে হাওয়া উঠুক, তবে তো লবাৎ বানাবো। নাও, টাটকা রস খেয়ে যাও।"—বলে দু'ভাঁড় রস আমাদের মুখের সামনে ধরে দিল। চমৎকার লাগল আমাদের এই রস খেতে।

এইভাবে রোজ সকালে আমি আর নবীন হারাধনের বাড়ী গিয়ে রস খেয়ে আসতুম। বেলা করে গেলে দেখতুম, বড় বড় লোহার কড়াইয়ে হারাধন আর তার দুই নাতি রস ফুটিয়ে গুড় বানাচ্ছে।

* * * *

একদিন সকালে উঠে দেখি খুব শীত পড়েছে। মাথা অবধি চাদর জড়িয়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে গেছি হারাধনের কাছে রস খেতে। গিয়ে দেখি, হারাধন আর তার দুই নাতি বড় বড় গুড়ের কলসী মাটিতে নামিয়ে রাখছে। আমরা পৌঁছতেই হারাধন বলল—"আজ লবাৎ বানাবো বাবু, দেখবে তো চলো মরা—পুকুর পাড়ে।"

রস খেয়ে এক দৌড়ে একবার নবীনদের বাড়ী হয়ে মরা-পুকুর পাড়ে আমরা যখন হাজির হলুম, দেখি, হারাধন আর তার দুই নাতি লবাতের সব আয়োজন শেষ করে ফেলেছে। মস্ত একটা মাটির উনুন—তার উপর মাপ-সই একটা লোহার কড়াই, কড়াই-এর মধ্যে গুড়। উনুনে শুকনো খেজুর-পাতা দিয়ে আঁচ দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। একপাশে জমির বেশ খানিকটা অংশ সমতল করে নিকোনো আর সমতলের মাঝে মাঝে সারিবন্দি ছোট ছোট চাক্তির মত গর্ত। গর্তগুলি সামান্য মাত্র গভীর।

নবীন সেই চাক্তির মত গর্তগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল—"ওইতে লবাৎ ঢালবে।"

আমি তখনও ব্যাপারটা কিছুই বুঝিনি। হারাধনকে বললুম—"এইবার বোঝাও হারাধন, লবাৎ কাকে বলে?"

হারাধন বলল—"বোসো বাবুরা স্থির হয়ে, ভালো করে মন দিয়ে শোনো এদেশে লবাৎ কেমন করে এল, তারই কাহিনী।" ব'লে নিজের বোনা খেজুর—পাতার একটা চাটাই পেতে দিল আমাদের জন্য। নিজেও বসল পাশে। নাতিরা হাওয়া দিতে লাগল উনুনে। ফোটাবার জন্য কড়াই-এ গুড় চড়ান হ'ল। হারাধন সুরু করল তার ইতিহাস।—

শোনো বাবুরা, এ অনেক দিনের কথা। এখন আমার বয়স হ'ল দেড়শো বছর, আর এ হচ্ছে আমার ঠাকুর্দার আমলের ঘটনা। সে সময় এই গ্রামে এক দেবতুল্য জমিদার থাকতেন. তাঁর নাম ছিল রামশর্মা। প্রজারা তাঁকে রামরাজা বলে ডাকত। প্রজারা ছিল সুখী। রামরাজার ভাঁড়ারও ছিল ভরা. সংসারও ছিল সুখের।

তাঁর এক আদরের মেয়ে ছিল। সেই মেয়ের একবার অসুখ করে মেয়ে, যায় যায় হ'ল। বদ্যি -হাকিম হিমসিম খেয়ে গেল। মেয়ে দিনের পর দিন যেন বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে যেতে লাগল।

শেষে একদিন অসুখের যখন খুব বাড়াবাড়ি, সেদিন দুপুর থেকে আকাশ অন্ধকার করে ঝড় উঠল। অমন ঝড় এই গাঁয়ে কেউ কোনদিন দেখেনি—কত গরীব মানুষের ঘর পড়ে গেল, কত গাছ উপড়ে পড়ল তার ঠিক নেই। একটু করে হাওয়া কমে, আবার বাড়ে—এমনি করে চলল তিন দিন তিন রাত্রি।

এই তিন দিন জীবন আর মরণের সঙ্গে চলল রুগীর লড়াই। কবিরাজ কতবার আশা ছেড়ে দিলেন, আবার দেখলেন রুগীর নাকে নিঃশ্বাস বইছে। ওষুধের খল তুলে রেখে দিচ্ছেন, আবার নিঃশ্বাস পড়া দেখে মধু দিয়ে ওষুধ মেড়ে মেয়ের ঠোঁট খুলে খাইয়ে দিচ্ছেন। অমনি করে তিন দিন পরে ঝড় যেই শেষ হ'ল, মেয়েও চোখ মেলে তাকাল। কবিরাজ দেখে অবাক! বললেন—"এ'টি সহজ দৃষ্টি।" নাড়ি পরীক্ষা করে বললেন—"রোগের আর কোন লক্ষণ পাচ্ছি না।"

মেয়ে ক্ষীণ হাসি হেসে বলল—"কি মিষ্টি ওষুধ দিলেন কবিরাজ মশাই, আর একটু দিন না।"

কবিরাজ তাঁর সাকরেদকে বললেন—"দাও তো রোগীর মুখে একটু মধু, ওষুধ দেবার আর দরকার নেই।

সাকরেদ মাথা নিচু করে দাঁড়ালো, বলল—"প্রভু, আর একটি ফোঁটাও মধু বাকি নেই। শেষ ওষুধে সবটুকু ঢেলে দিয়েছি।"

রামরাজা বললেন--"তাতে কি হয়েছে, মধু আনাচ্ছি আমি। মেয়ে মিষ্টি খেতে চাইছে আমি তাকে তা দিতে পারবো না!" বলে তিনি চাকরদের হুকুম দিলেন বাগানে গিয়ে চাক ভেঙে মধু নিয়ে আসতে। রামরাজার বাগানে প্রচুর মধু হ'ত—নিজেরা খেয়ে কখনও শেষ করতে পারতেন না, গ্রামের লোকেদের বিলিয়ে দিতেন।

চাকরেরা বাগান থেকে খালি হাতে ফিরে এসে বলল যে, ঝড়ে গাছপালা ভেঙে তচনচ, কোথাও একটি চাকও বাকী নেই। মধু পাওয়া গেল না। গ্রামে যাদের কাছে কিছু মধু থাকবার কথা, তাদের ঘরবাড়ীও ঝড়বৃষ্টিতে ভেঙে শেষ হয়ে গেছে। গ্রামে আর এক ফোঁটাও মধু নেই।

মেয়ের মুখে মিষ্টি দেওয়া গেল না। তখনকার দিনে গুড় করতে কেউ শেখেনি, চিনি তো দূরের কথা! জমিদারের মেয়ের কাঁদাকাটাই সার হ'ল। জমিদার আর কিছুই করতে পারলেন না।

(ক্রমশঃ)

বুদ্ধির ঢেঁকি

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

"ইলিশ মাছটা কোথায় থেকে আন্‌লে কিনে খুড়ো ?"-
শুধায় পাড়ার ছেলে এবং বুড়ো।
খুড়ো মশাই কেবল ভাবে
ফোক্‌লা যতো দাঁতগুলো সব হোক্ না বেবাক্ গুঁড়ো !

ছুট্‌ছে খুড়ো আপনমনে ফুর্তি ক'রে হন্‌হনিয়ে,
গাঁয়ের পথে সন্‌সনিয়ে।
উঠ্‌ছে নোলা সক্‌সকিয়ে
নাচছে জিব লক্‌লকিয়ে,
মক্‌মকিয়ে চ'লে খুড়োর বাড়ছে ক্ষিদে চন্‌চনিয়ে !

রকে ব'সে ছোক্‌রাগুলো ভেঁপো এবং জ্যাঠা,—
এমন সময় বাধিয়ে দিলে ল্যাঠা।
পট্‌লা বলে, "আয় না সবাই
খুড়োর হাতের মাছটা বাগাই,
এমন ইলিশ প্রেম্‌সে ব'সে একাই খাবে ব্যাটা !"

কাছে এসে বল্লে তখন মিষ্টি হেসে মধু ,—
ইলিশ মাছটা আন্‌লে ব'য়ে শুধু !
হায়রে কপাল ! বুঝলে খুড়ো,—
জানে গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো—
আজ বিধবা হ'লেন খুড়ী—অর্থাৎ তোমার বধূ !"

এই না শুনে খুড়ো তখন চল্লো চোঁচা বাড়ি,—
পথের মাঝেই হাতের ইলিশ ছাড়ি' !
ছোক্‌রাগুলো মাছটা নিয়ে
ক্লাবের ঘরে উঠ্‌লো গিয়ে ;—
খিঁচুড়ি আর ইলিশ মাছে ফিষ্টি হবে ভারি !

মেঠুড়ে
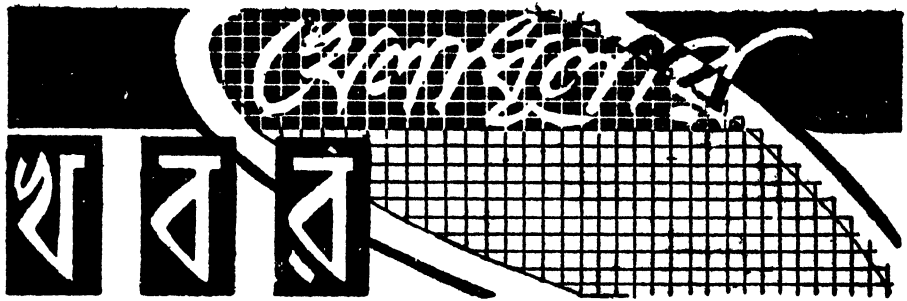
টেস্ট ম্যাচঃ অষ্ট্রেলিয়া বনাম পাকিস্তান

অস্ট্রেলিয়া দল পাকিস্তানের সঙ্গে টেস্ট ম্যাচ খেলে করাচীতে। পাকিস্তানের অধিনায়ক ছিলেন বিখ্যাত টেস্ট খেলোয়াড় হানিফ মহম্মদ। যে সব খেলোয়াড় নিয়ে পাকিস্তান দল গঠন করা হয়েছিল, তার ভেতর ছ-জন নতুন খেলোয়াড় ছিলেন। টসে জিতে পাকিস্তান প্রথম ব্যাট ক'রে প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ করে ৪১৪ রানে। ইবাতুল্লা এবং কাদের প্রথম উইকেট জুটিতে ২৪৯ রান তোলেন। মাত্র ৫ রানের জন্য কাদেরসেঞ্চুরি করতে পারেন নি। ইবাতুল্লা ১৬৬ রান তোলেন। ম্যাকেঞ্জি প্রথম ইনিংসে ছ-টা উইকেট দখল করেন।

অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে ৩৫২ রান তোলে। অধিনায়ক সিম্পসন একাই ১৫৩ রান সংগ্রহ করেন। দ্বিতীয় ইনিংসে ৮ উইকেটে ২৭৯ রান তুলে পাকিস্তান দল ইনিংসের শেষ ঘোষণা করে। বাকী সময়ে ২ উইকেটের বিনিময়ে অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসে ২২' রান ওঠায় এবং এই সময়ে খেলার সময় উত্তীর্ণ হয়। দ্বিতীয় ইনিংসেও সিম্পসন সেঞ্চুরি করেন। সুতরাং পাকিস্তানে এবারে অনুষ্ঠিত অস্ট্রেলিয়া বনাম পাকিস্তানের একমাত্র টেস্ট ম্যাচ অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়।

সন্তোষ ট্রফি

জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা সন্তোষ ট্রফির খেলা এবার গৌহাটিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মোট উনিশটি রাজ্য দল এবারের প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছে। গতবার সন্তোষ ট্রফির খেলা মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ফাইন্যালে মহারাষ্ট্র দল অন্ধ্রকে হারিয়ে দিয়ে সন্তোষ ট্রফি লাভ করেছিল। মাদ্রাজের কাছে হেরে বাংলা দল কোয়ার্টার ফাইন্যালে বিদায় নিয়েছিল।

গৌহাটির নেহেরু স্টেডিয়ামে এবারের একবিংশতিতম জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী বিমলাপ্রসাদ চালিহা।

উদ্বোধনী খেলায় বিহার ৪-৩ গোলে দিল্লিকে হারিয়ে দেয়। বিহারের রমজান এবারের প্রথম হ্যাটট্রিক লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেন। ৩-২ গোলে উড়িষ্যাকে হারিয়ে দিয়ে উত্তর প্রদেশ দ্বিতীয় রাউণ্ডে মিলিত হয় ভারতীয় রেল দলের সঙ্গে। রেল দলের কাছে ৫-০ গোলে হেরে উত্তর প্রদেশ এবারের প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়।

আসাম দল ৮-০ গোলের ব্যবধানে গুজরাট দলকে হারিয়ে তৃতীয় রাউণ্ডে উঠেছে। আসামের অজয় দাস প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় হ্যাটট্রিক করেন। অধিকাংশ তরুণ খেলোয়াড় নিয়ে এবারের বাংলা দল গঠন করা হয়েছে। বাংলার অধিনায়ক হয়েছেন শ্রীসুকুমার সমাজপতি। দেখা যাক বাংলা দল শেষ পর্যন্ত কী করে!

বালিগঞ্জ ক্রিকেট ক্লাব

ঠিক একশ বছর, আগে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বালিগঞ্জ ক্রিকেট ক্লাব স্থাপিত হয়। বালিগঞ্জ ক্রিকেট ক্লাব তাদের শতবার্ষিকী উপলক্ষে এক হপ্তা ধরে যে ক্রিকেট খেলার ব্যবস্থা করেছিলেন, তার প্রধান আকর্ষণ ছিল অতীত অধ্যায়ের অভিনব আয়োজন।

একশ বছর আগে, আজকের বালিগঞ্জ ছিল পাড়াগাঁর মতন। ক্রিকেট ছিল তখন সাহেবদের অবসর সময় কাটানোর অঙ্গ, আর একসঙ্গে মেলামেশার মাধ্যম। তখনকার দিনে কী ভাবে ক্রিকেট খেলা হ'ত বালিগঞ্জ ক্রিকেট ক্লাবের শতবার্ষিকী উৎসবে তারই অভিনয় করে উপস্থিত দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দেন বালিগঞ্জ ক্লাবের সদস্যরা। খেলোয়াড়রা পরেছিলেন তখনকার দিনে খেলোয়াড়রা যে রকম পোশাক পরে খেলতেন, মুখে ইয়া বড় জুলফি এঁটেছিলেন, তিনটের জায়গায় দুটো স্টাম্প পুঁতেছিলেন, তখনকার নিয়মকানুনেই খেলা চালিয়েছিলেন।

বালিগঞ্জ ক্রিকেট ক্লাবের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত ক্রিকেট ম্যাচ খেলা দেখার জন্যে সে-দিন যাঁরা বালিগঞ্জ মাঠে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা স্বচক্ষে অতীত দিনের অভিনয় দেখে যে খুব আনন্দ পেয়েছেন তা বলাই বাহুল্য।
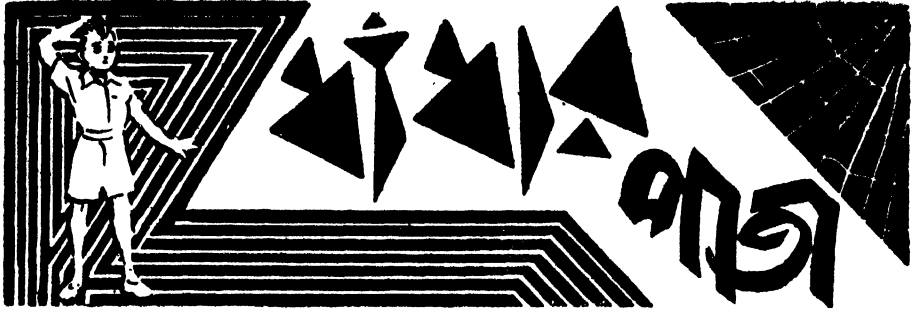
বুদ্ধি নিয়ে খেলা

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী

১। একটি দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগী ছিল সাত জন রাম হয়েছিল শেষের দু'জনের উপরে। রাম কোন্ স্থান অধিকার করেছিল বল তো?

২। জানালার কাচে নীচের সংখ্যাগুলি যদি রং দিয়ে লেখা হয়, তাহলে দু'দিক থেকেই কোন্ সংখ্যাটি একই রকম দেখাবে বল তো? সংখ্যাগুলি এই ৩১৬, ৩৩, ৪০৪, ১০১, ৭৭।

৩। টেবিলের উপর আছে এক গ্লাস জল। ঐ টেবিল বা গেলাস না ছুঁয়ে তুমি গেলাসটিকে শূন্য করে দিতে পার? কি ভাবে দেবে বল তো?

৪। ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

উপরে নয়টি শূন্য বা ০ আছে। ওগুলির মাত্র পাঁচটিতে ছোট ছোট লম্ব টেনে অর্থবোধক একটি বাক্য রচনা করতে পার?

৫। বিপরীতার্থক জোড়ায় জোড়ায় শব্দগুলি (যেমন, সুখ-দুঃখ) এক জায়গায় করে বসাও: আলো, পাপ, পাতলা, দিবা, অন্ধকার, পুণ্য, রাত্রি, দীর্ঘ, ঘন, হ্রস্ব।

৬। একটি গাছে প্রত্যহ পূর্ব-দিনের দ্বিগুণ ফুল ফোটে। দশ দিন পরে গাছের সমস্ত ফুল ফুটে গেলে অর্ধেক ফুল ক দিনে ফুটে ছিল বল তো?

৭। একটি বর্গক্ষেত্রের মধ্যে লম্বালম্বি ও খাড়া ভাবে দু'টি করে লাইন টেনে ওটিকে মোট নয়টি ঘরে ভাগ করা হ'ল। এর কোন্ ঘরে কত রাশি বসালে যে দিক থেকেই (লম্বালম্বি, খাড়া ভাবে বা কোণাকুণি) ঐ সংখ্যাগুলি যোগ করা যাক্, তার যোগ ফল ১৫ হবে?

প্রশ্ন ও উত্তর

১। রোগা লোকেরা কি মোটা লোকের চেয়ে বেশী শীত অনুভব করে?

২। কোন্ কোন্ জন্তু দুধ দেয়।

৩। পাখীর কি দাঁত আছে?

৪। সবচেয়ে বড় উড়ন্ত পাখী কোনটা?

৫। কোন্ পাখীর ল্যাজ বা ডানা নেই?

৬। পৃথিবীর কতটা অংশ জলে আবৃত? [উত্তর অন্য পৃষ্ঠায় দেখ

গত মাসের 'বুদ্ধি দিয়ে খে

১। কখনও না।

২। (ক) জাপান (খ) নরওয়ে (গ) ফিনল্যা (ঘ) মেসোপটেমিয়া (বর্তমান ইরাক)

৩। ব।

সীসার পেন্সিলে সীসা নেই ; গিনিপিগ পিগ নয় এবং Duinea থেকেও আসে না ; জার্মান সিলভারে—সিলভার নেই ; সোডাওয়াটারে সোডা নেই ; ফ্লাইং ফক্স —ফক্স নয় (ওটা এক রকমের বড় বাদুড়) ; তিমি মাছ—মাছ নয় ; গোল পাতা—গোল নয় ; টিনের বাক্স—টিনের নয় (পাতলা লোহার পাতে টিন ছেপে দেওয়া)।

৫। FATHER, COCKTAIL, LEGEND, DAMPEN, CARTET, WARDEN, COTTON, HATRED, ANTHEM, ENDEAR

৬। ১১ টি।

৭।

১	১৪	১৫	৪
৮	১১	১০	৫
১২	৭	৬	৯
১৩	২	৩	১৬

'প্রশ্ন ও উত্তর'-এর উত্তর

১। সত্য, মোটা লোকদের শরীরে বেশী চর্বি থাকায় কম শীত অনুভব করে। কারণ, এই চর্বির প্রলেপ দেহে থাকায় শীত তুলনায় কম শরীরে ঢোকে।

২। চমরী গাই রেনডিয়ার, ছাগল, উট, ঘোড়া, লামা, গরু, মেষ, গাধা, মহিষ প্রভৃতি।

৩। বর্তমানে পৃথিবীতে যত রকম পাখী আছে, তাদের কোন দাঁত নেই বলেই জানা গেছে।

৪। (Albatrass)।

৫, নিউজিল্যাণ্ডের কিউই (Kiwi)।

৬। শতকরা ৭১ অংশ।

(সমালোচনার জন্য দু'খানি বই পাঠাবেন)

পুজোর সময় নানা ধরনের নতুন নতুন যেমন সব কাগজ বেরোয়, সাধারণ চলতি কাগজগুলি যেমন আকারে মোটাসোটা ও রঙচঙে হয়ে বাজার ছেয়ে ফেলে, তেমনি এই সময় নতুন নতুন বই এবং বার্ষিকীও বেরোয় অনেক। বিশেষ করে তোমাদের জন্যে লেখা বার্ষিকী আর বইয়ের সমারোহ দেখা যায় এই সময়। এবারও পুজোর সময় এই ধরনের অনেকগুলি আমাদের হাতে এসেছে। এই বইগুলির প্রত্যেকটিই যেমন ঝকঝকে-চকচকে ছাপা, ছবিতে-ছবিতে ভরা, তেমনি মলাট-গুলিও দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। এগুলির মধ্যে তোমাদের যার যেটি পছন্দ সেটি কিনলে বা সংগ্রহ করে পড়লে প্রচুর আনন্দ পাবে এবং অনেক কিছু শিখতেও পারবে। সংক্ষেপে এখন বইগুলির পরিচয় দিচ্ছি।

'আমাদের দেশ'সিরিজের প্রথম বই **'উড়িষ্যা'** লিখেছেন রবীন্দ্র-পুরস্কারে সম্মানিত লেখক শ্রীসুবোধচন্দ্র চক্রবর্তী। বাঙলা দেশের গায়েই উড়িষ্যা। এই প্রদেশের ইতিহাস, মানুষজন, বিখ্যাত জগন্নাথ দেব ও তাঁর কাহিনী, রথযাত্রার গল্প অসংখ্য মন্দির-শিল্পের বৈশিষ্ট্য, কোণারক, ভুবনেশ্বর, যুক্তেশ্বর, যাজপুর প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রের কথা, আর দিগন্তবিস্তারি সমুদ্র ও তার নিরবচ্ছিন্ন উর্মিমালার কথা ভারী সুন্দর সহজ ও মিষ্টি করে কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে বলেছেন লেখক। পড়তে পড়তে উড়িষ্যা ঘোরার সাধ মেটে, সবই যেন দেখা হয়ে যায়। অনেক ছবি আছে। বই-খানি প্রকাশ করেছেন, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। দাম: দু'টা পঞ্চাশ পয়সা।

শ্রীবাদল সরকারের লেখা **'ছবির খেলা'** আর একখানি মজার বই। ধাঁধার বইও বলা যায় এটিকে। প্রতি পাতায় ছবি-ভরা এই বইটি থেকে অনেক জিনিস হাতে-কলমে করে দেখা যায়। এ বইটির সাহায্যে তোমাদের মাথা পরিষ্কার হবে আর জ্ঞানের পরিধিও হবে বিস্তৃত। বইটি প্রকাশ করেছেন—শিশু সাহিত্য সংসদ, ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯ দাম দু'টাকা। এই শিশু সাহিত্য সংসদেরই আর একখানি ইংরেজী অক্ষর পরিচয়ের সুন্দর বই সুখলতা রাও-এর লেখা 'New Steps'। এটির দাম: এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা। দামের তুলনায় বইখানি হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করলে আরও বেশী দাম বলে মনে হয়। যাদের নতুন ইংরেজী অক্ষর পরিচয় হবে, এ বই হাতে পেয়ে তারা যেমন ছাড়তেও চাইবে না, তেমনি শিখেও ফেলবে

খুব তাড়াতাড়ি। আস্তিকালের প্যারী সরকারের ফার্স্ট বুকের পর এমন বই আর বেরিয়েছে কিনা সন্দেহ!

এবার পূজোয় ছোটদের অভিনয় উপযোগী ভারী সুন্দর দু'টি বই বেরিয়েছে, কনটেমপোরারী পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯ থেকে। একটির নাম **'রবি যেদিন কবি হল**, শ্রীঅশোক গুহর লেখা। রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার কাহিনী, তাঁরই বই থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে পাঁচটি দৃশ্যে নাটকে রূপ দিয়েছেন লেখক। দু'জন সূত্রধরের সাহায্যে অত্যন্ত কৌশলে মিষ্টি করে গাঁথা হয়েছে কাহিনীটিকে। চরিত্রের বেশী বালাই না-থাকায়, তোমরা সহজেই কবিগুরুর বাল্য ও কৈশোর জীবনের উপর লেখা এই সুন্দর নাটকটিকে তাঁর জন্মদিনে অথবা অন্য কোন উৎসব-আনন্দের দিনে অভিনয় করে নিজেরাও যেমন আনন্দ পাবে, তেমনি দর্শকদেরও আনন্দ দিতে পারবে। দ্বিতীয় নাটক **'লঙ্কা-দহন পালা'**। নাম থেকে নাটকটির পরিচয় সহজেই পাওয়া যায়। রামায়ণের বিখ্যাত চরিত্র বীর হনুমান ল্যাজে আগুন ধরিয়ে যে লঙ্কা পোড়াতে গিয়েছিলেন, সেই কাহিনীকে মজার করে নাটকে রূপান্তরিত করেছেন শ্রীমতী লীলা মজুমদার। এতেও পাত্র-পাত্রী অল্প এবং দৃশ্য মাত্র দু'টি। চরিত্র হিসাবে রাক্ষস ও হনুমান তো আছেই, তাছাড়া আরও আছে দু'চারটি। এই চরিত্রগুলির সাজ-পোশাকের দিক থেকেও যেমন মজা আছে, তেমনি গান আর কথাবার্তার মধ্যেও আছে প্রতি দৃশ্যেই নানান মজা। এ নাটক অভিনয় করলেই জমবে এবং ছোট-বড় সবাই মিলে শেষ পর্যন্ত দেখবে আর হাততালি পড়বে মুহুর্মুহুঃ। দু'টি নাটকেই ছবি আছে অনেকগুলি করে।

শেষ বইটি একটি পূজা বার্ষিকী। তোমাদের মধুদি' (ইন্দিরা দেবী) সম্পাদিত **'সাত সমুদ্দুর'**। প্রতি বছরেই সম্পাদিকা এই বার্ষিকীটি যেমন সুন্দর করে প্রকাশ করেন, এবারেও তেমনি করেছেন। তবে এবারেরটি যেন অন্যান্য বছরের তুলনায় আরও সুন্দর হয়েছে ছবি, ছাপা ও লেখার দিক থেকে। আকারে গাব্দা-গোদা না হলেও, মাত্র দু'টাকা পঞ্চাশ পয়সায় এমন একখানি বার্ষিকী সত্যিই যে কি করে দেওয়া যায়, তা ভেবে আশ্চর্য লাগে। তোমরা যারা এটি এখনও সংগ্রহ করোনি, তারা এটি সংগ্রহ করার জন্য 'সাত সমুদ্দুর' অফিস, ৪০ বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা ১২ এই ঠিকানায় প্রকাশক জয়তী চক্রবর্তীর কাছে চিঠি লিখতে পার।

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত
ও তৎকর্তৃক প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণী,কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত। মূল্য : ০'৪৫ পয়সা

দিদির শাসন

ফটো : শ্রীশিবেন দাশগুপ্ত

বৃষ্টিতে ভিজলে যদি—দেখাবে মজা।

* ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র *

৪৫শ বর্ষ] পৌষ—১৩৭১ [৯ম সংখ্যা

শীত এলো

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

আহা রে চুপি চুপি এলো যে ঐ শীতের বুড়ি,
গায়ে তার লেপ চাদর আর চুলগুলো সব শনের নুড়ি।
তাইতে বিছানা ছেড়ে খুকুর কি আজ মন ওঠে না—
বাগানে গাঁদার রাশি, শিউলির ঝাঁক আর ফোটে না?
ভাইটি লেপ ছেড়ে আজ মুখটি ধুতে উঠবে নাকি?
এগারো প্রশ্নমালার পঁচিশখানা অঙ্ক বাকি!
কখন আর সারবে বলো হাতের লেখা একুশ পাতা—
টিপ টিপ করছে কেন, ঘুমোয় যদি, চোখের পাতা?

আহা রে ভাগ্যি এলো গুড়ি গুড়ি শীতের বুড়ি
তাই তো খাচ্ছো বসে কড়াইশুঁটির ফুল-কচুরি !
শীত এলো তাই সকালে দেখতে পেলে জানলা দিয়ে
বুড়োটা হাঁকছে কেমন খেজুর রসের কলসী নিয়ে ;
বাজারে থরে থরে দেখতে পাবে ফুলকপি যে—
কত সব শাকসব্জী শিশির মেখে উঠল ভিজে।
থলিটা লাল টম্যাটো রাঙা মূলোয় ভরলে খালি ?
এখনো রইল বাকি মিঠে-কড়া গোল পাটালি !

আহা রে এই তো সবে জাঁকিয়ে এলো শীতের বুড়ি—
এখনই মাতলে কেন, দাও না রেখে লাটাই ঘুড়ি।
চলো না দল বেঁধে সব যাই চলে আজ খেলার মাঠে,
বলো না একা একা গাদি খেলার ছক কে কাটে !
এখনো ব্যাডমিণ্টন পড়লো নাকো, খেলবে কবে ?
ছকুদার র‍্যাকেটখানা এক্ষুনি ভাই আনতে হবে।
বেশ তো আসল খেলার কথাই দেখি যাচ্ছি ভুলে—
ও বিশে, ক্রিকেট বুঝি রাখবি এবার শিকেয় তুলে ?

আহা রে এবার যে ভাই জাঁকিয়ে এলো শীতের বুড়ি—
দেখছো কাঁপছে বসে মজুরগুলো গুড়িশুড়ি,
ওরা সব কাঁপতে জানে, লেপ-তোষকের নাম জানে না ,
কচি ওই বাচ্চাগুলো কেউ পাবে না গরম জামা।
যদি না এদের কথা সবাই মিলে ভাবতে পারো—
তাহলে চাইনে গো শীত, চাইনে তোমায় একটি বারো !

———

হাওয়াই দ্বীপের গল্প

শ্রীবন্দনা গুপ্ত

অনেক অনেক দিন আগে হাওয়াই দ্বীপে ভারী দুষ্টু একটি ছেলে ছিল—নাম ছিল তার 'পুনিয়া'। ভাবছ বুঝি সে হাওয়াই সার্ট ও হাওয়াই চটি পরেই থাকত—উহুঁ তা মোটেই নয়। সেকি আজকের কথা, হাওয়াই চটির নামও শোনেনি কেউ তখনো। চারিদিকে সমুদ্রের জলে ঘেরা ছোট্ট হাওয়াই দ্বীপ; তখন সবেমাত্র সমুদ্রের তলা থেকে উঠেছে। তাই সমুদ্রের জীবজন্তুদের কথা পর্যন্ত বুঝতে পারত হাওয়াই দ্বীপের লোকেরা এবং তারাও বুঝত মানুষের ভাষা। পুনিয়ার বাবা ছিল না, বিধবা মা কষ্টেসৃষ্টে দিন চালাতো। অল্প একটু জমিজমা যা ছিল তাতেই মিষ্টি আলু, আর কচু চাষ ক'রে কোনমতে চলতো তাদের। কিন্তু পুনিয়া বেচারা মিষ্টি আলু খেতে খেতে একেবারে হয়রান হয়ে গিয়েছিল। একদিন মনের দুঃখে সমুদ্রের ধারে ছোট্ট একটা পাহাড়ের গায়ে বসে আছে, এমন সময় দেখে জলের নীচে কতগুলো মস্ত বড় বড় চিংড়ী মাছ গোঁফদাড়ি নেড়ে নেচে বেড়াচ্ছে। যেমনি দেখা ওমনি পুনিয়া একলাফে উঠে বসল—"ওঃ, আজ যা জমবে খাওয়া, মিষ্টি আলুর সঙ্গে চিংড়ী!" পুনিয়ার জিভে সুরুৎ ক'রে জল এসে গেল, কিন্তু ওরে বাপ রে—এগুলো কি? জলের নীচে ঠাহর ক'রে দেখে পুনিয়া—এ যে মস্ত মস্ত হাঙ্গর—একটা নয়, দুটো নয়, পাঁচ-পাঁচটা হাঙ্গর নরম বালির উপর পড়ে ভোঁস ভোঁস ক'রে ঘুমুচ্ছে। চিংড়ী মাছের বাড়ীর দরজায় যেন পাঁচ সেপাই বসে পাহারা দিচ্ছে। হায় রে! আলু দিয়ে চিংড়ীর এখানেই বুঝি খতম!

কিন্তু এত সহজে দমবার ছেলেই নয় পুনিয়া। মাথায় ততক্ষণে তার একটা (plan) প্ল্যান এসে গেছে। জলে থলথল শব্দ ক'রে, প্রথমেই সে হাঙ্গরগুলোর ঘুম দিলে ভাঙ্গিয়ে—তারপর ওদের শুনিয়ে শুনিয়ে চেঁচিয়ে বললে—"ঐ রোগা টিং টিং-এ ল্যাজওয়ালা হাঙ্গরটা আমাকে একটা ফন্দি শিখিয়ে দিয়েছে; হাঙ্গরগুলোকে ফাঁকি দিয়ে আমি ঠিক চিংড়ী মাছ নিয়ে চলে আসব। ওরা আমাকে কিছুতেই ধরতে পারবে না।" শুনে তো হাঙ্গরদের মধ্যে মহা হুল্লোড় পড়ে গেল। পালের গোদা হাঙ্গর হুলুলু, বিরাট বপু তার—আস্ত একটা ডিঙ্গী নৌকো গিলতে পারে একেবারে—সে তো রেগে একেবারে কাঁই। এমন ভাবে তাকালো এই কথা শুনে, যে আর সব হাঙ্গররা ভয়ে একেবারে তো হার্টফেল করবার মত অবস্থা। সবাই আড়চোখে চাইতে লাগল আপন আপন ল্যাজের দিকে—কার ল্যাজটা রোগা টিং টিং-এ তার আর রক্ষা নেই! দলের মধ্যে থেকে বিশ্বাসঘাতকতা! (সত্যিই যার ল্যাজ সব চেয়ে ছোট, সে বেচারা বিপদ দেখে একটু একটু ক'রে পিছু হটতে লাগলো, পালের গোদার হাত থেকে প্রাণ বাঁচানোর জন্য) এই সময় পুনিয়া ঢুম করে একখণ্ড পাথর ফেললো বেশ কয়েক হাত দূরে—শব্দ শুনে সবকটা হাঙ্গর ছুটলো ঐ দিকে পুনিয়া মনে ক'রে, আর সেই সুযোগে

পুনিয়া ডুব দিয়ে তুলে নিয়ে এল দু'বগলে দুটো চিংড়ী। পুনিয়াকে চিংড়ী হাতে পাহাড়ের উপরে দেখে, পালের গোদার সব রাগ গিয়ে পড়লো ঐ রোগা ল্যাজওলার উপর—একলাফে তার ঘাড় মট্‌কে ফেলল আর সবাই মিলে ভাগ করে খেয়ে ফেলল সেই নির্দোষ হাঙর বেচারাকে। তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পারছ পুনিয়া মিথ্যে করেই বলেছিল ওর নাম।

তোমরা শুনে অবাক হ'য়ে যাবে আবার দু'চারদিন পরেই দেখা গেল পুনিয়াকে সেই পাহাড়ের গায়ে দাঁড়িয়ে জলের নীচে লক্ষ্য করছে হাঙরদের গতিবিধি। সেদিন রাত্তিরে আলু-চিংড়ী খেয়ে পুনিয়ার লোভ বেড়ে গিয়েছিল, আগের দিন মায়ের অত কাতর মিনতি ভুলে গেল পুনিয়া। দুষ্টু-বুদ্ধি পুনিয়া বোকা হাঙরদের শুনিয়ে ফের মিথ্যে ক'রে বললে—"সবচেয়ে বড় ভুড়িওলা হাঙরটা আমাকে একটা কৌশল শিখিয়েছে, আজও দুটো চিংড়ী নিয়ে নিরাপদেই উঠে আসব আমি। "শুনেই তো দলপতি রেগে আগুন।

সবাই ভয়ে কুঁচকে চেষ্টা করতে লাগালা ভুঁড়ি কমাতে। একটি দুঃসাহসী হাঙর দলপতিকেই বলে ফেললো—"তোমার ভুঁড়িটাই তো বাবা সব চেয়ে বিরাট।" বলতেই সে বুঝলো আজ আর রক্ষা নাই—যেই ছুটে পালাতে গেছে পেছন পেছন ভুঁড়িওলা হলুলু ছুটে গিয়ে ধরলো তাকে চেপে এবং সবাই মিলে তাকে দিয়েই সেদিনের সান্ধ্যভোজ সারতেই যখন ব্যস্ত, সেই সময় পুনিয়া লাফিয়ে পড়ে আবার দুটো চিংড়ী নিয়ে উঠে পড়লো। বুড়ো হলুলু খুবই চটে রইলো পুনিয়ার ওপরে—কবে পুনিয়াকে বাগে পাবে সেই আশায় দিন গুনতে লাগলো। চিংড়ী খেয়ে খেয়ে পুনিয়ারও বেশ নধর চেহারা হ'য়ে উঠল। চিংড়ী খেয়ে আশ মিটলেও—পুনিয়ার এই হাঙরদের বোকা বানানো যেন কি এক খেলাতে পেয়ে বসলো—বিশেষ ক'রে হলুলুকে জব্দ করতে তার বেজায় আনন্দ।

তাই আবার কিছুদিন পরেই পুনিয়া আবার সেই পাহাড়ের গায়ে গিয়ে হাজির। দুটো হাঙরের বেশীরভাগটাই খেয়ে হলুলু যেন আরও কেঁদো হয়েছে। দুটো হাঙরের পরিণাম দেখে বাদবাকীগুলো সেই জায়গা থেকে সরে পড়েছে। শুধু হলুলু পুনিয়ার নধরকান্তির লোভে এখনো দিন গুণছে।

পুনিয়া জানত পালের গোদার যেমন বিরাট দেহ, তেমনি সেটা একটা প্রকাণ্ড বোকা—তাই সে ঠিক করল এবার তার যত দুষ্টুবুদ্ধি ছিল সব খাটিয়ে ওকে জব্দ করা চাই। এবার পুনিয়া সঙ্গে নিল একটা করাত, আর দুটো লোহার শিক, দুটো কাঠের টুক্‌রো, একটা ছোট পাত্র ও কিছু মিষ্টি আলু। বুঝতেই পারছ এবার পুনিয়া চিংড়ীর জন্য যায়নি মোটেই—ঐ পালের গোদাকে ঠকানোর জন্যই এত সাজ-সরঞ্জাম। কিন্তু ঐটুকু ছেলের সাধ্য কি গায়ের জোরে পারবে ঐ বিরাট আকার হাঙরের সঙ্গে। সমুদ্রের ধারে গিয়ে পুনিয়া চেঁচিয়ে বললো—"এবার আমি কিছু প্রবাল পাথর তুলতে নামব সমুদ্রের নীচে। হলুলু যদি মস্ত বড় 'হাঁ' ক'রে আমাকে আস্ত গিলে ফেলে তবে আমি

নিশ্চয়ই মরে যাব—আর সে কথা কেউ জানতেও পারবে না, কিন্তু আমি হলুলুকে একটুও ভয় পাই না—কারণ আমি জানি ওটা একটা আকাট মুখ্যু—নিশ্চয় আমাকে চিবিয়ে-চিবিয়ে বেশ রসিয়ে খাবে, আর আমার রক্তে সমুদ্রের জল লাল হয়ে গেলেই আমার মা জানতে পেরে আমাকে মন্তর দিয়ে বাঁচিয়ে দেবে। ব্যাস্, বোকারাম হলুলু ভাবল সত্যিই বুঝি তাই। সে প্রাণপণে একটা 'হাঁ' যা করলে—পুনিয়া কেন, গোটা হাওয়াই দ্বীপই গিলে ফেলা যায়। পুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে মারল হাঙরের 'হাঁ' লক্ষ্য করে এক লাফ, আর সুরুৎ করে তার মুখের মধ্যে ঢুকে গেল। হাঙরটা তার বিরাট 'হাঁ' বন্ধ করার আগেই সে চোখা লোহার শিক দুটো তার চোয়ালে গেঁথে ফেলল এমন ক'রে

'পুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে মারল হাঙরের 'হাঁ' লক্ষ্য করে এক লাফ'......

যে হলুলু আর মুখ বন্ধ করতে পারল না। তারপর সে তার করাত দিয়ে খানিকটা মাংস কেটে নিল তার ফোলা-ফোলা গালের ভেতরকার দিক থেকে। আর যে দুটো কাঠের টুকরো নিয়েছিল তাই ঘষে আগুন জ্বালিয়ে, চাপিয়ে দিল মাংস সেই পাত্রটায়। তারপর মিষ্টি আলু সহযোগে মাংস দিয়ে হাঙরের পেটে বসেই পুনিয়ার সে কি ভোজ!

এদিকে হাঙর বেচারার অবস্থা তো কাহিল। তার পেটের ভিতর কি কাণ্ডখানাই চলছে বল তো? আগুনের তাপে আর করাতে কাটার জ্বালায় দাপাদাপি করতে করতে তীরের কাছাকছি এসেই মরে গেল বেচারা।

একদল ছেলে খেলা করছিল সমুদ্রের ধারে। মরা হাঙর দেখে তারা টেনে তুলল তাকে জলের

উপর। কিন্তু চোয়ালে লোহার শিক বিঁধে আছে বলে হাঙরটা তখনো 'হাঁ' করেই আছে। সবাই যখন জটলা ক'রে ঠিক করল এটাকে এবার কেটে ফেলা যাক্—তখন পুনিয়া দেখলে এবার বিপদ।

তারা অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে যেই হাঙরটাকে কাটতে এল, অমনি একটা মানুষের গলা শুনতে পেল। আস্তে ভাই সব—আস্তে, খুব সাবধানে ছুরি চালিও, ভেতরে আমি আছি। তারাও অবাক! তারপর দেখে একি কাণ্ড! জলজ্যান্ত একটা মানুষ বেরিয়ে আসছে যে হাঙরের পেট থেকে! ছেলেদের তো চোখ ছানাবড়া। কিন্তু এ যে তাদের খেলার সাথী পুনিয়া তা কেউ বুঝতেই পারছিল না। কারণ এতক্ষণ হাঙরের পেটে থেকে পুনিয়ার যা হাল হয়েছে, তাতে তাকে আর চিনবারই উপায় নেই। একগাছা চুলও নেই তার। একদম তেল চক্‌চকে টেকো-মাথা। পুনিয়ার এই দুর্দশার কথা শুনে হাঙরের পেটে বসে ভোজ খাওয়ার প্ল্যান (plan) নিশ্চয় করবে না তোমরা কোনদিন—কি বল?

শব্দ ক'রে কি আসে চোর

শ্রীরবিদাস সাহারায়

বড় ভীতু ভূতনাথ, হয় যদি বেশী রাত,
যায় নাকো ঘর ছেড়ে বাইরে,
আর কিছু নাই ভয়, মনে শুধু সংশয়
চোর বুঝি এলো ঐ ভাইরে।

ওর মেশোমশাইয়ের ছোট নাত জামাইয়ের
চুরি হয়েছিল হাত-পাখাটা,
সেই থেকে ভূতনাথ হলেই আঁধার রাত,
ভয় পায় একা শুয়ে থাকাটা।

গুটিয়ে দু' হাত পা, কাপড়েতে ঢেকে গা,
শুয়ে থাকে মোর পাশে নিত্য,
হলে কোন শব্দ, ভয়ে হয় জব্দ
কেঁপে ওঠে বুঝি ওর চিত্ত।

নাড়া দিয়ে মোর গায় ভূতো ডাকে অসহায়
—ওঠো দাদা, কে যে ঐ ঠেলে দোর,
আমি বলি—তা' কি হয়, চোর অত বোকা নয়,
শব্দ ক'রে কি কভু আসে চোর?

তাই শুনে ভূতনাথ, বিছানায় হ'ল কাত
তারপর চরিদিক স্তব্ধ,
মাঝ রাত নিঝ্‌ঝুম, সবার চোখেতে ঘুম,
নাই কোনদিকে কোন শব্দ।

একটু পরেই তার ভূতো ডাকে আরবার
—ওঠো দাদা, চোর এল এই তো,
বলি আমি—বোকা ওরে, বুঝলি কেমন ক'রে?
ভূতো বলে—সন্দেহ নেই তো!

বলেছ তো কাছে মোর, শব্দ না করে চোর,
ঐ দেখ চারিদিক স্তব্ধ,
মনে মোর লাগে ভয়, চোর এল নিশ্চয়,
এখন তো নেই কোন শব্দ।

বেড়ালিনীর বিয়ে

শ্রীআভা পাকড়াশী

একটা মস্ত আস্তাবল। নবাব বাড়ীর আস্তাবল। তাই ঘোড়া আছে, এক পাশে মোষ আর গরুও আছে। ওদিকে আবার জাল দিয়ে ঘেরা ঘরে হাঁস-মুর্গিও আছে। আছে থাক, আমাদের তা দিয়ে দরকার নেই। আমাদের কাজ ঐ আস্তাবলে, আস্তাবলের মধ্যে যেমন ঘোড়া গরু রয়েছে, তেমনি ট্রেঞ্চ কেটে মাটির তলায় রয়েছে বিরাট এক রেজিমেণ্ট। তারা কে জান? ইঁদুর ভায়ারা।

ঘোড়ার দানার ছোলা আর মোষ-গরুর ভূষির সঙ্গে গুড় আর জল খেয়ে বেশ নাদুস-নুদুস হয়েছে। এদের কিন্তু একান্নবর্তী পরিবার। ঠাকুর্দা, ঠাকুমা, বাবা, মা, ভাইবোন, জ্যাঠতুতো, খুড়তুতো সবাই একসঙ্গে আছে। শুধু আছে নয়—রাতে যখন খাবারের খোঁজে বেরুতে হয়, তখন পুরো ফ্যামিলি একসঙ্গে যায়। সার বেঁধে চলে এই ইঁদুর-বাহিনী। আগে চলে যে, সে সবচেয়ে বলবান আর জোয়ান; নাম মুষিকচরণ। বাচ্চা নেংটিরা আগে বেরিয়ে সব খোঁজ-খবর নিয়ে ফিরে আসে, তারপর মুষিকচরণের নেতৃত্বে পুরো বাহিনী সেদিকে আক্রমণ চালায়। আসলে ওরা এড়িয়ে চলতে চায় ঐ বিল্লিদিদিদের। নাহলে ঘোড়া খুড়ো আর গরু মশাই জন্তু খারাপ নয়। এই যে ওরা গুষ্টিসুদ্ধ সবাই ওদের খাবারে ভাগ বসাচ্ছে—মেনে তো নিচ্ছে ওরা? বলছে না তো এই আস্তাবল আমাদের, তোমরা জবরদখল করেছ, আমাদের খাবার কেড়ে খাচ্ছ, যাও চলে যাও, পথ দেখ বাপু! নাঃ, বেশ আছে তারা।

মুস্কিলে পড়েছে কে জান? ঐ বিল্লীদিদি। সে তো আর ছোলা-গুড় খায় না? কটর-কটর চানা চিবোতে বয়েই গেছে তার। কিন্তু হলেই বা নবাব বাড়ী! একটু মুখ বদলাবার জো আছে? রান্নাঘরের জানলায় জল দেওয়া, মুর্গির খাঁচার জাল ঘেরা, উঃ জলে পড়েছে সেই! রসুই ঘরের জানলার ধারে বসে কাবাব আর কোপ্তার গন্ধ শুঁকেই মরে। বাবুর্চিটা কিন্তু টপাটপ মেরে দেয় ও জানলার কার্নিশে বসে বসে দেখে আর চোখ পিট পিট করে ভাবে তার বরাতে একটু কিছুই জোটে না। মাছ তো বিশেষ খায় না এরা, তাহলে নাহয় কাঁটাটাও চিবোতে পেত। সে গুড়েও বালি।

মতলব আঁটে বিল্লীদিদি কি করে মাংস খাওয়া যায়। ভেবে ভেবে একটা উপায়ও বার করে ফেলে শেষে।

নেংটিরা আজ খবর এনেছে—আস্তাবলে টাটকা ছোলার বস্তা এনেছে আজ সহিস! কিন্তু একটা ভয় আছে, ঐ বস্তার ওধারে যে ছাইগাদা, সেখানে বসে আছে সেই শয়তানী মেয়েটা।

মুষিকচরণ বুক ফুলিয়ে বলে—থাক না, থাকতে দাও। আমরা সবাই একসঙ্গে থাকলে কি করবে ঐ একটা বিল্লি।

ঠাকুর্দা বলল—ঠিক কথা। বাবা বলল—বেশ বলেছ। মা আর ঠাকুমা বলল—চল বাপু তাহলে, আর দেরি কেন? আমাদের ভাঁড়ার যে খালি। আগে আগে মুষিকচরণ, পেছনে বাহিনী। চলল ওরা ছোলার বস্তা লক্ষ্য করে।

এদিকে-ওদের গতিবিধি ঠিকই টের পেয়েছিল বিল্লিদিদি। গুটি গুটি এসে বসল সে সেই ছোলার বস্তার ওপরে। প্রথমেই সেই মুষিকচরণ এগিয়ে এলো বস্তা ফুটো করতে—তখনি সেই বিল্লি সুন্দরী, লজ্জায় মিউ মিউ করে উঠল। পালাচ্ছিল ওরা—কিন্তু সে টেনে টেনে বলল, ছিঃ ভাই, তোমরা চলে যাচ্ছ কেন? খাও না কত ছোলা খাবে! তারপর সেই ঠাকুর্দা-ইঁদুরকে বলল—আপনি দেখছি সকলের বড়, তাই আমার যা বক্তব্য আছে তা আপনার কাছেই বলি—আজ ইদমুবারক। এই দিনে সবাই সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতায়। শত্রুতা ভুলে গিয়ে মিলন-উৎসবে মাতে। তাই বলে—মিলাজশরিফ। তাই সমস্ত বিড়াল জাতির তরফ থেকে আমি শ্রীমতী বিড়ালিনী দেবী আপনার কাছে প্রস্তাব করছি, যে আজ থেকে আমরা ইঁদুর-বেড়াল বন্ধু। ভাই ভাই। কোনরকম মারামারি কাটাকাটি নয় আর। আজ থেকে আমরা উভয়েই উভয়ের সুবিধে দেখব। কেমন?—এই বলে গুটি গুটি লজ্জিত পায় এগিয়ে এলো ওদের কাছে। ওরা কিন্তু সব সচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এতদিনকার শত্রুতা এককথায় কি আর ভোলা যায়? কিন্তু যাই বল শ্রীমতী বিড়ালিনী বেশ জব্দ হয়েছে না? কেমন হাত জোড় করে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল—আর ওরা! বুক ফুলিয়ে ড্যাং ড্যাং করে নিজেদের খাবার নিয়ে ফিরে এলো।

ইঁদুর ভায়ারা কিন্তু সহজে বিশ্বাস করতে পারেনি। মনের মধ্যে একটা ভয় নিয়েই চলা-ফেরা করে ওরা। সেই জন্য কেউ দলছাড়া হয় না। এক জোটে বেরোয়।

এদিকে বিড়ালিনীর মনস্কামনা পুরো হয় না। ঐ নাদুস-নুদুস মুষিকচরণের ওপর ওর বড় লোভ। কিন্তু দলছাড়া যে হয় না। কি করে বাগে পায় ওকে? অন্য পথ ধরে এবার। ঘোঁড়া-খুড়োকে বলে,—আমার মা-বাবা কোথায় তাতো জানিনা খুড়ো, সেই কবে ছালায় পুরে আমাকে এখানে রেখে গেছে ঐ বেপাড়ার মানুষগুলো। তা তুমি আমার খুড়ো, তুমিই আমার বাবা, নিজের কথা নিজে বলতে নেই তো, তাই তোমায় বলছি—লজ্জা করছে আমার বলতে, তবু বলেই ফেলি—আমার একটা বিয়ে দাও তুমি। বর আমি অবিশ্যি নিজেই পছন্দ করেছি। ঘোঁড়া-খুড়ো ঘ্যাঁ ঘ্যাঁ করে জিজ্ঞেস করে—বরটি কে? আমাদের চেনা?

—ওমা হ্যাঁ, চেনা বৈকি। রোজ দেখছ তুমি। তোমারও পছন্দ হবে।

আবার ঘ্যাঁ ঘ্যাঁ করে ঘোড়া-খুড়ো বলে—বলেই ফেল। পাত্রটি কে?—ঐ যে, আবা চুপ করে মিটি মিটি চায় যেন কত সঙ্কোচ হচ্ছে ওর শেষে বলেই ফেলে, ঐ-ঐ মুষিকচরণ।

—অ্যাঁ, সে আবার কি? ওরা তোমাদের খাদ্য? বিয়ে করবে তুমি তাকে?

কেন খুড়ো? এমন তো আগেও হয়েছে। পড়নি মহাভারতে, ভীমের বৌ ছিল, হিড়িম্বা; সেও তো রাক্ষসী ছিল। কই মানুষ ভীমকে তো খেয়ে ফেলেনি? বরং ছেলে হয়েছিল—ঘটোৎকচ;

—সামনের পা দুটো একটু জড়ো করে নমস্কারের ভঙ্গী করে ঘোড়া-খুড়ো বলে, ওঁরা তে দেবতা ছিলেন ওঁদের কথা বাদ দাও। সে ছিল সত্যযুগ। আর এখন যে ঘোর কলি।

বেড়ালিনী মনে মনে গজরায়—বলে ছ্যাঃ—যেন ঘোড়ার মত বুদ্ধি। এবার গরুর কাছে যায়। সে ভগবতীর অংশ। ভালমানুষ গোবেচারী—অত-শত বোঝে না। বেড়ালিনীর মিষ্টি মিউ মিউতে ভুলে যায়। আহা ওকে মা বলেছে—বলেছে, তোমার দুধ আমাকে ওরা না দিলেও আমি তো কখন-সখন যেমন করে হোক খেয়েছি! এর মানেই আমি তোমার সন্তান। তা তুমি আমার বিয়ে দেবে না? পাত্রও সামনে রয়েছে—শুধু তাকে একটু বলে-কয়ে রাজী করানো। রাজী হয়েছে গরু-মা। বলেছে বলবে। ঠিক কথাই তো এতকালের শত্রুতা—মিটিয়ে ফেললাম বললেই তো আর ওরা বিশ্বাস করবে না? কিন্তু যদি একটা সম্বন্ধ পাতান যায়, ঠিক বিশ্বাস করবে তখন, সব ঝগড়া মিটে যাবে। এই মহৎ কাজটি করতে চায় শ্রীমতী বিড়ালিনী। নিজেই প্রথম ইঁদুরের ঘরের বৌ হয়ে ও এই দৃষ্টান্ত রাখতে চায়। তবেই দলাদলি মিটবে। যেমন ক্যাপুলেট আর মন্টেগুদের ঝগড়া মিটিয়েছিল রোমিও আর জুলিয়েট।

প্রথমটা তো কিছুতেই রাজী হবে না ইঁদুর ভায়ারা—বলে, সে কখনো হয় নাকি? এমন কথা তো জন্মে শুনিনি? কিন্তু আসলে যে পাত্র, ঐ মুষিকচরণ, সেই যখন বিড়ালিনীকে বিয়ে করবে বলে জিদ ধরল, তখন আর কি করবে তারা? বাধ্য হয়েই মত দিল। মুষিকচরণেরই বা দোষ কি বল? হাজার হোক বিড়ালিনী তো দেখতে সুন্দর? এ বিদেশিনী মেমসাহেবদের মত দুধ সাদা রং? নীল চোখ? আর তার কাছে ঐ কালো কালো ইঁদুরনীরা? ছিঃ, আবার সেই বিড়ালিনী ওকে একটুখানি একা পেয়ে, খেয়ে নেয়নি বরং বলেছে—মুষিকচরণ, তুমিও খুব সুন্দর।

যাই হোক বিদেশিনী বিড়ালিনী ইঁদুর বংশের বৌ হ'ল। কিন্তু বিদেশিনী মেয়ে, খোলা হাওয়ায় ছাই ছাই রংয়ের সনে থাকে, ঘুঁসুড়ির ট্যাঁক ইঁদুরের গর্তে কি করে ঢুকবে বল? তাই বরের কাছে বলল—এসো আমরা আলাদা থাকি। মুষিকচরণ তো সবেতেই রাজী। গর্তের সবাই বললে, ওমা! সবই যে দেখি উল্টো ব্যাপার! বউ তো বরের বাড়ী এসে থাকে, তা নয় বর যাবে বৌ-এর বাড়ী—সেটা কেমন কথা? তবু কিছুটা অনিচ্ছেতেই মত দিলে সবাই।

কিন্তু মুষিকচরণ আর ফিরে এলো না। নেংটিরা খবর নিতে এলে শ্রীমতি বিড়ালিনী বলল—শ্বশুরবাড়ীর থেকে একটু দূরে থাকা ভাল। বেশ বড় বাড়ী করেছি। অনেকগুলো ঘর। তোমাদেরও নিয়ে যাব। তোমরা গর্তে থাকলে আমার মান যায়। মাঝে মাঝে শ্বশুর বাড়ী যায় বিড়ালিনী আর বলে, তোমরা কিছু ইঁদুর চল আমার সঙ্গে, নতুন বাড়ী করেছি। খাঁখাঁ করছে ইঁদুর বিনা। মুষিকচরণের লজ্জা করল আসতে, তাই আসেনি। তা আমি তো এসেছি? বুড়ো ধাড়িদের বলে, চলুন আপনারা আমার সঙ্গে। অন্যদের বলে বাড়ীটা তো সব শেষ হয়নি! হলেই তোমাদের নিয়ে যাব। অন্য ঘরগুলো উঠুক। কি বিনীত ভাব! নতুন বৌ-এর কি মিষ্টি কথা শ্বশুর-শাশুড়ীদের নিয়ে যায়।

এইভাবে এক এক করে ঘর উঠল আর সে ইঁদুরের ঘর ভাঙল। একদল করে নিয়ে আসে, তারা আর ফিরে যায় না। আবার নিজেই এসে তাদের কাছে যাবার জন্য অন্যদের ডেকে নিয়ে যায়। এই ভাবে দল ভেঙ্গে দিয়ে সারা ইঁদুর রেজিমেণ্ট ও একলাই ধীরে ধীরে সাবাড় করে দিল। একেই বলে বিড়ালিনীর বুদ্ধি। কি! তারিফ করছ না তোমরা ওর বুদ্ধির?

যদি

শ্রীনিশিনাথ সেন

বাংলা দেশের নদীগুলোর
করতো যদি সর্দি;
হাউই-দ্বীপে মাইক নিয়ে
খুঁজতে যেতাম বদ্যি।

আরব দেশের মরুগুলোয়
কমতো যদি বালি;
বালীগঞ্জের নিয়ে কিছু
দিয়ে আসতাম কাল-ই।

থাকতো যদি বেঁচে এখন
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর;
কাব্য করে আঁকিয়ে নিতাম
ছবিন্দ্র এক কাকুর।

ঐ চলেছে বন-বাদাড়ে

[অমিল ছন্দের ছড়া]

শ্রীদেড়কড়ি শর্মা

ঐ চলেছে বন-বাদাড়ে
মৌমাছিরা দল বেঁধে রে—
গুনগুনিয়ে গান গেয়ে ঐ
ফুল-কলিদের ঘুম ভাঙিয়ে।
সেই সাথেতে চল্‌ছে দেখ—
বন-বিড়াল আর বল্‌গা হরিণ,
বন কাঁপিয়ে আসছে যত
ভাল্লুকেরা জল-কিনারে।
বাদশাহী-চাল চাল্‌ছে যত
সিংহি-মামা গোঁফ পাকিয়ে।
গণ্ডারও ঐ জেব্রা, হিপো,
লম্বা জিরাফ, মোটকা হাতি,
ব্যাঘ্র মশাই তার পাশেতে—
নেকড়ে, চিতা, হায়না, শেয়াল,
ধীর কদমে দৌড়ে কেমন
চলছে দেখ এক তালেতে।
সিন্ধুঘোটক বনমানুষও
শিম্‌পাঞ্জী আর গরিলা—
দল বেঁধে আর হল্লা ক'রে
আস্‌ছে কত সব জানোয়ার।
হাঙর ছুঁচো নেংটি ভোঁদড়,
কুমীর বেজী উট খড়গোশ,
কাঠবেড়ালী ব্যাঙ্‌-ব্যাঙাচি,
ছাগল গরু দুষ্টু বাঘা।

মহিষ ঘোড়া উল্লু গাধা,
বানর হনু খ্যাঁকশেয়ালী,
শূকর ভেড়া আর বরাহ,
ঐ সজারু আর ক্যাঙ্গারু।
গিরগিটি আর আরশুলা ও
টিক্‌টিকি সাপ বিচ্ছু মাকড়
পিঁপড়ে মশা ছারপোকারা
উইপোকা ডাশ আর মাছিরা।
তালকানা সব গঙ্গাফড়িং
ডানপিটে ঐ কাঁকড়া-ছানা,
কচ্ছপ আর শুশুক যত—
সবাই দেখ আসছে চলে।
আসছে দেখ তাদের সাথে
উচ্চিংড়ে চিংড়িমাছও,
রুই কাৎলা ইল্‌সে পোনা,
পায়রা-চাঁদা সরম পুঁটি।
তপ্‌সে মাগুর ট্যাংরা বেলে,
ভেট্‌কি ও কৈ শিঙ্গি ভোলা,
ভাঙড় বাটা চিতল বোয়াল,
শঙ্কর শিল কড্‌ মাছেরা।
মিরগেল আর গুড়জাওয়ালী,
পারসে ফ্যাঁসা বাণ তিমি শোল,
এমনিধারা হরেক রকম
মৎস্য আসে উল্লাসেতে।

এদের সাথে ঝাঁকে ঝাঁকে
আস্‌ছে উড়ে নানান্ সুরে
রঙ্‌বেরঙের পাখনা মেলে
বাচ্চা ধাড়ী পাখির দলে।
ময়না টিয়া পায়রা ঘুঘু,
চিল শকুনী শালিক ফিঙে,
বৌ-কথা-কও চন্দনা ও
চড়াই পাখী আর মুনিয়া।
কোকিল চাতক দোয়েল শ্যামা,
চোখ-গেল কাক কাকাতুয়া,
ডাহুক তিত্তির বাদুড়-ভায়া,
বাজ পাপিয়া ময়ুর টুনি।
চাম্‌চিকে হাঁস কাঠ-ঠোকরা,
সারস বাবুই মুরগী ও বক,
উট-পাখী ও চখাচখি
সদল-বলে আসছে উড়ে।

সবাই বলে—ব্যাপারটা কি?
কিসের তরে আসছে এরা?
বনের ধারে, নদীর পাড়ে
কিসের এত হল্লা-বাজি?
পশু পাখী মাছের দলে
সবাই মিলে সমান তালে
করছে কেন আমোদ এত?
জান্‌তে হবে—কারণটা কি?
এমন সময় টোপর মাথায়
বরের বেশে আস্‌লো প্যাঁচা,
হল্‌দে চেলী পেঁচীর গায়ে—
বিয়ের ভোজে বস্‌লো সবে।
হঠাৎ এ কি? ভোজের বাজি
মিলিয়ে গেল এক মিনিটে—
স্বপন মাঝে চেঁচিয়ে উঠে
মোদের পারুল উঠ্‌লো জেগে।

দুটি ছড়া

শ্রীকার্তিক ঘোষ

(১)

আহারে! আহারে!
ঐ দূর পাহাড়ে…
গাছে গাছে কতো ফুল
টুকটুকে বাহারে!

দুল্ দুল্ দুলুনি—
লতা-পাতা তুলুনি…
ঝর্‌নাটা যেন বলে:
খুকু ভাই ভুলুনি॥

(২)

দুল্ দুল্ দুল্‌কি—
টুকটুকে ফুল্‌কি।
ফুলে ভরা বনটা
হাসি খুশী মনটা!

মিঠে মিঠে গন্ধ—
ঢং ঢং ঘণ্টায়
ইস্কুল বন্ধ॥

মধুর চেয়েও মধুর

শ্রীজিতেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

রামরাজা মন মরা হয়ে থাকেন, সেই সময় কে এসে খবর দিল গ্রামে এক ফকির এসেছেন। তিনি রামরাজার মনোকষ্টের কথা জানেন ও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান।

জমিদার ফকিরকে ডেকে পাঠালেন। ফকির বলল—"রাজামশাই, চিন্তা করবেন না। দেশে মধু নেই তো হয়েছে কি? মধুর চেয়েও মধুর জিনিস আপনাকে আমি দেব। ঝড়ই হোক, বৃষ্টিই হোক, কোনদিন আপনার দেশে মিষ্টির অভাব হবে না।" এই বলে জেব থেকে কতকগুলি বীচি বার করে ফকির রাজাকে দেখালেন।

রামরাজা বললেন—"এগুলি কি?"

ফকির বললেন—"এই বীচিগুলি নানা জায়গায় ছড়িয়ে দিন। তারপর এর কাজ এ নিজেই করবে।"

রামরাজা বললেন—"এ বীজে কিসের গাছ হ'বে?"

—"খেজুর গাছ।"

খেজুর গাছের নাম কেউ কোনদিন শোনেনি। রাজা জিজ্ঞেস করলেন—"সে গাছে কি মধু ফলে?"

—"সে দেখে নেবেন।" বলে বীচিগুলি রাজার পায়ের কাছে রেখে ফকির চলে গেলেন।

রাজা তাঁকে কত কি দিতে চাইলেন—টাকা-কড়ি, রেশমী কাপড়, বাসন-কোসন, খাবার-দাবার—কিন্তু কিছুই না ছুঁয়ে কোথায় যে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন, কেউ আর তাঁকে দেখতে পেল না।

*   *   *

বীচিগুলি রাস্তার ধারের মাটিতে পড়ে রইল অনেকদিন। তারপর বর্ষাকাল এসে গেল। বীচি ফেটে অঙ্কুর বেরুল—তার থেকে হ'ল ছোট্ট ছোট্ট চারাগাছ। ছাগলে তাকে মুড়িয়ে খাবার চেষ্টা করল, ছোট ছেলেরা তার পাতা ছিঁড়ে নেবার চেষ্টা করল, কিন্তু তার কাঁটাওলা পাতার গুণে কেউ তার কোনও ক্ষতি করতে পারল না। সব রকম অত্যাচারের ভিতর দিয়ে সে বেড়ে উঠল।

এমনি করে কেটে গেল বছর দশেক। সেই সময় একদিন শীতের শেষে সেই সব গাছে ফুল ধরল—ফুল ঝরে তাই থেকে ছোট ছোট ফল হ'ল। ক্রমে সেগুলো বড় হয়ে পেকে উঠল।

এতদিনে গ্রামের লোক ফকিরের কথা ভুলে বসেছিল। অজানা গাছের অজানা ফল দেখে গ্রামের লোকে ভাবল—"এইগুলোই মধু-ফল নয়তো?—যার কথা ফকির বলেছিল?" গ্রাম থেকে বহু লোক এসে পাকা খেজুর পেড়ে নিয়ে যেতে লাগল। খেয়ে দেখল অতি সামান্যই মিষ্টি। তার উপর শাঁস নেই বললেই চলে, বীচিই সব। তারা আবার সেই সব খেজুরের বীচি নানা জায়গায় ছড়িয়ে দিল। তাই থেকে আরও অনেক খেজুর গাছ হয়ে গেল। এইরকম ভাবে ক্রমে বংশ-বিস্তার হয়ে চলল খেজুর-গাছের—সারা দেশ খেজুর-গাছে ভরে উঠল।

* * *

তার অনেক দিন পরে এক শীতের রাত্রে হ'ল মস্ত এক ঝড়—অনেক গাছের ডালপালা ভেঙে মাটিতে পড়ে গেল। ঝড়ের শেষে সকালবেলায় আমার ঠাকুর্দা বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন—ভাঙা কাঠ কুড়োচ্ছিলেন। তিনি ছিলেন কাঠুরে। কাঠ কুড়তে-কুড়তে তিনি এক খেজুর-তলায় এসে পৌছলেন। সেখানে কতকগুলি ঝড়ে-ছেঁড়া খেজুর-পাতা পড়েছিল। সেগুলিকে তুলতে যেতেই তাঁর হাতে খেজুর-কাঁটা ফুটে গেল। "উ-হু-হু" বলে আঙুলটা মুখে পুরতেই দেখেন মিষ্টি মিষ্টি লাগছে। পাতার গায়ে যেন মিষ্টি রস লেগে রয়েছে। কি ব্যাপার? একবার তিনি উপর দিকে তাকালেন, তাকাতেই দেখতে পেলেন একটা কাক খেজুর পাতার উপর বসে খেজুর গাছের গায়ে ঠোকরাচ্ছে—কি যেন খাচ্ছে।

ঠাকুর্দা উঠলেন গাছ বেয়ে। বড় কর্কশ খেজুর গাছের গা। তাঁর হাত-পা নানা জায়গায় ছড়ে গেল, তবুও ছাড়লেন না। উপরে উঠে দেখলেন কাক যেখানে ঠুকরে গেছে, সেখান থেকে টপ্‌টপ্ করে রস পড়ছে। হাতটা মুখে লাগাতেই তাঁর মুখ থেকে আপনি বেরিয়ে এল—"আঃ, কি মিষ্টি!"

হঠাৎ সেই ফকিরের কথা মনে পড়ে গেল তাঁর। মনে হ'ল তিনি এক সুধাভাণ্ডের সন্ধান পেয়েছেন। এই কি সেই মধুর গাছ নাকি? পরের দিন তিনি একটা হাঁড়ি আর একটা ছুরি নিয়ে খেজুর গাছে গিয়ে চড়লেন। ভাবলেন, এ মধু হাঁড়িতে ধরতে হবে। ছুরি দিয়ে একটা পাতা কেটে ঠিক তার নিচে একটু চিরে দিলেন—আগের দিন ঠিক যেমন করে কাকটা ঠুকরে গিয়েছিল। কিন্তু তিনি দেখলেন যে, খেজুর গাছের রস হাঁড়িতে এসে পড়ছে না, সব রস গাছের গা দিয়ে গড়িয়ে নিচে পড়ে যাচ্ছে। ঠাকুর্দা খানিকক্ষণ ধরে ভাবলেন, কি উপায়ে সমস্ত রসটুকু হাঁড়িতে এনে ফেলা যায়। কোনো নল চিরে লাগালে কেমন হয়? কিন্তু কিসের নল লাগান যায়? তারপরেই তাঁর মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল। পাশেই ছিল বাঁশঝাড়। সোজা গাছ থেকে নেমে এসে বাঁশঝাড়ে গিয়ে ঢুকলেন। সেখান থেকে একটা কঞ্চী কেটে সেটাকে লম্বালম্বিভাবে আধখানা করে চিরে

ফেললেন। তারপর কঞ্চীর সেই আধখানা নিয়ে গিয়ে যেখান থেকে রস বেরচ্ছিল, সেখানে একটু চেপে গুঁজে দিলেন। এবারে আর রস পড়ে নষ্ট হ'ল না—সমস্ত রসটুকু সেই নল বেয়ে হাঁড়িতে এসে জমা হতে লাগল।

পরের দিন ভোরে উঠেছেন ঠাকুর্দা। খেজুর-গাছে উঠে দেখেন রসে হাঁড়ি ভর্তি। বাড়ী নিয়ে গিয়ে সবাইকে ডেকে বললেন—"দেখে যাও, কি সুস্বাদু রস এনেছি; এই রস আমি আবিষ্কার করেছি। আমি এর নাম দিয়েছি 'খেজুর-রস'।" সেই নাম আজ অবধি চলে আসছে।

সবাই একটু করে রস চাখল। ঠাকুর্দা ভাবলেন সব রস-টুকু আজ শেষ করব না, কিছুটা কালকের জন্তে রেখে দিই। এই ভেবে খানিকটা রস হাঁড়ির মধ্যে রেখে দিলেন।

ঠাকুরদা' বাঁশ ঝাড় থেকে একটা কঞ্চি কেটে নিয়ে এসে দাঁড়ালেন।

যারা যারা রস খেতে এসেছিস, তাদের কাছ থেকে খবরটা আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। যার যার জমির ধারে যত খেজুর গাছ ছিল, সবাই চাইল তার থেকে রস বানাতে। ঠাকুর্দা সবাইকে শিখিয়ে দিলেন কেমন করে পাতার নিচে চিরতে হয়, কেমন করে সেখানে চেরা-বাঁশের নল গুঁজে দিতে হয়। কেমন করে হাঁড়ি বাঁধতে হয়।

*　　　　*　　　　*

রস খাওয়া সুরু হয়ে গেল গ্রামে। সবাই দেখল ঠাকুর্দার আবিষ্কার করা এই নতুন রস

খেতেও যেমন ভালো, শরীরের পক্ষেও তেমনি উপকারী। ওদিকে ঠাকুর্দা দেখলেন আগের দিনের রাখা রসে কেমন বিশ্রী মাতা মাতা গন্ধ হয়ে গেছে—মুখেই দেওয়া যায় না।

ঠাকুর্দা ভাবতে বসলেন কি করে একে রক্ষা করা যায়। এমন সুস্বাদু জিনিস—রোজ পাড়ব রোজ খাব, এ হয় না—একে রাখবার উপায় বার করতে হবে। ভেবে ভেবে শেষে বার করলেন এক উপায়; বড় এক উনুন করে তাতে চড়িয়ে দিলেন হাঁড়ি-ভরা খেজুর-রস। বুড়-বুড় করে রস ফুটতে লাগল। ঘন হয়ে এলে তাকে নামিয়ে রাখা হ'ল। ফল হ'ল ভালই—আর সেটা পচল না। রং হ'ল লাল—গন্ধ হ'ল ভুরভুরে—মিষ্টি হ'ল আরও বেশী। ফকিরের কথা হাতে হাতে ফলল। সকলে বুঝল মধুর চেয়েও মধুর রস এবার গাছ থেকেই পাওয়া যাবে। ঠাকুর্দা বললেন—"আমি ওর নাম দিলুম 'খেজুর-গুড়'।"

একদিন হ'ল কি ঠাকুর্দা খেজুর রসে পাক দিয়ে গুড় বানাচ্ছেন, হঠাৎ গ্রামে একটা সোরগোল উঠল—"চোর-চোর, ধর ধর।"

ঠাকুর্দা গুড়ের কড়া ছেড়ে ছুটলেন চোর ধরতে, গুড় পড়ে রইল আগুনের উপর। চোর ধরা পড়ল। গ্রামের লোকেরা যখন তাকে উত্তম-মধ্যম দিচ্ছে, তখন গুড়ের কথা মনে পড়তে ঠাকুর্দা গুড় বাঁচাতে ছুটলেন। উনুনের কাছে এসে দেখলেন যে ঠিক পোড়বার আগেই গুড়টা বেঁচে গেছে। হাঁড়িটা নামিয়ে রাখতেই গুড়টা জমে শক্ত হয়ে এল। ভারী একটা সুগন্ধে ভরে গেল চারিদিক। ঠাকুর্দা তখন ছুরি দিয়ে চেঁছে চেঁছে সেই জমা গুড়টাকে উদ্ধার করলেন। চেখে দেখলেন—গুড়ের চেয়ে আরও মিষ্টি, আরও ভাল খেতে হয়েছে। তখন তিনি তার নাম দিলেন, 'পাটালী গুড়'।

পাটালী গুড়ের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল সারা গ্রামে। গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে। আশপাশ থেকে অনেকে কিনতে আসতে লাগল পাটালী গুড়।

রামরাজার কানে উঠল কথাটা। তিনি ঠাকুর্দাকে ডেকে পাঠালেন। শুনলেন, তাঁর কাছ থেকে পাটালী করার ইতিহাস। জমিদার-কন্যার ততদিনে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল—সে ভিন্ গাঁয়ে শ্বশুরঘর করছিল। রামরাজা ডেকে পাঠালেন তাকে। ঘরে এনে সোনার পিঁড়ি পেতে বসতে দিয়ে মেয়েকে পাটালী গুড় আর এক ঘড়া জল খেতে দিলেন। মেয়ে স্বীকার করল অমন মিষ্টি সে জীবনে কখনও খায়নি। বলল—"শ্বশুরবাড়ী নিয়ে যাব আমি কিছু পাটালী।"

রাজা উপযুক্ত মূল্যে আরও কিছু পাটালী কিনতে চাইলেন। ঠাকুর্দা বললেন যে, কাল তিনি দিয়ে যাবেন। বাড়ী এসে ভাবলেন, জমিদারের মেয়েকে তো ভাঙা বা গুঁড়ো গুঁড়ো পাটালী

দেওয়া চলে না, ভাল কিছু করে দিতে হবে। ভেবে তিনি ঠিক করলেন, যে চ্যাপ্টা-গোল আকৃতিটাই সবচেয়ে উপযুক্ত। উনুনের ধারে খানিকটা মাটি বেশ করে নিকিয়ে নিলেন, তারপর সেই নিকোনো মাটির উপর কতকগুলি চ্যাপ্টা গোল গর্ত বানিয়ে নিলেন। মাটি শুকিয়ে গেলে তার উপর পেতে দিলেন একটি পরিষ্কার গামছা। গুড় ঘন হয়ে আসতে তিনি খুব ভাল করে সেটাকে নাড়তে লাগলেন, যাতে হঠাৎ পুড়ে না যায়। শেষে ঠিক পুড়ে আসবার আগের অবস্থা যখন এল, তখন সেই গরম গুড় খানিকটা খানিকটা করে গামছার উপর প্রত্যেক গর্তে ঢেলে দিলেন। দেখতে দেখতে শুকিয়ে গেল—গোল গোল চ্যাপ্টা পাটালীর চাকতি তৈরী হ'ল। ঠাকুর্দা এর নাম দিলেন —'লবাৎ'।

*　　*　　*

—"বুঝলে বাবুরা, এই হ'ল বীরভূমের লবাৎ। আমি যখন জন্মেছি, তখন লবাতের প্রচলন ছিল কেবল আমাদেরই গ্রামে। তারপর ক্রমে ক্রমে নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে।"

নবীন জিজ্ঞেস করল—"ঠাকুর্দার কাছ থেকে তুমি লবাৎ বানানো শিখেছ বুঝি, হারাধন? তাই তোমার লবাৎ এত ভাল?"

হারাধন ঠাকুর্দার উদ্দেশে একবার হাত-জোড় করে বললে—"তিনি হলেন আবিষ্কর্তা। তাঁর কাছে শিখেছি বটে, কিন্তু তাঁর মত লবাৎ কি আর আমরা বানাতে পারি?"

—"আর সেই ফকির?"

—"সেই ফকির? সে আর কোনদিন দেখা দেয়নি। কিন্তু আমার মনে হয় এখনও সে বেঁচে আছে। একদিন সে এই গ্রামে আসবে, এসে দেখে যাবে নিজের কীর্তি। আমি এই দেড়শ বছর বেঁচে রয়েছি ঠাকুর্দার আমলের সেই ফকিরকে দেখবার আশায়।"—এই বলে কেমন অদ্ভুতভাবে হারাধন আমাদের দিকে তাকাল।

গল্পই শুনছিলুম আমরা মন দিয়ে—লক্ষ্যই করিনি যে হারাধনের নাতিরা কখন গরম গুড় ভাগা ভাগা করে ঢেলে দিয়েছিল গামছার উপর। তারা ক'টা গরম গরম লবাৎ আমাদের হাতে তুলে দিল। তখনও অল্প অল্প গরম রয়েছে।

আমি একটাতে কামড় দিলুম। কামড় দিয়ে মনে হ'ল—এমন অমৃততুল্য দ্রব্য কখনও খাইনি, আর এমন আশ্চর্য গল্পও কখন শুনিনি। এ গল্প না ইতিহাস?

সংবাদ-বিচিত্রা

বন শহরের বীণা

পশ্চিম জার্মানীর বন শহরের রাইন নদীর ওপর এখন যে নতুন পুল তৈরী হচ্ছে, তা পার হবার সময় শহরের মানুষরা স্বর্গীয় সঙ্গীতের মুর্ছনায় তৃপ্ত হবে। এই দেড় হাজার ফুট লম্বা পুল, মাঝের দুটি ১৩৫ ফুট উঁচু স্তম্ভের সঙ্গে বীণাযন্ত্রের মত আশিটি মোটা মোটা তার দিয়ে বাঁধা থাকবে।
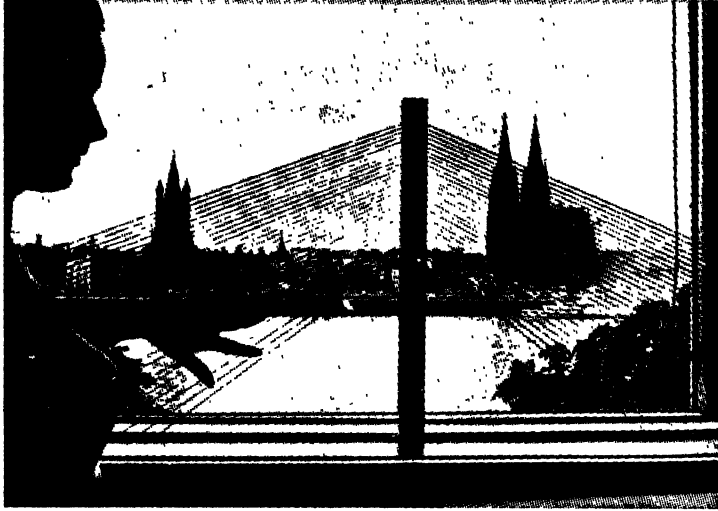
সেই তারের মধ্যে দিয়ে যখন হাওয়া বইবে, তখন মধুর ঝঙ্কার নিস্থত হবে। এই অভিনব পুল তৈরীর কাজ সবে শুরু হয়েছে এবং আড়াই বছরের মধ্যে শেষ হবে। ইস্পাতের তৈরী এই পুলের খরচ পড়বে ২১৩ মিলিয়ন জার্মান মার্ক। বর্তমানে কলোন স্টেট মিউজিয়মে এই নতুন পুলের একটি মডেল রেখে দেওয়া হয়েছে।

আকাশভেদী আধুনিক বাসগৃহ

কোলকাতার চোদ্দতলা নিউ সেক্রেটারীয়েট আমরা দেখেছি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেলিভিশন টাওয়ার বাদে ১,১০০ ফুট উঁচু ১০২ তলা এম্‌পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ের কথা শুনেছি বা ছবি দেখেছি কিন্তু পশ্চিম বার্লিনের স্থপতি রবার্ট গ্যাব্রিয়েল যে বাড়ি তৈরির পরিকল্পনা করেছেন তা শুনতেই তাজ্জব লাগে, তৈরী হলে তো চোখ কপালে উঠে যাবে! এই বাড়ি উঁচু হবে ৩৭৫০ ফুট এবং ব্যাস হবে ১৯০ ফুট। জমির ওপরে তলা থাকবে ৩৫৩ এবং মাটির নিচে তলা থাকবে ১৬। তৈরী হলে এই বাড়ি এম্‌পায়ার স্টেট বিল্ডিংকে তিনগুণ ছাড়িয়ে যাবে।

এর ৮০০০ ফ্ল্যাটে লোক থাকবে প্রায় ২৫০০০। প্রতি বিশ থেকে চল্লিশ তলায় জিনিসপত্র কেনাকাটা ও মেরামত করার দোকান থাকবে। মাটির তলায় থাকবে ৪০০০ গাড়ি রাখার ব্যবস্থা এবং পারমাণবিক বোমার আঘাত থেকে বাঁচার আশ্রয়। এই শহরের মত বাড়িতে অনেকগুলি সিনেমা ছাড়াও থাকবে একটি থিয়েটার, একটি আরক্ষা দপ্তর ও একটি মেয়রের অফিস। ওঠানামার জন্যে ১৮ খুপরিওয়ালা ছটি লিফ্‌ট থাকবে যাতে একসঙ্গে চল্লিশজন লোক যেতে পারে। এই লিফ্‌টগুলি প্রতি বিশ তলায় গিয়ে থামবে। মোট ৬০০০ লোক এই লিফ্‌টগুলি বহন করবে এক ঘণ্টায়। এগুলি ছাড়া মোট ১৮৬ খুপরির আরও অনেক লিফ্‌ট চলবে, যেগুলি এক একটি তলা ছেড়ে থামবে। বাড়িটির কাঠামো ক্রোম নিকেল-স্টীল দিয়ে তৈরী করা হবে বলে সহজে আগুন লাগবে না।

এই বাড়ি শুধু মেঘ ছোঁবে না, মেঘ ফুঁড়ে উঠে যাবে এবং এর অর্ধেক অধিবাসী মেঘলোকে বাস করবে—সেখানে প্রচুর রোদ, গোলমাল নেই, ধূলোবালি নেই। মেঘলোকে বসবাস করার উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই কয়েকজন ভাড়াটে আবেদন করেছে। এরা বেশিরভাগ হয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী নয় টেলিভিশন প্রতিষ্ঠান।

স্থপতি রবার্ট গ্যাব্রিয়েল জানিয়েছেন যে, এই বাড়ি দোল খাবে না, কারণ শুধু যে কাঠামোয় পাঁচ লক্ষ টন ইস্পাত ব্যবহার করা হবে তা নয়, বাড়িটা প্রতি বিশভাগে একটু একটু করে সরু হতে থাকবে।

বার্লিনের মাটির অবস্থা এই বিশাল উঁচু বাড়ির পক্ষে সুবিধের নয় বলে এবং এর আকাশভেদী উচ্চতা বিমান চলাচলের বিঘ্ন ঘটাতে পারে ব'লে, কলোন শহর থেকে ৩০ মাইল দূরে মুইন্‌স্‌-টেরেফিয়েলের কাছে একটি জায়গা এই বাড়ির জন্যে স্থির হয়েছে।

বর্তমানে এই পরিকল্পনা কাগজপত্রে সীমাবদ্ধ হলেও বিশ হাজার মার্ক খরচায় বাড়িটির একটি মডেল তৈরী করা হচ্ছে। আসল বাড়ি তৈরী করতে খরচা ধরা হয়েছে দুই বিলিয়ন মার্ক

ও সময় ধরা হয়েছে দশ বছর বহু মার্কিন ব্যাঙ্ক ও প্রতিষ্ঠান এই পরিকল্পনার জন্যে দাদন দিতে প্রস্তুত আছে বলে জানিয়েছে।

পশ্চিম য়ুরোপের ছেলেমেয়েদের তীর্থ

প্রতি বছরেই পশ্চিম য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের ছেলেমেয়েরা তাদের গরমের ছুটিতে পশ্চিম বার্লিনে এসে জড় হয়। এবছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি; মোট ৭০০০ ছেলেমেয়ে বার্লিনে এসেছিল। শহরের যেসব জায়গা ক্যাম্পিং করার উপযুক্ত, সেখানে তাদের দিব্যি তোয়াজে রাখা

হয়েছিল। পরস্পরের ভাষা না জানলেও তাদের মধ্যে আন্তর্জাতিক ভাবের লেনদেনের কোন অসুবিধা হয়নি। তবে একথাও ঠিক, বার্লিন শুধুই বিদেশী ছেলেমেয়েদের ডেকে এনে বিদেশী কৃষ্টি আমদানি করে না, জার্মান ছেলেমেয়েদেরও বিদেশে পাঠিয়ে নিজেদের কৃষ্টি রপ্তানি করে। পৌর সরকারের আর্থিক বদান্যতায় এ বছরের গরমের ছুটিতে ৭০,০০০ জার্মান ছেলেমেয়ে পশ্চিম জার্মানী ও পশ্চিম য়ুরোপের বহু জায়গায় ঘুরে আসার সুযোগ পেয়েছে।

(উপন্যাস)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

(১০)

বড়দিনের ছুটি। ইস্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে—তারপর প্রমোশন হয়ে গেছে। প্রদীপ সব সাবজেক্টে এত বেশী নম্বর পেয়েছে যে ইস্কুলে একেবারে তার নামে জয়জয়কার পড়েছে। মাণিকও সব সাবজেক্টে পাশ করে প্রমোশন পেয়েছে। পান্না টেষ্ট পরীক্ষা দেয়নি—হেডমাষ্টার মশাই তাকে ইউনিভারসিটি পরীক্ষার জন্য এলাউ করেছেন। উমাচরণকে তিনি বলেছেন, এতো বয়স হয়ে গেল কাঁহাতক ওকে একই ক্লাসে ফেলে রাখি। তার চেয়ে দিলুম ওকে এলাউ করে—বরাতে যদি থাকে, পাশ করুক। হেসে উমাচরণ জবাব দিলেন,—লেখাপড়া করলে তবে তো পাশ করবে। ডাগর হয়েছে, নিজের ভালো নিজে যদি না বোঝে এখন কি আর শাসন করে কোন ফল হবে? কথায় বলে, "কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, বাঁশ করে টাঁশ টাঁশ।"

এলাউ হওয়ার দরুণ পান্নার দুশ্চিন্তার সীমা নেই। ভেবেছিল, এবার মা সরস্বতীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নাট্যকলা নিয়েই থাকবে। কিন্তু তাতে বিঘ্ন ঘটলো। বাড়ির হোটেলটি আছে বলে খাওয়া-পরার চিন্তা নেই,—বুঝেছে, ভাগ্য-পরীক্ষার জন্য বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়লে চলবে কি করে! কাজেই···

সেদিন সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে প্রদীপ ও মাণিককে নিয়ে উমাচরণ বেরুবেন মিউজিয়ামে, এমন সময় ক্ষিতীশ রায়ের মোটর এসে দরজায় দাঁড়ালো। গাড়ি থেকে নেমে অমিয় এসে দাঁড়ালো বাড়ির দোরে। ব্যাপার কি! উমাচরণের হাতে অমিয় দিলো একখানি নিমন্ত্রণ কার্ড, সেই সঙ্গে ক্ষিতীশ রায়ের লেখা চিঠি। চিঠিতে ক্ষিতীশ রায় লিখেছেন—"আগামীকাল আমাদের সাইকল্ কোম্পানীর এনিভারসারী। সারাদিন ধরে একজিবিসন ও ফাংসন। আপনি ছেলেদের নিয়ে দয়া করে এখানে আসবেন বেলা দশটা নাগাদ, আমি গাড়ি পাঠাবো। নিজে যেতে পারলুম না বলে যে ত্রুটি হলো, দয়া করে মার্জনা করবেন।"

চিঠি পড়ে উমাচরণ বললেন,—এতো বড় ব্যাপার,—নিশ্চয় যাবো ভাই, তুমি তোমার বাবাকে বলো।

অমিয় চলে গেল। প্রদীপ এবং মাণিককে নিয়ে উমাচরণও বাসে চড়ে বেরিয়ে পড়লেন।

সন্ধ্যার আগে তিনজনে বাড়ি ফিরলেন। ফিরে দেখেন একটি ভদ্রলোক বসে আছেন। ···কে!

তাঁকে দেখে প্রদীপ উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠলো—দুলাল কাকা!

ভদ্রলোক উমাচরণকে প্রণাম করলেন। করে বললেন—আমার নাম দুলাল ঘোষ। বনগ্রাম থেকে আমি প্রদীপকে নিয়ে এসেছিলুম। তিনি বললেন—প্রদীপের বাবার প্রায় পাঁচ বিঘে জমি ঝোপঝাড় জঙ্গলে ভর্‌তি ছিলো। সে জঙ্গলের দিকে কারো নজর ছিলো না। এখন ঐ গ্রামেরই হরকান্ত রায়ের ছেলে বিনোদ বিলেত থেকে এগ্রিকালচার পাশ করে এসে গ্রামে পোলট্রি ফার্ম খুলছেন। প্রতাপবাবুর ঐ জমিটা তাঁদের বাগানের সঙ্গে লাগাও। ফার্মের জন্যে বিনোদ ঐ জমি তিন হাজার টাকায় কিনতে চায়; কিংবা যদি ঐ জমি বেচবার মত না থাকে তাহলে ঐ জমি পঞ্চাশ বছরের জন্য লীজ নিতে রাজী। আমার কাছে এই প্রস্তাব করার জন্য আপনার কাছে এসেছি। এখন আপনি যা বলবেন।···

উমাচরণ বললেন,—খুব ভালো কথা বাবা। আমার মত, ভূমি হলো লক্ষ্মী,—বেচতে নেই। প্রদীপের ও জমি বেচা হবে না। ও মানুষ হয়ে উঠে বাপ-পিতেমোর জমি ভোগ করবে, এই

আমার ইচ্ছা। ও জমি তুমি লীজ দেবার ব্যবস্থা কর বাবা।…কত টাকা মাসে ভাড়া হতে পারে তুমি তার ব্যবস্থা কর।

দুলাল ঘোষ বললেন,—তিনি বলেছেন পঞ্চাশ টাকা করে ভাড়া দেবেন এবং দেড়শো টাকা সেলামী।

উমাচরণ বললেন,—খুব ভালো কথা, বাবা। এ নিয়ে আমি দরদস্তুর করতে চাই না। তুমি ছিলে প্রতাপের বন্ধু—প্রদীপের মঙ্গলই তুমি চাও, আমি বুঝি। তুমি এই ব্যবস্থাই করো—প্রদীপের কিছু আয়ের সংস্থান হোক।

পরের দিন বেহালায় ক্ষিতীশ রায়ের সাইক্‌ল্ কারখানা…

উমাচরণ এলেন প্রদীপ ও মাণিককে নিয়ে। ক্ষিতীশ রায় খুব খাতির করে তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে ওয়ার্কশপ দেখালেন—সেই সঙ্গে প্রশস্ত হলে কারখানার তৈরী সাইকেলের একজিবিসন। ওয়ার্কশপে দেখালেন তাঁরা কারখানায় যে সব টায়ার, টিউব, চাকার স্পোক্‌স্ তৈরী করছেন সেইগুলি, তারপর কারখানার প্রশস্ত কমপাউণ্ডে কারিগরদের ফ্যামিলি কোয়র্টারস্। কারিগরদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার জন্য ছোট একটি স্কুল, চিকিৎসার জন্য ডাক্তারখানা, খেলাধূলার জন্য গ্রাউণ্ড—বিরাট ব্যাপার।

ক্ষিতীশ রায় বললেন, আমার এখানে কারিগররা সব বাঙালী। বাঙালী ছাড়া আমি আর কাকেও নিইনি এবং নেব না বলেই ইচ্ছা। বিস্ময় প্রকাশ করে উমাচরণ বললেন,—শুধু বাঙালীকে নিয়েই তো আমাদের জাত নয়, আমরা তো ভারতবাসী। আমাদের কাছে বাঙালী, বেহারী, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী সব এক। আমরা সব ভাই-ভাই।

ক্ষিতীশ রায় বললেন,—অতবড় আইডিয়া আমি ঠিক গ্রহণ করতে পারি না। চ্যারিটি বিগিনস্ এ্যাট হোম—আগে বাঙালীকে নিয়ে কাজ করি, তারপর রবীন্দ্রনাথের "ভারত ভাগ্য বিধাতার" চরণতলে দাঁড়াবো। তারপর "পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ"…! এই পর্যন্ত বলে ক্ষিতীশ রায় হাসলেন, হেসে বললেন,—কেন বাঙালীকে নিয়ে আমার এই চেষ্টা আপনাকে বলি। তখন আমার বয়স উনিশ-কুড়ি বছর…আমার এক মামা হ্যারিসন্ রোডে—নতুন বাড়ী করেছেন, গৃহ-প্রবেশের সময় সেই বাড়ীতে গিয়ে এক বছর ছিলুম। ভোরে উঠে গাড়ীবারান্দা দিয়ে দেখতুম, ফরফর করে রাস্তায় জল দিচ্ছে উৎকলবাসী, সাইকেলে চড়ে খবরের কাগজ বিলি করছে বেহারী, জলন্ত তোলা উনুনে নগরসানো কলসীতে চা ফিরি করছে বেহারী, ধোপা বেহারী, ট্যাক্সি চালাচ্ছে পাঞ্জাবী, তরিতরকারী বেচছে বেহারী, গোয়ালা বেহারী আর দেখতুম, আমাদের

বাঙালী বাবুরা ন'টা বাজতে না বাজতে ছুটছেন কেরানীগিরি করতে। আর দেখতুম, বাঙালী ভাই খঞ্জনী বাজিয়ে বা "জয়-রাধে কেষ্ট", "ভিক্ষে পাই মা"—বলে ভিক্ষায় বেরিয়েছেন। দুঃখ হতো, রাগ হতো। মনে হতো কবি সাধে বলেছেন—"ভূতলে বাঙালী অধম জাতি।" আমি স্যার পি, সি, রায়ের ছাত্র ছিলুম।—কলেজ লাইফ থেকে আমার সংকল্প ছিলো ব্যবাসাবৃত্তি করবো, কারিগরি করবো, আর কেরানীগিরির দিক থেকে ইণ্ডাস্ট্রীর দিকে বাঙালীর মন যাতে ফেরাতে পারি তার চেষ্টা করবো। আপনাকে বলেছি কিনা মনে নেই, আমার বড় ছেলেকে পাঠিয়েছি কোভেন্ট্রিতে। সাইকেলের পার্টস তৈরী শিখে এখানে ফিরে সেই কাজ করবে। অর্থাৎ আমাদের সাইকেল হবে আগাগোড়া এখানে তৈরী—বিলেত থেকে টিউব, টায়ার, চাকা কিনে, এনে সেগুলি জোড়া দিয়ে বাজারে ব্যবসা-বৃত্তি নয়। (ক্রমশঃ)

রোগের সঙ্গে সংগ্রামে চলন্ত ক্লিনিক

সুদূর অজ পাড়াগাঁয়ে কারুর শক্ত অসুখ হলে সবাই চিন্তিত হয়ে পড়ে। হাসপাতাল হয়তো দশ-বিশ-একশো মাইল দূরে। অতদূরে রোগীকে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করা কি কম ঝকমারি। কিন্তু খুব শীগ্‌গিরই মানুষ এই দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই পাবে। পশ্চিম জার্মানীতে তৈরী জলে-স্থলে চলার উপযোগী "ক্লিনোমোবাইল" আস্তে আস্তে সারা পৃথিবীতে হাজির হচ্ছে। এই অভিনব আবিষ্কারের কল্যাণে দূর-দূরাঞ্চলের মানুষরাও এখন ঠিক মত ওষুধ পাচ্ছে, ছোঁয়াচে রোগের বিরুদ্ধে প্রতিষেধ ব্যবস্থা করতে পাচ্ছে, প্রয়োজন হলে অস্ত্রোপচার করাও সম্ভব হচ্ছে। জনসাধারণকে ওষুধ দেবার মত যাবতীয় প্রয়োজনীয় ওষুধ-পত্র ক্লিনোমোবাইলের ডাক্তারখানায় মজুত থাকে।

এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার সাইত্রিশটি দেশে এই আধুনিক চলন্ত ক্লিনিক সরবরাহ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও হবে। প্রত্যেকটি রোগক্লিষ্ট মানুষ যাতে আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সুবিধা পায়, সেই উদ্দেশ্য নিয়েই ক্লিনোমোবাইল সরবরাহ করা হচ্ছে ও হবে। প্রত্যেকটি দেশ থেকে সংক্রামক রোগ ও মহামারী সমূলে দূর করার কাজে এগুলি ব্যবহার করা হবে।

ইন্দোনেশিয়া ও কলম্বিয়ার জন্যে বিশেষভাবে জলচারী ক্লিনোমোবাইল তৈরী হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে তুর্কী, ভারত ও সাহারাতেও ক্লিনোমোবাইল পাঠাবার ব্যবস্থা হচ্ছে।

লণ্ডনের ন্যাশানাল পোর্ট্রেট গ্যালারী

শ্রীঅমলকুমার চট্টোপাধ্যায়

কোন জাতই তার অতীতকে অস্বীকার করে বড় হতে পারে না। দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য, কৃষ্টি, কলা ও সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও তার সংরক্ষণের সাধ্য সেই সেই দেশের জাতীয় বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণতালাভ করে। আধুনিক দুনিয়ায় ইংরেজরা জাত হিসাবে বোধহয় এ-কথার সত্যতা সবচেয়ে বেশী উপলব্ধি করেছিল।

জগতের এক প্রাচীন সভ্যতার দেশ থেকে আমরা এখানে এসেছি। কিন্তু এদেশে আসার আগে কখনো বুঝতে পারিনি যে প্রাচীনের প্রতি আমাদের অবহেলা কত বেশী! যতই দেখছি ততই অবাক হচ্ছি যে, যা কিছু প্রাচীন, যা কিছু স্মরণীয়, যা'র পেছনে কোনও একটু ইতিহাস আছে, তাকেই সযত্নে রক্ষা করার জন্য এদের কী অসাধারণ চেষ্টা! ছোট বড় যে কোন শহরেই সরকারী-বেসরকারী অসংখ্য গ্যালারী, মিউজিয়াম দেখলে আমাদের দুঃখ হওয়ারই কথা।

যাক সে সব কথা। আজ বরং আমরা বিখ্যাত ন্যাশানাল পোর্ট্রেট গ্যালারী নিয়ে কিছু আলোচনা করি।

লণ্ডনের প্রাণকেন্দ্র, কর্মচঞ্চল 'ওয়েষ্ট এণ্ডের' মধ্যে দিয়ে সোজা চলে গেছে জনবহুল রাস্তা 'চেয়ারিং ক্রশ' রোড। 'টট্‌নম্' কোর্ট রোড টিউব-ষ্টেশন থেকে সুরু হয়ে লেষ্টার স্কোয়ার ষ্টেশনের পাশ দিয়ে সোজা গিয়ে পড়েছে 'ষ্ট্রাণ্ডের' ওপর। ষ্ট্রাণ্ডের পাশেই বহু প্রচারিত 'ট্রাফালগার স্কোয়ার'। এখানে গগনচুম্বী স্তম্ভের ওপর বিখ্যাত নৌ সেনাপতি লর্ড নেলসনের বিশাল মূর্তি। সারা ট্রাফালগার স্কোয়ার জুড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে পায়রাদের আসা-যাওয়া দাঁড়িয়ে দেখার মত দৃশ্য।

স্কোয়ারের চারপাশের রাস্তায় সর্বক্ষণ গাড়ীর ভিড় লেগেই আছে। কর্মব্যস্ত মানুষ সসব্যস্ত হয়ে চলাফেরা করছে। কৌতূহলী পর্যটকের দল ফটো তুলতে ব্যস্ত। সব মিলিয়ে একটা জীবন্ত ভাব!

এই ট্রাফালগার স্কোয়ারের এক পাশেই লণ্ডনের বিশ্ববিখ্যাত দুটি জাতীয় চিত্রশালা আছে। একটি হ'ল ন্যাশানাল আর্ট গ্যালারী আর তার পাশেই ন্যাশানল পোর্ট্রেট গ্যালারী। এদেশের এবং বিদেশের সেরা শিল্পীদের শ্রেষ্ঠ শিল্প নিদর্শন রাখা আছে ন্যাশানাল আর্ট গ্যালারীতে।

পৃথিবীর সর্বকালের বিখ্যাত প্রতিকৃতি চিত্রকলার সংগ্রহ হিসাবে ন্যাশানাল পোর্ট্রেট গ্যালারী প্রায় অদ্বিতীয় বলা চলে।

প্রতিকৃতি চিত্রের দিকে ইংরেজদের ঝোঁকটা বরাবরই বেশী। শুধু ধনী বা অভিজাতরাই নয়, সাধারণ স্বচ্ছল গৃহস্থও চাইতো বাপ-মা আর পরিবারের ছবি আঁকিয়ে রাখতে। দশম-একাদশ শতক থেকেই এ বিষয়ে এদেশের লোকেদের আগ্রহ দেখা যায়। তখন ক্যানভাস, কাঠ, কাগজ বা অন্য কিছুর ওপর ছবি আঁকার রেওয়াজ এদেশে চালু হয়নি। তাই এই সময় শিল্পীরা গ্রাহকদের বাড়ীতে গিয়ে বাড়ীর দেওয়ালেই পরিবারের ছবি এঁকে আসতেন। কিন্তু দুর্গ, ঘরবাড়ী পুরোনো হয়ে ধ্বংস হয়ে গেলে সেই সঙ্গে ছবিও নষ্ট হয়ে যেত। তাই সে সময়কার এ ধরনের শিল্পনিদর্শন প্রায় দুষ্প্রাপ্যই বলা চলে।

ত্রয়োদশ শতকের শেষের দিক থেকে ইংলণ্ডে ডাচ ও অন্যান্য বিদেশী শিল্পীদের আসা-যাওয়া সুরু হ'ল। এঁরা সাধারণতঃ ভাগ্য-অন্বেষণের আশাতেই এদেশে উপস্থিত হতেন। কিন্তু এদেশের ধনী ও অভিজাত সমাজে এঁরা সাদরেই গৃহীত হলেন। এঁরাই এদেশে প্রথম ক্যানভাস বা অন্যান্য উপাদানের ওপর ছবি আঁকার প্রবর্তন ঘটান, যা' সহজেই ফ্রেমে বাঁধিয়ে দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখা যেত। এঁদের ছবি আঁকার রীতিও ইংলণ্ডের শিল্প ধারাকে বিশেষ প্রভাবিত করলো।

শুধু তাই নয়, চিত্রের সমঝদার হওয়া এ সময়ে ইংলণ্ডের অভিজাতদের মধ্যে একটা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়াল। প্রত্যেক ধনী ও অভিজাত পরিবারের ছেলেদের শিক্ষার অন্যতম অঙ্গ ছিল শিল্পকলায় জ্ঞানলাভ করা। চিত্রকলায় ওপর ঝোঁকটা ছিল সবচেয়ে বেশী।

এই জন্যে দেশে লেখাপড়া শেষ করেই এদেশের বড় ঘরের ছেলেরা বেড়াতে যেতো ইটালীতে। ইটালীর ফ্লোরেন্স, ভেনিস, নেপল্‌স নগরী তখন চিত্রশিল্পের জন্য বিশ্ববিখ্যাত। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পী আর রসিকরা তখন গিয়ে সমবেত হতেন ইটালীতে। ইংলণ্ডের এই শিক্ষিত যুবকরা ইটালীতে গিয়ে শুধু যে শিল্পের চর্চাই করতেন তা নয়, দেশে ফিরে আসার সময় ইটালীর সমসাময়িক শিল্পীদের আঁকা কিছু ছবিও তাঁরা কিনে আনতেন নিজেদের বাড়ির জন্যে।

এর ফলে পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই চিত্রশিল্প ও চারুকলার ওপর বেশ জ্ঞান ও আগ্রহ আছে এমন অসংখ্য পরিবার দেখা দিল। বিখ্যাত ডাচ শিল্পী হ্যান্‌স্ হল্‌বিন যখন অষ্টম হেনরীর চিত্রশিল্পী হয়ে ইংলণ্ডে এলেন, শিল্প সম্বন্ধে ইংরাজদের গভীর আগ্রহ ও রসবোধ দেখে তিনি গভীরভাবে মুগ্ধই হয়েছিলেন।

পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই এদেশে চিত্রশিল্পের নতুন জন্ম বলতে হবে। তার আগে আঁকা প্রায় সব ছবিই নষ্ট হয়ে গেছে। আবার হ্যান্‌স্ হলবিনের আসার সংগে সংগেই এদেশে প্রতিকৃতি চিত্রকলায় নিত্য-নতুন ধারার প্রবর্তন হ'তে লাগল। হলবিন, তাঁর ছেলে, স্যার এ্যান্টনী ভ্যান

ডাইক, সার পিটার লেলী ও ইত্তহান জোফানীর মত বিখ্যাত বিদেশী শিল্পীর দল ইংলণ্ডে একে পর এক এসে হাজির হলেন। সেই সঙ্গে যাদুকরী ক্ষমতা নিয়ে জন্মালেন সার টমাস্ লরেন্স, সা জোসুয়া রেনল্ডস্, রামসে, হগার্থ টার্নারের দল। এঁরা যুগপৎ রাজা ও দেশের আপামরজন সাধারণের সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করলেন। ফলে পঞ্চদশ শতক থেকে প্রতিকৃতি চিত্রের ক্ষেত্রে সেই যে নতুন নতুন জোয়ারের দেখা দিল, তা আজও অব্যাহত রয়েছে।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই সব শিল্পীদের আঁকা সমস্ত ছবিই ছড়িয়ে ছিল বিভিন্ন পরিবারে, অভিজাতদের দুর্গপ্রাকার বা রাজার নিজস্ব সংগ্রহশালায়। তাদের প্রদর্শনীয় ব্যবস্থা করার কথা কেউ কখনো চিন্তা করেনি। যত্নের অভাব ও অন্যান্য নানা কারণেও অনেক মূল্যবান ছবি নষ্ট হয়ে যেতে লাগলো।

এই সমস্ত ছবির যথোপযুক্ত সংরক্ষণ ও জনসাধারণের কাছে তা' প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ১৮৪৫ সালে স্বনামধন্য কার্লাইল সাহেব প্রথম এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধ পঞ্চম আর্লষ্ট্যান-হোপের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি ছিলেন গুণী লোক। শিল্পের প্রতিও তাঁর ছিল একনিষ্ঠ অনুরাগ। তিনি কার্লাইলের অভিমতটি তুলে ধরে একটি জাতীয় প্রতিকৃতি চিত্রশালা গড়ে তোলার জন্যে আন্দোলন সুরু করেন। রাণী ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স এ্যালবার্ট ও তখনকার প্রভাবপরায়ণ রাজনীতিবিদ বেঞ্জামিন ডিস্‌রেইলী তাঁদের সক্রিয় সমর্থন জানিয়ে তাঁকে উৎসাহিত করেন।

লর্ড ষ্ট্যানহোপের আন্দোলনের তীব্রতায় সরকারের টনক নড়ল। ১৮৫৬ সালে প্রধান মন্ত্রী লর্ড পামার ষ্টোন ন্যাশানাল পোর্ট্রেট গ্যালারী প্রতিষ্ঠার জন্য পার্লামেণ্টে প্রয়োজনীয় আইন পাশ করিয়ে নিলেন। এর পরিচালনার জন্য উপযুক্ত অর্থও পার্লামেণ্ট সাদরে মঞ্জুর করলো। এক শক্তিশালী কমিটির ওপর এর পরিচালন-ব্যবস্থা ন্যস্ত করা হ'ল। ঐতিহাসিক প্যালগ্রেভ, লর্ড সল্‌সবেরী, লর্ড পামারষ্টোন, কার্লাইল সাহেব প্রভৃতি জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরা পরিচালকমণ্ডলীর সভ্য হলেন। প্রথম সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করলেন এর প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ষ্ট্যানহোপ।

প্রায় সুরু থেকেই ন্যাশানাল পোর্ট্রেট গ্যালারীর ওপর দুটো দায়িত্ব এসে পড়লো। প্রথমতঃ দেশের বিখ্যাত লোকদের প্রতিকৃতি সংগ্রহ করা। সেখানে দুটো কথা তাঁদের মনে রাখতে হয়েছে। প্রথমতঃ স্বনাম ধন্য সমস্ত মনীষীদের কথা। তাঁদের অনেক প্রতিকৃতি আছে যা কোন নামকরা শিল্পীদের দিয়ে করানো নয়, অথচ যার শিল্পমূল্য ও ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট বলতে হবে। তাঁদের সংগ্রহের এটাই হ'ল অন্যতম মাপকাঠি।

তাঁদের সংগ্রহের দ্বিতীয় মাপকাঠি হ'ল, সেরা শিল্পীদের যে কোন কাজ, তা রাজা-মহারাজার

প্রতিকৃতিই হোক বা সাধারণ মানুষের ছবিই হোক। তার মধ্যে দিয়ে তাঁরা শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের কাজের গুণাগুণ বিচার করতে চাইলেন।

কিন্তু আগেই আমরা বলেছি, সংগ্রহ ছাড়াও আর একটা দায়িত্বও ন্যাশানাল পোর্ট্রেট গ্যালারীর হাতে এসে পড়েছিল। সেটা হ'ল চিত্র সম্বন্ধে জনসাধারণের জিজ্ঞাসার যথোপযুক্ত উত্তর দেওয়া এবং শিল্প সম্বন্ধে ব্যক্তিগত নানা দাবী-দাওয়ার ব্যবস্থা করা।

কোনো ভদ্রলোক হয়তো সতেরো বা আঠারো শতকের কোন একটা ছবি এনে গ্যালারীতে হাজির করলেন; তাঁকে বলে দিতে হবে কে এই ছবি এঁকেছেন, ঠিক কোন সময়ের ছবি বলে এটিকে তাঁরা আন্দাজ করেন, ছবিটির শিল্পগুণই বা কেমন ইত্যাদি নানারকমের প্রশ্ন। সুরু থেকেই ন্যাশানাল গ্যালারীর কর্তৃপক্ষ এই সমস্ত প্রশ্ন সম্বন্ধে সতর্ক অনুসন্ধান চালিয়ে এসেছেন এবং তার সঠিক উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। এর ফলে বিভিন্ন সময়ে বিশেষ মূল্যবান প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্যের আবিষ্কার হয়েছে।

ন্যাশানাল পোর্ট্রেট গ্যালারীর শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে কয়েক বছর আগেই। এমন আর একটি গ্যালারীর কথা আমার জানা নেই। এডিনবরা, প্যারিস কিংবা রোমের মিউজিয়াম দেখে তাদের নানাধরনের শ্রেষ্ঠত্বের কথা আমার মনে হয়েছে। কিন্তু প্রতিকৃতি-চিত্রের এমন সুবিপুল সংগ্রহ, এবং শিল্প নিয়ে পড়াশুনো করার জন্য এরকম স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থাগারের জুড়ী বোধহয় নেই।

সৌভাগ্যবশতঃ এখানে এক দায়িত্বপূর্ণ পদে আমার কিছুদিন কাজ করার সুযোগ হয়েছিল। তখন চিত্র-সংগ্রহ ও তার রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে এখানকার আধুনিক ব্যবস্থা দেখে আমি অবাক হয়েছি। সারা পৃথিবীতে কোন্ চিত্রকর বা ভাস্করের কোন্ কোন্ কাজ কোথায় রাখা আছে এখানকার চিত্রতালিকা দেখে তা' খুঁজে বার করতে লোকের যথেষ্ট বিলম্ব হবে না। এ তো গেল পরিচালনার একটা দিক মাত্র।

যদি মুনশীয়ানার কথা বলা হয়, তাহলে বলবো, ধুয়ে-মুছে ঝাপসা হয়ে গেছে এমন সব ছবিকে পরীক্ষা করে অনতিবিলম্বেই এখানকার বিশেষজ্ঞরা বলে দিতে পারেন যে, কোন্ শিল্পী কোন্ সময় নাগাদ ঐ ছবিটি এঁকেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা সমীচীন বোধ করছি। ইদানীংকালে ন্যাশানাল গ্যালারীর যে জগতজোড়া প্রতিষ্ঠা তার পেছনে অলক্ষ্যে কাজ করেছে এর বর্তমান 'কিপার ও ডিরেক্টার' সার কিংস্‌লী এ্যাডাম্‌সের জীবনভোর পরিশ্রম ও সাধনা। এই শুভ্রকেশ, সৌম্যদর্শন, সুপণ্ডিত ভদ্রলোকটি আজও যে গভীর মমতা নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটির জন্ত কাজ করে যাচ্ছেন, তা' দেখলে

মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। এপষ্টেইন সাহেবের কয়েকটি ভাস্কর্য সংগ্রহ করে একদিন তিনি যে তাঁর খুশি ধরেই রাখতে পারছিলেন না! এরকম মানুষ সারা প্রতিষ্ঠানকেই অনুপ্রাণিত করে থাকেন।

ন্যাশানাল পোট্রেট গ্যালারীর ব্যয়ভার সরকারই বহন করে থাকেন। এছাড়াও নতুন নতুন সংগ্রহের জন্য সরকার প্রত্যেক বছরই অর্থ সাহায্য করে থাকেন। এছাড়াও অনেক সদাশয় ভদ্রলোক তাঁদের পারিবারিক চিত্রসংগ্রহ এই প্রতিষ্ঠানকে দান করে যান। এমনি করেই ন্যাশানাল পোট্রেট গ্যালারীর কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জগতে আজ আর তার জুড়ী নেই।

আমাদের দেশের বহু ছবিই তো অযত্নে নষ্ট হয়ে গেছে। রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্রের কথা নয় ছেড়েই দিলাম, রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, মাইকেল মধুসূদন প্রভৃতির কোন ভাল প্রামাণ্য তৈলচিত্র আছে কিনা আমাদের জানা নেই। থাকলেও তার যথোপযুক্ত সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থাই আজ পর্যন্ত আমরা করিনি। ন্যাশানাল গ্যালারীর মত জাতীয় চিত্রশালার পত্তন যত বিলম্বিত হবে, দিনে দিনে অনেক ঐতিহাসিক তথ্যও ততই লুপ্ত হতে থাকবে। সেই সমূহ ক্ষতির হাত থেকে আজ দেশকে কে-ই বা রক্ষা করবে!

ন্যাশানাল পোট্রেট গ্যালারীতে রাখা শিল্পী জোফানীর আঁকা কয়েকটি ছবিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর কলকাতা ও তার সন্নিহিত অঞ্চলের ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের সামাজিক চিত্রটি ফুটে উঠেছে। তৎকালীন অনেক কথাই তার থেকে আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল।

রবিবর্মা, অবনীন্দ্র ঠাকুর, যামিনী রায়, নন্দলাল বোস, অতুল বোস প্রভৃতির আঁকা বহু মূল্যবান ছবি আছে যা' পৃথিবীর যে কোন দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্প-নিদর্শনের সঙ্গে একাসনে বসতে পারে। এই সব শিল্পীদের জীবনব্যাপী সাধনার ফল যাতে নষ্ট না হয়ে যায় এবং আমাদের দেশের জনসাধারণ যাতে তাঁদের সৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন, তার জন্যে অবিলম্বেই কোন ব্যবস্থা হওয়া কি বাঞ্ছনীয় নয়?*

* লণ্ডন বি. বি. সি বেতার বিচিত্রার সৌজন্যে।

নূপুর

শ্রীসমর চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় দৃশ্য

নগরের প্রান্তে একটি ছোট্ট কুটীর, তার সামনে একটি সুন্দর উঠোন। পাঁচ-ছটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে একটি আট বছরের মধ্যমণি মেয়েকে ঘিরে খেলছে বা নাচছে। নাম তার নূপুর—

মোদের পায়ে চলন লেগেছে
(আহা) নাচন লেগেছে
আজ প্রভাতে কাহার পায়ের
ছোঁয়া লেগেছে
আহা নাচন লেগেছে।
আলোর রঙে উঠছে ধ্বনি
বাজছে মধুর বীণা
ঢেউ দিয়ে কয় সুরের বোঝা
আমায় চিনিস্ কিনা?
সাদা মেঘ হাতছানি দেয়
চমক লেগেছে—
আহা নাচন লেগেছে।

নাচতে নাচতে ছেলেমেয়েরা থেমে গেছে—কিন্তু নাচছে নূপুর। আর তার দিকে তাকিয়ে আছে সবাই। পায়ে যেন ফুল ফুটছে—কোনদিকে নূপুরের লক্ষ্য সেই। আপন মনেই নেচে চলেছে।

দাওয়ার ওপরে দাঁড়িয়ে বাবা, মা ও প্রতিবেশী কয়েকজন—ওদের নাচন দেখছেন।

নূপুর নাচছে আর গাইছে—

"ঢেউ দিয়ে যায় কাশের বোঝা
আমায় চিনিস্ কিনা?"

এমনি সময়ে এল সেই মেয়েটি যে কিছুক্ষণ আগে হলদে নূপুর কিনে এনেছে। নাম তার কাঁকন। পায়ে তার হলদে নূপুর। তার পায়েও আজ নাচন লেগেছে। হলদে নূপুরটি যেন বলছে—

"নাচ নাচ নাচ কাঁকন নাচ রে
তোর পায়ে দিলেম ছন্দ
কাঁকন নাচ রে
ও তুই নাচ নাচ নাচ!

কাঁকন নাচছে—আর ছেলেমেয়েরা অবাক হয়ে দেখছে। কাঁকন এত ছন্দ পায়ে ওঠাল কবে থেকে? নাচ থামলে নূপুর শুধালো—

নূপুর : ও কাঁকনমালা—
তুই নাচলি না তোর
নাচল নূপুর?

সবাই : ও তুই কোথায় পেলি হলদে নূপুর ঘুঙুর?

নূপুর : ও তুই নাচলি না তোর
নাচল নূপুর?

"ভিনদেশী এক নূপুরওলা সেথায় এসেছে।
ঠাকুর ঘরের দুয়ার যেথায় পথে মিশেছে।
ছোট্ট বিপণী।
(সেথায়) জোড়ায় জোড়ায় নূপুর তোলে
সুরের কিংকিণী।
আমি চেয়েছিলাম রক্ত নূপুর!
একটু হেসে সে
বললে, "বাছা হলদে নূপুর—
এই যে রয়েছে—
আমি তাই পরেছি পায়ে
নানান ঢঙে ছন্দ আমার পায়ে উঠেছে
ভিনদেশী এক নূপুরওলা সেথায় এসেছে।

নূপুর : রক্ত নূপুর ?

কাঁকন : আহা! রক্ত নূপুর!

"রক্ত গোলাপ পাপড়ি
তাতে সোনার নূপুর দানা—
তাকিয়ে যেন বলছে—
তফাৎ! আমায় ছুঁয়োনা না।"

আর নূপুরওলা বলছে—

"আমি তবেই পাব ছুটি
যোগ্য পায়ে পরাবো সে
কোথায় চরণ দুটি ?"

আমিও বলে এসেছি—

"নূপুরওলা—
যেদিন তোমার মিলবে চরণ দুটি
আমায় তুমি জানিয়ে দিও
আসব আমি ছুটি
যতন করে যুগল চরণ
ধুইয়ে দেব জলে
তোমার হবে ছুটি।

হঠাৎ কাঁকন বললে—নূপুর!

ও রক্ত নূপুর তোমার পায়ের
জন্য নয় তো ?

ছেলেমেয়েরা : নূপুর—ও তোমারই।
চল সেই নূপুরওলার দোকানে—

কাঁকন : কিন্তু ভাই সে তো এখন দোকান খুলবে না—

সবাই : তবে ?

কাঁকন : কাল ভোরে যখন মন্দিরের ঘণ্টা প্রথম প্রভাতি সুর বাজাবে—তখন নূপুরওলা মন্দির প্রদক্ষিণ করে—গোপুরমের চত্বরে তার দোকান খুলবে—

নূপুর : বেশ, কাল যাব তোমার ঐ রক্ত নূপুরের খোঁজে—

"মোদের পায়ে চলন লেগেছে—"

নাচতে নাচতে ছেলেমেয়েরা চলে গেল।

নূপুরের মা : গুরুজীকে শুধোলেন—

"ঐ আমার মেয়ে ওকে আপনি শিষ্যা করে নিন।"

"না মা! আমায় ক্ষমা কর—ওর শিক্ষার ভার নেওয়া আমার সম্ভব নয়—"

"তবে কি ওর গুরু মিলবে না?"

"ভেব না মা! স্বয়ং নটরাজ যার গুরু সে কন্যাকে শেখাবার স্পর্ধা আমার নেই।" বলে গুরু চলে গেলেন। মা স্তব্ধ হয়ে রইলেন—বাবা নির্বাক।

৩য় দৃশ্য

সেই গোপুরম—সেই চত্বর। প্রভাতি ঘণ্টা বাজছে—মন্দির-দ্বার খুলছে। পূজার্থীরা স্নান করে থালা সাজিয়ে মন্দিরের ভিতর চলেছেন।

আজও প্রাতে আসছেন নূপুরওলা। তার চওড়া কপালে চন্দনতিলক ফোঁটা। নূপুরওলা চলছে না নাচছে বোঝা যায় না। গুনগুন করে আজও গান গাইছে নূপুরওলা।

আমি রোজ তুলে দিই
একটি নাচের ধুন।
(তোমার) দেউল দরজায়।
ঘুম ভাঙে কি নূপুর কঙ্কণে
(তোমার) দুয়ার খুলে যায়।
কাহার পায়ের নূপুর ঝংকারে
বিশ্বজাগে অসীম আনন্দে।
নৃত্যে ওঠে সুরের মূর্ছনা
ফুলের গন্ধ সুনীল আকাশ ছায়।
তোমার দেউল দরজায়॥

নূপুরওলা এসে দাঁড়াল তার সেই ছোট বিপণিতে। রক্ত-নূপুরটি জলজল করছে—যেন বলছে, “কে আছ। আমায় পায়ে দেবার স্পর্ধা কে রাখো ?”

এমনি সময় এসে দাঁড়াল কাঁকন।

হাসিমুখে নূপুরওলা বলল,—“ওগো দিদি হলদে নূপুর লাগল পায়ে ভালো ?”

“ভালই লেগেছে। দেখতে এলুম তোমার লাল নূপুর পরার মত পা তোমার জুটল কিনা—আহা জোটেনি দেখছি—”

“না দিদি, অমনি পা পেলুম না তো।”

“তা আমার পায়ে চলবে নাকি বল ?”

“কি যে বল দিদি ! হলদে যে তোমাকে কি চমৎকার মানিয়েছে !”

কাঁকন হাততালি দিতেই এল নূপুর ও তাঁর সঙ্গীনীরা। নূপুরের পা দুটি দেখিয়ে কাঁকন বলল—

“দেখ তো নূপুরওলা তোমার ঐ নূপুর আমার এই বন্ধুর পায়ে মানাবে কিনা—ওর নামও নূপুর—

নূপুরওলা তাকালো নূপুরের মুখের দিকে আর তার পায়ের দিকে। নূপুরের সমস্ত চেহারা বদলে গেল—সমস্ত দেহ কেঁপে উঠল।

নূপুরওলা কয়েক মুহূর্ত নিষ্পলকে তাকিয়ে রইল নূপুরের দিকে—। তারপর লাফিয়ে উঠে তুলে নিল সেই লাল নূপুর জোড়া। আনন্দে তার মুখ ঝলমল করে উঠল। সে গাইল।

আমি পেয়েছি।
এই তো যুগল চরণ
আমি পেয়েছি।
এ চরণ ছন্দে বাঁধা
সুরে সাধা—

হঠাৎ নূপুরের পা দুটি আপনি নেচে উঠল—নূপুরওলার গানের সঙ্গে নিজের অজ্ঞাতেই সে নাচতে লাগল।

এ চরণ ছন্দে বাঁধা
সুরে সাধা
উঠছে ধ্বনি প্রাঙ্গণে—

নূপুরের লালের আভায়
চরণ রাঙায়
উঠছে ছটা অঙ্গনে।

আয় দেখি তোর জোড়া পায়ে রক্ত-নূপুর পরিয়ে দি।

আমি পেয়েছি।

নূপুর আর কাঁকন আর তার বন্ধুরা অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইল নূপুরওলার দিকে। নূপুরওলা সাবধানে রক্ত-নূপুর বন্ধনী মুক্ত ক'রে প্রথমে মাথায় ঠেকাল—তারপর বুকে ধরল। গুনগুন করে গাইতে গাইতে একটি একটি করে দু'পায়ে পরিয়ে দিল রক্ত-নূপুর—নূপুরের পায়ে।

চমকে উঠল নূপুর। পা দুটি তার স্থির—কিন্তু একি! কোথা থেকে আসছে নূপুরের ঝংকার?

"নূপুরওলা তুমি একি করলে?" বলল নূপুর। তার কণ্ঠে আকুল বিস্ময়—না উৎকণ্ঠা? ভয় না আনন্দ? কাঁকন একটু হেসে শুধালো—

"নূপুরওলা তোমার লাল নূপুরের যোগ্য পা মিলেছে তো?"

"ওর পায়ের চন্নামেত্ত নিতে আমার একটুও আপত্তি নেই।"

নূপুরওলা আনন্দে নাচছিল। কাঁকনের কথায় সম্বিত পেয়ে ছুটে এসে বুকে ধরল কাঁকনকে তার কপোলে চুমু খেয়ে বলল নূপুরওলা—

"হ্যাঁ দিদি আজ আমার ছুটি।"

নূপুরওলার দেহের স্পর্শে কাঁকনের ছোট্ট শরীরে শিহরণ খেলে গেল—

নূপুরওলা—কিন্তু তখন নূপুরওলা অদৃশ্য হ'য়ে গেছে। নূপুর-কাঁকনের বন্ধুরা বিস্ময়ে হতবাক। কোথায় গেল সে?　　　　(ক্রমশঃ)

"ভ্রমণ-কাহিনী পড়তে আমার ভাল লাগত। হিউয়েন সাঙ, মার্কো পোলো, ইবন বতুতা ও অপরাপর পুরাতন ভ্রমণ-কাহিনী, আধুনিককালের সেভেন হেডিনের মধ্যে এশিয়ার মরুভূমির মাঝখান দিয়ে ভ্রমণের বিবরণ, রোরিখের তিব্বত ভ্রমণের আশ্চর্য আশ্চর্য কাহিনী পাঠ করেছি। ছবির বইও ভাল লাগত, গিরিশৃঙ্গ, চিরতুষার মণ্ডিত পর্বত, মরুভূমি—কারাগারে মরুভূমি ও সমুদ্রের অসীম বিস্তারের জন্য প্রাণ আকুল হয়ে উঠত।"

—জওহরলাল

ব্যাঙ্‌ হতে চাই বাদ্‌লা দিনের

শ্রীসুধীর করণ

আমি—

ব্যাঙ্‌ হতে চাই বাদ্‌লার দিনে

ডুবে পুকুরে জলে।

দারুণ ইচ্ছে,—গ্যাঙোর গ্যাঙোর

গান গাই গলা খুলে॥

রিম্‌ঝিম্‌ঝিম্‌ বিষ্টির ফোঁটা

নাকের ডগায় রেখে,

মেঘমল্লার সুরের বাহার

শোনাবোই ডেকে ডেকে।

গান শুনে সবে অবাক হবেই

ভাববে, একি এ কাণ্ড,

ব্যাঙের গলায় গানের বাজনা—

লুকানো মধুর ভাণ্ড!

আকাশে আঁধার নামবে যখন

বর্ষাতিখানা পরে',

ঝিঁঝিঁ পোকারাও কাঁসর বাজাবে

একটানা এক স্বরে—

গাছের পাতারা তাল দিয়ে দিয়ে

মাথা নেড়ে যাবে তার,

আকাশে-বাতাসে গাঁয়ের পুকুরে

ঘনাবে অন্ধকার—

তখন কি মজা; কেউ জানবে না

আমি শুধু এক ব্যাঙ্‌,

গলাটি ফুলিয়ে সারারাত ধরে

ডাকবো গ্যাঙোর গ্যাঙ্‌।

তা বলে, আসলে আমি ব্যাঙ্‌ নই

শুধু ব্যাঙ্‌ হ'তে চাই;

মা-কে তো বলেছি, দেখি যদি তাঁর

অনুমতিটুকু পাই!

সূর্যমুখী

শ্রীসদানন্দ চট্টোপাধ্যায়

হিম-নদী!

কোথায় বা কোনখানে কেউ আর আজ তা জানে না। কিন্তু একদিন এই নদীর শান্ত পরিবেশের ভেতর দিয়ে গড়ে উঠেছিল এক দেশ। নাম তার ধর্মগড়।

সোনার দেশ এই ধর্মগড়। অভাব-অনটন বা কোন রকমের কোন অশান্তি ছিল না সেখানে। নিশ্চিন্ত মনেই যে-যার দিন দিচ্ছিল কাটিয়ে।

রাস্তার মোড়ে মোড়ে বড় বড় হরফে পাথরের বুকে খোদাই করা থাকত অনুশাসন-লিপি। তাতে লেখা মাত্র তিনটি কথা—ন্যায়, ধর্ম ও সততা: যাতে বিদেশীরা সহজেই জেনে নিতে পারে দেশের সেই বিধান-লিপি—সেই জন্যেই এই ব্যবস্থা।

আর রাজা-প্রজাও তা বর্ণে বর্ণে মেনে চলত। তাই অসমর্থ যারা, তারা ছাড়া আর সকলেই জান-প্রাণ দিয়ে কাজ করত দেশের উন্নতির জন্য।

দুর্দিনের বছরে দুর্ভিক্ষ বা মড়কে দেশ ছেয়ে গেলে, রাজা নাওয়া-খাওয়া ভুলে গিলে ঘুরে-ফিরে খবর নিয়ে ফিরতেন। এখানে-সেখানে অন্নসত্র খুলে দিতেন বুভুক্ষুদের জন্যে। রাজবৈদ্য চোখের ঘুম তাড়িয়ে, রাত ভোর করে দিতেন রুগী দেখে দেখে। এই ভাবেই সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি নিয়ে ধর্মগড়ের লোকেরা বেশ আনন্দের ভেতর দিয়েই দিন কাটিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু এক সকালে হঠাৎ সেখানের আকাশে বিষাদের মেঘ জমে উঠল। রাজ্যের সকলেই মনের উৎকণ্ঠা নিয়ে দেবালয়ে ছুটে গেল শেষ বারের মতো মিনতি জানাতে।

কারণ রাজবৈদ্য হাল ছেড়ে দেওয়ার পর ঢ্যাঁড়া ঢোল পিটিয়েও কোন ফল হলো না আর। রাজা রাজ-পাট তুলে দিয়ে, রাণীর শিয়রে চুপচাপ বসে রইলেন শুধু। মহা-মন্ত্রী সাদা দাড়ির গিঁটান গোড়া ডান হাতের মুঠির মধ্যে আলগোছে ধরে রেখে, দূর আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবতে লাগলেন খালি।

দিন গড়িয়ে রাত এলো। সানাইয়ের বুক-ফাটা করুণ সুরে আকাশ-বাতাস ছেয়ে গেল। শেষে সলতের বুক-পিঠ পুড়িয়ে দিয়ে, মন্দিরের শত-আট ঘিয়ের প্রদীপ নিবে গিয়ে, ধোঁয়া ছড়াতে লাগল যেই, অমনি সেই অন্ধকার ভেদ করে কালো এক অশুভ ছায়া ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো।

যেন বিভীষিকা দেখে চমকে উঠল সকলে। গায়ের রক্ত সাদা হয়ে যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেল সকলের মুখ।

আকাশে মেঘের ছড়াছড়ি আর নীচেয় ঝড়ের দাপাদাপি। তার ভেতর এক সর্বহারা রিক্ততার বেদনায় গুমরে উঠতে লাগল মাটির বুক। সে কেন? কারণ, নিরাশার মাঝখানে

দোল খাচ্ছিল রাণীর বুকের যে দুলুনিটুকু, সেটুকু হঠাৎ থেমে গেল! ব্যথার আগুনে বুকের ভেতরটা জ্বলতে লাগল সকলের। অঝোর ধারায় তাদের চোখের জল ঝরে প'ড়ে, মরা ঘাসের মাথা পিঠ ভাসিয়ে দিতে লাগল তখন। আর রাজকুমারী সূর্যমুখী?

সে তখন দিশে হারিয়ে, হারানো মাকে তার খুঁজে খুঁজে ফিরতে লাগল। আই-ধাই যে যেখানে ছিল তাই দেখে কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছল। কিন্তু অবুঝ মেয়ে শুনল না কারো কথা। আগান-বাগান, পুকুর-দীঘি যে দিকে মন চায়, চলে যায়। মাঝে মাঝে থামে, দেখে, নজর ছড়িয়ে আকাশ পারের চাঁদের দেশটাকে। সেই আলোর দেশে মা তার আছে কিনা। বুড়ি মোক্ষদা তাই ছায়ার মতো পেছন-পেছন লেগে থাকে। সে-ই কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে রাজকুমারীকে। এ-কথা সে-কথা, নানা কথা দিয়ে চেষ্টা করে ওর মায়ের ব্যথা ভুলিয়ে দিতে। শেষে কোলে নিয়ে হাত বাড়িয়ে নীল আকাশটিকে দেখাতে দেখাতে বলে, স্বর্গের এক বাগানের কথা। আর বলে মস্ত এক পাহাড়ের কথা। যে পাহাড়ের পথ বেয়ে ভীম, অর্জুন আর সকলে চলে গিয়েছিল সেই বাগানে। তার মাও নাকি সেখানে ফুল হয়ে ফুটে আছে। যারা ভাল—যাদের সকলেই ভালবাসে, শুধু তারাই সেখানে ফুল হয়ে ফুটে থাকে।

মার কত কথাই না মনে পড়ে যায় সূর্যমুখীর। ছোটবেলায় সে ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদত যখন মা কোলে তুলে নিয়ে চুমো খেয়ে বলতেন—খুকু জানো ওই ফুলগুলোর মধ্যে-না, ছোট্ট ছোট্ট পরীরা সব ঘুমিয়ে আছে। কেঁদ না আর। কান্না শুনে ঘুম ভেঙ্গে গেলেই কিন্তু পালিয়ে যাবে সব। দুষ্টুদের সঙ্গে যে ওদের আড়ি।

তখন কান্না থামিয়ে সে সেইদিকে অবাক চোখে তাকালে, মা পাঁচ আঙ্গুলে গাল টিপে দিয়ে ফের বলতেন—বুঝলে, রাত্রে যখন তুমি লক্ষ্মী হয়ে গিয়ে ঘুমিয়ে পড় না, তখন ওরা ফুলের থেকে বেরিয়ে এসে, তোমারি পাশে বসে খেলা করে। মায়ের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমের মধ্যেই দেখতে পায়—তার মা সেই স্বর্গের বাগানে ধবধবে সাদা ফুল হয়ে ফুটে আছে।...

ধর্মগড়ের লোকেরা রাণীমার শোক ভুলতে না ভুলতেই শুনলে রাজার আবার বিয়ে। মনের শোক মনেতে চেপেই তাই আবার তাদের ছুটতে হলো রাজবাড়ীতে ভেট নিয়ে। সূর্যমুখীও শুনেছিল সে কথা। অবাক চোখ মেলে ধরে মোক্ষদাকে জিজ্ঞাসাও করেছিল—তাই নাকি মাসী!...

রাজা বিয়ে করে নিয়ে এলেন নতুন রাণীকে। তার চোখের দিকে তাকিয়ে পাত্র-মিত্র, প্রজাপুঞ্জ সকলের মন গোপন আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে। ঠিক মতো দুটো বছরও কাটল না, ধর্মগড়ের সিংহাসন টলে উঠল অধর্মের নাড়া লেগে। রাজা রাণীর মায়ায় প'ড়ে রাজ-কাজ সব ছেড়ে দিয়ে, আমোদ-আহ্লাদ নিয়েই মেতে রইলেন সারা দিন। আর রাণী সেই সুযোগে রাজদণ্ড তুলে নিল

নিজের হাতে। রাজা কিছুই জানতে বা বুঝতে পারলেন না। অল্পদিনের মধ্যেই রাজমন্ত্রী বাধ্য হয়ে বিদায় নিল। পাত্র-মিত্র আরো অনেকে রাণীর ইচ্ছা-মর্জির মাসুল দিয়ে চলে গেল। তখন শুরু হলো নিপীড়ন। লোভের খেসারত দিতে দিতে প্রজারা নিঃস্ব হয়ে গেল একেবারে। তবু রেহাই নেই। মুখের গ্রাস কেড়ে এনে সৈন্যরা রাজ কোষ ভরিয়ে তুলতে লাগল। রাণীর দেশের অসাধু লোক আর বণিকে ছেয়ে গেল সারা দেশ। জাল-জয়াচুরি, মিথ্যে বেসাতির কারবার জুড়ে দিলে তারা। এই ভাবেই ধর্মের দেশ পাপ আর অনাচারে ছেয়ে গেল একেবারে।

পুরানো আমলের দাস-দাসী, নফর-চাকর, আমলা-কর্মচারী যারা তখনো পঁড়ে রইল. একে একে সকলেই শাসনের নাগপাশে বাঁধা পড়ে যেতে লাগল। রাণীর অনুচরদের চোখ এড়িয়ে এই সব সর্বনেশে ব্যাপার রাজার কানে পৌঁছে দেওয়া তো সহজ ব্যাপার নয়। আর সে সব শুনেই বা তিনি করবেন কী ? পাত্র-মিত্র যারা তাঁকে ভালবাসত, শ্রদ্ধা করত, রাজ্যের ওলট-পালট করার ক্ষমতা রাখত, তাদের সকলকেই একে একে বিদায় নিতে হয়েছে। ফৌজদার, সেনাপতি প্রভৃতি ধরনের দু-চারজন হোমরাচোমরা যারা তখনো ছিল বুদ্ধির কৌশলে আর প্রলোভন দেখিয়ে দেখিয়ে রাণী তাদেরও মুঠোর মধ্যে পুরে ফেলেছে। তাই রাণীর লোকের খবরদারী আর চোখ-রাঙানী সহ্য করে করে অতিষ্ঠ হয়েই শেষ পর্যন্ত ভিন্ দেশেতে পালিয়ে গেল অনেকে। আর তাও যারা পারল না. তারা চোখের জলে মৃতা রাণীকে স্মরণ করে, রাজকুমারীর জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে, মতিচ্ছন্ন রাজার কথাও ভেবে মনের বোঝা বাড়িয়ে তুলতে থাকে। কিন্তু সূর্যমুখী চুপচাপ তার মায়ের ঘরখানিতেই থাকে। মোক্ষদা সজাগ দৃষ্টির বেড়া দিয়ে আশপাশ ঘিরে রাখে।

মায়ের ছবির দিকে চোখ পড়লেই মন সূর্যমুখীর কেমন যেন করে। চোখের জল আর বাঁধ মানে না তার। উপচে পড়ে গাল বুক ভাসিয়ে দিয়ে মেঝেতে। মা তার যখন বেঁচে ছিল, ধর্মগড়ের লোকেরা কি আনন্দেই না দিন কাটাত। আরতি সারার পর মা মন্দির থেকে বেরিয়ে এলে, তারা তাঁকে প্রণাম করে প্রসাদ নিয়ে তবে যেত। দুপুর থেকে বিকেল না হওয়া পর্যন্ত চারণ কবিরা পালা করে কথকতা শোনাত। কতো লোক যে নাটমন্দিরে জমা হয়ে সে সব শুনত! তাদের মাথায় যত চুল রাণীমায়ের ততো পরমায়ু বাড়ুক—এই আশীর্বাদই দিনের পর দিন করত তারা।

নতুন রাণী আসার পর যে সব হাতী দাপিয়ে দাপিয়ে মরে গেল, তারা সকাল-বিকেল শুড় ছুঁইয়ে মাকে সেলাম দিয়ে তার হাত থেকে রুটি কলা খেত। আর পুঁচকে বাচ্চা হাতীটা ঘণ্টা দুলিয়ে শুঁড় নাচিয়ে তাকে পিঠে তুলে নিত। সে মায়ের গলা জাপটে ধরে পিঠে বসে বসে দুলত খালি। সে সব দিন স্বপ্ন—শুধু স্বপ্ন হয়ে লেগে রয়েছে সূর্যমুখীর চোখের পাতায়।

আর এখন অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার ও স্বৈরাচারে ভরে গেছে সারা দেশ। রাণীর দেশের

যে সব অসাধু বণিকের দল এসেছে, বলতে গেলে তারাই রাজ্যের সর্বেসর্বা। হাকিম কোটাল প্রভৃতি সবাইকে তারা ট্যাকে গুঁজে ছলাকলায় ব্যবসা করে। লোকের অভাব-অনটনের সময় পয়সা-কড়ি কর্জ দিয়ে পরে দশগুণ উসুল করে। না দিতে পারলে জোত-জমি, ভিটে-মাটির দখল নিয়ে নিজেদের নফর বানায়। হাকিম কোটাল হাতের লোক। তারা নোংরা পয়সা পকেটে পুরে মুচ্‌কি হেসে কাজ করে দেয়। তাই ছোটবড় চাষা-ভুষা সব প্রজারাই ওই সব বণিকদের সাধ্যমত এড়িয়ে চলে। আর দরবার!—সে হলো গিয়ে আর এক প্রহসনের স্থান। যদি কেউ অন্যায় বিচারের প্রতিবাদ জানাতে যায়, তা'হলে তাকে বিদ্রোহীর অপবাদ দিয়ে হিম-নদীর ঠাণ্ডা চড়ায় নির্বাসন দিয়ে তবে ছাড়ে। আর যারা ক্ষুধার জ্বালায় গিয়ে হাত পাতে, খাবার চায়, তারা হাঁড়ি-চাঁচা খেয়ে সারা দিন খেটে তবে ছাড়া পায়। তাই বুঝি ভুলেও কেউ আর রাজবাড়ীর ত্রিসীমানা মাড়ায় না। সূর্যমুখীও তার ঘর ছেড়ে বিশেষ কোথাও যায় না। ছোট ঘরটির জানলায় দাঁড়িয়ে, দূরের নদীকে দেখে সারাদিন। যখন দুপুরের নির্জনে নদীর জলে বাতাস লেগে ঢেউ জেগে ওঠে, সূর্যমুখী ভাবে এইবার হয়তো তার মা আকাশ থেকে নেবে এসে নাইতে নাববে। কখনো বা ভাবে, মা জল থেকে উঠে এসে ভিজে চুল শুকতে বসবে। তার মনের নদীতে অহরহ যে দুঃখের ঝড় বয়ে চলে, তারাই যেন রূপান্তরিত হয়ে দেখা দেয় হিম-নদীর জলেতে।

এই রকম নিজের ভাবনা নিয়ে গবাক্ষে দাঁড়িয়ে সূর্যমুখী একদিন যখন জল-ভরা চোখে নদীর দিকে তাকিয়েছিল, রাণীর ঝি এসে চুপি-সাড়ে তার মায়ের ছবিখানি খুলে নিতে গেল। কিন্তু মোক্ষদার কাছে ধরা পড়ে গিয়ে জানাল নতুন রাণীর আদেশ। সূর্যমুখী আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারল না। ছুটে গেল রাণীর কাছে এর কৈফিয়ৎ চাইতে। রাণী কিছুই বলল না। কটা-চোখের দৃষ্টি দিয়ে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

রাজা নালিশ শুনেই ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটে এলেন। এসে কঠোর হাতে শাসন করলেন মেয়েকে এতটুকু হাত কাঁপল না, এতটুকু মন টলল না। জীবনে বুঝি এই প্রথম তিনি সোনার পুতলির গায়ে হাত তুলে বসলেন। কিন্তু রাণী পাশেই দাঁড়িয়েছিল। দেখল সব কিছুই, কিন্তু বলল না কিছুই। শুধু চোখ দুটো ধকধক করে জ্বলতে লাগল তার। আর সূর্যমুখী—রাজকুমারী। মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরল না, চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জলও গড়িয়ে পড়ল না তার। পলক হারিয়ে বাপের মুখের দিকে সে তাকিয়ে রইল শুধু।

সেই দিন রাতেই মা তার স্বপ্নের ভেতর দিয়ে এলেন। পিঠের কাটা-ছেঁড়া জায়গায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, তিনি তাকে নিতে এসেছেন। সূর্যমুখী ধড়মড়িয়ে উঠে বসে দেখে মোক্ষদা তার মাথার কাছে বসে কাঁদছে।

এতক্ষণে বুঝি ভালবাসা-স্নেহের স্পর্শ পেয়ে জমে থাকা কান্না চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল সূর্যমুখীর। আকুল হয়ে মোক্ষদার গলা জড়িয়ে ধরে সে কাঁদল অনেকক্ষণ। তারপর বুকটা কিছুটা হাল্কা হয়ে গেলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললে তাকে—এখানে আমি আর থাকব না মাসী। এই কিছু আগেই মা আমায় নিতে এসেছিল। আমি যাব। কিন্তু যাবার আগে একটা কথা বলে যাই। এক কাজ করিস তুই। আমি চলে গেলে আমার পোঁতা রজনীগন্ধার ঝাড়ে মার মৃত্যুদিন স্মরণ করে একটি সন্ধ্যা-প্রদীপ জালিয়ে দিস্। আর যদি পারিস্ তো পাশে তার আর একটা ছোট্ট প্রদীপও জ্বেলে দিস্।

রাজপুরীর বিষাক্ত আবহাওয়া থেকে পালিয়ে পুরনো আমলের সকলেই বেঁচেছে। শুধু মোক্ষদাই মা-হারা ছোট মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে পারেনি যেতে। যদি সেও চলে যায়, তা'হলে এই পাপ-পুরীতে কোন্ আশা নিয়ে পড়ে থাকবে সে। রাজাকেও তো সে-ই মানুষ করেছিল। কিন্তু আজ আর তার জন্য মন কাঁদে না। তবে কী সূর্যমুখীকে নিয়ে সে কোন দূর দেশে চলে যাবে?...

তখন রাত অনেক। শরতের আকাশখানি তুলো-পেঁজা মেঘে ভরে গেছে। হিম-নদীর জল আলোছায়ার মাঝখানে কেঁপে দুলে উঠছে অনবরত। মাঝে-মধ্যে সেখানে আকাশের অদৃশ্য সুতোর আলো করা সোনার ঘুড়িটাও শোঁ করে নেবে গিয়ে জোরে জোরে কাঁপছে। আর সূর্যমুখীর বুকের সোনাও কেঁপে কেঁপে উঠছে।

আস্তে আস্তে সূর্যমুখী বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে মায়ের ছবির তলায় গিয়ে দাঁড়াল। ছবি-মা তার দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে রইলেন। ততক্ষণে আকাশ খানিকটা ফিকে হয়ে এসেছে। মাও হঠাৎ জীবন্ত হয়ে ফ্রেম থেকে বেরিয়ে এসে মাটিতে দাঁড়ালেন।

সূর্যমুখী খুশীতে দু'হাত দিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরতে গেলে তিনি সরে গেলেন। সূর্যমুখী

আবার ধরতে গেলে তিনি আবার সরে গেলেন। এইভাবে যেতে যেতে শেষকালে তিনি হিম-নদীর পাড়ে চলে এলেন। সূর্যমুখীও মরিয়া হয়ে ছুটে এলো তাঁকে ধরতে। সে আর তার হারান মাকে ফাঁকি দিয়ে চলে যেতে দেবে না। তখন তিনি জলেতে নাবলেন। সূর্যমুখী জল দেখে ভয় পেয়ে কেঁদে বললে—মা আমাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাও।

মা সেখান থেকেই হাত বাড়িয়ে দিল তার দিকে। সূর্যমুখী আর ভয় না পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার কোলের কাছটিতে। মা তখন আদর করে মেয়েকে তুলে নিলেন কোলে।...

ভোরের হাওয়ায় জেগে উঠে মোক্ষদা। দেখল সূর্যমুখী ঘরে নেই। গেল কোথায় ?

এদিক-ওদিক খোঁজ করে করে অবশেষে সে হিম-নদীর পাড়ে গিয়ে দাঁড়াল। বিদ্রোহী ব'লে যাদের ঠাণ্ডা চরে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল, তারাই তাদের রাজকুমারীর ছোট্ট দেহখানি যত্ন করে তুলে এনে ঘাসেতে শুইয়ে রেখেছিল। সব্জে সোনালী ধানের শীষ আর ধূসর সাদা কাশের ফুলে চারিদিক ছেয়ে গিয়েছিল। বাতাসের ঢেউয়ের তালে তালে মাথা দুলিয়ে তারা সকলেই রাজকুমারীর জন্য শোক করতে লাগল। সূর্যমুখী তখন চোখ মেলে চেয়েছিল সূর্যের দিকে। তার ঠোঁটের কোণে লেগেছিল একটুখানি তৃপ্তির হাসি।

এক সময় স্বর্গের থেকে দেবদূতের এসে তাকে নিয়ে চলে গেল সেই আলোকরা বাগানে। যেখানে তার মা রজনীগন্ধা ফুল হয়ে ফুটে আছে। তাকে তারা মার পাশেই সূর্যমুখী ফুল করে রাখল। তারপর সেই বাগানে ভোরের আলোয় মা যখন ঘুমিয়ে পড়ে, সে ধীরে ধীরে জেগে উঠে সূর্যের দিকে মুখ করে তাঁর স্তব করে। তিনি আকাশ রাঙিয়ে চলে গেলে সেও শেষবারের মতো তাঁকে প্রণতি জানিয়ে ঢলে পড়ে মায়ের কোলে। মা তখন জেগে উঠে মেয়েকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে সুরভি ছড়াতে থাকেন।

এদিকে ধর্মগড়ের পাপের মাত্রা যখন পরিপূর্ণ হলো, হিম নদীর বুকের জল তখন ফুলে-ফেঁপে উঠে ডুবিয়ে দিল সারা দেশটাকে।

অশ্বতর

সন্ধানী

আমরা অনেক সময় কোনো মানুষ একগুঁয়ে ও অবাধ্য দেখলে তাকে খচ্চর বলি। এর একটা কারণ আছে—পৃথিবীর নানা স্থানে একরকম প্রাণী আছে, যারা খচ্চর বা অশ্বতর নামে পরিচিত। এই জন্তুরা অত্যন্ত একগুঁয়ে ও অবাধ্য। এ ছাড়া এরা বর্ণসংকর, অর্থাৎ এরা পুরুষ-গাধা ও স্ত্রী-অশ্ব হ'তে উদ্ভূত। এছাড়া পুরুষ-ঘোড়া ও স্ত্রী-গাধা হতেও একরকম প্রাণী হয়, তাকেও খচ্চর (Hinny) বলে। তবে সাধারণতঃ খচ্চর বলতে পূর্বোক্ত শ্রেণীকেই বোঝায়। কিন্তু প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়ালেই খচ্চর বা অশ্বতর থেকে কোনো প্রাণী জন্মায় না। কারণ, এদের উৎপাদনশক্তি থাকে না।

এই জাতীয় অশ্বতরের বা খচ্চরের প্রধান গুণ হচ্ছে, ঘোড়ার চেয়ে এরা পরিশ্রমী ও অধিক ভারবাহী। পৃথিবীর অনেক অংশে, বিশেষতঃ পার্বত্যঅঞ্চলে যেখানে রাস্তা খারাপ ও বিপদসঙ্কুল, সেখানে খচ্চরই একমাত্র যানবাহনের উপায়।

অনেকের বিশ্বাস এরা অত্যন্ত রাগী, একগুঁয়ে ও বদমেজাজী এবং একস্থান হতে অন্য স্থানে সামান্য কারণে নড়তে চায় না। প্রকৃতপক্ষে তা নয়, এদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করলে এরা নম্র ও সহযোগী-ভাবাপন্ন। যখন তাদের ঘাড়ে বেশী ভারী বোঝা চাপানো হয়, তখনই তারা অবাধ্য হয়। পুরাকালে অশ্বতরের সাহায্যে দূর পথে স্ত্রীলোকদের যাতায়াতের সুবিধা হ'ত।

বিজ্ঞান-বার্তা

শ্রীঅসীমরঞ্জন পুরকায়েত

বিশ্বের বয়স

গত ৩০শে মার্চ, আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মহাশূন্যে একটি নূতন নক্ষত্রের অস্তিত্ব বের করেছেন। এই নক্ষত্রটি এত দ্রুতগামী ও পৃথিবী থেকে এত দূরে অবস্থিত যে, ইহা বিশ্বের আকৃতি ও বয়স সম্বন্ধে বর্তমান ধারণাকে সম্পূর্ণ ওলোট-পালোট করে দিয়েছে। বিজ্ঞানী স্মিদ্ ও ম্যাথেস বলেন যে, ইতিপূর্বে এত দ্রুতগামী ও এত দূরস্থিত কোন নক্ষত্র দেখা যায়নি। নব-আবিষ্কৃত এই নক্ষত্রটির নাম দেওয়া হয়েছে 3c-147 (একটা নম্বর)। এর আগে সবচেয়ে দূরবর্তী যে নক্ষত্রটির সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল, তার নাম ছিল 3C-295। 3C-147 নক্ষত্রটি, 3C-295 নক্ষত্রটির দূরত্বের প্রায় শতকরা দশ থেকে বারো ভাগ দূরে অবস্থিত বলে অনুমিত হয়েছে। পরীক্ষায় জানা গিয়েছে, 3C-295 নক্ষত্রটি পৃথিবী থেকে প্রায় ৬ কোটি মাইল দূরে অবস্থিত এবং ইহা আলোর বেগের অর্ধেক বেগে বা সেকেণ্ডে ৯৩ হাজার মাইল বেগে ছুটছে। তোমরা সকলেই বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আলবার্ট আইনষ্টাইনের নাম শুনেছ। তিনি তাঁর 'আপেক্ষিক তত্ত্ববাদ' দিয়ে দেখিয়েছেন যে, আলোর গতির চেয়ে বেশি গতিতে কোন কিছুই ছুটতে পারে না। আইন্‌ষ্টাইনের মতবাদকে স্বীকার করে নিয়ে অঙ্ক ক'ষে জানা গিয়েছে যে, পৃথিবী থেকে ১২০ কোটি আলোক-বছরের বেশি দূরত্বে কোন কিছু থাকতে পারে না (এক আলোক-বছর-দূরত্ব = এক বছরে আলোক যে দূরত্ব যায় = ১৮৬০০০ × ৩৬৫ × ২৪ × ৬০ × ৬০ মাইল)। আর তাই যদি হয়, তবে বিশ্বের বয়স হওয়া উচিত ১২০ কোটি বছর।

বাদাম খাওয়া খারাপ

সম্প্রতি তিনজন ভারতীয় ডাক্তার ঘোষণা করেন যে, চিনাবাদাম খাওয়া বিপজ্জনক, ইহা লিভার নষ্ট করে দেয়। এই তিনজন ডাক্তারের নাম হ'ল, ডাঃ গোপাল, ডাঃ তুল্‌পে ও ডাঃ মাধোবন্। তাদের এই মতবাদ ব্রিটিশ জারন্যাল 'ল্যাংকাষ্ট্'-এ প্রকাশিত হয়। তাঁরা বলেন যে, বাদামের মধ্যে 'এফ্ল্যাটক্সিন্' নামে একপ্রকার জিনিস আছে, যাহা বিষ এবং এই বিষই লিভার ক্ষতিগ্রস্থ করে। প্রথমে পাখী জাতীয় ও পরে জন্তু-জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে এই পরীক্ষা করা হয়। জন্তু-জাতীয়দের মধ্যে বানরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ গঠনের দিক দিয়ে বানরের সঙ্গে মানুষের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। এই এফ্ল্যাটক্সিনের প্রভাবে প্রথমে পেটের গণ্ডগোল সুরু হয় এবং পরে লিভার এতই খারাপ হয়ে যায় যে মৃত্যু ঘটে।

ক্যানসার রোগ সংক্রামক

গত জানুয়ারীর ১৪ তারিখে 'আমেরিকান ক্যানসার সোসাইটি'র এক বিবরণে প্রকাশ যে, রুট্‌গার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা ক্যানসার রোগের সম্প্রসারণ সম্বন্ধে এক নতুন মতবাদ দিয়েছেন। তাঁদের মতে ক্যানসার রোগ সংক্রামক। পূর্বে এ ধারণা ছিল না। পূর্ব-ধারণা অনুসারে শরীরের মধ্যস্থিত 'ম্যালেগন্যাণ্ট্' নামক কোষের দ্রুত বিভাজনের ফলে ক্যানসার হয়। যে পদ্ধতিতে এই বিভাজন ঘটে তার নাম 'মেটাস্ট্যাসিস্'। বৈজ্ঞানিক 'গ্রুপে' ও 'বার্গস্' এই মতবাদ দেন।

পৃথিবীর কেন্দ্রস্থ তাপের ব্যবহারিক প্রয়োগ

সোভিয়েট রাশিয়ার বিখ্যাত বিজ্ঞান-পত্রিকা 'তাস'-এর এক খবরে জানা যায় যে, রাশিয়া পৃথিবীর কেন্দ্রের জলন্ত কুণ্ড থেকে তাপ ও গরম জল নিয়ে শহরে সরবরাহ করার জন্য গবেষণা করছেন। তাঁরা সাইবেরিয়ান শহর ও ওমস্কাতে ভূনিম্ন থেকে প্রায় ৪২০০০ ফুট নীচে একটা গরম জলের উৎস পেয়েছেন। এখানে 70°C থেকে 80°C তাপমাত্রার গরম জল পাওয়া সম্ভব। হিসাব করে দেখা গেছে, এর ফলে বছরে প্রায় 100 থেকে 150 কোটি টন কয়লা বেঁচে যাবে এবং প্রতিদিন কমপক্ষে 530 কোটি ঘন-ফুট জল ও ষ্টিম 60°C থেকে 140°C তাপমাত্রায় সরবরাহ করা যাবে।

মৃত ব্যক্তির পুনর্জীবন

গত মার্চ মাসে রাশিয়ার বিখ্যাত 'প্রভদা' পত্রিকা এক বিস্ময়কর সংবাদ পরিবেশন করে। জনৈক ডাক্তার একজন মৃত ব্যক্তিকে পুনর্জীবিত করেন। লোকটি একজন ট্রাক্টার ড্রাইভার। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কাজ করতে করতে সে হঠাৎ মূর্ছা যায় এবং তার চোখ স্থির হয়ে যায় ও হৃদ-স্পন্দন বন্ধ হয়। ডাক্তারী পরীক্ষায় তার প্রাণের কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না এবং লোকটি মৃত বলে পরিগণিত হয়। এর তিন ঘণ্টা পরে জনৈক ডাক্তার লোকটিকে নিয়ে অধ্যাপক নেগোভ্‌স্কি আবিষ্কৃত পন্থায় ১২ ঘণ্টা ধরে চিকিৎসা করেন এবং শেষ পর্যন্ত তাকে বাঁচিয়ে তুলতে সক্ষম হন। লোকটি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক।

কুকুরের মাথা বদল

মস্কো-বেতারের এক খবরে জানা যায় যে, ডেমিকভ্ নামে একজন সোভিয়েট সার্জেন দুটো কুকুরের মাথা এক সঙ্গে কেটে, পরস্পরের মাথা বদল করে দিয়েছেন। নতুন মাথা নিয়ে কুকুর দুটি সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করছে।

মারাত্মক গ্যাস

সম্প্রতি আমেরিকান গবেষকরা মিলিটারীতে কাজে লাগবার জন্য একপ্রকার মারাত্মক গ্যাস আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা এই গ্যাসের নাম দিয়েছেন 'নার্ভ্ গ্যাস্'। জানা যায় যে, এই গ্যাস প্রয়োগে এক থেকে চার মিনিটের মধ্যে যে কোন প্রাণীর মৃত্যু ঘটান যেতে পারে।

রোগ নির্ণয়ে তেজস্ক্রিয় গ্যাস

বর্তমানে গ্যাসের সাহায্যে মস্তিষ্ক অপারেশন না করেও তার ভিতরের কার্যপ্রণালী ও রোগনির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে। এই নূতন প্রথা প্রবর্তন করেছেন ডেনমার্ক ও সুইডেনের ডাক্তাররা। তেজস্ক্রিয় গ্যাসের একটি ছোট বিন্দু মাথার রক্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় এবং উহার তেজস্ক্রিয়-তার পরিবর্তন মাপা হয় তেজ-মাপক যন্ত্রের সাহায্যে। তেজস্ক্রিয়তার পরিবর্তন থেকে জানা যায় মস্তিষ্কে কোন রোগ আছে কি নেই। টিউমার থাকলে তেজস্ক্রিয়তা কমে যায়। এই তেজস্ক্রিয় পদার্থটির রাসায়নিক নাম F-18.।

শীতের সকাল

শ্রীপলাশ মিত্র

শীতের দিনে সকাল বেলা
চারিদিকেই খুশির মেলা
বুড়ো দাদু বেজায় কাঁপে
খোকার মুখে ধোঁয়া ;
কোঁচড় ভরা মুড়ি নিয়ে
কুলতলাতে সবাই গিয়ে
কেউবা ছোটে রসের খোঁজে
কেউবা খাবে মোয়া।

শীতের সকাল মজার যে তাই
হচ্ছে পিঠে আসছে মিঠাই
মিষ্টি রোদে বসবে ছাদে
নামতার বই নিয়ে ;
কেউবা খেলে ডাণ্ডাগুলি
পড়ার কথা যায় যে ভুলি
পয়ড়া-নলেন গুড় এসেছে
চল্ মা দেখি গিয়ে।

ঘুমকাতুরে চৌকিদার

শ্রীনির্ম্মলেন্দু গৌতম

হুতোম থুমো গোম্‌ড়ামুখো
রাতদুপুরের প্যাঁচা
ঘুমকাতুরে চৌকিদারের
কানের কাছে চেঁচা !
উঠ্‌তে ঘুমোয়, বসতে ঘুমোয়.
চৌকিদারের চোখে,
ঘুম ছাড়া আর নেইকো কিছু
জানে গাঁয়ের লোকে !
ডাকলে ঘুমোয়, হাঁকলে ঘুমোয়,
সুড়সুড়িও মিছে ঃ
চুলকোবে না নাকের ডগায়
দাও না ঘষে বিছে !

ঘুম-পোকাতে মগজ ঠাসা,
দিনরাত্তির তারা—
বেড়ায় ঘুরে মগজটাতে
উঁচিয়ে রেখে দাঁড়া !
ঘুমের জ্বালায় চৌকিদারের
বৌটি বেজায় ক্ষেপে
বাপের বাড়ি পালিয়ে গেছে
এক্‌কা গাড়ি চেপে !
হুতোম থুমো গোমড়ামুখো
রাত দুপুরের প্যাঁচা—
চৌকিদারের কানের কাছে !
আচ্ছা করেই চেঁচা !

ছড়া

শ্রীঅমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ফ্যান্তা-ফ্যাচাং গাংগুলী
গাংগুলী না ডাংগুলি,
ডাংগুলিতে চোখ কানা
পেচকগুলো রাত-কানা ;

পেচকগুলো রাত-কানা
বাদুড়গুলো দিন-কানা,
বন-বেড়ালের চোখে আগুন .
করবে চুরি কার্‌ ছানা !

অলিম্পিক সাঁতার

জাপানের টোকিও সহরে খুব ধূমধামের সঙ্গে অষ্টাদশ অলিম্পিক গেমস শেষ হ'ল। পৃথিবীতে এর থেকে বড আকর্ষণীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান আর দ্বিতীয় নেই। সারা পৃথিবী জুড়ে নানা দেশের বাছাই করা প্রতিযোগীরা অলিম্পিক গেমসে অংশ গ্রহণ করেন বলেই অলিম্পিক গেমস সম্পর্কে প্রবল উত্তেজনা, উদ্বেগ ও আনন্দ. এবং তা সারা পৃথিবী জুড়ে। টোকিও অলিম্পিক গেমসের সাঁতারে স্কুল-কলেজের কয়েকজন ছেলেমেয়ে জয়ী হয়ে পদক পাওয়াতে সারা পৃথিবীতে

গ্যালিনা প্রোজুমেনশ্চিকোভা (রাশিয়া) ২০০ মিটার সাঁতারে নতুন অলিম্পিক রেকর্ড সময়ে স্বর্ণপদক পান। বয়স ১৫।

একটা বিরাট সাড়া পড়ে গেছে। ছাত্র-ছাত্রীমহল তো খুব খুশী এবং উৎসাহিত। অলিম্পিকের কোন খেলায় স্বর্ণ, রৌপ্য এবং ব্রোঞ্জ পদক জয় করার অর্থ, সেই খেলায় পৃথিবীর প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান পাওয়া।

টোকিও অলিম্পিক গেমসের সাঁতারে যে সব অল্প বয়সের সাঁতারু এবং স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী পদক জয় করেছেন, তাঁদের সাফল্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই সঙ্গে দেওয়া হ'ল।

একটা কথা, তোমাদেরও চেষ্টা করতে হবে এইভাবে খেলাধুলায় সাফল্যলাভ ক'রে ভারতবর্ষের গৌরব বৃদ্ধি করা। অসম্ভব কাজ নয়—নিষ্ঠার সঙ্গে অনুশীলন দরকার।

শারণ স্টাউডার (আমেরিকা): বয়স ১৫। মহিলা বিভাগের সাঁতারে সর্বাধিক পদক (স্বর্ণ ২ ও রৌপ্য ১) জয় করার রেকর্ড করেন। ১০০ মিটার বাটারফ্লাই সাঁতারে নতুন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড সময়ে (১ মিনিট ০৪'৭ সেকেণ্ড) স্বর্ণ পদক পান। ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল সাঁতারে এক মিনিটের কম সময়ের মধ্যে দূরত্ব অতিক্রম ক'রে রৌপ্য পদক পান। কেবলমাত্র তিনি এবং স্বর্ণপদক বিজয়িনী ডন ফ্রেজার এক মিনিটের কম সময়ে ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল সাঁতারের দূরত্ব অতিক্রম করেছেন।

ডোনা ডে ভারোনা (আমেরিকা) ৪০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলি সাঁতারে স্বর্ণপদক জয় করেন। বয়স ১৭।

গ্যালিনা প্রোজুমেনশ্চিকোভা (রাশিয়া): বয়স ১৫, স্কুলের ছাত্রী। ২০০ মিটার বুক সাঁতারে নতুন অলিম্পিক রেকর্ড সময়ে (২ মিনিট ৪৬'৪ সেকেণ্ড) স্বর্ণপদক জয় করেন।

ডোনা ডে ভারোনা (আমেরিকা): বয়স ১৭, স্কুলের ছাত্রী। ৪০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলি সাঁতারে অলিম্পিক রেকর্ড সময়ে (৫ মিনিট ১৮'৭ সেকেণ্ড) স্বর্ণপদক জয় করেন।

বব্ উইণ্ডল (অষ্ট্রেলিয়া): বয়স ১৭, স্কুলের ছাত্র। ১,৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইল সাঁতারে নতুন অলিম্পিক রেকর্ড সময়ে (১৭ মিনিট ০১'৭ সেকেণ্ড) স্বর্ণপদক জয় করেন।

আয়ান ও'ব্রীয়েন (অষ্ট্রেলিয়া): বয়স ১৭, স্কুলের ছাত্র। ২০০ মিটার বুক-সাঁতারে নতুন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড সময়ে (২ মিনিট ২৭'৮ সেকেণ্ড) স্বর্ণপদক জয় করেন।

গিনি ডুয়েনকেল্ (আমেরিকা) : বয়স ১৭, স্কুলের ছাত্রী। ৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে এই অনুষ্ঠানের বিশ্বরেকর্ড স্রষ্টা সাঁতারুকে পরাজিত ক'রে নতুন অলিম্পিক রেকর্ড সময়ে (৪ মিনিট ৪৩·৩ সেকেণ্ড) স্বর্ণপদক জয় করেন।

ডন স্কোল্যাণ্ডার (আমেরিকা) : বয়স ১৮, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। টোকিও অলিম্পিকে

ডন স্কোল্যাণ্ডার (আমেরিকা) চারটি স্বর্ণপদক জয় ক'রে সর্বাধিক স্বর্ণপদক জয়ের রেকর্ড সৃষ্টি করেন। বয়স ১৮

মোট চারটি স্বর্ণপদক জয় ক'রে পুরুষ ও মহিলা সাঁতারুদের মধ্যে সর্বাধিক স্বর্ণপদক জয়ের রেকর্ড করেন।

কেভিন বেরী (অষ্ট্রেলিয়া) : বয়স ১৯, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ২০০ মিটার বাটারফ্লাই সাঁতারে নতুন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড সময়ে (২ মিনিট ০৬·৬) স্বর্ণপদক জয় করেন।

লেসজি বুস (আমেরিকা) : বয়স ১৭। মহিলাদের হাই ডাইভিংয়ে স্বর্ণপদক জয় করেন।

মেঠুড়ে
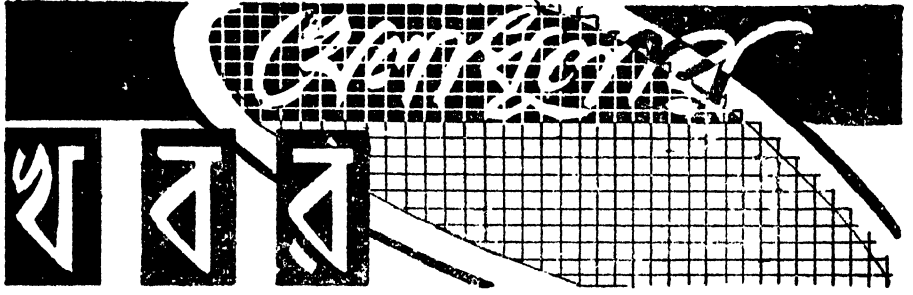
মোহনবাগান ক্লাবের প্লাটিনাম জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে গত ৫ নভেম্বর ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে জয়ন্তী উৎসবের কার্যসূচী আরম্ভ হয়েছে। মোহনবাগান ক্লাবের পঁচাত্তর বছর পূর্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পঁচাত্তর দিন ধরে চলবে নানা ধরণের অনুষ্ঠান। অপূর্ব আলোর মালায় সাজানো মাঠ ও ক্লাব-তাঁবুর মনোরম দৃশ্যই বজায় থাকবে পঁচাত্তর দিন আর তার সঙ্গে অনির্বাণভাবে জ্বলবে হোমাগ্নি থেকে জ্বালানো আলোর শিখা।

মোহনবাগান ক্লাব যাঁরা খেলাধুলো ভালবাসেন তাঁদের কাছে স্মরণীয় নাম। সেই ক্লাবের প্লাটিনাম জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে যে ব্যাপক খেলাধুলোর আয়োজন হবে তা খুবই স্বাভাবিক। অ্যাথলেটিক অনুষ্ঠানের সঙ্গেই ক্লাবের প্লাটিনাম জয়ন্তী উৎসব আরম্ভ হয়। সবে শেষ হওয়া টোকিও অলিম্পিকের পর ভারত-জার্মান দ্বৈত অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতার গুরুত্ব ছিল অনেকখানি। কারণ দু'দেশেরই অলিম্পিকে অংশগ্রহণকারী কয়েকজন প্রতিযোগী ক্লাবের দু' দিনের অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন। দু'দিন ব্যাপী দ্বৈত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদের কাছে দর্শকরা এমন কিছু অ্যাথলেটিক নৈপুণ্যের পরিচয় পেয়েছেন যা আগে কেউ কোনোদিন ভারতের মাটিতে দেখেন নি। উদাহরণ হিসেবে, হপস্টেপ ও হপজাম্প, ১০০ মিটার দৌড় এবং ১১০ মিটার হার্ডল রেসের কথা ধরা যায়। জার্মানীর ইনডোর ও আউটডোর ট্রিপল জাম্প চ্যাম্পিয়ন ম্যানফ্রেড সয়ার লাফিয়েছেন ১৫'৮৯ মিটার। আর হানজ হেলমুট ট্রেনসে লাফিয়েছেন ১৫'২৪ মিটার। ম্যানফ্রেড সয়ারের ১৫'৮৯ মিটার অর্থাৎ ৫২ ফুট ১¼ ইঞ্চি ট্রিপল জাম্প ভারতের মাটিতে নতুন কৃতিত্ব। এর আগে ভারতের বা বিদেশের কোনো অ্যাথলীট এখানে এত বেশী লাফাতে পারেন নি। ১০০ মিটার দৌড়ে জার্মানীর ফ্রেডারিক রডারফিল্ডের ১০'৩ সেকেণ্ড সময়ও ভারতের মাটিতে ১০০ মিটার দৌড়ের সব চেয়ে ভালো সময়। ১১০ মিটার হার্ডল রেস সম্পর্কে এই একই কথা বলা যায়। ভারতের অলিম্পিক অ্যাথলীট অধিনায়ক গুরুবচন সিং, যিনি টোকিও অলিম্পিকে পঞ্চম স্থান অধিকার করেছিলেন,

তিনি দৌড় ও লাফের ঐ প্রতিবন্ধক প্রতিযোগিতা শেষ করেন ১৪'১ সেকেণ্ডে। অবশ্য টোকিওতে তাঁর সময় লেগেছিল পুরো ১৪ সেকেণ্ড। যাই হোক, গুরুবচনের ১১০ মিটার হার্ডল রেসে ৪'১ সেকেণ্ড সময় ভারতের মাটিতে নতুন কৃতিত্ব।

ভারত-জার্মান দ্বৈত অ্যাথলেটিকসে ভারত যে তিনটে বিষয়ে জিতেছে তা হ'ল—পোল ভল্ট, ১১০ মিটার হার্ডলস, আর ৪×১০০ মিটার রিলে রেস। বাকি ন-টা বিষয়ে জার্মানীর অ্যাথলীটরা প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১০০ মিটার দৌড়ে সব চেয়ে বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। এই প্রতিযোগিতায় ভারতের তিনজন অলিম্পিক প্রতিযোগী কেনেথ পাওয়েল, এণ্টনী ফ্রান্সিস ও রাজশেখরনের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন জার্মানীর রডারফিল্ড ও স্মিট। রডারফিল্ড এই দৌড়ে প্রথম হন এবং ঐ দূরত্ব শেষ করতে তাঁর সময় লেগেছিল ১০'৩ সেকেণ্ড। ১০০ মিটার দৌড়ে ভারতের জাতীয় রেকর্ড হ'ল ১০'৫ সেকেণ্ড এবং ঐ রেকর্ডের অধিকারী বিহারের এণ্টনী ফ্রান্সিস।

* * * *

মোহনবাগান মাঠে প্লাটিনাম জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে সবেমাত্র অলিম্পিক বিজয়ী ভারতীয় হকি দলের সঙ্গে মোহনবাগান ক্লাবের প্রদর্শনী হকি খেলায় অলিম্পিকে দল খুব সহজেই ৩-০ গোলে জয়ী হয়। জয়ন্তী উৎসব প্রদর্শনী খেলায় অংশ নেবার আগে অলিম্পিকে দল পূর্ব-জার্মান হকি দলের সঙ্গে দুটো টেস্ট খেলে দুটোতেই জয়ী হয়। দিল্লীর প্রথম টেস্টে ভারত জেতে ২-০ গোলে, বোম্বের দ্বিতীয় টেস্টে ৪-১ গোলে।

এ বছরের গোল্ড কাপ বিজয়ী এবং আগা খাঁ কাপ ও বেটন কাপের যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান ভারতীয় হকি খেলার রাজ্যে শক্তিশালী টীম। প্রতি অর্ধে পঁয়ত্রিশ মিনিট করে সত্তর মিনিটের খেলায় খুব বেশী প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তের অবকাশ ছিল না সত্যি, কিন্তু অলিম্পিক-খ্যাত খেলোয়াড়দের পরিচ্ছন্ন ও সুষ্ঠু ক্রীড়াবিন্যাস দর্শকদের অনেকখানি আনন্দের কারণ ছিল। টোকিও অলিম্পিকের সেমি-ফাইন্যাল ও ফাইন্যালে ভারতের পক্ষে যে-সব খেলোয়াড়রা খেলেছিলেন, তাঁদের ভেতর অধিনায়ক চরঞ্জিত সিং, রাইট আউট যোগীন্দার সিং এবং সেণ্টার ফরোয়ার্ড হরবিন্দার সিং ছাড়া বাকী আটজন খেলোয়াড় জয়ন্তী উৎসব প্রদর্শনী খেলায় অংশ নেন। অলিম্পিক খেলোয়াড়দের ভেতর গোলকিপার শঙ্কর লক্ষ্মণ এবং রাইট ব্যাক পৃথ্বিপাল সিং এই প্রদর্শনী খেলায় বেশ আত্মবিশ্বাস এবং দৃঢ়তা নিয়েই খেলেছিলেন। পৃথ্বিপাল এই খেলায় সর্ট কর্ণার থেকে দুটো গোল করেন। অলিম্পিক দলের পুরোভাগের খেলোয়াড়দের ভেতর পিটার ও হরিপালের খেলায় স্টিকের নৈপুণ্য ও পরিকল্পনাপ্রসূত আক্রমণের প্রয়াস মাঠে উপস্থিত দর্শকদের খুবই আনন্দ দান করে। মোহনবাগান দলের খেলোয়াড়রাও বিপক্ষ গোলে হানা দিয়ে বিপদের সৃষ্টি করেছিলেন। অন্তত তিনবার অলিম্পিক গোলরক্ষক শঙ্কর লক্ষ্মণকে

মোহনবাগানের তিনটে গোল উপযোগী হিট আটকাতে হয়, কিন্তু এই প্রদর্শনী খেলায় মোহন-বাগানের খেলোয়াড়রা নিজেদের ভেতর তেমন যোগাযোগ ও সমন্বয় রেখে আক্রমণ রচনা করতে পারেননি।

ফুটবলকে কেন্দ্র করেই মোহনবাগানের প্রতিষ্ঠা এবং সমৃদ্ধি। তাই জয়ন্তী উপলক্ষে নানা রকমের খেলাধূলার আয়োজনের ভেতর শক্তিশালী হাঙ্গেরী দলের প্রদর্শনী ফুটবল খেলার আয়োজন সময়োপযোগী এবং অনুষ্ঠানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা। তিনটে প্রদর্শনী ফুটবল খেলা দেখতে মাঠে যে হাজারো দর্শক সমাগম হয়েছে, যে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা গেছে, তাতে মনে হয়েছে জয়ন্তী উৎসব সত্যি সার্থক হয়েছে।

প্লাটিনাম জয়ন্তী উৎসবে আগত হাঙ্গেরীর তাতাবানিয়া ফুটবল ক্লাব তিনটে প্রদর্শনী খেলায় অংশ নেয়। তিনটে খেলায় তারা শুধু জয়ী হয়নি, পরিচ্ছন্ন ক্রীড়ারীতি এবং বিজ্ঞানসম্মত ফুটবল খেলার উন্নত কলাকৌশলে দর্শকদের মন জয় করে। মোহনবাগানের সঙ্গে প্রথম প্রদর্শনী খেলায় তাতাবানিয়া ক্লাব ৩-০ গোলে বিজয়ী হয়েছে, দ্বিতীয় প্রদর্শনী খেলায় ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবকে ৫-১ গোলে হারিয়ে দিয়েছে ও শেষ প্রদর্শনী খেলায় ভারতীয় একাদশকে ৩-১ গোলে পরাজিত করেছে।

তাতাবানিয়া ও মোহনবাগানের প্রথম প্রদর্শনী ফুটবলেরই আমেজ ছিল বেশী। মোহনবাগান দল তাদের সব শক্তি দিয়ে তাতাবানিয়ার সঙ্গে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে এবং দৃঢ়তাপূর্ণ ক্রীড়াধারার পরিচয়ে বিশ্রাম সময় পর্যন্ত প্রতিপক্ষের গোল করার চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই, কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের তিন মিনিট থেকে ন' মিনিট—মাত্র ছ' মিনিটের ভেতর তাতাবানিয়া পরপর তিনটে গোল করে প্রমাণ করে দেয়, গোল করাটা তাদের কাছে এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। সমস্ত খেলায় মোহনবাগান গোল করবার দু' একটা সুযোগ পায়নি এমন নয়, কিন্তু দু' দলের ভেতর ক্রীড়াধারার পার্থক্য ছিল বড্ড বেশী। তাতাবানিয়ার কাছে মোহনবাগানকে অনেক শক্তিহীন মনে হয়েছে।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বিরুদ্ধে তাতাবানিয়া দল ৫—১ গোলে জয়লাভ করে। ইস্টবেঙ্গল—ও—তাতাবানিয়া দলের খেলা যাঁরা দেখেছেন তাঁরা এ কথাই স্বীকার করবেন : ইস্টবেঙ্গল ভালো খেলেও বেশী গোলে হেরে গেছে। এই খেলাতে তাতাবানিয়ার পর্যাপ্ত প্রাধান্যের কথা অনস্বীকার্য। তাদের নিখুঁত বল পাসিং, পারস্পরিক স্থান বদলের প্রক্রিয়া, আক্রমণ করার কৌশল—সব কিছু প্রশংসা করার মতন। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল যে অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং বহুবার প্রতিপক্ষের গোলে হানা দিয়ে শেষ সময় পর্যন্ত খেলার আকর্ষণ পুরো মাত্রায় বজায় রাখে, এটাই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের খেলোয়াড়দের পক্ষে প্রশংসার কথা। মোহনবাগান ও

তাতাবানিয়া প্রথম প্রদর্শনী খেলায় যে আকর্ষণের অভাব ছিল, ইস্টবেঙ্গল ও তাতাবানিয়া দলের প্রদর্শনী খেলা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণের মধ্যে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। তাই দর্শকরা এই দ্বিতীয় খেলাটি দেখে আনন্দ পেয়েছিল অনেক বেশী।

তৃতীয় প্রদর্শনী খেলায় ভারতীয় একাদশের বিরুদ্ধে তাতাবানিয়া দলের ৩—১ গোলে জয়লাভকে ক্রীড়াধারার ঠিক সঙ্গতিসূচক ফলাফল বলা যায় না। দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় ভারতীয় দলের আধিপত্য অনস্বীকার্য। সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারলে ভারতীয় দল এ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমান সম্মান লাভ করতে পারত। ভারতের খেলোয়াড়রা চমৎকার যোগাযোগের পরিচয় দিয়ে অনেকবার বিপক্ষ গোলে হানা দিয়েছেন, কিন্তু শুটিং দুর্বলতার জন্যে গোল করতে পারেন নি। গোলে একবারই ভালো শট হয়েছিল এবং সে শর্টে গোলও হয়েছে। অবশ্য যিনি শট করেছিলেন তিনি গোল পাননি। গোল করেন প্রদীপ ব্যানার্জী। প্রথম দুটো খেলা হয়েছিল প্রতি অর্ধে পঁয়ত্রিশ মিনিট করে সত্তর মিনিট। কিন্তু তৃতীয় প্রদর্শনী খেলাটি চলেছিল পঁয়তাল্লিশ মিনিট করে নব্বই মিনিট। নব্বই মিনিটের খেলার শেষ দিকে ভারতের খেলোয়াড়রা প্রাধান্যের পরিচয়ে প্রতিপক্ষের ক্রীড়ামানকে যে নিষ্প্রভ করে দিয়েছেন, একথা বলার মতন।

———
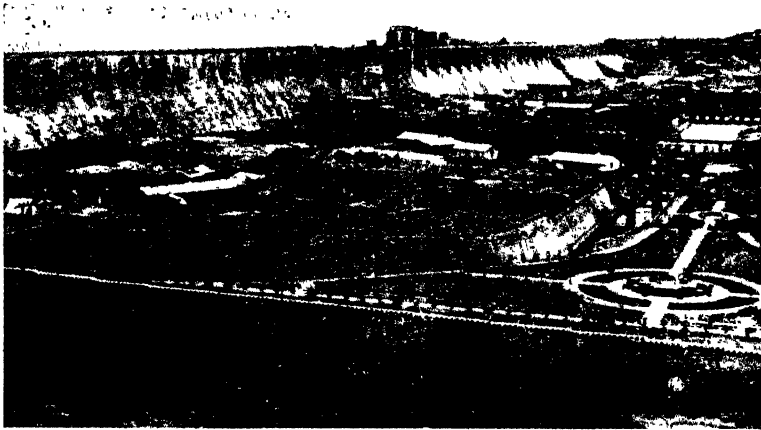
একটি ড্যামের শেষ পর্বের দৃশ্য

মধুচক্র

দিনের পর দিন তারই শোভাযাত্রা চলেছে পৃথিবীর ইতিহাসের পাতায়। কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামায় না, কারণ যা অপরিবর্তনীয় সত্য তার কথা কেউ ভাবে না। তবু দিনগুলোর ইতিহাস নিয়ে যাদের কারবার, তারা জানেন এক একটি বিশেষ দিন এক একটি যুগের প্রতীক হিসাবে তাদের চিহ্ন রেখে যায় মহাকালের পৃষ্ঠায়। ১৪ই নভেম্বর এমনি একটি অবিস্মরণীয় দিন—৭৫ বছর আগে এলাহাবাদে নেহরু পরিবারে যে শিশুর আবির্ভাব সেদিন ঘটেছিল, তারই পরিণত জীবনের প্রভাব আজ আর শুধু ভারতবর্ষের ভৌগলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়। সেই প্রভাব অনুভূত হয়েছে বিরাট বিশ্বজীবনের বিভিন্ন স্তরে। নেহরু আজ আর শুধু ভারতবাসীর নয়, তিনি একান্তভাবে বিশ্ব-পৃথিবীর। সারা জীবন ধরে যিনি ভারতের প্রতিটি ধূলিকণাকে ভালোবেসেছেন, আত্মীয় বলে জেনেছেন—ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত অর্ধ-শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সর্ব শ্রেণীর ভারতবাসীকে, ভারতবর্ষের কল্যাণে যাঁর প্রতিভা, কর্মপ্রচেষ্টা, স্বদেশপ্রেম তাঁকে ভারতীয়দের কাছে করে তুলেছে ভারত-আত্মার মূর্তিময় রূপ, সেই জহরলাল নেহরু যিনি আজীবন ছিলেন ভারতের। আজ মৃত্যুর পরপারে তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন বিশ্বলোকে—তাই পৃথিবীর সকল দেশের সকল মানুষ তাঁর শুভ আবির্ভাব দিবসটিকে স্মরণ করে পরস্পরের কাছাকাছি এসে সেই মহান প্রিয় নেতার আদর্শ অনুসরণের সুযোগ পাচ্ছে। নেহরুর আদর্শ রূপায়িত করার দায়িত্ব আজ শুধু ভারতবাসীর নয়, সে পবিত্র দায়িত্ব আজ বিশ্ববাসীর। বিচ্ছেদ আর বিদ্বেষ জর্জর এই মানুষের অন্তরে যে ক'জন মহামানব শান্তি, প্রেম আর মৈত্রীর বাণী পৌঁছে দিয়েছেন, তাদেরই অন্যতম ভারতের জহরলাল—আজ তাই পৃথিবীর নেহরু বলে পরিচিতি লাভ করেছেন। তাঁর শুভ জন্মদিনটি তাই শুধু ভারতের পক্ষে নয়, সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে এক পরম পবিত্র পুণ্যক্ষণ।

মহাজীবন থেকে—

মধ্যযুগে যে সব জৈন ধর্মাচার্য আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন আচার্য হেমচন্দ্র। তাঁর পাণ্ডিত্য শুধু জৈনশাস্ত্র বিষয়ক বিদ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। তৎকালীন যুদ্ধের উপযোগী সকল প্রকার শিক্ষাদীক্ষা অধিগত করে তিনি শিক্ষিত সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন। তাছাড়া তিনি শুধু শুষ্ক বিদ্যাচর্চার মধ্যেই জীবনের সার্থকতা পেতে চাননি। দেশ ও সমাজের সেবার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর শক্তি সামর্থ্য অকাতরে নিয়োগ করেছিলেন।

হেমচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্ব নিয়ে আমরা গর্ব বোধ করি। ইতিহাসের পৃষ্ঠা তাঁর কার্যকলাপের জয়গানে মুখরিত হয়ে উঠেছে—কিন্তু হেমচন্দ্রের মায়ের কথা, যাঁর জন্যে হেমচন্দ্রের অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছিল—তিনি ছিলেন তাঁর জননী পাহিনী দেবী। এঁরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই

পুজার্চনা করতেন। নিয়মিত তীর্থ পর্যটনে বার হতেন, সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেন আর দরিদ্রকে দান করতেন অকৃপণ হাতে। অবশেষে একদিন দেবতার কৃপায় লাভ করলেন পুত্রকে। এই ঘটনার কয়েকদিন আগে পাহিনী দেবী তাঁর গুরু দেবচন্দ্রকে প্রণামী হিসেবে চিন্তামণিরত্ন দান করছেন। এরপর পুত্রের শিক্ষাদীক্ষা সুরু হলো। পাঁচ বছরের ছেলেকে নিয়ে পাহিনী দেবী গয়া দর্শনে গেলেন। সেখানে গুরুদর্শন করতে গিয়ে দেখেন, দেবচন্দ্র উপস্থিত নেই—তাঁর আসনে বালক গিয়ে বসে পড়লো। পাহিনী বিব্রত হয়ে তাকে আসন ছেড়ে আসবার জন্য যত ডাকাডাকি করেন, বালক ততখানি জেদ নিয়ে আসন আঁকড়ে বসে থাকে। এমন সময় গুরুদেব উপস্থিত হয়ে আশীর্বাদ করলেন। পাহিনী দেবী যখন গৃহে ফিরে যাবার জন্যে উদ্যত হলেন তখন দেবচন্দ্র বল্লেন: মা, তোমার কি মনে হয় কিছুদিন আগে তুমি স্বপ্নে আমায় চিন্তামণি রত্ন দান করেছ? আজ সেই প্রতিশ্রুত রত্ন আমি চাইছি। পাহিনী কিছু বুঝতে পারলেন না—গুরুদেবকে না দেবার মত তাঁর কিছু নেই, কিন্তু চিন্তামণি রত্ন তিনি কোথায় পাবেন? দেবচন্দ্র বল্লেন: 'এই ছেলে তোমার চিন্তামণি রত্ন, একে আমি চাই, এই বালক কালে হবে মহাপুরুষ—তারই প্রস্তুতি চলবে এখন থেকে। তুমি একে এখানে রেখে যাও।'

পাহিনী দেবী শুষ্ক মুখে বল্লেন: 'এর বাবার অনুমতি না নিয়ে কি করে রেখে যাবো।' তারপর স্বামীর কথা মনে হতেই বুঝলেন, কিছুতেই স্বামী রাজী হবেন না এই প্রস্তাবে। অপেক্ষা করলে গুরুর মনস্কামনা সিদ্ধ হবে না আর বালক সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণীও অপূর্ণ থাকবে।

পাহিনী দৃঢ়পদে এগিয়ে গিয়ে ছেলেকে গুরুর কাছে নিঃসঙ্কোচে সঁপে দিয়ে ফিরে এলেন গৃহে। তাঁর মনে সেদিন এতটুকুও ক্ষোভ ছিল না। প্রসন্ন স্নিগ্ধতা ঝরে পড়ছিল তার চোখ-মুখে।

স্বামী অনেক ভর্ৎসনা করলেন, কিন্তু অনড় অটল হয়ে রইলেন পাহিনী। স্বামী ও পরিজনের কটুক্তি, মায়ের মনের ব্যকুলতা, সব তুচ্ছ করে তিনি সমাজের ও দেশের কল্যাণে উৎসর্গ করেছেন তাঁর প্রথম সন্তান। ব্যক্তিগত জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করার মত মনের ঐশ্বর্য খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি আপন অন্তরের মধ্যে।

জৈনাচার্য হেমচন্দ্রের মহাজীবন রচনার সূচনা করেছিল তাঁর জননী পাহিনীর আত্মত্যাগ। এসব কাহিনীর সঙ্গে তোমাদের পরিচয় ঘটলে এঁদের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসবে।

সকলে আমার শুভ-ইচ্ছা গ্রহণ করো।

তোমাদের—মধুদি'

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক
প্রভু প্রেস, ৩০ কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য: ০'৪৫ নয়া পয়সা

রসওয়ালা

* ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র *

৪৫শ বর্ষ]　　　　মাঘ—১৩৭১　　　　[১০ম সংখ্যা

চাঁদের বুড়ি গল্প বলে

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

চাঁদের বুড়ি গল্প বলে
লক্ষ তারাদের,
দু'কান পেতে শোনে পাহাড়
স্তব্ধ সে রাতের
মৌনতাকে—স্বপ্নে আঁকে
আনন্দে চঞ্চল
ঘুমের যাদু-কাঠি হাতে
পুষ্প-পরী দল।

শকুন শিশু কান্না ভোলে
গল্প শুনে সেই,
চামচিকে ছা' এক-পা তুলে
নাচে তা ধেই-ধেই !
গল্প শোনে : প্রহর গোণে
ভুঁড়-শিয়ালী হাতী,
হুড়ুম-ভুড়ুম-হালুম জাগে
জোনাক জ্বালে বাতি।
হাসির বাঁশী বাজে ঝিঁঝির
পাঁচ-মিশেলী সুরে ;
গল্প মুখর আজকে রাতে
কেউ থাকে না দূরে !
গল্প শুনে লক্ষ্মী পেঁচা
চুপটি করে থাকে,
তন্দ্রাহারা ঝর্ণাধারা—
খুশীর হাওয়া মাখে।
গল্প শোনার কল্পনাতে
ভয়ের জুজু-বুড়ো :
চরকা কাটে, ফোক্‌লা দাঁতে
চিবোয় খয়ের গুঁড়ো।
নিঝুম রাতে একলা আজও
নীল আকাশের তলে,
চাঁদের বুড়ি—মেঘের ঘুড়ি
ওড়ায়। গল্প বলে ॥

স্পেনদেশের বিখ্যাত শহর 'গ্রানাডা'র সবটা সমতল নয়। শহরের সব চেয়ে উঁচু অংশটা আলবেসিয়া নামক পাহাড়ের গা বেয়ে ক্রমশঃ উঠে গেছে। তার সব চেয়ে উঁচু চুড়োর কাছে কিছুকাল পূর্বেও একটা বহুদিনের পুরানো রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ত। বাড়ীটা নাকি তৈরি হয়েছিল অষ্টম শতাব্দীতে, আরব সৈন্য যখন স্পেন জয় করে তার কিছুকাল পরেই। এখন শহরে লোক বেড়েছে, চারিদিকে নোতুন নোতুন বাড়ী উঠেছে, সেই ভাঙা প্রাসাদ-দুর্গটা মেরামত করে একটা কারখানার কাজ চলছে। এমন ঘেঞ্জির মধ্যে প'ড়ে গেছে বাড়ীটা যে এখন খুঁজে পাওয়াই মুস্কিল। আমার স্পেনদেশীয় সর্বজ্ঞ বন্ধু 'মাতিয়ো ক্লিমিনিস' সঙ্গে ছিলেন, তা সত্ত্বেও খুঁজে বার করতে বেগ পেয়েছিলুম আমি। তবে বাড়ীর নামটা বহু শতাব্দী আগে যা ছিল, আজও তাই আছে; 'হাওয়াই মোরগের প্রাসাদ' ব'লেই সেটা পরিচিত। আসলে বাড়ীর চুড়োর

'হাওয়াই মোরগ' কোনও দিনই ছিল না, সেখানে ব্রোঞ্জের তৈরি একটি বর্ম-চর্মধারী অশ্বারোহী সৈনিকের মূর্তি দাঁড় করানো ছিল বহুকাল; যেদিকে হাওয়া বইত, সেইদিকে ঘুরত সেটা। মূর্তির পায়ের তলায় আরবী অক্ষরে এই কবিতাটি লেখা ছিল:

"এইরূপে," কহিছেন আবেন হাবুজ মতিমান্,
"শত্রু দর্প চূর্ণ করে হেলাভরে আন্দালুসিয়ান।"

মুরদের ইতিবৃত্ত অনুসারে পূর্বোক্ত আবেন হাবুজ ছিলেন স্পেন বিজয়ী মুরজাতীয় সেনাপতি 'তারিক'এর অধীনস্থ অন্যতম সেনানায়ক। তারিক দেশে ফেরবার সময় তাঁকে গ্রানাডার শাসনভার দিয়ে যান। তখনও চারদিকে বহু খৃষ্টান শত্রু রাজার রাজ্য অবিজিত ছিল, দেশের অধিবাসীরা তো অধিকাংশই খৃষ্টান। এক্ষেত্রে একদল মুসলমানকে গায়ের জোরে দেশে কর্তৃত্ব করতে হচ্ছিল, সম্ভবতঃ তাই আবেন হাবুজ তাঁর স্বধর্মীদের সদা সতর্ক হ'য়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকার প্রয়োজন প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে তাঁর দুর্গচূড়ায় সেই মূর্তিটি স্থাপন করেছিলেন।

জন-প্রবাদ কিন্তু অন্য কথা বলে। মূর্তিটি নাকি মায়ামন্ত্রচালিত এবং অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ছিল এক সময়ে, পরবর্তীকালে মন্ত্রশক্তি ভ্রষ্ট হয়ে সেটা অবশ্য বায়ুরগতি নির্দেশক মোরগের মতোই কাজ করত। আমরা সেদেশে কিংবদন্তী যা চ'লে আসছে—তারই কথা বলব এখানে।

সেকালে, মানে বহুশত বৎসর আগে—গ্রানাডা রাজ্যে আবেন হাবুজ নামে এক রাজা ছিলেন। যৌবনকালে তিনি ছিলেন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, বৃদ্ধ বয়সে শরীর দুর্বল হওয়ায় তাঁর মনটা বিশ্রামের জন্য ব্যাকুল হ'ল। প্রতিবেশী রাজাদের কাছে থেকে কেড়েকুড়ে জমিজায়গা, ধনরত্ন, যা কিছু এতদিন সঞ্চয় করেছিলেন, এখন সেগুলি নিশ্চিন্ত মনে ভোগ করতে চাইলেন তিনি। সকলকে বললেন, "আর আমি যুদ্ধবিগ্রহে নেই, কারো সঙ্গে ঝগড়া নেই আমার। তোমরা শান্তিতে থাকো, আমাকেও একটু শান্তিতে থাকতে দাও।"

কিন্তু গ্রানাডা-রাজ এমন যে শান্তির ললিত-বাণীটি শোনালেন, সেটি তাঁর প্রতিবেশী খৃষ্টান রাজাদের মনঃপূত হ'ল না। তাঁদের অনেকেরই বয়স ছিল অল্প, যুদ্ধ জয়ের যে নেশা আবেন হাবুজের আগে ছিল, রক্ত গরম থাকায় সেটা তাঁদের তখনও যায়নি। বিশেষ করে তাঁদের বাপ ঠাকুরদা'দের ওপর যে সব অন্যায় অত্যাচার বুড়ো রাজা করেছিলেন, সেগুলোর প্রতিশোধ না নিয়ে ছেলেরা বা নাতিরা স্বস্তি পাচ্ছিল না। গ্রানাডা রাজ্যের দূরবর্তী অঞ্চলের প্রজাদের শায়েস্তা করতে যৌবনে আবেন হাবুজ নিষ্ঠুরভাবে দমননীতি চালিয়েছিলেন, এখন, রাজা শান্তিকামী হয়েছেন খবর পেয়ে, সেইসব অঞ্চলে প্রজা বিদ্রোহ আরম্ভ হ'ল। এমনি কি তাঁর রাজধানী আক্রমণের চেষ্টাও চলতে লাগল বারংবার। একে তো চারদিকে শত্রু, তার ওপরে রাজধানী

গ্রানাডা শহরটির চারদিক পাহাড় জঙ্গল দিয়ে এমনভাবে ঘেরা যে শত্রুসৈন্য সেইসব পাহাড় ডিঙিয়ে বা গিরিপথ পার হয়ে শহরের ভিতরে না আসা পর্যন্ত তারা কোন্‌দিক থেকে যে ঢুকবে তা বোঝা যেত না। বিপদে পড়লেন আবেন হাবুজ। তিনি চারদিকে পাহাড়ের মাথায় দুর্গ বানালেন, দিবারাত্র পাহারা বসালেন সেখানে। নগরে আসবার জন্য যে কটি গিরিপথ ছিল, সেগুলিতেও সৈন্যেরা পাহারা দিতে লাগল, তাদের ওপর হুকুম রইল, কোনোদিক্‌ থেকে শত্রুসৈন্য আসছে দেখলেই তারা সঙ্কেত ক'রে জানিয়ে দেবে: রাত্রে জ্বালাবে আগুন, আর দিনে ছাড়বে ধোঁয়া। এদিকে তাঁর শত্রুরাও ছিল তেমনি চতুর, যেখান দিয়ে মানুষ আসবার কোনো সম্ভাবনা কল্পনা করা যায় না, সেই রকম কোনো এক পথে হঠাৎ তারা পাহাড় ডিঙিয়ে শহরে এসে ঢুকত, আবেন হাবুজ সৈন্য সাজাতে না সাজাতে তাঁর নাকের ওপর দিয়ে লুঠপাট করে বাড়ী ভেঙে, তাঁর মুসলমান প্রজাদের বন্দী করে নিয়ে পাহাড়ের মধ্যে গা-ঢাকা দিত। হায় হায়, আবেন হাবুজের মতো নির্বিরোধী শান্তিকামী ব্যক্তিকেও এমন উত্যক্ত করতে পারে মানুষে!

রাজা সাহেব যখন নিত্য এইভাবে উৎপীড়িত এবং অপদস্থ হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় পৌঁচেছেন, সেই সময়ে তাঁর সভায় এলেন এক আরবদেশীয় বৈদ্যরাজ। ভদ্রলোকের সাদা দাড়ি কোমর পর্যন্ত ঝুলছে, বয়সের গাছ-পাথর নেই, অথচ মিশর থেকে স্পেনের গ্রানাডা পর্যন্ত দীর্ঘপথ তিনি একমাত্র যষ্টি সম্বল করে পায়ে হেঁটে এসেছেন বলে জানা গেল। তাঁর লাঠিটিতে মিশরের প্রাচীন চিত্রাক্ষরে কি সব লেখা ছিল। তাঁর পাণ্ডিত্যের এবং শক্তির খ্যাতি তিনি এসে পৌঁছোবার আগেই লোক মুখে পৌঁছে গেছল। তিনি এক ধারে চিকিৎসক, জ্যোতিষী এবং ঐন্দ্রজালিক।

বৈদ্যরাজের নাম ইব্রাহিম ইবন আবু আজীব, তিনি নাকি মহাপুরুষ মহম্মদের সময় থেকে জীবিত আছেন। তাঁর বাবা আবু আজীব সাহেব ছিলেন পয়গম্বরের শেষ পার্শ্বচর। শৈশবে মিশর-বিজয়ী সেনাপতি অমরুর (আমর?) সৈন্য দলের সঙ্গে তিনি মিশরে গেছলেন, সেখানেই দীর্ঘকাল পড়াশোনা করেছেন। বিশেষ করে সে দেশের প্রাচীন ধর্মের পুরোহিতদের কাছে ইন্দ্রজাল বিদ্যা শিক্ষাই ছিল তাঁর জীবনের সাধনা। দীর্ঘজীবন লাভের যে গুপ্ত উপায় তিনি শিখেছিলেন, তার বলেই দু'শ বছরের ওপর বেঁচেছিলেন তিনি, যদিও বয়সকালে বিদ্যাটা আয়ত্ত করতে না পারায় বার্ধক্যের চিহ্নগুলো তাঁর দেহে রয়েই গেছে; অর্থাৎ গত শতাধিক বৎসরে তাঁর চেহারার আর কোনও পরিবর্তন হয়নি, গুপ্তবিদ্যালাভের সময় যে বয়সে ছিলেন, সেই বয়সেই রয়ে গেছেন তিনি।

গ্রানাডার রাজসভায় হাকিম সাহেবের আদর অভ্যর্থনা খুবই হ'ল। অতিবৃদ্ধ অধিকাংশ বড়োলোকের মতো মহারাজ আবেন হাবুজেরও বয়সের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের মায়াটা বাড়ছিল,

দীর্ঘজীবন পাবার জন্য তিনি অনেক বৈদ্যকেই পুষতেন, সুতরাং এত বড়ো একজন চিকিৎসক যে তাঁর কাছে মহাসমাদরে স্থান পাবেন সে কথা বলাই বাহুল্য। রাজবাড়ীর একটা মহলই তিনি ইব্রাহিম সাহেবকে ছেড়ে দিতে তৈরি ছিলেন, কিন্তু বৈদ্যরাজ সেখানে থাকতে রাজি হলেন না। গ্রানাডার একপ্রান্তে পাহাড়ের গায়ে একটি গুহার মধ্যে থাকতে চাইলেন তিনি; বর্তমানে 'আল্‌হাম্‌ব্রা' প্রাসাদ যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, গুহাটা আগে সেই জায়গাতেই ছিল।

বৈদ্যরাজ চাইলেন, প্রাকৃতিক গুহাটাকে বড়ো করে কাটিয়ে মাটির তলায় একটি প্রকাণ্ড হলঘর তৈরি করতে। তার ছাদের কাছে একটি গোল ফুটো থাকবে, সেই ফুটো দিয়ে পাতকুয়ায় নামার মতো লোকে গুহা মধ্যে নেমে আসতে পারবে, আবার নীচে থেকে তিনি সেই ফুটো দিয়ে দিনের বেলাতেই তারা দেখতে পারবেন। তাঁর নির্দেশ মতো গুহার ভিতর দিকের দেয়ালগুলিতে চিত্রাক্ষর এবং নানা মন্ত্র বীজ, গ্রহ-তারাদের প্রতীক চিহ্ন, রাশিচক্র প্রভৃতি আঁকা এবং খোদাই করা হ'ল। নিপুণ কারিগরেরা তাঁর উপদেশ অনুসারে অনেক গৃহসজ্জা এবং যন্ত্রপাতি তৈরি করলে, যে সব যন্ত্রের আশ্চর্য গুণ তিনি ছাড়া আর কেউ জানত না।

কিছুদিনের মধ্যেই ইব্রাহিম সাহেব গ্রানাডা রাজ্যের প্রধান পরামর্শদাতা হয়ে উঠলেন। বলকারক ওষুধের দরকার ছাড়া যে-কোনো জটিল রাজকার্যের মীমাংসা করতে হলে ডাক পড়ত তাঁর। একদিন আবেন হাবুজ তাঁর প্রতিবেশীদের দুর্ব্যবহার এবং সেজন্য তাঁকে কি অশান্তিতে দিন কাটাতে হচ্ছে সদা-সশঙ্কিত চিত্তে সেই কথা ব'লে দুঃখ করছিলেন ইব্রাহিমের কাছে। বৈদ্যরাজ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলেছিলেন, "মহারাজ, আমি যখন মিশরে ছিলুম তখন প্রাচীন যুগের কোনো পূজারিণীর উদ্ভাবিত একটি অপূর্ব যন্ত্র দেখেছিলুম। নীলনদের বিশাল উপত্যকার মধ্যে বসরা নামে একটি শহর আছে। তার পাশে একটা পর্বতের চূড়ায় একটা ভেড়ার মূর্তি রাখা ছিল, তার পিঠের ওপর আবার একটা মোরগের মূর্তি ছিল। মূর্তি দু'টিই পিতল ঢালাই ক'রে তৈরি। যখনই দেশ কোনও শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হ'ত, তখনই যেদিক থেকে শত্রুরা আসছে ভেড়ার মুখটা সেইদিকে ঘুরে যেত, আর মোরগটা ডেকে উঠত। মোরগের ডাক শুনে শহরের লোক সতর্ক হ'য়ে যেত এবং অবিলম্বে শত্রুকে বাধা দেবার ব্যবস্থা করত।

আবেন হাবুজ ব'লে উঠলেন, "শোভান্ আল্লা, আমার যদি ঐ রকম একটা ভেড়া থাকত ঐ পাহাড়গুলো পাহারা দেবার জন্যে,—আর একটা মোরগ থাকত ডেকে সকলকে সাবধান ক'রে দেবার জন্যে তা'হলে কি সুবিধেই হ'ত! দুর্গের চূড়োয় ঐ রকম দুটি প্রহরী রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে বাঁচতুম।"

রাজার উচ্ছ্বাসপূর্ণ উক্তি থামলে বৈদ্যরাজ বললেন, "মহারাজ, বিজয়ী আমরু (তাঁর অক্ষয়

স্বর্গ লাভ হোক) মিশর জয় করবার পর আমি সে-দেশের পৌত্তলিক পুরোহিতদের মধ্যে বহু বৎসর বাস করেছিলুম, যে সব ক্রিয়া দ্বারা তারা নানা অলৌকিক শক্তি লাভ করত সেইগুলি জেনে নেওয়া ছিল আমার উদ্দেশ্য।

একদিন নীলনদের ধারে ব'সে একজন বৃদ্ধ পুরোহিতের সঙ্গে আলাপ করছিলুম। অদূরে মরুভূমির মধ্যে দণ্ডায়মান পর্বতাকার পিরামিডগুলির দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, আমরা যা কিছু আপনাকে শেখাতে পারি তা ঐ পিরামিডের মধ্যে বন্দী বিদ্যার তুলনায় কিছুই নয়। ঐ মাঝের পিরামিডটার ঠিক মাঝখানে একটি সমাধিকক্ষ আছে, সেখানে ঐ পিরামিড নির্মাণের পরামর্শদাতা প্রধান পুরোহিতের মৃতদেহ অবিকৃত অবস্থায় রাখা আছে 'মামি' ক'রে, সেই সঙ্গে আমাদের শিল্পকলা এবং ইন্দ্রজালবিদ্যার শ্রেষ্ঠতম সংকলন গ্রন্থটি রাখা আছে। আদম স্বর্গভ্রষ্ট হবার সময় সেটি সঙ্গে এনেছিলেন, তাঁর সন্তান পরম্পরায় সেটি মহারাজ সলোমনের হস্তগত হয়েছিল বহুদিন পরে। সেইটির সাহায্যে তিনি জেরুজালেমের মন্দির গড়েছিলেন। তারপর কিভাবে যে বইখানি পিরামিড নির্মিতার হাতে এসে পৌঁছল, সে কেবল সেই সর্বজ্ঞ ঈশ্বর ছাড়া কেউ জানে না।"

পুরোহিতের কথা শোনবার পর আমার প্রতিজ্ঞা হ'ল যেরকম ক'রে হোক সেই গুপ্তবিদ্যার বই আমাকে উদ্ধার করতেই হবে। আমরুর বিজয়ী সৈন্যদলের মধ্যে অনেকে আমার বাধ্য ছিল, মিশরীদের মধ্যেও অনেকের সঙ্গে ভাব হয়ে গেছল আমার। তাদের সাহায্যে আমি পিরামিডের গায়ে একটা গর্ত কাটতে আরম্ভ করলুম। অনেক দিনের চেষ্টার পর গর্তটি গিয়ে ঠেকল পিরামিডমধ্যস্থ সুড়ঙ্গপথে। আর তখন আমায় পায় কে? পিরামিডের গহ্বরে সেই সুড়ঙ্গপথ গোলকধাঁধার মতো ঘুরে ঘুরে উঠেছে, সেই পথের শেষে প্রধান পুরোহিতের সমাধিকক্ষ। সেই সমাধিকক্ষে ঢুকে পুরোহিতের মামির বাইরের ঢাকা খুলে গায়ে জড়ানো ওষুধের তেলমশলা-মাখা ন্যাকড়ার ফালির রাশি খুলে পুরোহিতের বুকের ওপর রাখা বইখানা বার করলুম শেষ পর্যন্ত। পুরোহিতের মৃতদেহটা শেষ বিচারের দিনের অপেক্ষায় সেই অবস্থায় পড়ে রইল, আমি কম্পিত-হস্তে বইখানি তুলে নিয়ে দীর্ঘপথ অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে হোঁচট খেতে খেতে পিরামিডের বাইরে ফিরে এলুম,—দিনের আলোতে।"

আবেন হাবুজ বললেন, "হে আবু আজীবের পুত্র, জানি আপনি নানাদেশে ঘুরেছেন, নানা অদ্ভুত অলৌকিক বস্তু দেখেছেন, কিন্তু আমার তাতে লাভ কি হবে বলতে পারেন? সলোমনের জ্ঞানের খনিস্বরূপ সেই বইখানি আপনি যদি পেয়েই থাকেন তবে আমার কি তাতে কিছু উপকার হবে?"

ইব্রাহিম বললেন, "হবে বইকি, মহারাজ! সেই গুপ্তবিদ্যার বইখানি পড়বার ফলে এবং দীর্ঘকাল তদনুসারে ক্রিয়াকলাপ ক'রে পৃথিবীর সব রকম ইন্দ্রজালবিদ্যায় আমি পারদর্শী হয়েছি। বোরসা শহরের সেই ভেড়ার মূর্তির চেয়ে বেশী গুণসম্পন্ন মূর্তি এখন আমি নিজে তৈরি করতে পারি।"

আবেন হাবুজের আনন্দ আর ধরে না। বললেন, "হে আবু আজীবের পুত্র ইব্রাহিম সাহেব, আমার রাজধানীর চারদিকে পাহাড়ের চুড়োয় চুড়োয় দুর্গ এবং সীমান্ত রক্ষার জন্যে শত শত প্রহরী রাখার চেয়ে ঐরকম মন্ত্রপূত একটি ভেড়া এবং একটি মোরগ উপস্থিত আমার বেশী প্রয়োজন। ঐ জাতীয় একটি রক্ষাকবচ আপনি আমায় দিন, আমি আপনার পায়ে আমার রাজভাণ্ডার উজাড় ক'রে দেব।"

রাজার ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্য জ্যোতিষী অবিলম্বে কাজে লাগলেন। আলবেসিয়ার উঁচু পাহাড়ের চুড়োয় রাজবাড়ী, তারও ছাদের ওপর আর একটা প্রকাণ্ড উঁচু মিনার খাড়া করলেন তিনি। মিনারের জন্য পাথর আনানো হ'ল মিশর থেকে, শোনা গেল কোন্ এক পিরামিড ভেঙে নাকি সংগৃহীত হয়েছে সেইসব পাথর। ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে মিনারের চুড়োয় উঠলে দেখা যেত একটা প্রশস্ত গোলঘর, তার সকল দিকে সারি সারি জানলা। সেই জানলাগুলি খুললে দেখা যেত না—রাজ্যের চতুর্দিকে এমন কোনো স্থান ছিল না। প্রত্যেক জানলার সামনে ছিল একটি করে টেবিল, তার ওপর একটি ক'রে দাবার ছকের মতো ছক আঁকা ছিল। সেই ছকের ঘরে ঘরে ছিল বহু ছোটো ছোটো অশ্বারোহী আর পদাতিকের মূর্তি, আর সেইদিকে যে শত্রুরাজা বা দলপতি বাস করেন তাঁর মূর্তি। সমস্তই কাঠের পুতুল, নিখুঁত করে তৈরি। প্রত্যেক টেবিলের সঙ্গে একটি ক'রে ছোটো বল্লম আটকানো ছিল, সেগুলো ঘড়ির কাঁটা বা গুণ ছুঁচের চেয়ে বড়ো নয়। সেই বল্লমগুলির গায়ে অজ্ঞাত অক্ষরে কি সব মন্ত্র লেখা ছিল। গোলঘরটির শক্ত পিতলের দরজা ইস্পাতের তালা দিয়ে বন্ধ ক'রে রাখা হ'ত সর্বক্ষণ। চাবি থাকত রাজা আবেন হাবুজের কাছে।

সেই সুউচ্চ মিনারের চুড়োয় রাখা ছিল একটি মুরদেশীয় অশ্বারোহী সৈনিকের মূর্তি। মূর্তিটি ব্রোঞ্জের তৈরি, তার একহাতে ঢাল, একহাতে খাড়া ঊর্ধ্বমুখ বল্লম। সৈনিকের মুখটা সাধারণতঃ শহরের দিকে ঘোরানো থাকত, যেন সে পাহারা দিচ্ছে সেখানে দাঁড়িয়ে, কিন্তু যখনই কোনোদিকে শত্রুরা অভিযান আরম্ভ করত, তখনই অশ্বারোহী মূর্তির মুখ যেত সেইদিকে ফিরে, আর বল্লমের মুখ সেই দিক লক্ষ্য ক'রে উদ্যত হয়ে উঠত তার ডান হাতে।

সেই অদ্ভুত রক্ষাকবচটি যখন তৈরি করা শেষ হ'ল, ততদিনে গ্রানাডা-রাজ তার গুণ পরীক্ষা

করবার জন্য অধীর হয়ে উঠেছেন। সম্প্রতি যেমন তিনি শান্তিপ্রিয় হয়েছিলেন, হঠাৎ তেমনি যুদ্ধপ্রিয় হয়ে দাঁড়ালেন। শীঘ্রই তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল। কয়েকদিন পরেই, যে লোকটিকে মিনারের চুড়োর দিকে নজর রাখবার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল, সে এসে খবর দিলে, মূর্তিটির মুখ এলভিরা পাহাড়ের দিকে ফিরেছে আর তার বল্লম 'লোপ' নামক গিরিপথের দিকে উদ্যত হয়েছে।

রাজা বললেন, "রণভেরী বাজিয়ে দাও, দামামা বাজাতে বলো। সৈন্যদলকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করো, ঐ দিক্ দিয়ে শত্রু আসছে।"

মুরদেশীয় অশ্বারোহী সৈনিকের মূর্তি। তার এক হাতে ঢাল, অপর হাতে বল্লম।

জ্যোতিষী বললেন, "মহারাজ, অকারণ লোককে উদ্ব্যস্ত করবেন না, সৈন্য সাজাবারও কোনো দরকার নেই। চলুন আমরা মিনারের চুড়োর সেই গোল ঘরটিতে যাই, দুজনেই আমরা শত্রুজয় করে আসতে পারব।"

বৃদ্ধ আবেন হাবুজ তাঁর চেয়ে বৃদ্ধ ইব্রাহিম সাহেবের কাঁধে ভর দিয়ে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে গোলঘরে পৌঁছোলেন। পিতলের দরজার তালা খুলে ঢুকলেন তাঁরা। ইব্রাহিম বললেন, "ঐদিক থেকে শত্রু আসছে। মহারাজ এই টেবিলের কাছে আসুন, টেবিলের মজাটা দেখুন।" রাজা তাঁর কথা মতো সেই দাবার ছকের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই অবাক হয়ে গেলেন। টেবিলের ওপর যে ক্ষুদে পুতুলগুলি সাজানো ছিল, তারা হঠাৎ যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ঘোড়াগুলো ছুটছে, সৈন্যেরা দল বেঁধে এগিয়ে চলেছে, ভেরী এবং দামামার ক্ষীণ শব্দও যেন শোনা যাচ্ছে, যদিও মৌমাছির গুঞ্জনের চেয়ে জোর নয় শব্দটা। অস্ত্রের ঝঞ্চনা, যোদ্ধাদের চীৎকার, ঘোড়ার হ্রেষা,—সবই শোনা গেল ঐ রকম মৃদুস্বরে। ইব্রাহিম বললেন, "মহারাজ লোপ গিরিপথের দিকে শত্রুর অভিযান

আসছে। যদি ওদের বিনা রক্তপাতে ভয় পাইয়ে তাড়িয়ে দিতে চান তবে ঐ বর্শাটার বাঁটের দিকটা ঠুকে দিন সৈন্যগুলোর মাথায়, আর যদি রক্তপাত এবং হত্যাকাণ্ড চান তবে বর্শার মুখটা দিয়ে খুঁচিয়ে দিন ওদের।"

অবেন হাবুজের মুখে চোখে সর্বাঙ্গে সহসা যেন একটা তড়িৎপ্রবাহ খেলে গেল। আগ্রহে কাঁপতে কাঁপতে জরাজর্জর দেহ নিয়ে এগিয়ে গেলেন তিনি, কম্পিত হস্তে বল্লমটা তুলে নিলেন। বললেন, "হে আবু আজীবের পুত্র, আমি একটু রক্তপাত হলেই খুশি হ'ব।"

বলতে বলতে তিনি সেই ছোট্ট বল্লমটির ছুঁচলো মুখ দিয়ে ক্ষুদে পুতুলগুলির কয়েকটিকে খোঁচা মারলেন, আর কতকগুলিকে বল্লমের বাঁট দিয়ে আঘাত করলেন। যারা বল্লমের খোঁচা খেলে তারা ধপাধপ মরার মতো শুয়ে পড়ল, আর যারা তার বাঁটের পিটুনি খেল, তারা পিছন ফিরে দুড়দাড় করে ছুটতে লাগল। শান্তিপ্রিয় গ্রানাডা রাজের তখন রোখ চেপে গেছে, তিনি তাদের বল্লমের খোঁচা দিয়ে নিঃশেষ করবার চেষ্টায় ছিলেন, ইব্রাহিম অনেক কষ্টে তাঁকে থামালেন; তাঁকে বুঝিয়ে শান্ত ক'রে নীচে নামিয়ে এনে 'লোপ' গিরিপথে কি ঘটেছে সন্ধান নেবার জন্য লোক পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন।

রাজার চরেরা কিছুক্ষণের মধ্যে খবর নিয়ে এল, 'সিয়েরার মধ্য দিয়ে একদল খৃষ্টান সৈন্য গ্রানাডা শহরের অদূরে পৌঁছে ছিল, সেই সময় হঠাৎ তাদের নিজেদের মধ্যে কি কারণে ঝগড়া বেঁধে যায়। নিজেরা খুনোখুনি করে তাদের মধ্যে অনেক সৈন্য মারা গেছে, বাকি ক'জন সীমান্ত পার হ'য়ে পালিয়ে গেছে।'

রক্ষী মূর্তির এবং বল্লমের শক্তির পরিচয় পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হলেন আবেন হাবুজ। বললেন, "বাঁচা গেল। এখন থেকে আমি শান্তিতে থাকতে পারব, শত্রুদের আমার হাতের মুঠোয় পেয়েছি এইবার। হে আবু আজীবের পুত্র, আপনাকে কী পুরস্কার দিলে আপনার এই উপকারের ঋণ শোধ হবে?"

[ক্রমশঃ

আকবর ও মুকুন্দরাম

শ্রীমানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

[তোমরা মহামতি আকবরের সুখ্যাতি নিশ্চয়ই শুনেছো। ইতিহাসের পাতায় তাঁর নাম যে উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে লেখা, তাও নিশ্চয়ই জান। তাঁর রাজত্বকালে, ভারতের হিন্দুদের কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না স্ব-ধর্মের জন্য। কোনো অসুবিধাও ছিল না—কারণ মহামতি আকবর ছিলেন মহান্,—উদার। দেশের দরিদ্র নরনারীর জন্য;—তারা হিন্দু-মুসলমান বা অন্যান্য জাতি যা-ই হোক না কেন;—সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করত। হিন্দুরাও তাঁকে দেবতার অভিপ্রেত পুরুষ বলেই মনে করতেন। তাই, আকবরের পূর্বজন্ম সম্বন্ধে হিন্দুদের মধ্যেও প্রচারিত হয়েছে সুন্দর একটি কল্পিত কাহিনী। সত্য-মিথ্যা বিচার না করেও বলতে পারা যায় যে, এই কাহিনীর মধ্য দিয়েই আমরা আকবর সম্বন্ধে জনসাধারণের শ্রদ্ধার পরিচয় পাই।

তোমরা শুনেছ—বর্তমানে পাকিস্তানে হিন্দুদের প্রতি অমানুষিক নির্যাতন আরম্ভ হয়েছে—হয়ত, ভবিষ্যতেও হবে। পবিত্র ইসলামের দোহাই দিয়ে যে সকল অমানুষের দল এই নৃশংসতা আরম্ভ করেছে—মহান্ আকবরের জীবনী পাঠ তাদেরই জন্য; যদি চৈতন্য হয়। এবার গল্পটা শোন।]

ত্রিবেণী। বিস্তৃত নদীবক্ষের ওপর শুভ্র মেঘ খণ্ড যেন নেমে আসতে চাইছে। দূরে দূরে—বন জঙ্গল টিলা পাহাড়ের ধারে ধারে ছোট ছোট গ্রাম। সবুজ শ্যামল বনরাজির স্নিগ্ধ ছায়া পড়েছে কালিন্দীর কালো জলে। গৈরিকবসনা জননী গঙ্গা ও শ্বেতা শুভ্রা সরস্বতীর প্রবাহ এসে মিসেছে কৃষ্ণ-শ্যাম যমুনার সাথে।

উপরে অগ্নি সদৃশ অংশুমালীর প্রচণ্ড তেজপুঞ্জ সবেগে আকর্ষণ করছে ত্রি-ধারার জলকণা। মুহূর্তে বাষ্পীভূত হয়ে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে কিছু কিছু প্রাণ।

স্নিগ্ধ প্রভাত। পূর্বদিগন্তে অরুণাভা দেখা দিলে। বিশাল বালুর চড়ার বাতাসে ভর করে ভেসে এল সুললিত সুগম্ভীর প্রার্থনা-ধ্বনি—"ওম্ জবাকুসুম সংকাশং কাশ্যপেয়ং··· হে অরুণ! হে পবিত্র প্রাণদাতা! ক্লেদ মুক্ত কর ধরা; পাপমুক্ত কর। সমস্ত প্রাণীর মঙ্গলসাধন কর, দূর কর অমানিশা··· !"

নদী তীরে বিশাল একটি পাথরের ওপরে বসে প্রার্থনা করছিলেন সৌম্যদর্শন এক সন্ন্যাসী। পাশে তাঁর শিষ্যদ্বয়।

এখুনি গ্রামবাসীগণ আসতে শুরু করবে। আসবে অভাব-অভিযোগ জানাতে—দুঃখের

কাহিনী শোনাতে। বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেলে যতদিন না পুনরায় ক্লেশে পতিত হয়, ততদিন আসবে না কেউ। কারণ, মানুষ ভগবানকে দুঃখে ডাকে, সুখে নয়।

গ্রামবাসীগণ এসে অভিযোগ শুরু করল—প্রবল অত্যাচারী বাদশার অনাচারে দেশের আইন-শৃঙ্খলা দূর হয়েছে। একজন বৃদ্ধ কেঁদে উঠল—বাবা, আমার কিশোরী মেয়েকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে; ছেলেটাকে বিনাকারণে কেটে কুচি কুচি করেছে! আমি কি নিয়ে থাকব বাবা? কি করে বাঁচব? বৃদ্ধ কাঁদতে কাঁদতে ভেঙ্গে পড়ল—চোখের লবনাক্ত জলে ত্রিবেণীর পবিত্র শুষ্ক ধূলি ভিজে উঠল।

ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীর উদাস মন ব্যথাতুর হয়ে উঠল। অশ্রুসিক্ত হ'ল দীপ্ত দুটি নয়ন।

গ্রামবাসীগণ বিদায় নিল। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। জ্বলন্ত সূর্যের দিকে তাকালেন। অরুণালোক এসে তাঁর চোখে লাগল। তিনি পরক্ষণেই গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। কিছুক্ষণ পর শিষ্যদ্বয়ের দিকে চেয়ে গম্ভীর স্বরে বললেন, বৎস, আজ আমি বড় বিচলিত হয়েছি। নূতন এক চিন্তা আমার মনের আঁধার দূর করে দিচ্ছে। মনে হচ্ছে—জীবনের নূতন অর্থ খুঁজে পেয়েছি। এবং এও মনে হচ্ছে—এতদিনের এই সন্ন্যাসী জীবন-সাধনা সফল হয়নি। ব্যর্থ! সব ব্যর্থ!

শিষ্যদ্বয় শিহরিত হলেন। একি আত্মধিক্কার! একি অনুশোচনা! একি পরম বিস্ময়ের কথা!*

সন্ন্যাসী মুকুন্দরাম বলে চললেন, ঠিকই বলছি বৎস। মানুষের হৃদয়ের পবিত্র আসনেই তাঁর বাস। মানুষ চির-পবিত্র। মানুষের পূজাই তাঁর পরম পূজা। মানুষের সেবা করলেই তাঁকে সেবা করা হয়। অথচ এতদিন আমি এই দরিদ্রনারায়ণের সেবা না করে নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতিতে মগ্ন ছিলাম। ছিঃ ছিঃ! ধিক্ এ সাধনায়!

শিষ্যগণ অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন গুরুদেবের জ্যোতির্ময় শ্রীমুখের দিকে।

* * *

দিবাবসান হ'ল। প্রদীপ্ত বিবস্বান পশ্চিম দিগন্তে রক্ত আবীর ছড়িয়ে বিদায় নিলেন—পৃথিবীর অপর প্রান্তের তমসা দূর করে দেবার শুভকার্যে এগিয়ে চললেন। অনন্ত দাহে জ্বলছে সর্বশরীর, তবুও অবিরত পরোপকার। সূর্যদেব তাই প্রাতঃস্মরণীয়।

* তখনকার যুগে এটা পরম ও চরম বিস্ময়ের কথাই ছিল। কেন বলো তো? শোন,—তখনকার মানুষ ভাবত, নিজেদের আত্মিক উন্নতিই একমাত্র করণীয়। পরহিতে নিজের জীবন উৎসর্গ করার মত উন্নততর শুভ কামনা তখনকার মানুষের মনে খুব কমই জাগত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণই এসে বললেন যে, নিজের উন্নতির জন্য স্বার্থপরের মত জপতপ কৃচ্ছ্রসাধন করা নীচতা ও ক্ষুদ্র মনোভাবের পরিচয়। এই উপদেশ বাস্তবে পরিণত করলেন—স্বামিজী, বিদ্যাসাগর, নেতাজী প্রভৃতি মহামানবগণ।

স্বামী মুকুন্দরাম দিনে দিনে গম্ভীরতর হয়ে উঠলেন। তাঁর একমাত্র চিন্তা—কি করে এই দরিদ্র অপমানিত, লাঞ্ছিত নরনারায়ণের প্রকৃত সেবা করা যায়! কি উপায়ে?—কোন পথে?

রাত এল। ঘোর অমানিশায় ছেয়ে গেল ত্রিভুবন। শিষ্যদ্বয় গ্রামবাসীদের প্রণামীস্বরূপ দিয়ে-যাওয়া দুধ, ফল, মিষ্টি আনলেন। প্রথমে গুরুদেব অতি সামান্য দুধ পান করবেন, তারপর বাকী সবকিছু নিজেরা গ্রহণ করবেন।

স্বামী মুকুন্দরাম দুধের পাত্র মুখে তুললেন। এক চুমুক খেয়ে চম্‌কে উঠে ফেলে দিলেন দুধটুকু। একি! দুধের মধ্যে যে একগাছি চুল! গাভীর গায়ের রোম! পশমের গোড়ায় আবার তিল পরিমাণ গো-মাংস! সর্বনাশ! একি গর্হিত কাজ করলেন তিনি। জননী গাভীর মাংস স্পর্শ করেছেন, খেয়েছেন! ছিঃ ছিঃ! নরকেও যে তাঁর ঠাঁই হবে না!!

ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন শিষ্যদ্বয়! তাঁদের অপরিণাম দর্শীতার ফলেই তো এই সর্বনাশ গুরুদেবের!

সন্ন্যাসী সাধক তখন দ্রুত চিন্তা করে চলেছেন। কি করবেন? কি করা যায়!

যজ্ঞ করলেই তো প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যায়! কিন্তু এরপর তো আবার সেই গতানুগতিক এক-ঘেয়ে স্বার্থপরের জীবনযাপন করতে হবে। তার চেয়ে…হ্যাঁ! তা-ই হোক্…তা-ই করবেন তিনি…।

হঠাৎ যেন প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝা আধার দূর করে পরম করুণাময় অমিত শক্তি দিবাকরের উদয় হ'ল। বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গের মত এক শুভ-কামনা দীপ্ত হয়ে উঠল সন্ন্যাসী মুকুন্দরামের শুচিস্নিগ্ধ অন্তরে।

তিনি ইচ্ছা মৃত্যু বরণ করবেন; মৃত্যুর পূর্বে কামনা করে যাবেন, যাতে আগামী জীবনে তিনি এ দেশের শাসক হয়ে জন্মান, যাতে তিনি পরের জন্মে, নরনারায়ণের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করতে পারেন। তাই, কামকূপে ঝাঁপ দেবার আগে তিনি সাধনা শুরু করলেন—যাতে ভবিষ্যতে তিনি বাদশা হতে পারেন। গো-মাংস ভক্ষণ করে ধর্মান্তরিত হয়েছেন তিনি, সুতরাং বাদশা-ই হবেন তিনি।

কৃচ্ছসাধনে মেতে উঠলেন তিনি; সুকঠিন জপতপে শরীর কৃশ হয়ে উঠল। শিষ্যদ্বয় হাহাকার করে উঠলেন।

তারপর এল সেই শুভদিন। দেশের লোক ভেঙ্গে পড়ল। মহাসাধক মুকুন্দরাম স্বামী আত্মত্যাগ করলেন। শিষ্যদ্বয় গুরুর আদেশে একটি প্রস্তরখণ্ড এনেছিলেন। মুকুন্দরাম প্রস্তরখণ্ডে লিখে রাখলেন—"দরিদ্র, নিপীড়িত মানুষের মুক্তির জন্য আমার এ আত্মত্যাগ সফল কর, ঈশ্বর!

আগামী জন্মে আমি যেন হিন্দুস্থানের রাজচক্রবর্তী বাদশা হয়ে জন্মাই। আমার থাকবে না পাণ্ডিত্যের গর্ব, ঐশ্বর্যের অভিমান, ধর্মের গোঁড়ামি। একমাত্র কর্তব্য হবে—মানুষের সেবা। সেবা-ই পরম ধর্ম। আমি যেন পবিত্র কোরান আর শুদ্ধ বেদের সমন্বয় সাধন করতে পারি!"

কামকূপে ঝাঁপ দিলেন স্বামী মুকুন্দরাম। কূপের সুগভীর জলরাশি পরম স্নেহে নিজ-বক্ষে টেনে নিল সাধককে।

* * *

বহুদিন কেটে গেল। অনেক ধুলো জমা হ'ল ঐ প্রস্তরখণ্ডটির গায়ে। তারপর একদিন—

সমস্ত আকাশ জুড়ে ভীষণ কালো মেঘ করল। প্রবল বেগে হাওয়া বইল। বিশালাকায় গাছের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ডাল-পালাগুলো ভেঙ্গে পড়তে লাগল। সমস্ত প্রকৃতি জুড়ে চলল রুদ্রের এক নিদারুণ তাণ্ডবলীলা! মরুভূমির শুষ্ক পথ বেয়ে চলেছেন একদল অভিশপ্ত যাত্রী। তাঁদের মধ্যে আছেন শক্তিশালী, দুর্মদ প্রতিপক্ষ কর্তৃক পরাজিত দুর্বল এক সম্রাট,—হিন্দুস্থানের এক বাদশা।

ধীরে ধীরে ঝড় থামল। বৃষ্টিতে ধুয়ে গেল ধরার গ্লানি। রৌদ্র ঝিলমিলিয়ে হেসে উঠল পরম খুশিতে। মঙ্গলবাদ্যে ভরে উঠল আকাশ-বাতাস। আঁধার নীলিমার মধ্যে ফুটে উঠল এক উজ্জ্বল অপার্থিব আলো—স্বর্গ থেকে ধরিত্রীর পথ দেখিয়ে নিয়ে এল এক মহামানবকে।

মরুভূমিতে যাত্রীদল থামলেন। হিন্দুস্থানের পরাজিত বাদশার মহিষীর গর্ভে জন্মাল সুদর্শন, সর্ব অঙ্গে সুলক্ষণ-যুক্ত এক শিশু। পারিষদবর্গ আনন্দধ্বনিতে মুখরিত করলেন মরু প্রান্তরের নিস্তব্ধ বাতাস।

বাদশা বললেন, এই আনন্দের দিনে আপনাদেরকে উপহার দেবার আমার কিছুই নেই। এই সামান্য মৃগনাভিটুকু ভাগ করে দিলাম। আশিস দিন, নবজাতকের মহিমা যেন এই কস্তুরীর মত বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে।

স্নেহময় পিতার সেই কাতর আবেদন পূর্ণ হ'ল। পূর্বজন্মের মহাসাধক মুকুন্দরাম পরজন্মে জন্ম নিলেন মানবদরদী উদার হৃদয় প্রবল প্রতাপান্বিত আকবর বাদশা রূপে। ঈশ্বর আল্লার মহিমা নূতন রূপে প্রচারিত হ'ল দিকে দিকে! আকবর বললেন, দীন ভাবে প্রজার সেবা-ই রাজার একমাত্র কর্তব্য। সুলতান মানে প্রজাবৃন্দের সেবক। এর মধ্যে কোন বিভেদ নেই, দ্বেষ নেই, ঈর্ষা নেই। প্রজাগণ সবই এক। হিন্দু-মুসলমান সব এক—একই আল্লার, একই ঈশ্বরের সন্তান।

মুসলমান বাদশা আকবর কোরান আর বেদ এক করেছিলেন—হিন্দু-মুসলমানকে সত্যিকারের ভাইয়ের প্রেমে বেঁধেছিলেন। সেদিন ধরায় স্বর্গ নেমেছিল।

পিতাপুত্র

শ্রীসাবিত্রী সেনগুপ্তা

গ্রীক দেশে মুস্তাফি নামে এক মল্লবীর ছিলেন। তাঁর মত বড় মল্লবীর সে দেশে তখন আর কেউ ছিল না।

হঠাৎ একদিন মুস্তাফির ইচ্ছা হ'ল তিনি পৃথিবী ঘুরতে বেরুবেন এবং তাঁর সমকক্ষ কেউ আছে কিনা দেখবেন। এই কথা মনে মনে যখন স্থির করছেন, সেই সময় তাঁর একটি পুত্রসন্তান জন্ম গ্রহণ করলো।

মুস্তাফি তাঁর পৃথিবী ভ্রমণ কিছু দিনের জন্য বন্ধ রাখলেন। পুত্র যখন এক বৎসরের তখন মুস্তাফি পৃথিবী বিজয়ে বের হলেন।

এক একটি রাজ্যে মুস্তাফি যান্ এবং সেখানকার মল্লবীরদের মল্লযুদ্ধে আহ্বান করেন। তাঁর নাম শুনে অনেকে এগিয়ে আসেন, আবার পরাজয়ের ভয়ে অনেকে আসেন না। কিন্তু কেউই তাঁর সঙ্গে জয়ী হতে পারেন না। এইভাবে মুস্তাফি রাজ্যে রাজ্যে জয়লাভ করে, একদিন দেশে ফিরবার মনস্থ করেন।

এদিকে মুস্তাফির এক বৎসরের পুত্র ইভনস্কাস্ এখন যুবক এবং পিতার মতই বিখ্যাত মল্লবীর। পিতা পৃথিবী জয়ে বেরিয়েছেন একথা মাতার কাছে শুনতে পেল ইভনস্কাস্। তখন মনে মনে সেও স্থির করল পিতার মত পৃথিবী জয়ে বের হবে এবং পিতাকে ফিরিয়ে আনবে। জ্ঞান হয়ে অবধি ইভনস্কাস্ পিতাকে দেখেনি, তাই পিতাকে দেখবার জন্য সে আকুল হয়ে উঠল। মনে মনে স্থির করল সেও পিতার মত দেশে দেশে গিয়ে মল্লবীরদের মল্লযুদ্ধে আহ্বান করবে। যদি তার পিতা বেঁচে থাকেন তাহলে নিশ্চয় এই আহ্বানে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারবেন না। অতি সহজেই তাহলে পিতৃদর্শন মিলবে। মাতাকে সমস্ত কথা বলে এবং পিতাকে ফিরিয়ে আনবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে পিতার খোঁজে বেরিয়ে পড়ল ইভনস্কাস্।

ইভনস্কাস্ দেশের পর দেশ পার হয়ে চলতে থাকে। এক একটি গ্রামে গিয়ে সেখানকার মল্লবীরদের মল্লযুদ্ধে আহ্বান করে এবং তাদের হারিয়ে আবার এগুতে থাকে।

ইভনস্কাস্ যখন এইভাবে পিতাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে তখন তার পিতা দেশে ফিরছেন। হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন এক অল্পবয়স্ক যুবক মল্লবীর সমস্ত মল্লবীরকে মল্লযুদ্ধে হারিয়ে দিচ্ছে। কেউই তার সঙ্গে পেরে উঠছে না। এই কথা শুনে মুস্তাফি খুব চটে উঠলেন। মনে মনে বললেন—এত বড় সাহস! তাঁর মত বিখ্যাত মল্লবীর থাকতে কোন মল্লবীরকে ডাকতে সাহস পায়? তিনি ইভনস্কাস্ যে দেশে ছিল, তিনি সেই দেশে গিয়ে হাজির হলেন এবং তাকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করলেন।

শুরু হ'ল পিতা-পুত্রে যুদ্ধ। মুস্তাফি কিছুতেই ইভনস্কাসকে হারাতে পাচ্ছেন না। 'হঠাৎ

মুস্তাফি কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন তারপর বললেন—আমিই না সেই বিখ্যাত মুস্তাফি? যার কাছে সমস্ত পৃথিবীর মল্লবীর মাথা নত করে থাকে! সেই আমিই কিনা একজন সামান্য যুবকের কাছে পরাজয় স্বীকার করবো?

এই বলেই প্রবল ক্রোধে সব শক্তি দিয়ে এবার আক্রমণ করলেন ইভনস্কাস্‌কে। পিতার প্রবল শক্তির কাছে হতভাগ্য পুত্র এবার পরাজিত হ'ল এবং ভীষণ আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

আহত ইভনস্কাস্‌ তখন একটি কথাই বার বার বলতে লাগল—তুমি মুস্তাফি! সেই বীর মুস্তাফি!

হ্যাঁ, আমিই বিখ্যাত মুস্তাফি। কিন্তু তুমি কে যুবক? আর বার বার আমার পরিচয় জানতে চাইছ কেন? আমায় কিছু বলবে?

ইভনস্কাস্‌ তখন ধীরে ধীরে তার সব কাহিনী বলল—কেমন করে সে বড় হ'ল। পিতাকে ফিরিয়ে আনবার জন্য মাতার কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে কেমন করে ঘর থেকে বের হ'ল। সব শেষে ইভনস্কাস্‌ করুণ কণ্ঠে বলল—বড় দুঃখ থেকে গেল পিতার সন্ধান পেলাম বটে কিন্তু প্রতিজ্ঞাপালন করতে পারলাম না।

এই কথা বলার পরেই ইভনস্কাসের মৃত্যু হ'ল। মুস্তাফি এবার বুঝতে পারলেন, কে এই শক্তিমান মল্লবীর। পুত্রকে জড়িয়ে ধরলেন এবার মুস্তাফি; তাঁর চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল।

শহর দেখা

শ্রীউমা দেবী

শহর দেখতে গিয়ে জানো
দেখে এলাম কি?
—নেংটি ইঁদুরটি।

চওড়া চওড়া পথের ধারে প্রকাণ্ড সব বাড়ী,
দোতলা সব গাড়ী—
ছুটটে দিলাম পাড়ি।

হঠাৎ দেখি হুলোর মতন কেঁদো
ইঁদুর ইয়াঃ বড়ো
দেখে যত কুকুর জড়োসড়ো।

তাকে দেখে বিড়ালগুলো দিল চোঁ-চোঁ দৌড়—
আর ছেলেরা ভয় পেয়ে
রইল ভ্যাবার মতন চেয়ে।

বড় শহর বড় বাড়ী বড় গাড়ীর দেশে
নিশ্চিতই ওটা
নেংটি ইঁদুর মোটা।

রোড্‌সদ্বীপের পিত্তল প্রতিমা

॥*॥ শ্রীনির্মলজ্যোতি দেব ॥*॥

ভূমধ্যসাগরের মধ্যে অবস্থিত একটি ছোট দ্বীপ, এই দ্বীপের পরিধি ১২০ মাইল। নাম তার রোড্‌স্‌। অতি প্রাচীনকালে এই দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করবার জন্য এলেন ক্রীট ও থেসালিবাসী গ্রীকগণ। তারা এই নির্জন জায়গায় উপনিবেশ স্থাপন করে খুব শীঘ্রই ধনে ও ঐশ্বর্যে যশস্বী হয়ে উঠেছিলেন, এই রোডসবাসীগণ পরে এই ক্ষুদ্র দ্বীপের মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ করে রাখেন নি। নিকটবর্তী দেশগুলিতে নিজেদের প্রতিপত্তি বজায় রাখবার চেষ্টা করলেন।

এই রোড্‌সবাসীদের উপাস্য দেবতা ছিল সূর্যদেব। তারা বিশ্বাস করতেন যে, সকল দেবদেবীর মধ্যে সূর্যের শক্তি সবচেয়ে বেশী। এই দ্বীপের এই অধিবাসীরা তাদের উপাস্য দেবতার একটি বিরাট মূর্তি তৈরী করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। এই মূর্তি নির্মাণ করবার ব্যয় নির্বাহের জন্য তারা যুদ্ধের অস্ত্রসস্ত্র বিক্রয় করে প্রয়োজনীয় প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করলেন।

খৃঃ পূঃ ৩৫০ শতাব্দীতে তখনকার গ্রীকদেশের বিখ্যাত শিল্পী লিসিপিয়সের প্রধান শিষ্য 'চারলাস' সকলের অনুরোধে এই মূর্তি তৈরী করার ভার গ্রহণ করলেন। সেসময় 'ল্যাকেস্‌' নামক অপর আর একজন শিল্পীকেও এই কাজে নিযুক্ত করা হ'ল। এই দুই বিখ্যাত গ্রীকশিল্পীর দ্বারা উপাস্য দেবতার এই প্রতিমূর্তি দীর্ঘ বার বৎসর ধরে নির্মাণ করা হয়। এই প্রতিমার উচ্চতা

ছিল ১০৫ ফুট। সমুদ্রের মধ্যে বড় বড় প্রস্তরখণ্ডের উপর এই বিশাল মূর্তিটি দণ্ডায়মান ছিল। এই প্রতিমা পিতল ধাতুর সাহায্যে নির্মাণ করা হয়। এই বৃহৎ দর্শনীয় জিনিষটি তৈরী করতে শিল্পীদ্বয়ের যে সুদক্ষতার প্রয়োজন হয়েছিল তা এই পিত্তল মূর্তিটি দেখে সেকালের অনেকেই স্বীকার করে গিয়েছেন। কিন্তু কি করে বিশুদ্ধ পিতল গলিয়ে এটি তৈরী করা হয়েছিল; তা কেউ কখনও বলতে পারেন নি। এই ধরণের বিশাল প্রতিমা পৃথিবীতে আর কখনও নির্মাণ করা হয়নি।

এই বৃহৎ প্রতিমার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠকে জড়িয়ে ধরতে কয়েকটি লোকের প্রয়োজন হ'ত। উপাস্য দেবতার প্রতিমূর্তির শীর্ষদেশে কোন মানুষ সহজে উঠা-নামা করতে পারতেন না। উপরে উঠবার জন্য ঘূর্ণায়মান সোপানবলী প্রাতমাগাত্রে দৃঢ় সংলগ্ন ছিল। এই পিত্তল মূর্তির এক হাতে রয়েছে প্রকাণ্ড তীর ও অপর হাতে রয়েছে বিরাট আয়তনের এক তৈলভাণ্ড। এই তৈলভাণ্ডের সাহায্যে অনেক উপর থেকে রাত্রিকালে আলোকমালা বিস্তার করা হ'ত। রোড্‌স দ্বীপের এই পিত্তল প্রতিমার পদতল দিয়ে বন্দরের বড় বড় জাহাজ অনায়াসে যাতায়াত করতে পারত। দিনের বেলায় এর বিপুলতর ছায়া বহুদূর পর্যন্ত সমুদ্রবক্ষে প্রসারিত হ'ত। উপাস্য দেবতার প্রতিমূর্তির ছায়াকে দিনেরবেলায় নাবিকেরা সমুদ্রের মধ্যে থেকে পরমশ্রদ্ধার সঙ্গে প্রণাম করত। সুদূর ঈজিপ্ট ও সিরিয়ার উপকূল থেকে মানুষ এই মূর্তিকে সহজে লক্ষ্য করতে পারতেন।

২২৪ পূঃ খৃষ্টাব্দে এক ভয়ানক ভূমিকম্পে প্রতিমার কিছু অংশ মাটির নীচে তলিয়ে যায় এবং ভূমিকম্পে এই মূর্তির কিছু কিছু অংশ ভেঙ্গে যায়। এ অবস্থায় প্রায় ৯০০ বৎসর এই আকর্ষণীয় জিনিষটি দণ্ডায়মান ছিল। মূর্তির এই ভগ্নাবস্থার সময় রোডস্ দ্বীপের অধিবাসীগণের প্রতিপত্তি আর পূর্বের মত এত অধিক ছিল না। তারা তখন দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এই দুর্বল রোডস্-বাসীগণ তাদের এই উপাস্য দেবতার পিত্তল প্রতিমূর্তিকে সংস্কারার্থ প্রথমে প্রয়াসী হলেন এজন্য নিকটবর্তী দেশের সমৃদ্ধশালী রাজাদের নিকট আর্থিক সাহায্য চাইলেন। কিন্তু অর্থ সাহায্য লাভ করে তাদের দ্বারা এই বিশাল মূর্তির সংস্কারকার্য সাধিত হয় না। কারণ রোডস্ দ্বীপের কয়েক জন সেইসব অর্থ নিজেদের প্রয়োজনে আত্মসাৎ করলেন এবং তারা সকলের কাছে পরে প্রচার করে বেড়ালেন যে, মূর্তি নির্মাণে তাদের উপাস্য দেবতার ইচ্ছা নেই।

৬৭২ খৃঃ অব্দে আরবীয়গণ দ্বারা যখন এই ক্ষুদ্র দ্বীপটি আবিষ্কৃত হয়, তখন শিল্পবিদ্বেষী মুসলমানেরা এডেসার জনৈক ইহুদি বণিককে প্রচুর টাকার বিনিময়ে পৃথিবীর এই আকর্ষণীয় বৃহৎ মূর্তির ধ্বংসাবশেষ বিক্রয় করে। এভাবে রোড্স্ দ্বীপের এই পিত্তল প্রতিমার অস্তিত্ব পৃথিবী থেকে একেবারেই লোপ পায়।

পরীক্ষা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

লোকালয় থেকে অনেক দূরে বনের মধ্যে একখানি কুঁড়ে ঘর। আগড় খোলা সেই ঘরের মধ্যে দেখা যাচ্ছে—হাসি-হাসি মুখ এক বাল-গোপালের মূর্তি—চমৎকার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। কুঁড়ের সামনে খানিকটা খোলামেলা জায়গা। সেইখানে পত্রশূন্য গাছের তলায় হাঁটু গেড়ে বসে আছেন এক সর্বরিক্ত উদাসী মানুষ; ন্যাড়া মাথা, পরনে কৌপীন, ভাববিহ্বল দৃষ্টি—হাতে তাঁর আধখানি রুটি। রুটিসুদ্ধ হাতখানি বাড়িয়ে ধরেছেন গোপাল মূর্তির সামনে। যেন ছেলেটিকে খাবার এগিয়ে দিতে দিতে বলছেন, খাও। সর্বরিক্ত ভিখারী আমি কোথায় পাব সুস্বাদু খাবার! ভিক্ষে করে যেটুকু আটা সংগ্রহ করেছি, তাই দিয়ে তৈরী করেছি ক্ষুধা নিবৃত্তির এই সামান্য সামগ্রী—একখানি রুটি। এর অর্ধেক তোমার।

বৈরাগীর মুখে প্রগাঢ় নিষ্ঠা—বালগোপালের মুখে প্রসন্ন হাসির আভাস। ন্যাড়া গাছ, কুটীর, আকাশ, বনভূমি, সমস্ত পরিবেশে হাল্কা গৈরিক রঙের প্রলেপ—ছবিখানির মর্মকথাটি ব্যক্ত করছে।

তবু আমরা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে শিল্পীর পানে চেয়ে রইলাম।

শিল্পী ঈষৎ হেসে বললেন, গল্পটা বলছি। এই উদাসী কৌপীন পরা মানুষটি হলেন সনাতন—এককালে যাঁর উপাধি ছিল সাকর মল্লিক। প্রবল প্রতাপান্বিত গৌড়ের বাদশাহ হুসেন শাহের দক্ষিণ হস্ত। অর্থাৎ বাদশাহের পরেই এঁর আসন। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপা লাভ করে ধনজন বিষয় সম্পত্তি ক্ষমতা সম্মান সব কিছু পরিত্যাগ করে ইনি এসেছিলেন শ্রীবৃন্দাবনধামে। সেখানে লোক সমাজ থেকে বেশ খানিকটা দূরে বনের মধ্যে সামান্য একটি পাতার কুটীরে ব'সে ভগবানের আরাধনা করতেন। প্রতিদিন ভিক্ষার্থে একবার করে লোকালয়ে যেতেন। পাঁচটি বাড়ীতে ঘুরে ভিক্ষা করতেন না। একটি বাড়ীতে যা পেতেন তা যত সামান্যই হোক—এক মুঠো আটা বা ছাতু তাই নিয়ে আসতেন। তাই দিয়ে আহার্য প্রস্তুত করে ইষ্টদেবকে নিবেদন করে দিনান্তে সেই প্রসাদ গ্রহণ করতেন। অগাধ বিষয়-সম্পত্তি রাজভোগ মহামূল্যবান পোষাক-পরিচ্ছদ ভোগ-বিলাস সব ছেড়ে দিয়ে দীন-হীন ভিখারীর মত বনের মধ্যে বাস করছিলেন সনাতন।

কুঁড়ে ঘরের সামনে যে মাঠটুকু দেখা যাচ্ছে—ওইখানে প্রতিদিন অপরাহ্ণে মথুরার পাঁড়েদের ছেলেরা এসে খেলাধূলা করত। সন্ধ্যা হলে তারা শহরে চলে যেত। একদিন সনাতন দেখলেন—ওদের দলে একটি নতুন ছেলে এসে জুটেছে। ছেলেটির রং কালো, মুখখানি ভবভবে, চোখ দুটি

টানা টানা, হাত পা দেহের গড়ন বেশ নরম নরম, মাথার চুলগুলি ঝুঁটি করে বাঁধা। কোঁকড়া চুল, সবগুলি ঝুঁটিতে বাঁধা পড়েনি—কপালে কানের পাশে, মাথার পিছনে থোকা থোকা হয়ে ঝুলছে। ছেলেটিকে এদের দলে কোনদিন দেখেননি অথচ ছেলেটি যে সম্পূর্ণ অপরিচিত এ-ও মনে হচ্ছে না। ছেলেটির পানে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন সনাতন।

দেখতে সুন্দর হলেও ছেলেটি খেলায় মোটেই পটু নয়। খেলায় হেরে গিয়ে ও তর্ক জুড়ে দিল—যেমন ছেলেরা করে। তর্কাতর্কির শেষ পরিণাম হাতাহাতি। পাঁড়েদের ছেলেরা রেগে উঠে ওকে মারতে লাগল। ও ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল সনাতনকে। কাঁদো কাঁদো গলায় বললে, দেখ না —ওরা আমাকে মারছে।

সনাতনের আশ্রয়ে আসাতে ছেলেরা আর কিছু বলল না—ওকে শাসাতে শাসাতে চলে গেল।

ছেলেটি বলল, আমি শহরে যাব না—গেলে ওরা আবার মারবে। আমি তোমার কাছেই থাকব। কেমন?

সনাতন বললেন, তুমি বুঝি শহরেই থাক?

ছেলেটি বললে, না তো—আমি থাকি অনেক দূরে। যারা আমায় আদর-যত্ন করে তাদেরই কাছে থাকি।

এবার হাসলেন সনাতন। বললেন, সে তো জানি—কথার ছলে তোমাকে কে এঁটে উঠবে! কিন্তু আমার কাছে তোমার তো থাকা হবে না।

ছেলেটি শুকনো মুখে বলল, কেন?

সনাতন বললেন, ভাবছ তোমার পরিচয় আমি জানি না?

ছেলেটি বলল, তবে কেন তোমার কাছে আমাকে থাকতে দিচ্ছ না?

সনাতন বললেন, কারণ তোমাকে রাখবার ক্ষমতা আমার নাই। আমি তো তোমায় আদর-যত্ন করতে পারব না। ভিখারী মানুষ, কোথায় পাব ক্ষীর সর ননী—ভাল ভাল খাদ্য সামগ্রী!

ছেলেটি বলল, বাঃ রে, আমি কি তোমার কাছে ক্ষীর সর ননী চাইছি? যা তুমি খাবে—তাই দিয়ো আমাকে। তাই খাব আমি।

সনাতন বললেন, ভিক্ষের জিনিসে একলা মানুষের পেট ভরে না। এক মুঠো আটা—তাই দিয়ে একখানা কি বড় জোর দু'খানা রুটি বানাই—তার আদ্দেক দিলে ভরবে তোমার পেট?

ছেলেটি বলল, খুব ভরবে। তুমি যা দেবে তাতেই আমি খুশি হব।

সনাতন বললেন। শুধু একখানা কি আধখানা রুটি, একটু তরকারি নয়—নুনটুকু পর্যন্ত নয়।

ছেলেটি বলল, তাই দেবে। যত্ন করে দিলে তাই আমার ভাল লাগবে।

সনাতন হেসে বললেন, দেখো—পরে যেন বায়না ধরো না—এ চাই—ও চাই!

ছেলেটি ঘাড় দুলিয়ে বলল, না-না-কিচ্ছু বলব না।

আচ্ছা মনে রেখো। আবার প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন সনাতন।

এমনি করে দিন যায়। প্রতিদিন ভিক্ষার আটায়·· ···একখানা কিংবা দু'খানা রুটি তৈরী করেন সনাতন। অর্ধেক দেন ছেলেটিকে—নিজে নেন অর্ধেক। শুধু রুটি আর কোন উপকরণ নয়।

একদিন ছেলেটি বলল, দেখ সনাতন—শুকনো রুটি গিলতে আমার ভারী কষ্ট হয়। শুধু রুটি না দিয়ে একটু নুন যদি দাও ওর সঙ্গে—

সনাতন হেসে বললেন, জানি—একথা একদিন বলবেই।

ছলছল চক্ষে বলল ছেলেটি, আর তো কিছু চাইছি না শুধু একটুখানি নুন।

সনাতন বললেন, ওই একটুখানি থেকেই তো সুরু হয়। আজ বলছ একটুখানি নুন দাও—কাল বলবে একটু তরকারি—পরশু পঞ্চ ব্যঞ্জন—তারপর ক্রমে ক্রমে ক্ষীর সর ননী। এমনি করে রসনায় স্বাদ বাড়িয়ে বাড়িয়ে আমাকে রসাতলে নিয়ে যেতে চাও? যাও-যাও—তোমার মতলব আমি বঝেছি। নিজে খাওয়ার নাম করে আমাকে তুমি আবার বিলাসের ঝাঁকে ডোবাবে ভেবেছ? যাও-যাও-চলে যাও তুমি।

ছেলেটি চলে গেল না—আরও এগিয়ে এসে সনাতনকে জড়িয়ে ধরে বলল, না সনাতন, আমি যাব না। আমি তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম। তুমি আমাকে যে জিনিস দিয়েছ তা হীরে মুক্তো মণির চেয়েও অনেক দামী! রাজার রাজভোগের চেয়ে তোমার এই আধখানা রুটি অনেক মিষ্টি। আমি চিরজীবন ধরে চাইব এই খাবার।

ছেলেটিকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন সনাতন। চোখ দিয়ে তাঁর দরদর ধারে জল গড়াতে লাগল।*

* নিজের আঁকা ছবিখানি দেখিয়ে গল্পটি বলেছিলেন, প্রবীণ চিত্রশিল্পী ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার। ইনি বহুদিন থেকে এলাহাবাদ প্রবাসী। আচার্য অবনীন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্য পরম বৈষ্ণব—শিল্পশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এই মানুষটি রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গলীলা থেকে চিত্রের বিষয়বস্তু আহরণ করে থাকেন। এঁর অন্যতম স্মরণীয় সৃষ্টি চিত্রে গীতগোবিন্দ। শিল্পসৃষ্টিতে এখনও ইনি সক্রিয়।

সমাদর!

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু

কি বল্‌লে? কে এসেছে,—স্কুলের এক মাষ্টার?
শ্রাদ্ধ কিংবা কন্যাদায়ের সাহায্য চাই তার?
অথবা চাই চাঁদা কিছু, ছাঁদা কথার মালা,—
ঝালাপালা করবে এসে, এ যে বিষম জ্বালা!

চেয়ার কেন দেবে? ওর ভাঙ্গা টুলই ঢের,
আদর পেলে বাঁদর হয়ে চড়বে ঘাড়ে ফের।—
এই যে,—কি চাই? চাঁদা বুঝি? মাইনে কত পাও?
আটশো টাকা! কাকের ঘরে এ যে বকের ছাও!

ওরে ওরে কুর্‌শী দেরে, মশলা তামাক আন্‌,—
মশাই আপনার পদার্পণে ধন্য হ'ল প্রাণ।
আহা, হেঁটে এলেন কেন? আগে খবর দিলে
পাল্‌কী যেত, কাঁধে করে আন্‌তে হেলে দুলে!*

* বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে সেকেলে এক গ্রাম্য জমিদারের বিচিত্র অভ্যর্থনা অবলম্বনে রচিত।

সার্কাস

সন্ধানী

নানারকম আমোদ-প্রমোদের দিকে ছেলেমেয়েদের বিশেষ আকর্ষণ আছে। যেমন ক্রিকেট, হকি, ফুটবল ইত্যাদি খেলা দেখা বা খেলায় অংশ গ্রহণ করা। থিয়েটার, সিনেমা, গান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি দেখা ও শোনার প্রতিও আমাদের সকলের আকর্ষণ কোন অংশে কম নয়, কিন্তু এমন একটা খেলা আছে যা দেখবার বিশেষ আকাঙ্ক্ষা ছেলে বুড়ো সকলেরই সমভাবে আছে। এই ধরণের খেলা শিশু থেকে বুড়ো বয়সী লোক পর্যন্ত সকলকেই আকর্ষণ করে। এইখানেই আমরা বুঝতে পারি বুড়োদের মনের মধ্যে কোনো জায়গায় শিশু-মন লুকিয়ে আছে। তাই বুড়োরা সমভাবে সার্কাস দেখতে উৎসুক হয়। বুড়োদের বললেই তারা বলে—ও সার্কাস কি দেখবে? ও তো ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে; বলার পরেই সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মনে জেগে ওঠে একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা এই সার্কাস দেখবার জন্যে।

শীতের প্রারম্ভে শহরে সার্কাস এসেছে। এই সার্কাসের তাঁবুতে নানান দেশের লোকের সঙ্গে নানারকম জীবজন্তু এসেছে যা তারা চিড়িয়াখানা ছাড়া কখনও দেখতে পায়নি। এবারে আমরা কলকাতায় দেখতে পাচ্ছি সার্কাসের অদ্ভুত জানোয়ারের মধ্যে হিপোপটেমাসের খেলা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কয়েক বৎসর আগে এই কলকাতাতেই খেলা দেখিয়ে গেছে বিখ্যাত জার্মান হেগেনবেকের সার্কাস। এই সার্কাসে অসংখ্য জন্তুজানোয়ার ছিল—এমন কি, এই অদ্ভুত জন্তু জানোয়ারের মধ্যে সামুদ্রিক সীল মাছও ছিল। ছেলেবেলায় বিংশ শতাব্দীর প্রায় আরম্ভ হতেই কয়েক বৎসর কলকাতায় হার্মস্টোনের সার্কাস আসত—তার সঙ্গে আসতো অন্যান্য দু'একটি বিদেশী সার্কাল।

ভাবলে আশ্চর্য হ'তে হয় আমাদের দেশ, বিশেষতঃ বাংলা দেশ সার্কাসে বেশ সুনাম অর্জন করে। প্রোফেসার বোসের সার্কাস—এই নাম আমরা তো ১৯০৮-১০ সাল থেকে ছেলেবেলায় অনেক শুনেছি। এই সার্কাসের দল পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের নানাস্থানে ঘুরে ঘুরে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিল। রয়াল বেঙ্গল টাইগারের নাম এই বোসের সার্কাসই বিশেষভাবে ভারতের বাইরে চারিদিকে প্রচার করেছিল।

আমরা সকলেই কর্নেল সুরেশ বিশ্বাসের নাম ও খ্যাতি জানি। তিনি যোদ্ধা হিসাবে সুদূর দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলে স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন—তিনিও প্রথম জীবনে

ছিলেন একজন সার্কাসের খেলোয়াড়। বাংলাদেশের কত অজ্ঞাত-অখ্যাত ছেলে বিদেশের নানা-প্রকার সার্কাস খেলায় এককালে যোগ দিয়েছিল তার কোনো হিসাব-নিকাস নেই।

এখন আমরা শুনতে পাই, যে ভারতীয় সার্কাস আমরা শহরে শহরে দেখি বা শহরে শহরে যারা দলবল নিয়ে খেলা দেখিয়ে বেড়ায়, তারা প্রায় সবই দক্ষিণ ভারতীয় ও মহারাষ্ট্রীয়। কথাটা মিথ্যা নয়। এই খেলোয়াড়রাই (মেয়েপুরুষ) সমস্ত ভারতীয় সার্কাসের অবলম্বন। কিন্তু ৬০।৭০ বৎসর আগে বাঙালীদেরই এতে প্রাধান্য ছিল।

হিন্দুমেলার নবগোপাল মিত্র খুব সম্ভব ৮০ বৎসর আগে ভারতীয় সার্কাসের সূত্রপাত করেন। তারপর এসেছিল প্রিয়নাথ বসুর নেতৃত্বে বোসের সার্কাস। রাজা রামমোহন রায়ের পৌত্র হরিমোহন রায়ের সার্কাস, কৃষ্ণলাল বসাকের হিপোড্রোম সার্কাস ইত্যাদি। বাঘের খেলায় শ্যামাকান্তের সার্কাস ও তার খেলা যে কতটা অপূর্ব কৃতিত্ব সৃষ্টি করেছিল তা এখনও অনেকের স্মরণে আছে। শ্যামাকান্ত পরে সোহহং স্বামী নাম গ্রহণ ক'রে হিমালয়ে বাস করতেন। শারীরিক উৎকর্ষে বা কসরতে এইসব বাঙালী খেলোয়াড়রাও বেশ সুনাম অর্জন করেছিল—যেমন ভীম ভবানী বা বোসের সার্কাসের কুমুদিনী।

সার্কাসের আকর্ষণের কথা বলতে এসে অন্য কথায় এসে পড়েছি। কিন্তু এর চমৎকারিতা, দক্ষতা সমস্ত প্রকার আমোদের অগ্রণী, এবং এর একটা মোহ আছে, সেইজন্যে ছেলে বুড়োরা সকলেই শহরে সার্কাস এলে দেখবার জন্য একরকম উন্মত্ত হয়ে যায়।

সেইজন্য দেখতে পাই প্রতিবৎসর শীতকালে ছোট বড় সব রকম শহরেই নানা দেশের সার্কাসের আগমন হচ্ছে। এই তো সেদিন মাত্র রাশিয়ান সার্কাস আমাদের সকলকে মুগ্ধ করে খেলা দেখিয়ে গেল।

তবে একটা কথা শুনতে পাই, নানারকম জানোয়ারকে নানারকম খেলা শিখাতে তাদের সব সময় অত্যাচার সহ্য করতে হয়। সেইজন্য জন্তুদের এইরূপ কষ্ট দিয়ে খেলা শেখানোর বিরুদ্ধে একটা মত সৃষ্টি হয়েছে। এইভাবে বিবিধ কষ্টের ভিতর দিয়ে আমরা যে আমোদ পাই, সেটাকে সহজে গ্রহন করতে সবাই রাজী নয়। সুখের বিষয় এই শিক্ষার পদ্ধতি নানাভাবে বদলে গিয়ে এখন অতটা কঠোর বা নির্মম নেই। সেটা এবারে রাশিয়ান সার্কাস যারা দেখেছেন তারা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন।

তাই আবার বলছিলাম, নানাপ্রকার জন্তু জানোয়ার, ক্লাউন, ট্রাপিজের খেলা, ঘোড়ার উপর চ'ড়ে বিচিত্র দৌড় চারিদিকের আলোকমালা ও ব্যাণ্ডের বাদ্য এমন একটা মায়াজালের সৃষ্টি করে, যার আকর্ষণ আমরা ছেলে বুড়োরা কিছুতেই এড়াতে পারি না।

মিঞা সায়েব

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ছোট একফালি দোকান। ছুটি বড দোকানের মাঝখানে রাস্তার দিকের দেওয়ালটিতে কাঠ দিয়ে তৈরী করা। দোকানে শুধু বিক্রি নয়, মেরামতও হয় চশমা আর ফাউন্টেন পেন।

কতদিন থেকে যে দোকানটি খোলা হয়েছে জানি না, কারণ সেই ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি দোকানের মালিক মিঞা সায়েবকে—চোখে এক জোড়া রূপালী চশমা লাগিয়ে, দোকানে বসে কখনও নিবিষ্ট মনে কাজ করতে, কখনও বা ছু' একটি বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দিতে। আবার অনেক সময় দেখেছি মিঞা সায়েব চুপ করে বসে বিড়ি টানছে আর
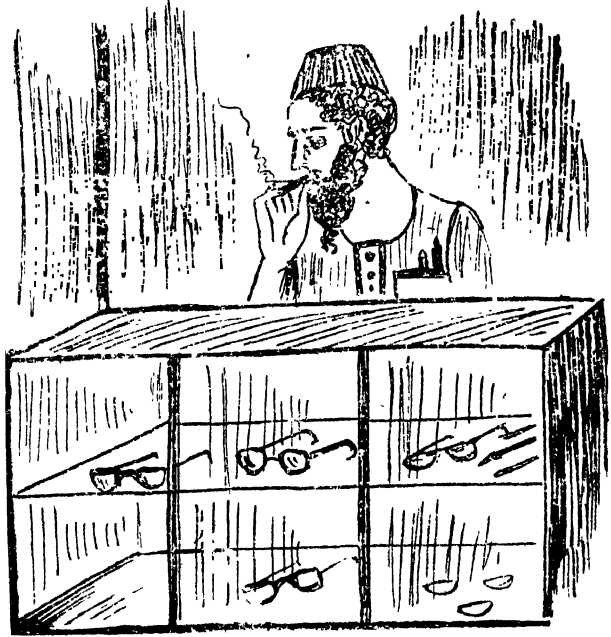
ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে রাস্তার দিকে চেয়ে লোকজন গাড়ী-ঘোড়া দেখছে। সাধারণতঃ বেলা তিনটে সাড়ে তিনটের দিকে মিঞা সায়েব বিশ্রাম পেত, অর্থাৎ চুপ করে বসে বিড়ি খেতে খেতে রাস্তার দিকে চেয়ে থাকত।

চশমার দোকানটি থেকে আমাদের বাড়ী ছিল খুব কাছে। তাই মিঞা সায়েবের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় সেই ছেলেবেলা থেকেই। বেশ মনে আছে, স্কুল থেকে বাড়ী ফেরবার পথে কোন ঘুঁড়ি কেটে গিয়ে আমার মাথার থেকে বেশ খানিকটা উঁচু দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেছি, আর মিঞা সায়েব তার দোকান থেকে দেখতে পেয়ে লম্বা বাঁশ নিয়ে অন্য যারা ঘুঁড়ি ধরবে বলে দাঁড়িয়েছিল তাদের সবায়ের আগে ঘুঁড়িটি ধরে আমায় দিয়ে দিয়েছে।

মিঞা সায়েব সকাল ন'টায় দোকান খুলত আর বন্ধ করত রাত ন'টায়। বেলা দুটো-আড়াইটে নাগাদ একটি লোককে দোকানে বসিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে খেতে বেরিয়ে যেত, তারপর আবার তিনটে নাগাদ দোকানে ফিরে এসে বিড়ি ধরিয়ে একটু জিরিয়ে নিত। দোকানে কাজ প্রায় বেশীরভাগ সময়ে থাকলেও সন্ধ্যার দিকটাতে মিঞা সায়েব একটু বেশী ব্যস্ত থাকত। কারণ যাঁরা সারাদিন স্কুল-কলেজ আপিসে থাকতেন, তাঁরা সাধারণতঃ ঐ সময়টাতেই দরকার থাকলে দোকানে আসতেন।

আশ্চর্যের বিষয় মিঞা সায়েবের দোকান সম্পর্কে এত খবর জানলেও, মিঞা সায়েব কোথায় থাকত, তার বাড়ীতে কে আছে না আছে কোনদিন জানবার চেষ্টা করিনি। কারণ মিঞা সায়েব, মিঞা সায়েব। অর্থাৎ মিঞা সায়েব চশমাওলা। চশমার দোকানই মিঞা সায়েবের পরিচয়।

কিন্তু অনেক পরে একদিন মিঞা সায়েবের বাড়ীর খবরও আমাকে জানতে হয়েছিল। তখন আমি স্কুল-কলেজ পার হয়ে চার পাঁচ বছর চাকরী করছি একটি নামজাদা বিদেশী কোম্পানীতে। আমার ভাগ্য ভালো তাই চাকরীতে তিন বছর থাকবার পর কোম্পানী আমায় বিদেশ ভ্রমণে পাঠিয়ে দিলে সমস্ত কিছু শিখে আসবার জন্যে। প্রথম গেলুম ইংল্যাণ্ড, তারপর জার্মানী, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড।

বিদেশে থাকতে থাকতেই খবর পেয়েছিলুম কলকাতায় দাঙ্গা বেঁধেছে হিন্দু-মুসলমানে। আমাদের কলকাতার বাড়ী হিন্দু পাড়ায়। কাজেই হিন্দুদের এ পাড়ায় কোন ভয় নেই, এই ভেবেই নিশ্চিন্ত ছিলুম। স্বার্থ এমনি জিনিস যে, আমার পাড়ায় মিঞা সায়েব বা অন্য মুসলমান-দের যে কি অবস্থা হতে পারে দাঙ্গায় তা একবারও মনে হয় নি।

তারপর দেশে ফিরে এলুম। দাঙ্গা-হাঙ্গামা তখন ক'মাস হ'ল বন্ধ হয়েছে। ধীরে ধীরে মুসলমানরা হিন্দু পাড়ায় আর হিন্দুরা মুসলমান পাড়ায় যাতায়াত আরম্ভ করেছে। আমাদের পাড়ায় অনেক মুসলমানের দোকানের তালা খুলে গেল। নির্বিবাদে যে যার কাজ করে যেতে লাগল।—কেবল একটি দোকানে তখনও রইল তালা ঝোলান।

হয়ত দু'চার দিনের মধ্যেই সে দোকানটিরও তালা খুলে যাবে, প্রথমটা এই বিশ্বাসই হয়েছিল। কিন্তু দিনের পর দিন চলে যেতে লাগলো তবুও দোকান খোলবার কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না যখন, তখন বাধ্য হয়ে একদিন খবর নিতে গেলুম পাশের রং-এর দোকানটায়।

রংয়ের দোকানের ফতুয়া গায়ে লোকটা আমাকে দোকানে ঢুকতে দেখে, একগাল হেসে, হাতজোড় ক'রে দু'হাত মাথায় ঠেকিয়ে, আমার দিকে এগিয়ে এল। লোকটা বোধ হয় আমার কাছ থেকে বেশ বড় রকমের অর্ডার আশা করেছিল।

যাই হোক খবর যা শেষ পর্যন্ত পেলুম তার কাছ থেকে, তা' হ'ল—যেদিন দাঙ্গা বাঁধে সেই দিনই দোকানে কাজ করতে করতে মিঞা সায়েব অজ্ঞান হয়ে যায়। আশপাশের সকলে ধরাধরি করে ডাক্তারের পরামর্শে তাকে হাসপাতালে দিয়ে আসে। কারণ মিঞা সায়েব অজ্ঞান হয়ে যায় হাই ব্লাড প্রেসারের দরুন এবং হাসপাতালেই একমাত্র তার উপযুক্ত শুশ্রূষা হতে পারে। দাঙ্গার মধ্যে মুসলমান পাড়ায় যাওয়া হিন্দুদের পক্ষে বিপজ্জনক ব'লে পুলিশ গিয়ে দিয়ে আসে মিঞা সায়েবের বাড়ী এই অসুখের খবর।

পার্ক সার্কাস অঞ্চলে একটি ছোট্ট একতলা বাড়ীতে থাকত মিঞা সায়েব—তার একটি মাত্র মেয়ে, জামাই আর দু'চারটি ছোট ছোট নাতি-নাতনী নিয়ে। তারা দাঙ্গার মধ্যেই অনেক কষ্ট করে মিঞা সায়েবকে দেখতে আসত। তারপর ধীরে ধীরে মিঞা সায়েব যখন কিছুটা সুস্থ হ'ল, দাঙ্গা-হাঙ্গাম৷ তখন অনেক দিন থেমে গেছে। 'মাত্র সাত দিন আগে', রংয়ের দোকানের লোকটি বললে, 'মিঞা সায়েব হাসপাতাল থেকে মুক্তি পেয়েছিল, তিন দিন আগে দোকানের ভাড়া পাঠিয়ে জামাইকে দিয়ে ব'লে পাঠিয়েছিল, মিঞা সায়েব সামনের হপ্তা থেকে দোকান খুলবে। কিন্তু সব ফুরিয়ে গেল! যেদিন সকালে ভাড়া নিয়ে জামাই এসেছিল, সেই দিনই বিকেলে মিঞা সায়েব আবার অজ্ঞান হয়ে পড়ে, আর তারপরেই ক' ঘণ্টার মধ্যে সব শেষ!'

কথা ক'টি বলে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে লোকটি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল আর আমিও খনিকটা নির্বাক নিস্পন্দ থেকে জল-ভরা চোখে বাড়ীর দিকে চলে এলুম। মনের মধ্যে একটি তীব্র খোঁচা থেকে থেকে অনুভব করতে লাগলুম এই মনে করে যে, আর ক'টা দিন আগে খবর নিতে এলে মিঞা সায়েবের সঙ্গে হয়ত দেখা করতে পারতুম।

কি সুবোধ ছেলে!

শ্রীশচান মিত্র

ঘোঁতনের ভ্রাতা
ছেঁড়ে বই খাতা
চিবোবেই পাতা
কি পড়ায় মাথা॥

কলম'কে দেখে
ঠুকে নিব বেঁকে
ছুঁড়ে দেয় রেখে
কি লেখাই লেখে॥

কালি যেই পেলে
মেঝেতেই ঢেলে
ঘষে হাত ফেলে
কি সুবোধ ছেলে॥

নূপুর

শ্রীসমর চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

নূপুর ও কাকনের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল তার সঙ্গিনীরা। এদের যেন চেতনা নেই। হঠাৎ কাঁকন বলল—"নূপুর নাচের বাজনা শুনছিল কি ?"

নূপুর নিরুত্তর—কিন্তু তখন লাল রেশমের ঘুঙুর কেঁপে কেঁপে উঠছে।

সঙ্গিনীরা বলল—"ভারী চমৎকার মানিয়েছে তোকে নূপুর"—

"একটু নাচ না নূপুর—"

"দেখ দেখ ! কাঁকনকে দেখ—ওর চোখেও পলক পড়ছে না—"

"নাচ নূপুর নাচ—"

"নাচ কাঁকন নাচ—"

তখন দুজনেরি পা থর থর করে কাঁপছে। ভাবছে কাঁকন—"কোথা থেকে আসছে নাচের বাজনা—? কোথা থেকে আসছে ফুলের সুগন্ধ ? মন্দির থেকে কি ?"

কাঁকন তাকিয়ে দেখল নূপুরের দিকে মুখটি তার আনন্দ-উজ্জ্বল হয়ে উঠছে—কোন্ এক অদৃশ্য সঙ্গীত ও বাজনার সঙ্গে নূপুর নাচতে লাগল। কাঁকন ও। নাচের ছন্দ দিয়ে তালে চলছে। নূপুর ভাল নাচে তা বন্ধুরা জানে। কিন্তু এ যেন অন্য নূপুর। দুটি নূপুর-পরা পায়ে কে যেন তাকে নাচিয়ে চলেছে। কাঁকন যথাসাধ্য চেষ্টা করছে তাকে অনুসরণ করতে।

পথচারীরা চমকে দাঁড়াচ্ছে। তারা শুনতে পাচ্ছে না নাচের বাজনা—অথচ কি অপরূপ তালে নেচে চলেছে মেয়েটা। মৃদঙ্গ নেই, বাঁশী নেই !

ক্ষণেক দাঁড়াল নূপুর—

তাকে থামতে দেখে কাঁকনও থামল।

কিন্তু ক্ষণেক মাত্র। বলল নূপুর—"এ পা দুটো আমার নয় কাঁকন।—"

নেচে উঠলো দু পা—তারপর ধীরে নগরের দিকে চলল নূপুর। কাঁকন ও।

"কোথা যাচ্ছিস তোরা ?" শুধোলো বন্ধুরা।

"যেথায় বাঁশী ও মৃদঙ্গের আওয়াজ পাচ্ছি"—বলল নূপুর।—মন্দিরের চত্বর থেকে তারাও চলল নূপুর কাঁকনের সঙ্গে।

নগরের এক প্রান্তে ছোট্ট একটি পল্লী। ইঁদারার ধারে মেয়েরা এসেছে জল ভরে নিতে।

রঙবেরঙের শাড়ী-পরা ছোট-বড়র দল। হঠাৎ তারা উৎকণ্ঠ হয়ে উঠলো। ঝুম্‌ঝুম্ নূপুরের আওয়াজ আসছে। দেখতে দেখতে এসে পড়ল নূপুর, কাঁকন। তার বন্ধুরা ক্লান্ত—

পল্লীর মেয়েরা স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখল দুটি মেয়ে নেচে চলেছে। পায়ে যেন তাদের ফুলঝুরি ফুটছে। মরি মরি একি নৃত্যছন্দ!

ক্লান্ত সঙ্গীদের একজন বলল—"নূপুর অনেকক্ষণ হ'ল, ভাই—এবার চল বাড়ি যাই।"—এক মুহূর্তের জন্য থামল নূপুর—থামল কাঁকন।

"চল ভাই বাড়িতে ভাববে।"

"না।" মাথা নেড়ে জানাল নূপুর।

"আমার নাচের বাজনা যখন থামবে, তখনই আমি থামব।" পা দু'খানি চঞ্চল হয়ে উঠল নূপুরের, তারপর আবার নাচতে নাচতে চলল এ-পল্লী থেকে সে-পল্লীতে।

"আয় কাঁকন আমরা বাড়ি যাই।"

"তোরা যা—ও একলা কোথায় চলেছে দেখি।" বলে নূপুর যে পথে গিয়েছে সেই দিকেই চলল কাঁকন।

ক্লান্ত সঙ্গিনীরা কাঁকনের চলার পথে তাকিয়ে থেকে মুহূর্ত পরে বাড়ীর পথে চলল। তারা ভীত। তারা যেন কি আশঙ্কায় চঞ্চল।

আরো সময় চলে গিয়েছে। নগরের আরেক প্রান্তে নেচে চলেছে নূপুর। তার দেহে ক্লান্তি ঘনিয়ে আসছে—কিন্তু পা দু'খানার বিরাম নেই। ফুল ফুটিয়ে চলেছে সে পথের ধুলোয় ধুলোয়। রাস্তার দু'ধারে দরজা জানলা খুলে যাচ্ছে। নগরবাসী স্তব্ধ-বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখছে। কাঁকনের নাচ কখন থেমে গিয়েছে। সেই অশরীরী বাজনা আর সে শুনতে পাচ্ছে না। কিন্তু নূপুরের কানে তা আরো উদ্দাম হয়ে বাজছে।

কাতরকণ্ঠে কাঁকন নূপুরকে চেপে ধরল—"নূপুর বাড়ী চল।"

আহা। নূপুরও তো তাই চায়। কিন্তু তার দু'টি পা? সে যে মানা শুনছে না। অস্ফুট কণ্ঠে বলল নূপুর—"কাঁকন, আমার পায়ের লাল-নূপুর খুলে দে ভাই।"

"দিই।" ব'লে কাঁকন নূপুর দুটি খুলতে গেল। কিন্তু এ কি! এ যে বজ্রের মত ওর পায়ের সঙ্গে লেগে রয়েছে। ভয়ে-বিস্ময়ে কাঁকন চেঁচিয়ে উঠল—"খুলছে না নূপুর!—"

রাস্তায় লোক জড়ো হয়েছে। কাঁকন বলছে—"ওগো, তোমার কে আছ ওর পায়ের নূপুর খুলে দাও।"

দু'একজন এল এগিয়ে। কিন্তু না, এ যে খুলছে না!

মলিন হাসি হেসে নুপুর বলল—"কাঁকন তুই যা"—তারপর নাচতে নাচতে বেরিয়ে গেল—কোথায় ?

কাঁকন অস্ফুটস্বরে কি একটা বলল বোঝা গেল না। তারপর ছুটে চলে গেল উল্টো দিক দিয়ে—

নূপুরের মাকে বলতে হবে।

* * * *

নূপুরদের বাড়ীতে তার মা ঘর-বার করছেন। কোথায় নূপুর ? সেই কখন বেরিয়েছে তাঁর চোখের মণি। তার বন্ধুরা এসে বলে গিয়েছে নূপুর নেচে চলেছে। একি বিভ্রাট ! কোথায় কাঁকন !

ঝড়ের মত কাঁকন এসে জড়িয়ে ধরল নূপুরের মাকে। মা শুধোলেন—"নূপুর ? আমার নূপুর কোথায় ? কোথায় রেখে এলি তাকে, বল ?"

"সে নাচছে—নেচেই চলেছে মাসীমা। তাকে থামানো যাচ্ছে না—"

"কেন, কেন ? সে যে এখনও কিছু খায়নি—বাছা আমার !"

"ঐ লাল-নূপুর তার পা থেকে খোলা যাচ্ছে না !"—

"চল চল, আমার নিয়ে চল—"

নূপুরের মা আলুথালু বেশে কাঁকনকে নিয়ে ছুটে চললেন সেই দিকেই—যেথায় নূপুরকে কাঁকন শেষ দেখে এসেছিল নাচতে।

ছোট্ট বাড়ীর অপর দিক থেকে ঢুকলেন নূপুরের মা'র গুরুজী। তাঁর চোখে আকুল বিস্ময়—নগরবাসীর কাছ থেকে তিনি শুনছেন ঐ অপরূপ কন্যার অপরূপ নৃত্য-কাহিনী। আড়াল থেকে শুনছিলেন তিনি কাঁকনের কথা। শিউরে উঠলেন গুরুজী। তারপর যে দিকে কাঁকনরা গেল, সেই দিকে তিনিও ছুটলেন।

* * * *

একি অঘটন। থামছে না নূপুর। শহরের বাইরে যেথায় রাজপথ এসে মিশেছে উপবনের ধারে—নূপুর নেচে চলেছে সেথা। তার পা দুটি চলছে, কিন্তু দেহ নয়। তার শরীর মন বলছে—"ওগো কে আছ আমার দুটি পা থেকে রক্ত-নূপুর খুলে নাও।"

অলক্ষ্যে মৃদঙ্গ মন্দিরা তাকে নিয়ে এক নিষ্ঠুর খেলা খেলছে।

নগর কোতোয়াল ও প্রহরীরা স্তব্ধ। কে এই বালিকা ? কোথায় চলেছে সে একলা এই রাত্তিরে ?

"আয় বাছা তোকে বাড়ী পৌঁছে দিই।" বললে কোতোয়াল।

নূপুর নিরুত্তর।

"কার বাছারে—চল আমাদের সঙ্গে।"—উত্তরে নূপুর ঝম্‌ঝম্ করে ঘুঙুর বাজিয়ে চলে গেল। প্রহরীরা তাকিয়ে রইল তার পথের দিকে।

পাগলের মত প্রবেশ করলেন নূপুরের মা—সঙ্গে গুরুজী—সঙ্গে কাঁকন।

"দেখেছ কেউ আমার নূপুরকে ?"—মা শুধোলেন কোতোয়ালকে।

নিঃশব্দে কোতোয়াল হাত দিয়ে দেখিয়ে দিল—"ঐ দিকে গেছে অসামান্যা—আমরা তাকে রাখতে পারিনি মা—"

ঝড়ের মত মা চলে গেলেন।

*　　　*　　　*　　　*

রাত্রির সাথী সাধুর কণ্ঠ ভেসে আসছে—

"ও কে যায় অমানিশায়—
সুরের ফুলঝুরি আকাশে উঠায়।
আকাশ ভরেছে আজি বন-জোছনায়
ও কে যায়।"

নৃত্যপরা নূপুর সমস্ত শহর প্রদক্ষিণ করে আবার রাজপথে নামে। হায়! হায়! ক'রে ছুটে এসেছেন মা। এতক্ষণে তিনি পেয়েছেন তাঁর দুলালীকে—

চিৎকার করে উঠলেন—"নূপুর মা আমার!" তারপর জড়িয়ে ধরলেন মেয়েকে—

নিঃশব্দে নূপুর দেখিয়ে দিল তার পায়ের দুটি রক্ত-নূপুরের দিকে। বলল—"মা, আমার নূপুর খুলে দাও।"

মা খুলতে গেলেন নূপুর—হাত তাঁর কাঁপছে।

"এ কি খুলছে না তো। গুরুজী এ কি হ'ল ?"

গুরুজী মাকে সরিয়ে খুলতে গেলেন—কিন্তু বৃথা। বজ্রের মত এ লেগে রয়েছে নূপুরের দু'খানি পায়ে।

ডুকরে কেঁদে উঠলেন নূপুরের মা। গুরুজী হঠাৎ সম্বিৎ পেয়ে বলে উঠলেন—'কোথা সে নূপুরওলা—চল শান্তা, সে নূপুরওলাকে খুঁজে বার করি—"

"নূপুরওলা, নূপুরওলা বলতে বলতে—নূপুরের মা ছুটে চললেন সেই গোপুরমের দিকে। তখন পূব-আকাশ ফিকে হয়ে এসেছে। নূপুরের কানে বাজছে মৃদঙ্গ মন্দিরা। কোথা থেকে আসছে শব্দ—সেই মন্দির থেকেই তো! গুরুজী দেখলেন, আস্তে আস্তে টলতে টলতে মুদিত নয়নে সেই মন্দিরের পথে চলেছে নূপুর। পায়ে ফুটছে অপরূপ ছন্দ।

*　　　*　　　*　　　*

নূপুরের মা ছুটতে ছুটতে এসেছেন সেই গোপুরমের সামনে। নূপুরওলার বিপণিতেই পাওয়া যাবে হয়তো তাকে। কিন্তু কই সে নূপুরওলা—বিপণি বন্ধ।

"নূপুরওলা—নূপুরওলা তোমার নূপুর খুলে নাও, আমার নূপুরের পা থেকে।" হাহাকার করে লুটিয়ে পড়ল নূপুরের মা পথের ধুলোয়। স্তম্ভিত পথচারী—পূজার্থীরা আনত শিরে দাঁড়িয়ে রইল। কে সান্ত্বনা দেবে শান্তাকে!

এদিকে নূপুর এগিয়ে আসছে মন্দির অভিমুখে। ক্লান্ত মুখটি আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—দুটি পায়ের নৃত্যছন্দ মুখর করে রেখেছে আজ ভোরের মন্দির-প্রাঙ্গণকে! এসে দাঁড়াল সে গোপুরমের দরজায়—তাকাল বিপণির দিকে—যেখানে সে রক্ত-নূপুর পরেছিল—তাকালো ভূতলে শায়িত মায়ের দিকে—তাকালো সে মন্দিরের চূড়ার দিকে—তারপর কাহার অদৃশ্য আহ্বানে সে গোপুরমের সিংহদ্বার দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করলো। আজ নগরীর সমস্ত নাগরিক ঐ মন্দির দরজায়। তারাও ঢুকল মন্দিরে। গুরুজী মাকে তুলে নিলেন—"চল বেটি, এ-নৃত্যের শেষ অধ্যায় আগত।"

* * * *

নাচতে নাচতে নূপুর এসে দাঁড়ালো বিগ্রহের সম্মুখে—তার দেহ-বল্লরী থরথর করে কাঁপছে। সহসা সমস্ত মন্দির-প্রাঙ্গণে ধ্বনিত হ'ল কাহার অপূর্ব কণ্ঠের সঙ্গীত—

"গড়ে যাই আমার নূপুর
সরগম দানা দিয়ে।"

অস্ফুট কণ্ঠে সবাই বলল—"নূপুরওলা।" সত্যিই সে। ঐ সেই সৌম্যদর্শন নূপুরওলা।

জগতের সবটুকু স্নেহ দুই চোখে নিয়ে নূপুরওলা এগিয়ে এল নূপুরের দিকে। তাকে অনায়াসে নিজের কোলে তুলে নিয়ে ভারী সন্তর্পণে রক্ত-নূপুর দুটি খুলে নিল সে। কণ্ঠে তার গানের কলির ধুন ধ্বনিত হচ্ছে মৃদু স্বরে—

"এ নূপুর তারেই সাজে
সুরেলা হৃদয় আছে।"

নূপুর দুটি খুলে নিয়ে আস্তে আস্তে তাকে শুইয়ে দিল বিগ্রহের সামনে।

"ঘুমোক ও আজ ক্লান্ত।"

মন্দিরে তখন পূর্ণ-আরতির ঘণ্টা বেজে উঠেছে। পূজারী দৃপ্ত হস্তে তুলে নিয়েছে তার পঞ্চপ্রদীপ। ধূপ ধুনার সুগন্ধে মন্দির পূর্ণ। কিন্তু কোথায় সে নূপুরওলা?

বিস্মিত চকিত পূজার্থীরা দেখল বিগ্রহের দুটি পায়ে জ্বল জ্বল করছে রক্ত-নূপুর।
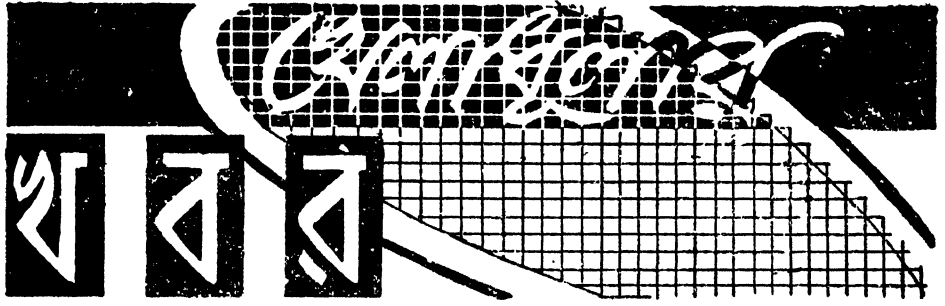
মেঠুড়ে

মোহনবাগানের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী

মোহনবাগান ক্লাবের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে তুটো প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলা হয়। কমনওয়েলথ ও জয়ন্তী কমিটির সভাপতি দলের তিনদিনের খেলাটি অমীমাংসিত থেকে যায়। কমনওয়েলথ ও পশ্চিম বাঙালার মুখ্যমন্ত্রী দলের পাঁচদিনের খেলায় কমনওয়েলথ দল এক উইকেটে জয়ী হয়। অবশ্য দ্বিতীয় প্রদর্শনী খেলার ফলাফল মীমাংসা হতে পাঁচদিন সময় লাগেনি—চারদিনেই খেলা শেষ হয়।

সানাইয়ের সুরের সঙ্গে এক অভিনব ব্যবস্থায় খেলা আরম্ভ হয়েছিল। খেলা যাঁরা দেখেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, তাঁদের চোখ ও মন পরিতৃপ্ত হয়েছে। অবশ্য খেলার ভেতর হালকা আবহাওয়া ছিল। কোনো কিছুর ওপর বেশী গুরুত্ব না দিয়ে খুশির আমেজে খেলে গেছেন তু-দলেরই খেলোয়াড়রা।

প্রথম প্রদর্শনী খেলায় কমনওয়েলথ দলের অধিনায়ক পিটার রিচার্ডসন ও বেসিল বুচারের সেঞ্চুরী ও প্রথম দিনে কমনওয়েলথ দলের ৬ উইকেটে ৪১৮ রান করার কৃতিত্ব সত্যই চিত্তাকর্ষক। এ ছাড়া খ্যাতনামা কলিন কাউড্রের ৪০ রান এবং পাকিস্থানের মুস্তাক মহম্মদের ৪৪ রানও উল্লেখ করার মতন। বাঙালার খেলোয়াড় দিয়ে গড়া জুবিলি দল শক্তিশালী কমনওয়েলথ দলের সঙ্গে সমানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারলে হয়তো খেলাটি আরো আকর্ষণীয় হ'ত, কিন্তু তা হয়নি। ফলে বিদেশী খেলোয়াড়রাই মারের ছটায় দর্শকদের এক তরফা হাততালি কুড়িয়েছেন।

দ্বিতীয় প্রদর্শনী খেলায় ভারতের টেষ্ট খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়া মুখ্যমন্ত্রীর দল কমনওয়েলথ দলের সঙ্গে সমান তালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় খেলাটি খুবই আনন্দদায়ক হয়। এ খেলায় তু-দলের খেলোয়াড়দের ব্যাটিংয়ের চটক ছিল প্রাণবন্ত। চারদিনে তু-দল ১৫৬০ রান তোলে। এ সংখ্যা থেকেই বেপরোয়া ব্যাটিংয়ের আনন্দ তোমরা পাবে।

মুখ্যমন্ত্রীর দলের খেলোয়াড়দের ভেতর চাঁদু বোরদের একটা সেঞ্চুরী সমেত দু-ইনিংসে ১৮১ রান, সেলিম দুরানীর প্রথম ইনিংসে ৯২ রান, দ্বিতীয় ইনিংসে হনুমন্ত সিংয়ের চোখ জুড়ানো সেঞ্চুরী, জয়সীমার ৬৪, মাত্র চল্লিশ মিনিটে দুটো ওভার বাউণ্ডারীর সঙ্গে রামকান্ত দেশাইয়ের ৬৮ রানের কথা ক্রিকেট ক্রীড়ামোদীদের অনেক দিন মনে থাকবে। কমনওয়েলথ দলের খেলোয়াড়দের ভেতর সোবার্সের কথা মনে থাকবে তাঁর হাতের পরম রমণীয় মারগুলোর জন্যে। বর্তমান বিশ্বের সব সেরা চৌকস খেলোয়াড় সোবার্সেয় বোলার হিসেবে দক্ষতাও কম নয়। কিন্তু তাঁর প্রথম ইনিংসের ৮৩ রান আর দ্বিতীয় ইনিংসের ১০২ রান চোখ ভরে দেখার মতন। এছাড়া, কাউড্রে, স্মিথ, ক্লোজ প্রমুখ খুব ভালো খেলেছেন।

ডুরাণ্ড কাপ বিজয়ী মোহনবাগান

প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উৎসবের বছরে মোহনবাগানের ডুরাণ্ড জয় যেমন তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, তেমন ডুরাণ্ড ফাইন্যালে বাঙলার দুটো দলের পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ভারতের ফুটবল-ক্ষেত্রে পশ্চিম বাঙলার একচ্ছত্র প্রাধান্যের প্রমাণ। শুধু ফাইন্যালে দুটো দলের কথাই বা বলি কেন, সেমি-ফাইন্যালে হেরে যাওয়া বি. এন. রেলও বাঙলার টিম। সুতরাং মোহনবাগান যেমন ডুরাণ্ড জিতে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিয়েছে, তেমনি বাঙলার খেলোয়াড়রা প্রমাণ করেছে ভারতীয় ফুটবলে তাদের পর্যাপ্ত আধিপত্য।

মোহনবাগানের সঙ্গে ডুরাণ্ড কাপের অনেক স্মৃতি জড়ানো। প্রথম যুগে ব্রিটিশ সামরিক দলগুলো নিয়েই ডুরাণ্ডের খেলা হ'ত। মোহনবাগানকে খেলায় সুযোগ দেবার জন্যে ডুরাণ্ডের নিয়ম বদলে বে-সামরিক দলগুলোর জন্যে ডুরাণ্ডের দ্বার মুক্ত হয়। তারপর ১৯৫০ সালের আগে মোহনবাগান ফাইন্যালে উঠতে না পারলেও ব্রিটিশ সামরিক ফুটবল দলগুলোর সঙ্গে মোহনবাগান অনেক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ডুরাণ্ডে আরম্ভ হয়েছে ভারতীয় প্রাধান্য। এই যুগেও ডুরাণ্ডের জয়ের তালিকায় মোহনবাগানের জায়গা প্রথমে। ১৯৫৯ সাল থেকে আরম্ভ করে মোহনবাগান প্রতিবারই ফাইন্যালে খেলছে। তার ভেতর চারবার জিতেছে, একবার হেরেছে।

এবার একদিক থেকে মোহনবাগান এবং আরেক দিক থেকে ইস্টবেঙ্গলকে ফাইন্যালে উঠতে বেশ কিছু প্রবল বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে। মোহনবাগান একে একে হারায় শিখ রেজিমেণ্টাল সেণ্টারকে ৩-০ গোলে এবং সেমিফাইন্যালে বোম্বের টাটা স্পোর্টস ক্লাবকে ১-০ গোলে। অপর দিকে সিমলা ইয়ংকে ৩-০ গোলে, গুর্খা ব্রিগেড দলকে ৪-০ গোলে, ই. এম. ই. দলকে ১-০ গোলে ও সেমি-ফাইন্যালে বি. এন. রেল দলকে ২-১ গোলে হারিয়ে ইস্টবেঙ্গল

ফাইন্যালে উঠে। ফাইন্যালে মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলকে ২-০ গোলে হারিয়ে পাঁচ বার ডুরাণ্ড জয়ের সম্মান পায়। পাঁচ বার ডুরাণ্ড জয়ের মধ্যে অবশ্য একবার যুগ্ম-জয়ের অপর অংশীদার মোহনবাগানেরই প্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল ক্লাব।

এই বছর ডুরাণ্ড ফাইন্যালে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে মোহনবাগানের জয় ক্রীডাধারার সংগতি-সূচক ফলাফল। মোহনবাগান দু-অর্ধেই প্রতিপক্ষের ওপর প্রাধান্যের পরিচয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে এবং প্রতি অর্ধে করেছে একটা করে গোল। প্রথমার্ধের পাঁচ মিনিটের সময় লেফট-আউট অরুময় প্রথম গোল করেন। দ্বিতীয়ার্ধের চার মিনিটের সময় দ্বিতীয় গোলটি করেন সেণ্টার ফরোয়ার্ড অশোক চ্যাটার্জি। ইস্টবেঙ্গল ডুরাণ্ডে হারলেও মোহনবাগানের সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

ভারত বনাম সিংহলঃ প্রথম টেস্ট ম্যাচ

ব্যাঙ্গালোরে ভারত ও সিংহলের বে-সরকারী প্রথম টেস্ট খেলায় ভারতীয় দল এক ইনিংস ও ৪৬ রানে সিংহলকে হারিয়ে দেয়। চারদিনের এই টেস্ট খেলা শেষ হতে পুরো তিনদিনও সময় লাগেনি। তৃতীয় দিনের খেলা শেষ হবার নির্দিষ্ট সময়ের আধ ঘণ্টা আগেই খেলা শেষ হয়। শক্তিহীন সিংহল দলের বিরুদ্ধে ভারতের খেলোয়াড়রা ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং—সব কিছুতেই পর্যাপ্ত প্রাধান্যের পরিচয় দেন। সেঞ্চুরী করেছেন সারদেশাই ও হনুমন্ত সিং এবং আব্বাস আলী বেগ মাত্র চার রানের জন্যে সেঞ্চুরী করতে পারেন নি। চন্দ্রশেখর নিয়েছেন দু-ইনিংসে দশটা উইকেট। সিংহল দলের খেলোয়াড়দের এই টেস্টে দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিংয়ের পরিচয় না মিলেছে এমন নয়। এডওয়ার্ড, পুন্নাইয়া, জয় সিংহে ও অধিনায়ক টিমেরা মোটামুটি ভালো রান করেছেন।

অষ্ট্রেলিয়া বনাম পাকিস্তানঃ প্রথম টেস্ট ম্যাচ

মেলবোর্ণ মাঠে অস্ট্রেলিয়া ও পাকিস্তানের প্রথম টেস্ট খেলার ফলাফল অমীমাংসিত থেকে যায়। শেষ দিনের খেলায় জয়ের জন্য অস্ট্রেলিয়ার যখন ১৬৬ রান দরকার এবং ১২৭ মিনিট হাতে তখন পিটিয়ে রান তুলতে চেষ্টা করে তারা ৭১ মিনিটে ৮৮ রান সংগ্রহ করলে বৃষ্টির জন্য খেলা বন্ধ হয়ে যায়। ফলাফলের মীমাংসা না হলেও চারদিনের খেলায় ১১৪৯ রান ওঠায় খেলাটিকে চিত্তাকর্ষক খেলার পর্যায়ে ফেলা যায় এবং পাকিস্তান তাদের অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম সফরে যেভাবে খেলেছে তার জন্যে প্রশংসাও প্রাপ্য। পাকিস্তানের প্রথম ইনিংসের ২৮৭ রানের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়া যখন ৪৪৮ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করে তখন দ্বিতীয় ইনিংসে পাকিস্তানের আশঙ্কার কথা। কিন্তু হারার আশঙ্কার ভেতর পাকিস্তানের খেলোয়াড়রা দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ৩২৬ রান

সংগ্রহ করেছেন। পাকিস্তাতের অধিনায়ক হানিফ মহম্মদই একমাত্র খেলোয়াড় যিনি এই খেলায় একটা সেঞ্চুরী করেছেন এবং মাত্র সাত রানের জন্যে আর একটা সেঞ্চুরী করতে পারেন নি। করতে পারলে তিনি পৃথিবীর আর তিনজন খেলোয়াড়েয় সঙ্গে নিজের নাম যুক্ত করতে পারতেন, যাঁরা টেস্ট খেলায় দু-বার করে দু-ইনিংসেই সিঞ্চুরী করেছেন।

অস্ট্রেলিয়া ও পাকিস্তানের মধ্যে এটি ছিল দু' দেশের ষষ্ঠ এবং অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে পাকিস্তানের প্রথম টেস্ট খেলা। পাকিস্তানের আগের পাঁচটা টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া দুটো খেলায় এবং পাকিস্তান একটা খেলায় জেতে এবং দুটো খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। এটি নিয়ে তিনটে খেলায় ফলাফল অমীমাংসিত রইল।

কাঠপুতুলীর বিয়ে

শ্রীনির্মল ভট্ট

ডুম্ ডুমাডুম ব্যাণ্ডি বাজে,
কাঠপুতুলীর বিয়ে।
কেষ্ট মাটির বর এলো ঐ
টোপর মাথায় দিয়ে॥
শোলার টোপর নয় তো রে ভাই,
এ যে সোনার তাজ।
হীরের মুকুট মাথায় দিয়ে
আস্‌বে মহারাজ॥
মহারাজের রাজ্য আছে
সাত শো হাটিম টিম।
তেপান্তরের মাঠে তারা
পাড়ছে সোনার ডিম॥

তেপান্তরের মাঠের পারে
নিঝুমপুরীর দেশ।
কুঁচবরণ কন্যা ঘুমায়,
মেঘবরণ কেশ॥
সোনার খাটে কন্যা ঘুমায়,
রুপোর খাটে পা।
সেই পুরীতে যায় কেবলি
মন-পবনের না॥
মন-পবনের নায়ের খবর
জান্‌তে যদি চাও।
সব যে জানে, আণ্ডিকালের
টিয়ের কাছে যাও॥

বিচিত্র-সংবাদ

মডেলের ছাঁচে বড় জাহাজ

মোটরগাড়ী বা সিগারেটের মত কলে একটার পর একটা জাহাজ তৈরী করা যায় না, কারণ বিরাট বিরাট জাহাজ সমুদ্রে যাবার আগে ভাসিয়ে পরীক্ষা করা তো সম্ভব নয়। তাহলে না ভাসিয়েই কি বড় বড় জাহাজ তৈরী হয়? না ভাসলে তো সবকিছুই বরবাদ যাবে। সে তো লোকসান। তাই পশ্চিম জার্মানীর হামবুর্গে, যেখানে সমুদ্রগামী সব জাহাজ তৈরী হয়, সেখানকার পরীক্ষামূলক জাহাজনির্মাণ প্রতিষ্ঠানে বড় বড় জাহাজের ১২ থেকে ৩৬ ফুট লম্বা মডেল জাহাজ তৈরী করে ছোটখাট নকল সমুদ্রে আগে ভাসিয়ে চালিয়ে দেখা হয়। নকল সমুদ্রে আসল সমুদ্রের সবরকম ব্যবস্থা সৃষ্টি করার আয়োজন আছে। দেড়হাজার ফুট লম্বা চৌবাচ্চায় মডেল জাহাজ কিরকম চলে তা দেখার জন্যে জটিল বৈদ্যুতিক জরিপ-যন্ত্র আছে। মডেল জাহাজ ঐ চৌবাচ্চায় সেকেণ্ডে ১২০ ফুট, অর্থাৎ ঘণ্টায় প্রায় ৭০ মাইল বেগে চালিয়ে দেখা হয়, আর তখন মডেল জাহাজের প্রতিটি হালচাল খুব স্পর্শকাতর নানারকম যন্ত্রের সাহায্যে লক্ষ্য করা হয়। পরীক্ষায় সফল হলে, তবেই ঐ মডেল জাহাজের মাপজোপ হিসেব করে বড় বড় সমুদ্রগামী জাহাজ তৈরীতে হাত দেওয়া হয়।

গ্রীষ্মকালের খেলা হিসাবে "রোল্‌ক"-এর জনপ্রিয়তা

তুষারাবৃত পর্বতে স্কি-খেলা য়ুরোপে খুব জনপ্রিয়, কিন্তু তুষারহীন পর্বতে তো আর স্কি খেলা যায় না। তবে সেজন্যে বসে থাকাও তো চলে না। সুতরাং এমন কিছু বানাও যাতে তুষারহীন পর্বতেও স্কি-খেলার আনন্দ উপভোগ করা যাবে। আর তার ফলেই আবিষ্কার হয়েছে রোলার-স্কি বা "রোল্‌কা", যেটা মাঠে ঘাটে কাদা, মাটিতে বা পাথুরে জমিতে অক্লেশে গড়িয়ে চলে। এটি যাতে কোনদিকে না হেলে যায়, সেজন্যে দু'দিকে ঠেকা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। "রোলকা" তৈরী করেছেন পশ্চিম জার্মানীর যন্ত্র উদ্ভাবক জোসেফ কাইজার। বছরের যে সময় পর্বতে তুষার থাকে না, সেই সময় অভ্যাস বজায় রাখার জন্যে পশ্চিম জার্মানীর নামকরা খেলিয়েরা অনেকেই "রোলকা" কিনেছেন।

হামবুর্গ বন্দরের আকাশ-ছোঁয়া ইমারত

হামবুর্গ বন্দরের যেখানে দেশ-বিদেশের জাহাজ এসে ভিড় জমায়, ঠিক তার কয়েক গজ দূরেই ভবিষ্যতে এক আঠারো তলা আকাশ-ছোঁয়া ইমারত উঠবে। এই ইমারতের নামকরণ

হয়েছে "ইউরোপয়েন্ট"। এই ইমারত ঘিরে তৈরী হবে পাঁচটি কাঁচের প্যাভিলিয়ন, যেখানে নানা জিনিসের প্রদর্শনী হবে। আর থাকবে একটি রেস্টুরেণ্ট, সভা-সমিতির একটি হলঘর, নানারকমের খেলাধুলার ব্যবস্থা, ছোটদের পার্ক ও খেলার জায়গা ও বেশ কয়েক শত গাড়ী পার্ক করার জায়গা।

এই ইমারতটি হবে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়বস্তুর একটি সঙ্গমস্থল। য়ুরোপ ও বিদেশী কুড়ি-তিরিশটি দেশ তাদের উৎপন্ন সেরা সামগ্রী এখানে স্থায়ীভাবে রেখে দেবে ও সেসব সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য পরিবেশনের ব্যবস্থা করবে। এর ফলে একটি দেশ অপর দেশের জিনিসপত্রের সঙ্গে উৎপন্ন দ্রব্যের তুলনা করার সুযোগ পাবে।

তাছাড়াও এই ইমারতের কিছুটা হোটেল হিসেবও ব্যবহার করা হবে। এই ইমারতের পরিকল্পনা করেছেন হামবুর্গের কুর্ট লাডেনডর্ক। আট বছরের চেষ্টায় কর্তৃপক্ষ তাকে এই ইমারত নির্মাণের অনুমতি দিয়েছেন। আগামী বছরে এই ইমারত নির্মাণ শুরু হবে এবং শেষ হবে ১৯৬৭ সনে।

বন শহরের সেরা অংশ বাদগোদেসবের্গ

বছর পনের আগের কথা। আজকের রাজধানী বন ছিল তখন ছোট্ট, ঘুমন্ত এক বিশ্ববিদ্যালয় শহর। হঠাৎ একদিন বন হয়ে গেল পশ্চিম জার্মানীর রাজধানী। কূটনীতিক, পার্লামেণ্ট সদস্য, বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা, সরকারী কর্মচারী আমলায় ভরে গেল বন! কিন্তু অত লোকের ঠাই কোথায়? তাই বন শহরকে প্রসারিত হতে হ'ল চারদিকে। সেদিক দিয়ে শহরের আট মাইল তফাতে শহরতলী বদাগোদেসবের্গ সবচেয়ে জমজমাট হয়ে উঠেছে। সমাজের গণ্যমান্য মানুষরা ও দেশ-বিদেশের কূটনৈতিক কর্মচারীরা এখানেই তাদের উপনিবেশ গড়ে তুলেছে।

রাজধানী বন থেকে কাজকর্ম সেরে গাড়ীতে বাদগোদেসবের্গ পৌঁছতে মাত্র পনের মিনিট সময় লাগে। আসতে আসতে পথের দু'পাশে দেখা যায় নতুন ও পুরাতন বাদগোদেসবের্গের সহাবস্থান। এখানকার প্রস্রবণের জলের খুব নাম, ৭৫০ বছরের প্রাচীন দুর্গটিও এখানকার দর্শনীয় বস্তু। স্থানীয় অধিবাসীদের আনন্দবিধানের জন্যে এখানে আছে একটি থিয়েটার, গুটিচারেক সৌখীন পানশালা ও একটি নাচঘর। পরিবারবর্গ নিয়ে মোট প্রায় সাড়ে চারহাজার কূটনীতিক এখানে বাস করে। এছাড়া একান্নটি রাজদূতাবাস ও পঞ্চান্নটি ইমারত এখানকার রাইন নদীর তীরে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। পথে-ঘাটে বেরুলে জার্মানের চেয়ে ইংরেজী বেশি শুনতে পাওয়া যায়।

আশ্চর্যের কথা, গত মহাযুদ্ধে মিত্রপক্ষের বোমার ঘায়ে জার্মানীর কোন শহর যেখানে রেহাই পায়নি, সেখানে বাদগোদেসবের্গের গায়ে একটুও আঁচড় লাগেনি। রাজধানী বন শহরে নতুন যারা কাজকর্মে আসে, সবাই থাকার জন্যে জায়গা খোঁজে বাদগোদেসবের্গে। কারণ, এখানকার আবহাওয়া বেশ সুন্দর, হাসিখুশি ও স্বচ্ছতাপূর্ণ। ১৯৩৯ সনে এখানকার জনসংখ্যা ছিল উনত্রিশ হাজার, কিন্তু আজ এখানের লোকসংখ্যা সত্তর হাজারের কাছাকাছি। ফলে, এখানের জমির দাম প্রায় দেড়হাজার গুণ বেড়ে গেছে।

একটি ঐতিহাসিক ফোয়ারার কাহিনী

ফিলিপাইনের জাতীয় বীর নেতা জোসে রিজালের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি পশ্চিম জার্মানীর বাদেন রাজ্যের হ্বিলেম্‌সফেন্ট গ্রামে ফিলিপাইনের রাষ্ট্রদূত ডাক্তার মেলসোর অ্যাকুইনোর নেতৃত্বে এসেছিলেন তিরিশ জন ফিলিপাইনের অধিবাসী নিয়ে গঠিত একটি সদস্যদল। এই গ্রামটি হাইডেলবার্গ থেকে মাইল পঁচিশেক দূরে অবস্থিত। রিজালের স্মরণে এখানে একটি ফোয়ারা তৈরী করা হয়েছিল। একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের পর ঐ ফোয়ারটি ফিলিপাইন দলের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

চক্ষুচিকিৎসা বিদ্যা শেখার উদ্দেশ্য নিয়ে জোসে রিজাল মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। এখানকার দার্শনিক মার্গে বেড়াতে বেড়াতে রিজালের সঙ্গে একদিন পরিচয় হয়ে যায় হ্বিলেম্‌সফেন্টের যাজক উলমেরের সঙ্গে। উলমের আমন্ত্রণ জানালেন রিজালকে তাঁর নির্জন গ্রামে। আমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে, রিজাল এসে রইলেন বৃদ্ধ যাজকের সঙ্গে পাঁচমাস। তিনি যখন এখানে ছিলেন, সেই সময়, অর্থাৎ ১৮৮৬ সনে ঐ গ্রামে ভীষণ জলকষ্ট দেখা দেয়। গ্রামের গির্জার সামনে ছিল একটি ফোয়ারা, কিন্তু সেটিও শুষ্ক। হঠাৎ একদিন দেখা গেল কাছের একটি পাহাড়ী ঝর্ণার জল এক আশ্চর্য উপায়ে এসে ঐ ফোয়ারার মুখ দিয়ে পড়ছে। রিজাল সেই জল পান করে তৃষ্ণা মেটালেন, আর এই অলৌকিক কাণ্ড দেখে গ্রামের মানুষ বিস্ময়ে অভিভূত হ'ল। সেই থেকে ফিলিপাইনবাসীদের কাছে হ্বিলেম্‌সফেন্টের গির্জাটি এক তীর্থে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া হ্বিলেম্‌সফেন্টের কাছে ফিলিপাইনবাসীরাও যে প্রিয়, তার প্রমাণস্বরূপ এই বছর গির্জার সামনের রাস্তাটির নাম রাখা হয়েছে, জোসে রিজাল পথ।

মাত্র কিছুদিন হয়েছে, ফোয়ারাটির লাল বেলে-পাথরের গাঁথনি একটি একটি করে খুলে বাক্সবন্দী করে ম্যানিলায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।
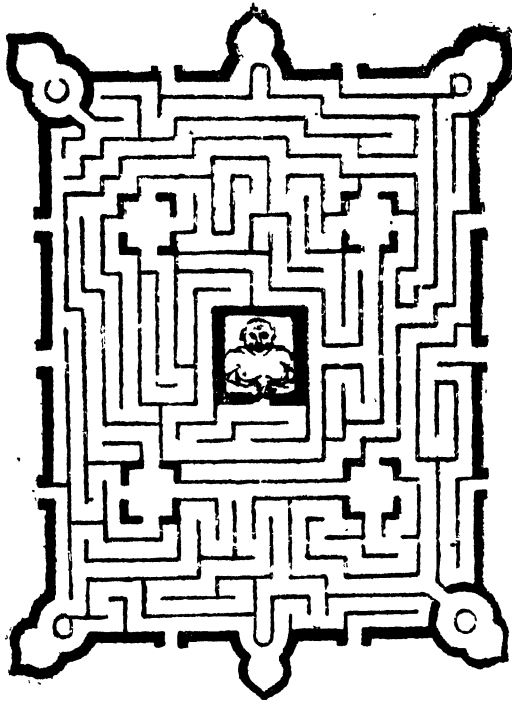
ধাঁধার পাতা

ছেলে-ধরা বুড়ো

বেরিয়েছিলো ছেলে-ধরা মাণিকতলার মোড়ে
বস্তা ভ'রে নিয়ে যেত ছেলে ধ'রে ধ'রে।
আটটা ছেলে ধরার পরে দারোগা এক এসে,
অনেক ফন্দি এঁটে তবে ধরলো তারে শেষে।
মস্ত উঁচু পাঁচিল-ঘেরা গোলকধাঁধার মত
গারদ-পুরে পাহারা দিত রক্ষী শত শত।
তারই মাঝে ফাঁক পেয়ে সেই ছেলে ধরা বুড়ো
পালিয়ে গেলো ফুড়ুৎ করেথ' জমাদার খুড়ো।
দারোগা দিয়ে মাথায় হাত ভাবছে বসে বসে
কোথা দিয়ে কি মন্তরে পালিয়ে গেলো সে!
তোমায় যদি ঐ গারদে রাখতো পুলিস ধরে।
পালিয়ে তুমি যেতে ভেবে দেখ কেমন করে?

বিমান-যুদ্ধ

জাপানীরা ফেললো বোমা কলকাতার 'পরে
খুঁজতে বিমান সিপাইরা সব সার্চলাইট ধরে।
খপ্ কোরে ঐ লাফ দিল কে জড়িয়ে প্যারাসুট্
নামলো খিদিরপুরের মাঠে দেহটি অটুট্।
সন্-সন্-সন্ বইছে বাতাস নামাতো নয় সোজা!
খানিক নামা খানিক ওঠা ভারী কঠিন বোঝা।
নামতে গেলে বোমার বর্ষণ উঠতে গেলে আলো
এই কথাটি রাখলে মনে বুঝবে ধাঁধা ভাল।
এমনি করে এঁকে-বেঁকে নামলো যে কলকাতা
কোন্ পথে তা' দেখাও দিকি খাটিয়ে
তোমার মাথা।

(সমালোচনার জন্য দু'খানি বই পাঠাবেন।)

শিশু-সাহিত্যের ক্ষেত্রে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের নামটি চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তাঁর 'হাসিখুশি'র ছড়াগুলি আজও সকলের মুখে মুখে ফেরে। **'শিশু-চয়নিকা'** তাঁর আর একখানি সচিত্র পদ্যের বই। এমন সহজ কথায় ছেলেমেয়েদের মন ভোলাবার এবং ভোলা জিনিস মনে করিয়ে রাখবার যাদু ও মিলের কৌশল এক সুকুমার রায় ছাড়া আর কারু মধ্যে দেখা যায় না। প্রত্যেকটি কবিতা পড়েই ছোটরা আনন্দ পাবে এবং মুখস্থ করে ফেলবে। ছবিতে-ছবিতে ভরা বইখানি ছোটদের হাতে নিঃসন্দেহে তুলে দেওয়া যায়। বইখানি প্রকাশ করেছেন, **সিটি বুক সোসাইটি, ৬৪ কলেজ ষ্ট্রীট,** কলিকাতা থেকে। দাম ২·৫০ পয়সা।

ধীরেন্দ্রলাল ধরের বইয়ের সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। খুবই লিখতে পারেন ভদ্রলোক! সম্প্রতি শেক্সপীয়রের একটি ছোট্ট পরিচয়সহ তাঁর নামকরা বইগুলির সংক্ষিপ্ত কাহিনী সুন্দরভাবে স্থান গ্রহণ করেছে 'শেক্সপীয়রের গল্প' নামক এই বইখানির মধ্যে। কিশোর-কিশোরীরা এই বই থেকে শেক্সপীয়রের রচনা—হ্যামলেট, জুলিয়াস সীজার, ম্যাক্‌বেথ, ওথেলো, রোমিও ও জুলিয়েট, কিং লিয়ার, দি টেমপেষ্ট, মার্চেন্ট অব্ ভেনিস প্রভৃতি আঠারোখানি বইয়ের পরিচয় পাবে এই বইয়ে। এই আঠারোটি কাহিনীর ছবি নিয়ে প্রচ্ছদপটটিও ভারী সুন্দর হয়েছে। বইখানির ছাপা ও কাগজ ভালো এবং সে তুলনায় দাম দু'টাকা পঞ্চাশ পয়সা মোটেই বেশী বলে মনে হয় না। ১।৬২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ১২ থেকে অশোক প্রকাশনের ধনঞ্জয় প্রামাণিক বইখানি প্রকাশ করেছেন।

এর পর আর তিনখানি বইয়ের নাম করেই এবারকার নতুন বইয়ের কথা আমাদের শেষ হবে। এর তনখানির নাম **'ছড়ায় ছড়ায় গল্প'** ও অপরখানির নাম **'কুঁড়ি ও ফুল'**। তৃতীয় বইখানি সম্পাদনা করেছেন, শ্যামাপ্রসাদ সরকার। এই সংকলন বইখানির নাম **'সোনার কাঠি রুপোর কাঠি'** 'ছড়ায় ছড়ায় গল্প'টি লিখেছেন বিজনকুমার চট্টোপাধ্যায়, এবং বইটি প্রকাশ করেছেনও তিনি নিজেই ২৫০, শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা-৩১ থেকে। দাম এক টাকা পঁচাত্তর পয়সা। বিষ্ণুশর্মা ও ঈশপের কাহিনীর মত কতকগুলি কাহিনী অত্যন্ত সহজ মিলের ছড়ার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে এই বইয়ে। ছড়ার চেয়ে এগুলিকে গাথা বা পদ্য

বললেই ভাল হয়। কারণ, আকারে এর অনেকগুলিই দীর্ঘ এবং কোথাও নিছক প্রাণখোলা হাসি এবং কোথাও বা তলে তলে শিক্ষার বিষয় পরিবেশিত হয়েছে। প্রত্যেকটি পদ্যের সঙ্গে পাতায় পাতায় ছবি থাকায় ছোটদের কাছে বইটি খুবই আকর্ষণীয় হবে সন্দেহ নেই। কবিশেখর কালিদাস রায় বহু প্রশংসা করে এই বইয়ের একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছেন।

'কুড়ি ও ফুল'-এর লেখক শ্রীরমেশচন্দ্র দাশগুপ্ত। এই বইখানি বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে ছোটদের সহজ ভাষায় কতকগুলি মিষ্টি-মধুর পদ্য সংযোজিত হয়েছে শেষাংশে। স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের পরিচয়দানের সঙ্গে যে সমিল দু'টি করে পঙ্‌ক্তি দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে যথেষ্ট নতুনত্ব আছে। সুন্দর কাগজে বড় বড় হরপের অক্ষরগুলি ও সেই সঙ্গে ছবিগুলি ছেলেমেয়েদের পড়ার প্রতি অবশ্যই আগ্রহ জাগাবে। গ্রন্থকার নিজেই এই বইয়ের ছবিগুলি এঁকেছেন।

শেষ বইখানির একটি বিশেষ পরিচয় আছে। একটি রূপকথায় সংকলন এবং তার জন্যে সাজগোজ, ছবি, ছাপা যা-যা দরকার তার সবই সুন্দরভাবে সাজিয়ে তুলেছেন সম্পাদক। লেখাগুলিও যা-যা নির্বাচন করেছেন, সে সম্বন্ধে বলার কিছু নেই। অন্নদাশংকরের 'ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী' নামে একটি পদ্য দিয়ে বইটি আরম্ভ হয়েছে, তারপর এসেছেন 'ক্ষীরের পুতুল'-এর অপূর্ব স্রষ্টা অবনীন্দ্রনাথ। অবনীন্দ্রনাথের পর শিশু-সাহিত্যের স্মরণীয় ও ক্ষণজন্মা পুরুষ উপেন্দ্র-কিশোর রায়চৌধুরী 'মজন্তালী সরকার', দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'কাজল জল' প্রভৃতি লেখাগুলি তো আছেই, তাছাড়া আছে প্রেমেন্দ্র মিত্র, লীলা মজুমদার, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও মিলাডা গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা।

লেখক-লেখিকা নির্বাচনের দিক থেকে কয়েকটি নাম ব্যতীত আরও এমন অনেক নাম সহজেই মনে পড়ে, যাঁদের লেখা সম্পাদক সহজেই খুঁজে পেতেন, কিন্তু সম্পাদক তাঁদের কথা সম্ভবতঃ মনে করেন নি। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও হেমেন্দ্রকুমারও রূপকথা লিখেছেন। বইখানি প্রকাশ করেছেন—রূপম, এ ১২এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। দাম তিন টাকা।

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক প্রভু প্রেস, ৩০ কর্নওআলিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য : ০'৪৫ নয়া পয়সা

সাপুড়ে

* ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র *

৪৫শ বর্ষ] ফাল্গুন—১৩৭১ [১১ম সংখ্যা

ঝুড়ি ঝুড়ি মাছ

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু

যাচ্ছি আমি মাছ কিন্‌তে
কাঁকনতুলির হাটে।
নাওখানা মোর লাগ্‌ল এসে
কঙ্কেফুলির ঘাটে।
হেথায় কোথা মাছ রে ?
শুধুই ফুলের গাছ রে !

ফুল তুলতে মালা গাঁথতে
দুপুর-বিকেল কাটে।
খালি খালুই ঝুলিয়ে এলুম
ভেঙ্কিটুলির মাঠে।

রাজার ছেলে যাচ্ছে সেথা
পক্ষিরাজে চ'ড়ে।
বল্লে, 'খোকা, ঘোড়ায় চড়ো
হাতটা আমার ধ'রে।'
রাজপুত্তুর হেসে রে—
পৌঁছুল তার দেশে রে।
মালাটা মোর গলাতে তার
পরাই যতন ক'রে।
ঘোড়াটা তার দিল আমায়
চাবুক লাগাই জোরে।

পক্ষিরাজের পিঠে চ'ড়ে
গেলুম পাতালপুরী।

মৎস্যরাণী রুই-কাত্‌লা
দিলেন ঝুড়ি ঝুড়ি।
অগ্নি পেয়ে গেলুম রে;
ঘরে ফিরে এলুম রে।
মামার বাড়ি মাসীর বাড়ি
দিলুম এক-এক কুড়ি।
বঁটি ছুরি ভোঁতা হ'ল
বিশটা গেল চুরি।

মা বল্ল, 'মাছ ভাজা কি
তেল বিনে হয় বোকা?
সর্ষের তেল কিলো পাঁচেক্
এখুনি আন্ খোকা।'
খাস উজিরের চরণ রে,
তেল চুকচুক বরণ রে!
খাস মুন্সীর দপ্তরেতে
সর্ষের হিসেব টোকা।
নিয়ে এলুম থলি-ভর্তি
সর্ষে গাছের পোকা।

শিল্পী-কবি সুকুমার

শ্রীসুধাংশু গুপ্ত

সুকুমার রায়

"আয় রে ভোলা খেয়াল-খোলা
স্বপন দোলা নাচিয়ে আয়,
আয় রে পাগল আবোল-তাবোল
মত্ত মাদল বাজিয়ে আয়।"

যদি প্রশ্ন করি এটি কার লেখা? আর কোন বইতে আছে? তোমরা সবাই নিশ্চয়ই এক সঙ্গে বলে উঠবে: এ-আর এমন কী কঠিন প্রশ্ন! লেখা সুকুমার রায়ের—আর আছে 'আবোল-তাবোল' বইয়ের মুখবন্ধে।

ছোটবেলা থেকেই সুকুমার রায়ের প্রতিভার স্ফুরণ দেখা দিয়েছিল। ও-বয়সে তিনি ছবি আঁকতে ও ফোটোগ্রাফিতে নিপুণ হয়ে উঠেছিলেন। তা' ছাড়া মিষ্টি ভাষায় নানা বিষয়ে ছড়া ও কবিতা লিখে বাড়ির আত্মীয়-স্বজন এবং বড়োদের কাছ থেকে অজস্র প্রশংসা লাভ করেছিলেন। কয়েকটি ছবি তুলে পুরস্কারও পেয়েছিলেন।

বালক-বয়সে তাঁর সাহসের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিলো, সে-সম্বন্ধে একটি মজার গল্প বলছি। সুকুমার তখন বাবা-মা ও ভাইবোনদের সঙ্গে দেশের বাড়িতে বাস করছিলেন। বাড়ির বাইরে ছিলো একটি পুকুর—তার জল ছিলো কাকের চোখের মতো টল্‌টলে নির্মল। সেই পুকুরের বাঁধানো ঘাটে বসে তিনি একদিন তাঁর দিদি ও ছোট বোনের সঙ্গে নানা মজার সব গল্প করছিলেন। জায়গাটি ছিলো নির্জন। প্রকৃতি তার শ্যামল শোভা অকৃপণ হাতে ছড়িয়ে দিয়েছিলো চারদিকে। পুকুরের বুকে বাতাসের মৃদু আন্দোলনে জলের ঢেউ দুলে দুলে উঠছিলো। কিন্তু হঠাৎ সে-সময়ে

এক ভীষণকায় লোকের আবির্ভাবে ওঁরা চমকে উঠলেন। লোকটার হাতে একটা লম্বা ছুরি… দু'হাত রক্তে ভর্তি। ছুরিটা থেকে তখনো টাটকা রক্ত ঝরে পড়ছিলো। দু' বোন তো দেখামাত্রই একেবারে ভয়ে চুপসে গেলেন। কিন্তু সুকুমারের এতটুকু ভয় নেই। উনি দুর্জয় সাহসে অবিচলিত চিত্তে লোকটার পথ আটকে দাঁড়িয়ে রইলেন। লোকটা তো পালাতে পারলে বাঁচে! আসলে বেচারা এসেছিলো ওদের বাড়ির একটি পাঁটা কেটে হাত-মুখ ধুতে পুকুরে। ওর ঐ দস্যুর মতো বিরাটকায় চেহারা যত অনাসৃষ্টি করেছিলো।

কলেজে মেধাবী ও ভাল ছাত্র হিসেবে ওঁর সুনাম ছিলো। ওই বয়সেই কলেজের ছক-কাটা, ধরা-বাঁধা পাঠ্যপুস্তরের পড়াশোনার ভেতর তিনি নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও সাহিত্যের বই তিনি লাইব্রেরী থেকে এনে গভীর মনযোগ সহকারে পাঠ করতেন। অধ্যাপকের দল তাঁর অনুসন্ধিৎসা ও বিদ্যাচর্চার তারিফ করতেন। বি, এস, সি পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি গুরুপ্রসন্ন বৃত্তি নিয়ে চিত্রশিল্পের নতুন ধারার সম্যক পরিচিতি এবং গবেষণার জন্য বিলেত যাত্রা করেন। লণ্ডন ও ম্যাঞ্চেস্টারের টেক্‌নলজি স্কুলে অধ্যয়ন করে তিনি সুখ্যাতির সঙ্গে দেশে ফিরে আসেন। বাংলার মধ্যে সুকুমারই উন্নত ধরনের ফটোগ্রাফির জন্য এফ, আর, পি, এস উপাধি পেয়েছিলেন।

মহাভারতের ভীষ্ম চরিত্রটি সর্বজন বরেণ্য। তার সম্বন্ধে একটি কবিতায় তিনি বলেছেন:

কুরুকুলে পিতামহ ভীষ্ম মহাশয়
ভুবনবিজয়ী বীর, শুনো পরিচয়—
শান্তনু রাজার নাম সত্যব্রত
জগতে সার্থক নাম সত্যে অনুরত।

মাত্র চার লাইনের ভেতর পিতামহ ভীষ্মের জাতি, কুল ও চরিত্রের পরিচয় আছে।

ইংরাজীতে যেমন ননসেন্স রাইম আছে—তেমনি বংলার শিশু-সাহিত্যে আবোল-তাবোল বইটি সেই ধাঁচে লেখা। এর প্রতি পাতায় রয়েছে ছোটদের আনন্দ-ভোজের নিমন্ত্রণ। ভোজের মধ্যে নানা ধরনের ব্যঞ্জন আছে। প্রথমেই খিচুড়িতে শুরু—তারপর শেষ হলো মেঘমুলুকে ঝাপসা রাতে, রামধনুকের আবছা রাতে। 'ছায়া-বাজি' কবিতায় কবি বলতে চান:

"আজগুবি নয়, আজগুবি নয়, সত্যিকারের কথা—
ছায়ার সাথে কুস্তি করে গাত্রে হ'ল ব্যথা।
ছায়া ধরার ব্যবসা করি, তাও জান না বুঝি?
রোদের ছায়া, চাঁদের ছায়া অনেক রকম পুঁজি।"

ছায়া-বাজি ব্যবসা করাও সোজা নয়। জিনিসটা আজগুবি নয়, সত্যিকারের। ছায়ার সঙ্গে কুস্তি করে গায়ে ব্যথা হলো। ছায়া ধরার ব্যবসার কথা—তাও জান না। পুঁজি হচ্ছে রোদের ছায়া, চাঁদের ছায়া।

হুঁকোমুখো হ্যাংলা কবিতার সেই যে :

"হুঁকোমুখো হ্যাংলা　　　বাড়ী তার বাংলা
মুখে তার হাসি নাই দেখেছ ?
নাই তার মানে কি ?　　　কেউ তাহা জানে কি ?
কেউ কভু তার কাছে থেকেছ ?"

হুঁকোমুখো হ্যাংলার বাড়ি বাংলা দেশে। তার মুখে যে হাসি নেই তা লক্ষ্য করেছো! কেন নেই তার অর্থ কি! কেউ কি তা জানে। কেউ কি তার কাছে কোনদিন বাস করেছো।

হুঁকোমুখো হ্যাংলার কবিতার সঙ্গে যে ছবিটি কবি সুকুমার রায় এঁকেছেন তাতে অভিনবত্বের ছাপ রয়েছে।

মেয়ের বাবা পাত্রের খোঁজে বেরিয়েছেন। অনেক খুঁজে খুঁজে মনের মতো পাত্র আর পেলেন না। কিন্তু যাকে পেলেন তার পরিচয় হচ্ছে :

"গায়ের রং—　মন্দ নয়, সে পাত্র ভাল
রং যদি হয়ও বেজায় কাল
…　　…　　…
বিদ্যেবুদ্ধি—　বিদ্যেবুদ্ধি ? বলছি মশাই
উনিশটি বার ম্যাট্রিকে সে
ঘায়েল হ'য়ে থামল শেষে।
বিষয়-আশয়—বিষয়-আশয় গরীব বেজায়
কষ্টে-স্বষ্টে, দিন চলে যায়।
ঘর—　কিন্তু তারা উচ্চ ঘর
কংস রাজের বংশধর!
শ্যাম লাহিড়ী বনগ্রামের
কি যেন হয় গঙ্গারামের।"…

এরকম সর্বগুণসম্পন্ন পাত্র ক'জনের ভাগ্যে ঘটে! বাবুরাম সাপুড়ে কবিতাটির সঙ্গে তোমাদের পরিচয় নিশ্চয়ই আছে। ও-কবিতাটি গ্রামফোন কোম্পানীর রেকর্ড করা

হয়েছিল। সাপ যদি কারো দরকার হয় তা'হলে এমন সাপ চাই, যার শিং নেই, নখ নেই, হাঁটতে জানে না, কাউকে দংশন করে না।

তাই তো কবির কলম থেকে বেরোল :

"সেই সাপ জ্যান্ত
গোটা দুই আন্‌ত ?
তেড়ে মেড়ে ডাণ্ডা
করে দিই ঠাণ্ডা।"

ঘুরঘুরে এক বুড়ির বাড়ির বর্ণনা শোন :

"কাঁটা দিয়ে আঁটা ঘর—আঠা দিয়ে সেঁটে,
সুতো দিয়ে বেঁধে রাখে থুতু দিয়ে চেটে
ভর দিতে ভয় হয় ঘর বুঝি পড়ে,
খক্ খক্ কাশী দিলে ঠক্ ঠক্ নড়ে।"…

'খাই খাই' কবিতায় পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতির এবং ভারতীয়দের খাবার সম্বন্ধে কবি একটি চমৎকার তালিকা দিয়েছেন। সে-তালিকা থেকে তোমাদের সামান্য ভোজ্য পরিবেশন করছি।

"ব্যাং-খায় ফরাসীরা (খেতে নয় মন্দ)
বার্মার 'ঙাপ্পি'তে বাপ্‌রে কি গন্ধ !
মাদ্রাজী ঝাল খেলে জলে যায় কণ্ঠ,
জাপানেতে খায় নাকি ফড়িঙের ঘণ্ট !
… … …
টোল খায় ঘটি বাটি, দোল খায় খোকায়,
ঘাব্‌ড়িয়ে ঘোল খায় পদে পদে বোকায়
আকাশেতে কাত হয়ে গোৎ খায় ঘুড়িটা
পালোয়ান খায় দেখ ডিগবাজি কুড়িটা।"

পিতা উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যুর পর 'সন্দেশ' পত্রিকার সম্পাদনা ভার পুত্র সুকুমারের সুযোগ্য হস্তে ন্যস্ত হয়। তিনি সে-দায়িত্ব এমন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছিলেন যে, চল্লিশ বছর আগে 'সন্দেশের' মতো সর্বাঙ্গসুন্দর প্রথম শ্রেণীর সচিত্র মাসিকপত্র আর ছিল না।

তিনি ছ' বছর পত্রিকা সম্পাদনা করে শিশুদের মাসিকপত্র জগতে এক নতুন দিগন্তের প্রবর্তন করেছিলেন। শিল্পী-কবি সুকুমার দেখতে ছিলেন প্রিয়দর্শন, মিষ্টভাষী এবং বন্ধুবৎসল।

হাস্য-রসিক সুকুমার সুকণ্ঠেরও অধিকারী ছিলেন। তাঁর কণ্ঠে স্বদেশী-সংগীত, ব্রহ্ম-সংগীত, হাসির গান মর্মস্পর্শী হয়ে উঠতো।

অভিনয়েও তাঁর দক্ষতা কম ছিল না। 'ননসেন্স ক্লাব' নামে তিনি একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাতে যে-বই অভিনীত হতো, সেই বইয়ে নিজে অভিনয় করতেন তো বটেই, তা ছাড়া সক্রিয় অংশও নিতেন।

শিল্পী-কবি সুকুমার স্বল্প জীবনে মধ্যে যে ক'খানা বই লিখে রেখে গেছেন, তাতে তাঁর নাম শিশু সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আবোল তাবোল, পাগলা দাশু, হ-য-ব-র-ল, খাই খাই, ঝালাপালা, লক্ষণের শক্তিশেল, অবাক জলপান, শব্দ কল্পদ্রুম ইত্যাদি বইগুলো তাঁর স্নেহ-স্নিগ্ধ হৃদয়ের অমৃত-ধারা বহন করে চিরদিন ছেলেমেয়েদের রঙীন আকাশকে আরো রঙীন করে তুলবে।

ফাল্‌গুন ফাল্‌গুন

শ্রীমুরারিমোহন বিট

ফাল্‌গুন ফাল্‌গুন
এলো মধু ফাল্‌গুন
ফুলবনে মৌমাছি চললো,
ফুলদের কানে কানে
গুন্‌গুন্ গানে গানে
কত কথা যেন তারা বললো।

শিমুলের বন লাল,
ডাকে ফিঙে হরিয়াল,
পলাশেরা লাল চোখে চাইলো;
আকাশের নীলিমায়
বলাকারা উড়ে যায়,
'চোখ গেল' পাপিয়ায় গাইলো।

ফাল্‌গুন ফাল্‌গুন
এলো মধু ফাল্‌গুন
শীত-ঋতু বিদায়ের লগ্নে;
দখিনের সমীরণে
আবিরের রঙে রঙে
রঙ্-মাখা 'হোলি হ্যায়' স্বপ্নে।

বকুলেরা জেগে ওঠে,
পদ্মের কুঁড়ি ফোটে,
গাছে রাঙা কিশলয় জাগ্‌লো;
ফাগুনের ইশারায়
আমবনে নিরালায়
মকুলের ঘুম আজ ভাঙ্‌লো।

টুনাই মুনাই

শ্রীকার্তিক ঘোষ

ছোট্ট দুটো টুনটুনির ছানা।...

বাপ-মা'র বড় আদরের দু'ভাই বোন। তেমনি আদুরে আদুরে দু'জনেরই দুটো মিষ্টি নাম। ভায়ের নাম টুনাই। বোনের নাম মুনাই।...

ডুমুর গাছের দু'তিনটে পাতা জোড়া ছোট্ট একটা বাসা। তার মধ্যে শুকনো ঘাসের ওপর শিমুল তুলো মোড়া তুলতুলে নরম বিছানা। তার ওপর বসে বসে দু'ভাই বোন সারাদিন গল্প করে। রাতের বেলায় মায়ের বুকের নীচে লক্ষ্মী সোনা হয়ে ঘুমোয়।...

বাইরে বেরুতে ওদের মানা।...

কেন না, ওদের ডানায় যে এখনো পালক গজায়নি ভালো ক'রে। তাইতো কাজে-কম্মে যাবার সময় বাবা আর মা দু'জনকেই বুঝিয়ে রেখে যায়—খবরদার! বাইরে যেওনা মোটে। উড়তে পারবে না তোমরা এখন। বাজে ধরে নেবে। লাফাতে যেও না যেন, নরম পা ভেঙে যাবে। কিছুতে ঠোকরাতে যেও না যেন, এখনো তোমাদের ঠোঁট নরম তুলতুলে!...

টুনাই শুনে হাসে।

মুনাই শুনে মাথা নেড়ে বলে, না-না—যাবো না বাইরে।

কিন্তু, তাহ'লে কি হয়। টুনাই মুনাই দু'জনেই বড় চালাক চটপটে। পাতার বাসায় বসে বসে প্রায়ই দু'জনে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে ছাখে বাইরের দিকে, আর ইচ্ছে মতন গল্প বানায় আকাশ, বন, পাহাড়, নদী, ধূ-ধূ মাঠ নিয়ে!

বাইরে যাবার জন্যে টুনাইটা আনমনা হ'য়ে পড়ে মাঝে মাঝে। তখন আবার বোন মুনাই সাবধান ক'রে দেয় ভাই টুনাইকে,—এখন বাইরে যাবার মন করিস্ নে টুনাই! মুস্কিলে পড়বি শেষকালে! উড়তে পারবি না!

টুনাই কিন্তু অতো-শতো বুঝতে চায়না এখন। আর কতোদিন বসে থাকবে বাসায়! এখনো বুঝি সে বড় হয়নি! ডানার ধূসর রঙের পালকে নরম তুলতুলে ঠোঁট ঠুকরে ঠুকরে দেখে নেয় ভালো ক'রে। হ্যাঁ—হ্যাঁ, এইতো এতো পালক গজিয়েছে। এবার কেনো উড়তে পারবে না তবে! বাইরে যাবার জন্যে টুনাইয়ের মনটা কেমন যেন ছটফট করতে থাকে ভেতরে-ভেতরে। কিন্তু, একা যেতে সাহস হয় না মোটেই। যদি মুনাইটাও রাজী হয়, তাহ'লে আর ভয় নেই কিন্তু!

—এই মুনাই, মুনাই...

সেদিন সকালবেলা বাবা-মা কাজ-কম্মে বেরিয়ে যেতেই টুনাই চুপি চুপি বললে, চল্‌না একটু বাইরে বেড়িয়ে আসি !…

বাইরে যাবার নাম শুনে মুনাইটারও যেন কেমন মনটা ধেই ধেই ক'রে নেচে উঠলো আনন্দে ! নরম ঠোঁট দাদার ধূসর রঙের পালকের ঢাকা তুলে তুলে ডানার ওপর ঘষতে ঘষতে বললে, কিন্তু—হারিয়ে যাবো না তো ?…

'দেখলি দাদা, কি সুন্দর ওর ডানা দুটো !'

—না-না, হারাবো কেনো ! টুনাই বললে, বেশী দূর যাবো কেনো—এই কাছাকাছি মাঠ ঘাট দিয়ে একটু ঘুরে আসবো।

বলতে বলতে বাসার থেকে বেরিয়ে পড়লো দু'ভাই-বোনে।

ফুরুৎ…ফুরুৎ…

প্রথমে উড়ে পড়লো টুনাই, তারপর ওর পরেই উড়ে পড়লো মুনাই।

কিন্তু না, হলো না ! মনের জোর থাকতেও বেশী দূর যেতে পারলো না দু'জনে। কাছাকাছি একটা কলকে গাছের ডালে উড়ে গিয়ে বসে পড়লো শেষকালে।

কাছাকাছি ছিল একটা প্রজাপতি। সে এসেছিল কলকে ফুলের মধু খেতে। টুনাই মুনাইকে দেখতে পেয়ে ছুটে এলো তাড়াতাড়ি। সোনালী রঙের ছোপ দেওয়া রূপোলী রঙের নক্সা-কাটা ডানা দুটো তুলে একটা কলকে ফুলের ওপর বসে হাসতে লাগলো মিটমিট ক'রে। টুনাই-মুনাই কিছু বুঝতে পারলো না মোটেই। শুধু হাঁ ক'রে চেয়ে রইল প্রজাপতির দিকে।

—কি হলো, উড়তে পারলে না?

বললে প্রজাপতি, এইটুকুন বাচ্চা তোমরা—বাইরে বেরিয়েছো কেনো দু'জনে?

টুনাই চুপ ক'রে আছে দেখে মুনাইও কিছু জবাব দিল না প্রজাপতিকে।

প্রজাপতিও আর কিছু বললো না। ও ওর ফুরফুরে ডানা মেলে ফুলের বনে হারিয়ে গেল এক সময়।

মুনাই বোকার মতন চেয়ে আছে দেখে হেসে ফেললো টুনাই।

বললে, কি দেখছিস্ অমন করে!

—দেখছি ওর ডানা দুটো। মুনাই হাসে আর বলে, দেখলি দাদা, কি সুন্দর ওর ডানা দুটো! আমি যদি পেতুম···

টুনাই শুনতে পেল না মুনাই কি বলছে। কেন না, ওর মন তখন উড়ি-উড়ি করছে। করছে এদিক-ওদিক!

—এই দাদা! মুনাই ওর ঠোঁট দিয়ে ঠেলা দেয় টুনাইকে।

—উঁ!···চমকে ফিরে মুনায়ের দিকে তাকালো টুনাই।

—কি দেখছিস্ অমন ক'রে?

—দেখছি·· ঢোঁক গিলে বললে টুনাই, হুঁ···দেখছি আকাশ আর মাঠ।

টুনাইয়ের কথা শুনে মুনাইও তাকায় আকাশের দিকে।

—দেখছিস্, আকাশটা কতো বড়, কেমন নীল! টুনাই আবার বলে, মাঠের দিকে চেয়ে ত্যাখ্ থৈ থৈ করছে সবুজ আর সবুজ!···

ফুর···ফুর · ফুর···

এক ঝলক হাওয়া এলো এই সময়। ফুরফুরে মিষ্টি হাওয়ায় হাততালি দিয়ে উঠলো কলকে গাছের সরু সরু পাতাগুলো।

কি মজা! কি মজা!!···

আনন্দে হেসে উঠলো টুনাই। হাওয়ায় কলকে গাছের ডালগুলো দুলছে।

দুল···দুল···দুল···দুল!

দোল খেতে খেতে মুনাই বললে টুনাইকে—হাওয়ায় কিসের গন্ধ ছাড়ছে বলতো দাদা ?

—কাঁচা ধানের !

কাঁচা ধানের ! বলতে বলতে হাসলো টুনাই।

খুশীতে নেচে উঠলো মুনাইয়ের চোখ দু'টো।

—আহা ! আহা ! বাতাস কি মিষ্টি ! কি মিষ্টি !!

কিন্তু, হঠাৎ—হঠাৎই বিপদ এলো এই সময় ! ভয়ে থরথর ক'রে কাঁপতে লাগলো মুনাই ! টুনাই উঠলো কেঁদে।

শোঁ—শোঁ—শোঁ—শোঁ—

দেখতে পেয়েছে বাজ পাখীটা। তাই নেমে আসছে ঝড়ের মতন।

ফুর ফুর ফুরুৎ। উড়ে পালাতে গিয়ে একটা ঝোপের ওপর ঝুপ্ ক'রে পড়ে গেলো টুনাই আর মুনাই।

বাজ পাখীটা ছোঁ দেবে কি—ঠিক এমনি সময় কাছে পিঠে কোথায় যেন ছিল এক বন মুরগী, ছুটে এলো টুনটুনির বাচ্চা দু'টোকে বাঁচাবার জন্যে।

এই দেখে রুখে দাঁড়ালো বাজপাখি। ঘাড় ফুলিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো বন মুরগী। কোঁকর কোঁ—কোঁকর কোঁ !···

ডাক দিল বন মুরগীটা। অম্নি দেখতে দেখতে কোত্থেকে সব ছুটে এলো বন মুরগীর ঝাঁক। কোঁক্কর কোঁ-কোঁ ! কোঁক্কর কোঁ-কোঁ ! ··এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো সবাই। কি হয়েছে ? কি হয়েছে ?

হয়েছে আর কি ! হবেই বা আর কি !

অতোগুলো বন মুরগীকে দেখেই ছুট দিয়েছে বাজ পাখিটা।

আর কে জানে কোথায় ছিল টুনাই মুনাইয়ের বাপ-মা, ওরাও এসে হাজির হয়ে গেছে তখন। মাকে দেখে ঠোঁট ফোলায় টুনাই। বাপকে দেখে কেঁদে ওঠে মুনাই।

আর তাই দেখে কাছের খেজুর গাছটা থেকে একটা বুড়ি কাঠবেড়ালী ছড়া কেটে ওঠে হাসতে হাসতে :

টুনাই মুনাই
আর যে হুঁ নাই—
কোঁকর কোঁকর কোঁ !
বন মুরগী যেই এসেছে
বাজ পাখীটা ভোঁ !!

স্বাধীন ভারতের অ আ ক খ

শ্রীদেড়কড়ি শর্মা

অচলের মত হোক্ ভারতের বীর,
আমাদের ছেলেদের উন্নত শির।
ইতিহাস ভারতের হোলো যে উজ্জ্বল,
ঈপ্সিত স্বাধীনতা করে ঝল্‌মল্!
উমেশ আসিল যেই কংগ্রেসেতে,
ঊষার আলোয় সবে উঠ্‌লো মেতে।
ঋষি বঙ্কিম এল লেখনী হাতে,
ঌয়ের মতন গোল পাগড়ি মাথে।
এল যে গোখেল আর বিপিন, সুরেন,
ঐ আসে লজপৎ, দত্ত নরেন।
ওধারে প্যাটেল এল, মতিলাল বীর,
ঔষধ—অহিংসা—মহাত্মাজীর।

* * * *

কালিদাস আমাদের জাতীয় কবি,
খুশি মনে পড়ি তাঁর কাব্য-ছবি।
গান্ধীজী আমাদের দেশের আলো—
ঘন-ঘোর আঁধারেতে দীপ জ্বালালো।
ঙ-র মতন যার শরীর ভাঙা,
চঞ্চল মন তারও আশায় রাঙা।
ছাত্রেরা জেগে ওঠে স্বদেশী গানে,
জগদীশ উদ্ভিদে চেতনা আনে।
ঝঙ্কার আজো তা'র বেতারে ওঠে,
ঞ-র মতন ঢেউ 'ইথারে' ছোটে।

টকটকে তেজী বীর সূর্য হাসে,
ঠাকুরের প্রতিভায় বিশ্ব ভাসে।
ডাক্তার ও মন্ত্রী যে শ্রীবিধান রায়—
ঢাকা তিনি অগণিত গুণ-গরিমায়।
ণ-য় নাম নেই কো কোনো—
তিলকের গুণ-গান ঐ যে শোনো।
থামাও থামাও গোল—সবার আগে
দেশবন্ধুর নাম মনেতে জাগে।
ধন্য সুভাষ! ওগো, গুণের খনি,
নেহেরু যে ভারতের মাথার মণি!
প্রফুল্ল প্রাণ দিল হাসি-মুখে ভাই,
ফাঁসি গেল ক্ষুদিরাম, শহিদ কানাই।
বিদ্যাসাগর ছিল দয়ার আধার,
ভূদেবের কত গুণ—বল্‌বো কি আর!
মাইকেল কবিতায় মধু বিতরে,
যতীন জীবন দিল দেশের তরে।
রামমোহনের খ্যাতি সারা দেশময়,
লোকনাথ চাট্‌গাঁয়ে আনে বিস্ময়।
বাঙলার আশুতোষ—প্রতিভা কী তার!
শ্যামাপ্রসাদ হোলো যোগ্য পিতার।
ষণ্ডামার্ক দেহ ভীম ভবানীর,
সরোজিনী সেরা যে গো বিদুষী নারীর।
হেম, দ্বিজেনের বাণী জাগায় স্বদেশ—
—সবারে প্রণাম এবে লেখা করি শেষ।

চল যাই 'বাসন্তী'

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী
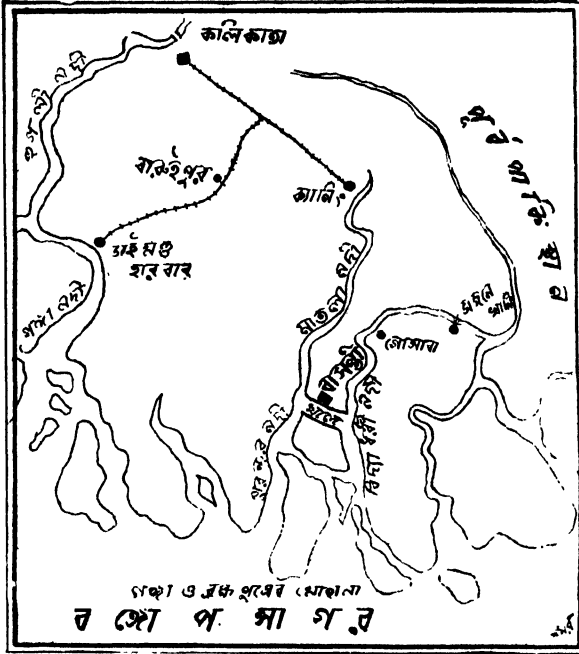
চল যাই বাসন্তী ঘুরে আসি। সুন্দরবনের একটা অংশ এই বাসন্তী। এর নদী-পথের দৃশ্য অপূর্ব। সুন্দরবনের বন আবাদ করে এখানে বসতি গড়া হয়েছে।

জঙ্গল যেমন চেষ্টা করছে চিরকাল—মা নু ষ কে তা ড়ি য়ে নিজেকে বিস্তার করতে, মানুষও তেমনি জঙ্গল কেটে, বন্যপশু তাড়িয়ে, জমি চাষ করে—নিজের আধিপত্য বিস্তার করে আসছে বহুকাল থেকে।

'বাসন্তী' এইরকম একটি জায়গা—যেখান থেকে সুন্দরবনের হিংস্র পশুদের তাড়িয়ে, জঙ্গল কেটে, আবাদ করে, কৃষি-শিল্পের প্রতিষ্ঠা করে—তৈরি করা হয়েছে মানুষের বসতি মানুষের কৃতিত্বের পরিচয় এই বাসন্তী। এটা দেখে আসবার মত জায়গা। আমরা ছুটি-ছাটায় বাইরে যাওয়ার জন্য ছটফট করি, কিন্তু এই বাংলার মধ্যেই—আমাদের ঘরের কাছে যে কত দেখবার মত সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে,—সেদিকে আমরা একবার ফিরেও তাকাই না।

ক্যানিং হয়ে যেতে হবে বাসন্তী। কলকাতার দক্ষিণে ক্যানিং। শিয়ালদা'র সাউথ স্টেশন থেকে 'কলকাতা-ক্যানিং' লাইনে ট্রেন আছে। কলকাতা থেকে ক্যানিং মাত্র ১৮ মাইল দূর।

ক্যানিংয়ের নাম তোমরা এবার অনেকে কাগজে দেখেছ। চার আনা ছ' আনা ক'রে ইলিশ মাছের কেজি বিক্রী হচ্ছিল ওখানে। আজকের দিনে চার আনা দরে ইলিশ মাছ শুনে তোমাদের খুব লোভ হয়েছিল নিশ্চয়।

মাতলা নদীর তীরে এই ক্যানিং। এর উত্তরে বিদ্যাধরী নদী। উনবিংশতি শতাব্দীর

মধ্যভাগে লর্ড ক্যানিংয়ের সময়ে ভাগীরথী নদীতে অতিমাত্রায় বালি পড়ায় যখন কলকাতা বন্দর সম্বন্ধে অনেকে আশঙ্কা করছিলেন, তখন পত্তন হয় এই ক্যানিং পোর্ট। কলকাতা বন্দরকে অবশ্য পরে স্থানান্তরিত করবার প্রয়োজন হয়নি এবং সেইজন্যই ক্যানিং বন্দরেরও উন্নতি হয়নি কিছু।

সুন্দরবন অঞ্চলের ধান, গরাণকাঠ, মধু, গোলপাতা প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য ক্যানিং দিয়েই যাতায়াত করে। আর যাতায়াত করে চোরা-কারবারীদের জিনিসপত্তোর। পাকিস্তান থেকে সস্তায় লবঙ্গ, গোলমরিচ, সুপারি, ঘড়ি, টর্চ ও সাইকেল প্রভৃতি সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে লুকিয়ে নিয়ে এসে চড়া দামে চালান দেয় কলকাতায়। ক্যানিং তাদের যাতায়াতের পথ। ক্যানিং-এ সেজন্য সজাগ প্রহরী—'কাস্টম অফিসার' রাখতে হয়েছে।
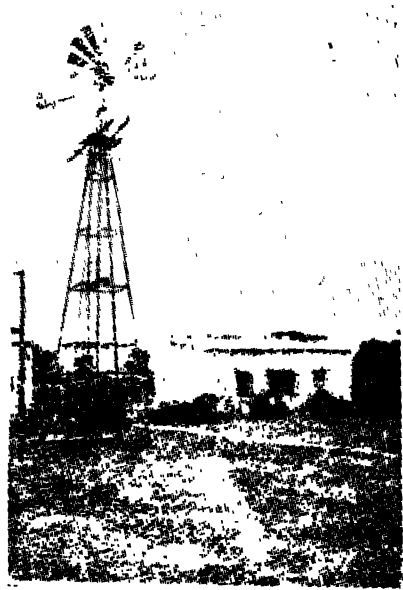
বাসন্তী যাবার কালে দূর থেকে নজরে পড়ে এই উইণ্ডমিলটি।

ক্যানিংয়ের অপর পার থেকেই সুন্দরবন এলাকার আরম্ভ। ধান এ অঞ্চলের একমাত্র শস্য। যেদিকে তাকাও কেবল ধান আর ধান। নদী-নালারও অন্ত নেই এদিকে। মত্ত মাত্‌লা নদীর প্রবল জলোচ্ছ্বাস থেকে ক্যানিংকে রক্ষা করবার জন্য নদী-তীর দিয়ে একটা দীর্ঘ বাঁধ করা আছে। এই বাঁধের উপর থেকে বিস্তীর্ণ মাত্‌লা নদীর দৃশ্য খুবই সুন্দর।

এখান থেকে নিয়মিত মোটর লঞ্চ চলে—বাসন্তী হ'য়ে গোসাবা। সুন্দরবন অঞ্চলে চাষ-আবাদ প্রবর্তনের জন্য স্যার ড্যানিয়েল সাহেব অনেক জমি নিয়ে গোসাবায় একটি আদর্শ কৃষি উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। স্যার ড্যানিয়েলের চেষ্টায় গোসাবা একটি আদর্শ পল্লীতে পরিণত হয়েছে। এখানে সম্প্রতি একটি থানাও বসানো হয়েছে।

এইবার যাত্রা।

ক্যানিং থেকে মোটর লঞ্চ মাত্‌লা নদীর জল নোনা। অপেয়। রাত্তির বেলা এর জল

বাসন্তীতে লঞ্চ এসে ভিড়ল।

ছিটিয়ে দিলে চক্‌চক্‌ করে। বেশ প্রশস্ত নদী এই মাত্‌লা। দূরে দূরে গ্রাম। নদীতে কত পাল তোলা নৌকা। ভিড়ল লঞ্চ একটা ঘাটে।

এ কোন্‌ স্টেশন ?—নারায়ণপুর।

তারপর বটতলা, রেতো-খালি, গোলাবাড়ি, সোনাখালি। নদী-পথের দুই ধারে মাঝে মাঝে পল্লীর দৃশ্য ছবির মত ফুটে ওঠে চোখের সম্মুখে। কত নাম না-জানা পাখী! লঞ্চ ঢেউ তুলে, জল কেটে এগিয়ে যায়—দুলতে থাকে জেলে-ডিঙ্গি। মাছ-ধরা চলছে নদীতে। আবার বাঁক ঘুরলেই দৃশ্যের পরিবর্তন! গাঁয়ের লোকেরা উঠা-নামা করে লঞ্চ থামলে। যাওয়ার সময় এদের সঙ্গে থাকে নানা রকম বেচবার জিনিস। ফিরবার পথে কিনে নিয়ে যায় তরি-তরকারী, কাপড়, তেল, নুন এই সব।

বাসন্তীর মাইল দুই আগে মাত্‌লা নদী ছেড়ে লঞ্চ চলল একটা খাল দিয়ে। খালটি কিন্তু নদীর মতই চওড়া হয়ে গেছে। এর প্রায় আট মাইল পরে গোসাবা। পুরন্দর নদী মাত্‌লারই পরবর্তী নাম। জ্যোৎস্নাকালে এই নদীর দৃশ্য মনোরম।

এইবার কূলে এসে ভিড়ল তরী।

বাসন্তী।

যাত্রীদের উঠা-নামার সুবিধার জন্য কাঠের জেঠি করা আছে এখানে। নদীতে বেশ জোয়ার-ভাঁটা খেলে। জোয়ারের সময় সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস কানায়-কানায় ভরে দেয় পুরন্দরকে। ভাঁটার সময় তার জল যায় নেমে। তখন নদীর পাড়ে অনেকখানি কাদা হয়ে যায়। এজন্য জেঠিটিও বেশ ঢালু করে তৈরি।

বাসন্তী নেমে দূর থেকে চোখে পড়ে 'উইণ্ডমিল'। এই অঞ্চলে হাওয়ার জোর খুব বেশি।

ক্যাথলিক খৃষ্টানদের একটি গীর্জাও আছে এখানে। একটি জুনিয়ার টেক্‌নিক্যাল স্কুল, একটি
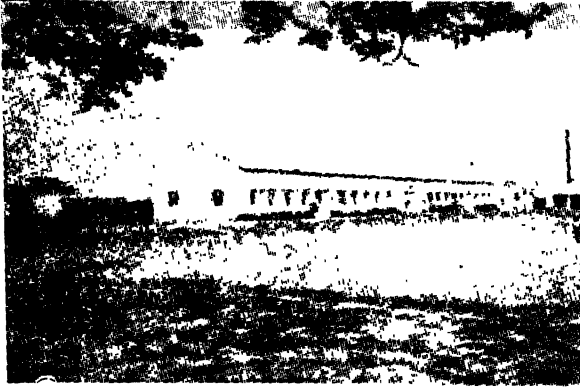
জুনিয়ার টেক্‌নিক্যাল স্কুলের বাড়ি।

অরফ্যানেজ এবং একটি হাই-স্কুলও এখানে আছে। পানীয় জল এঁরা নলকূপ থেকে পান—নদীর জল লবণাক্ত।

মাছের জন্য এখানে পর-মুখাপেক্ষী হতে হয় না এঁদের। এখানকার পুকুরগুলির পাড় উঁচু করে বাঁধ দিয়ে রাখা হয়। চলতি কথায় এখানে বাঁধকে বলা হয় ভেড়ী। বাঁধ দিয়ে না রাখলে পুকুরে নোনা জল ঢুকে পড়ে। টানা জাল দিয়ে যখন পুকুরে মাছ ধরা হয়, তখন কোন কোন মাছ লাফাতে আরম্ভ করে—সেটা দেখবার মত।

বাসন্তী থেকে গোসাবা যাওয়া যায় লঞ্চে। সারাটা দিন ওই লঞ্চ থাকে এখানে। এই লঞ্চ নিয়েই বিশেষ ব্যবস্থায় আরও দূরে যাওয়া চলে—সজনেখালি। এখানে একটি সরকারী ফরেষ্ট অফিস আছে। কাঠের মাচানের উপর এই অফিস।

এখানে এলে দেখা যাবে—পক্ষীতীর্থ! কত রকমের ছোট বড় এবং বিচিত্র বর্ণের পাখী এসে জমা হয়েছে এখানে। বছর বছর এদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

সাবধান, এদের গুলি করে মারতে যেও না যেন। এরা সব সংরক্ষিত পাখী। মারলে আইনে দণ্ডনীয় হবে।

বেশি দূর এগিও না আর। এর পরেই পাকিস্তানের সীমানা।

এ অঞ্চলের বনশ্রী অপূর্ব। সেই সঙ্গে নদীর খেলা আর পাখীর গান। যেন আলাদা একটা জগৎ এই দক্ষিণাঞ্চল। ভ্রমণের জন্য দূরে যেতে হয় না—কাছে আসতে হয়। দক্ষিণ বাংলার নদী, ধানক্ষেত, বন, মানুষ, পাখী, হরিণ এদের আপনার বলে দেখলেই বাসন্তী ভ্রমণ সার্থক হবে।

পাখী পুষতে বোধকরি তোমাদের সবারই খুব ভাল লাগে। এবং সেটা লাগাই স্বাভাবিক, সুন্দর ছোট ছোট জীবগুলি, কি সুন্দর বাহারে রং, আর কেমন চমৎকার স্বভাব—ভাল তো লাগাই উচিত! কিন্তু তাদের পুষতে যাবার একটু মুস্কিল আছে, বহু তদ্বির। তাকে কেনা, খাঁচা কিংবা তার প্রকৃত ঘরের ব্যবস্থা করা, তাকে রোজ খাওয়ানো, স্নান করানো—তার খাঁচা পরিষ্কার রাখা। অসুখে বিসুখে দু' একবার, অবশ্য খরচা করতে পারলে—'ভেট' (Veterinary Surgeon) দেখানো অনেক ঝঞ্ঝাট, অনেক ঝামেলা। তার চাইতে প্রকৃতির জিনিস প্রকৃতিতেই থাক, এস আমরা শুধু দেখেই খুশী হই। হাঁ, দেখা—শুধুই দেখা। পোষার মতই বা পোষার চাইতেও বেশী আনন্দ সঞ্চয় করা যায় শুধুই দেখে, ঠিকমত দেখতে জানলে।

পাখিরা বেশীর ভাগই থাকে নগরের বাইরে, গ্রাম্য পরিবেশে—যেখানে মাঠ-ঘাট, গাছপালা, নদী-নালা-পুকুর অফুরন্ত; কারণ ঐ পরিবেশেই ওদের বাঁচবার রসদ মেলে বেশী। তবে কতক পাখী আছে যারা শহরেও থাকে এবং সত্যি কথা বলতে কি, শহরেই ভালো থাকে—যেমন কাক-চিল-চড়ুই-পায়রা। কাজেই শহরে থেকেও পাখী দেখা যায়; প্রয়োজন শুধু একটু দেখবার জ্ঞান ও ইচ্ছে।

ওরা কেউ খায় পোকা-মাকড়, কেউ মাছ-মাংস, কেউ কেবলই মাছ, কেউ শস্য, কেউ ফল, কেউ মানুষের পরিত্যক্ত ভাত-রুটি-তরকারী—এক এক শ্রেণীর এক এক রকম রুচি। কেউ থাকে

একা, কেউ সদলবলে। কাউকে দেখা যায় সকাল বেলায়, কাউকে হয়তো দুপুরে। কাউকে আবার দিনের বেলায় দেখাই যায় না, রাতের অন্ধকার না হ'লে সে বেরোয়ই না। কেউ ক্ষুদ্র, কেউ এক রঙা, কেউ বিচিত্র রঙে রঞ্জিত। আর তাদের বাসারই বা কত রকম রকম-ফের—কত তার আকার, কত ধরন আর সরঞ্জাম।

পাখী দেখতে, বলা বাহুল্য যারা গ্রামে থাকে তাদেরই সব চাইতে সুবিধে। তবে যারা শহরে থাকে তারাও একেবারে বাদ যাবে না; যে কয়েকটি পাখী তোমার সম্মুখে রয়েছে, তাদের দিয়েই আরম্ভ করতে পারো তোমার দেখা। তারপর একবার ভালো লেগে গেলে এ উদ্দেশ্যেই গ্রামে যেতে কতক্ষণ!

কাজটি আরম্ভ করতে চাই কয়েকটি জিনিস। একটি নোট বই, কিছু আলগা কাগজ (কিংবা একটি খাতা), কলম, পেন্সিল আর একটি Field glass; সাধারণ ভাবে যাকে বলা হয় 'বায়নাকুলার' সংগ্রহ করতে পারলে ভাল হয়। বায়নাকুলারটি অবশ্য এই মুহূর্তে না হ'লেও চলে, পরে সময়-সুযোগ মত ওটা যোগাড় করা যায়। খুব সস্তা ছোট সাধারণ বায়নাকুলার দিয়েও মোটামুটি কাজ চলে এবং সে-রকম জিনিস কলকাতার বাজারে যথেষ্টই পাওয়া যায়। তবুও এই মুহূর্তেই ওটা না হয় নাইবা হলো, খালি চোখই তো যথেষ্ট।

নোট বইটির প্রয়োজন তোমার অভিজ্ঞতা টুকে রাখতে। একবার আরম্ভ করলেই দেখা যায় অফুরন্ত সে ভাণ্ডার, প্রতিদিন যেন নতুন নতুন অভিজ্ঞতার পাতা খুলে খুলে যাচ্ছে চোখের সামনে। পেন্সিল ও আলগা কাগজ (কিংবা খাতা) দরকার হয় ছবি আঁকতে। পাখিটি দেখলেই তার আকার, তার মাথা, ঠোঁট, ডানা, পা, লেজ এ সবের ড্রইং নেওয়া দরকার। তারপর ড্রইং নওয়া দরকার তার গতিভঙ্গী, ওড়া, স্নান ও ঝগড়ার। কথা হতে পারে যে তুমি তো আর আর্টিষ্ট নও, ও তুমি পারবে কি? নিশ্চয় পারবে, একবার সুরু করে দিলেই দেখা যাবে যে ও অতি সহজ—করতে করতেই হাত খোলে, তারপর কিছুদিন বাদেই হাত দিয়ে পাকা ওস্তাদের মত 'স্কেচ্' বেরোয়। রঙের বাক্সও ব্যবহার করা যায় এ কাজে এবং সস্তা স্কুলের ছেলে-মেয়েদের রঙের বাক্সই যথেষ্ট এ ব্যাপারে।

পাখির বাসারও কত ঢং। কারু বাসা গাছের একেবারে চুড়োয়, কারু বা একেবারেই মাটিতে। ছোট পাখির বাসা ছোট, বড়দের বড়, কিন্তু বাসাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এক এক জাতির বাসা বাঁধবার মাল মশলায় প্রায়ই রয়েছে একটা মিল—তারা সবাই কতগুলো বিশেষ জিনিস দিয়ে করে তাদের বাসা। বাসা বিশ্লেষণ করতে প্রথমেই অবশ্য প্রয়োজন হয় একটি বাসা, তারপর কয়েকটি বড় আকারের মোটামুখো শিশি বা টিন। বাসাটিকে ধীরে ধীরে ভেঙ্গে ভেঙ্গে

এক একটি বস্তু এক একটি পাত্রে সংগ্রহ করতে হয়। দেখা যায় এই বাসায় খড়-কুটো ছাড়াও রয়েছে তুলো, কাগজ, কাপড়, সুতো, চুল, তারের টুকরো, কাচের টুকরো, ইটের টুকরো, টিনের টুকরো এমনি কত কি। উড়ে যাওয়া পাখির পরিত্যক্ত বাসা নেওয়াই ভাল, কারণ কারুরই কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই তাতে।

একেবারে মাটির উপরেও পাখিরা বাসা করে সাধারণতঃ নদীর চরে যেখানে মানুষের যাতায়াত নেই বা খুব বেশী নেই। আর মাটি খুঁড়ে গর্ত করে বাসা করে মাছ-রাঙা আর আরও কয়েক ধরনের নদী-ঘোরা পাখী। ওরা বাসা করে নদীর উঁচু পাড়ের গায়ে গায়ে।

বাবুই পাখির বাসা বোধ করি তোমরা সবাই দেখেছো। যারা গ্রামে থাকো তারা তো বটেই আর যারা কলকাতায় থাকো তারাও হয়তো দেখে থাকবে 'মিউজিয়াম'-এ।

এমন সুন্দর বাসা আর কোন পাখীই করে না। অতটুকু একটি পাখী কারু কাছেও কাজ না শিখে, শুধু মন থেকে কি করে ও কাজ করে, মানুষের কাছে এ এক পরম বিস্ময়।

সাধারণভাবে প্রচলিত যে, ওরা বাসা করে ঘাস দিয়ে। কিন্তু এ কথাটা ঠিক নয়। ওরা পাতা বাসা করে নারিকেল বা খেজুর দিয়ে। পাতাটাকে প্রথমে ওরা ঠোঁট দিয়ে চিরে চিরে সরু সরু তন্তুর মত করে নেয়। তারপর তাই দিয়ে বুনে বুনে করে ওদের বাসা।

পাখী দেখতে হলে প্রথমেই ঠিক করা দরকার তোমার জানা পাখির একটি তালিকা। তারপর তা থেকে দু' একটা সহজ এবং সর্বদা-লভ্য পাখী দিয়ে আরম্ভ করতে হবে তোমার দেখার কাজ। পরে একটি একটি করে বাড়িয়ে চলবে তোমার দেখার তালিকায়। কয়েক দিন, কয়েকটি দিন মাত্র। তারপরে ভাল লাগলে নেশা লেগে যাবে ও কাজে। কেউ একথা বলতে পারে কি যে ভবিষ্যতে তুমিই একজন 'পক্ষীবিদ' হবে না, দেশের সমস্ত পাখির তালিকা তৈরী করবার ব্যাপারে। তাদের সম্বন্ধে পঠন-পাঠন করবার, দেশের জনসাধারণকে তাদের বৈজ্ঞানিক সংবাদ দেবার ভার পড়বে না তোমার হাতে? সবই হতে পারে, সবই হওয়া সম্ভব এবং তার প্রস্তুতির কালের আরম্ভ এখনি থেকেই—তোমার এই বয়েস থেকেই।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ইব্রাহিম বললেন, "মহারাজ, আমি বৃদ্ধ দার্শনিক, প্রয়োজন আমার অতি সামান্যই। আপনি যদি কেবল আমার গুহাটির মধ্যে একটি আশ্রম স্থাপনের ব্যবস্থা ক'রে দেন তা'হলেই যথেষ্ট হবে।"

আবেন হাবুজ বললেন, "যাঁরা প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি তাঁদের আকাঙ্ক্ষাও এইরকম মহৎ হয়ে থাকে, মিতাচারই তাঁদের চরিত্রের ভূষণ।" এত অল্প খরচে এত বড়ো একটা শক্তিলাভ হ'ল ভেবে তিনি পুলকিত হয়ে উঠলেন। কোষাধ্যক্ষকে ডেকে আদেশ দিলেন, ইব্রাহিম সাহেবের গুহাগৃহ শেষ করতে এবং সেটি তাঁর প্রয়োজন মতো সাজিয়ে দিতে যা খরচ হবে, অবিলম্বে বিনা আপত্তিতে যেন দেওয়া হয়।

জ্যোতিষী তখন তাঁর কেন্দ্রস্থ মানমন্দিরের চারদিকে সেই বড়ো ঘরটির সঙ্গে যুক্ত সারি সারি ছোটো ছোটো গুহাঘর কাটবার জন্য লোক লাগালেন। পাহাড়ের গা খোদাই ক'রে তৈরি হ'ল সেই ঘরগুলি। সেগুলির দেয়ালে দামাস্কাসের বহুমূল্য রেশমের আস্তরণ দিয়ে ঢাকা হ'ল, মেঝেতে তুলোভরা মখমলের গদি বালিস, তাকিয়া ও মূল্যবান কার্পেট বিছানো হ'ল। ইব্রাহিম বললেন, "বুড়ো হয়েছি, পাথরের মেঝেতে শুতে হাড়গুলোয় ব্যথা হয় আর স্যাঁৎসেঁতে পাথরের দেয়াল তো না ঢাকলেই নয়।"

জ্যোতিষী তখন মানমন্দিরের চারিদিকে গুহাঘর কাটবার জন্য লোক লাগালেন।

মাটির তলায় স্নানাগারও তৈরি হ'ল জ্যোতিষীর জন্য: একটা নয়, অনেকগুলি। তাতে নানারকমের প্রসাধন দ্রব্য এবং সুগন্ধি তেল রাখা হ'ল। "দিনরাত লেখাপড়া করে শরীরটা শুকিয়ে যায়, সেটাকে মাঝে মাঝে ভিজিয়ে সরস করা দরকার, বয়সের সঙ্গে কাঠিন্য আসে দেহের কাঠামোতে, তারও প্রতিকার প্রয়োজন।"

গুহা-প্রাসাদের ঘরে ঘরে অসংখ্য রুপোর প্রদীপ এবং স্ফটিকের ঝাড় ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ল, মিশরের কোনও ধ্বংসস্তূপে তিনি যে-সব সুগন্ধি তেলের সন্ধান পেয়েছিলেন তাঁর নির্দেশ মতো মশলা দিয়ে তৈরি সেইরকম সুগন্ধি তেল দিয়ে জ্বালা হ'ল সেই আলোগুলি। সেই অনির্বাণ

দীপালোক দিবালোকেরই যেন স্নিগ্ধতর মনোরম রূপ। জ্যোতিষী বললেন, "সূর্যের আলো আমার মতো বৃদ্ধের চোখে বেশীক্ষণ সহ্য হয় না। তাছাড়া পড়াশোনার জন্য বাতির আলোই প্রশস্ত।"

কোষাধ্যক্ষ ইব্রাহিমের ফরমাসের পর ফরমাসে টাকা দিতে দিতে বিপন্ন হ'য়ে পড়লেন, তিনি রাজাকে জানালেন সব কথা। কিন্তু হাকিম ফেরে তো হুকুম ফেরে না। রাজা যখন কথা দিয়েছেন তখন টাকা বন্ধ করা চলতেই পারে না। আবেন হাবুজ বললেন, "এখন উপায় কি? ধৈর্য ধরে থাকো দিন কতক। মিশরের পিরামিড দেখে এই বুড়ো দার্শনিক তাঁর আশ্রমের ধারণা লাভ করেছেন, তাই এইরকম বিরাট ব্যাপর হচ্ছে। তবে সব জিনিসেরই শেষ আছে, ওঁর আশ্রম তৈরি এবং সাজানোও শেষ হবে একদিন। ভয় কি?"

রাজার অনুমান সত্য, আর অল্পদিনের মধ্যেই পাহাড়ের ভিতর ইব্রাহিমের আশ্রম বা প্রাসাদ তৈরি শেষ হ'ল এবং সুসজ্জিতও হ'ল। ইব্রাহিম কোষাধ্যক্ষকে ডেকে বললেন, "ব্যস্, আর আমার কিছু চাই না, এইবার আমি নিশ্চিন্ত চিত্তে পড়াশোনা করতে পারব। কেবল পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে একটু অবসর বিনোদন চাই আমার, তার ব্যবস্থা হলেই হয়।" কোষাধ্যক্ষ বললেন, "ইব্রাহিম সাহেব, আর কি চাই বলুন খুলে, রাজার আদেশে আপনাকে যা চাইবেন তাই দিতে বাধ্য আমি।"

দার্শনিক বললেন, "ভালো নাচতে জানে এমন কয়েকটি মেয়ে চাই।" কোষাধ্যক্ষ তো অবাক! বললেন, "সে কি হাকিম সাহেব? নাচ-উলি মেয়ে চাই আপনার মতো ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির?"

ইব্রাহিম বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, অল্প কয়েকটি হলেই চলবে। বুঝছেনই তো, আমি দার্শনিক মানুষ, অল্পেই সন্তুষ্ট। তবে দেখবেন, মেয়েগুলি যেন সুন্দরী এবং অল্পবয়সী হয়, বুড়ো-হাবড়া পাঠাবেন না যেন। রূপযৌবনের সাহচর্য আমার মতো বৃদ্ধের মনটাকে তাজা রাখবে, এই-জন্যেই বলা।"

এদিকে যখন সুপণ্ডিত ইব্রাহিম সাহেব তাঁর আশ্রমে এইভাবে ধর্মজীবন যাপন এবং জ্ঞান-চর্চা করছেন, তখন ওদিকে নির্বিরোধী মহারাজ আবেন হাবুজ মহা উৎসাহে তাঁর মিনার চুড়োর ঘরে বসে যুদ্ধ চালাচ্ছেন এবং কাঠের পুতুল দিয়ে শত্রু সংহার করছেন। তার মতো অশক্ত বৃদ্ধের পক্ষে এইভাবে সহজে যুদ্ধজয়টা খুবই উপভোগ্য হয়েছে। মশা-মাছির মতো হাজার হাজার শত্রুকে অনায়াসে মারতে পারা কি কম আনন্দের কথা? এখন থেকে তিনি প্রতিবেশী রাজাদের ইচ্ছামতো অপমান এবং বিদ্রূপ ক'রে কৌতুকছলে যুদ্ধ বাধাতে লাগলেন, তাঁরা যাতে তাঁকে আক্রমণ ক'রে বসেন রাগের মাথায়, তাঁদের ধ্বংস করবার সুবিধা হয় যাতে। তাঁরা কিন্তু বারংবার

পরাজিত এবং ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়ে শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিলেন, তাঁর রাজ্য আক্রমণ করবার সাহস কারোই রইল না আর। কয়েক মাস ধরে দুর্গ-চূড়ার অশ্বারোহী মূর্তির বল্লম সোজা আকাশ-মুখো হ'য়ে রইল, কোনোদিকে বাঁকল না। বৃদ্ধ গ্রানাডারাজ তাঁর সাধের যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা বন্ধ হওয়ায় একঘেয়ে জীবনযাত্রায় ক্লান্ত হয়ে পড়লেন।

অবশেষে একদিন অশ্বারোহী মূর্তি হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল—গুয়াদিক্স্ পর্বতের দিকে বল্লম উদ্যত ক'রে। আবেন হাবুজ তাড়াতাড়ি রাতে গোলঘরে উপস্থিত হলেন, কিন্তু সেদিন তাঁর খেলনাগুলির মধ্যে নড়ন-চড়ন নেই দেখে অবাক হয়ে গেলেন। বিস্মিত হয়ে একদল সৈন্য পাঠালেন তিনি ঐ দিকের পাহাড়গুলো খুঁজে দেখবার জন্য। তারা তিন দিন খোঁজাখুঁজির পর ফিরে এসে খবর দিলে, সমস্ত পাহাড়ে জঙ্গলে খুঁজে শত্রু সৈন্য পাওয়া যায়নি। কেবল একটি অপরূপ সুন্দরী খৃষ্টান মেয়ে দুপুরবেলা ঝরণার ধারে ঘুমোচ্ছিল, তাকে বন্দী করে এনেছে তারা।

খৃষ্টান মেয়েটিকে আবেন হাবুজের সামনে এনে হাজির করা হ'ল।

বৃদ্ধ আবেন হাবুজের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বললেন, "সুন্দরী খৃষ্টানীকে নিয়ে এস আমার কাছে।" সুন্দরীকে নিয়ে আসা হ'ল। আরবরা যখন স্পেন জয় করে, তখন স্পেনের রাজবাড়ীর মেয়েরা যে-রকম গথিক পোষাক ও গহনাগাটি পরত, এ মেয়েটি সেই ভাবেই সজ্জিত। তার কুচকুচে কালো চুলে ধবধবে সাদা মুক্তোর মালা জড়ানো, তার চোখ দু'টির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কপালের ওপর মুকুটে হীরামাণিক জ্বলছে। তার গলা থেকে একটি সোনার হার ঝুলছে, একটি ছোট্ট রুপোর বীণা আটকানো আছে তার সঙ্গে, সেটি তার বাঁদিকে কোমরের কাছে ঝুলে আছে।

খৃষ্টান মেয়েটির রূপ দেখে বুড়ো আবেন হাবুজের মাথা ঘুরে গেল। তিনি বললেন, "সুন্দরী কে তুমি? কোথা থেকে এসেছ?"

মেয়েটি বললে, "মহারাজ, আমার বাবা কিছুকাল আগে এই দেশেরই একজন গথ জাতীয়

রাজা ছিলেন। তাঁর সৈন্যদল ঐ পাহাড়গুলোর মধ্যে আসায় একদিন অকস্মাৎ যেন যাদুমন্ত্রে সব ধ্বংস হয়ে গেল। বাবা স্বেচ্ছা-নির্বাসনে গেছেন প্রাণ ভয়ে পালিয়ে, আমি আপনার বন্দিনী হয়েছি।"

ইব্রাহিম ইব্‌ন্ আবু আজীব খবর পেয়ে এসেছিলেন। তিনি ব'লে উঠলেন, "সাবধান, মহারাজ! মনে হচ্ছে এ মেয়েটি যাদু জানে। আমি পড়েছি এদের কথা, এই সব উত্তরের যাদুকারীরা মায়ারূপিণী, অসতর্ক লোককে বিপদে ফেলতে ওস্তাদ। ওর চোখের চাউনিতে, চলনে-বলনে আমি বুঝতে পারছি মেয়েটি মায়াবিনী। এই জন্যে দুর্গচূড়ার যোদ্ধমূর্তি ঐদিকে বল্লম উঁচিয়েছিল। যে শত্রু আসবার কথা সেই ঐ মেয়ে। সাবধান!"

রাজা বললেন, "হে আবু আজীবের পুত্র, শান্ত হোন। আপনি মহাজ্ঞানী, নিপুণ ইন্দ্রজালিক সব মেনে নিচ্ছি, কিন্তু মেয়েদের ব্যাপার আপনি আমার চেয়ে বেশী বোঝেন না। রাজা সলোমনের অনেক স্ত্রী ছিল, তা সত্বেও আমি দর্প করে বল'তে পারি, স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা তাঁর চেয়ে আমার কম নয়। মেয়েটিকে আমার ভালো লেগেছে, একে আশ্রয় দিলে কোনও বিপদ হবে ব'লে মনে হয় না আমার।"

জ্যোতিষী বললেন, "মহারাজ, আমার দেওয়া রক্ষাকবচের সাহায্যে আপনি বহু যুদ্ধ জয় করেছেন, অনেক ঐশ্বর্য লাভ করেছেন তার ফলে। আমি কোনও দিন সে-সবের ভাগ চাইনি। আজ চাইছি। আপনি এই বন্দিনীকে দান করুন আমাকে, বৃদ্ধ বয়সে ওর বীণাধ্বনি শুনে আমি সান্ত্বনা লাভ করব। আর সত্যই যদি ও মায়াবিনী হয় তবে ওর মায়াজাল ভেদ করবার উপায় আমার জানা আছে, আপনার জানা নেই।"

আবেন হাবুজ বিস্মিত হয়ে বললেন, "বলেন কি? আপনাকে বৃদ্ধ বয়সে সান্ত্বনা দেবার জন্যে একদল নর্তকী দিয়েছি, তবু আশা মিটছে না আপনার?"

ইব্রাহিম বললেন, "নর্তকী অনেকগুলি দিয়েছেন বটে, গায়িকা তো দেননি। অধ্যয়নের ক্লান্তি দূর করবার জন্য একটু গানবাজনার দরকার হচ্ছে আমার।"

আবেন হাবুজ বিরক্ত হ'য়ে বললেন, "সাধু মানুষের আর অত লোভে কাজ নেই। এ মেয়েটিকে আমি নিজের জন্য পছন্দ করেছি, মহাজ্ঞানী সলোমনের বাবা ডেভিড যেমন সুন্নাসাইট জাতীয় আবিসাগকে পেয়ে সুখী হয়েছিলেন আমিও সেই রকম সুখী হতে পারব আশা করি।"

প্রথমে কথা কাটাকাটি; তারপর রীতিমতো মনোমালিন্য হয়ে গেল রাজাতে এবং জ্যোতিষীতে। জ্যোতিষী রাগ ক'রে সভা থেকে চলে গেলেন এবং গুহাগৃহে গিয়ে দরজা বন্ধ করলেন। তাঁর যাবার সময়েও তিনি শেষবার রাজাকে সাবধান করে দিলেন বন্দিনীর সম্বন্ধে। কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। রূপমুগ্ধ গ্রানাডারাজের তখন একমাত্র চিন্তা, কি ক'রে মেয়েটিকে

মনস্তুষ্ট করবেন। রাজার বয়স গিয়েছিল, কিন্তু ঐশ্বর্যের অভাব ছিল না তখনও। গ্রানাডার রাজ ভাণ্ডার শূন্য করে রাজার উপহার যেতে লাগল রাজকন্যার কাছে। এশিয়া এবং আফ্রিকার শ্রেষ্ঠ মণিরত্ন, রেশম, পশম, গন্ধদ্রব্য এবং প্রসাধন সামগ্রী দিয়ে তার পূজো চলল একদিকে, আর একদিকে নাচ-গান, দ্বন্দ্বযুদ্ধ, অস্ত্র-পরীক্ষা, ষাঁড়ের লড়াই প্রভৃতির আয়োজন চ'লল নিত্য, গ্রানাডায় মাসের পর মাস উৎসবের স্রোত বইতে লাগল।

গথজাতীয় রাজকুমারীর কিন্তু কোনো ভাবান্তর নেই এ-সবে। এ-সব উপহার এবং আয়োজন খুব স্বাভাবিকভাবে সে যেন তার পাওনা ব'লেই ধরে নিতে লাগল। এমন কি যাতে রাজকোষ আরও খালি হয়ে যায় এমন সব ফরমাস করতে লাগল সে, যদিও রাজার বিবাহ প্রস্তাবে সম্মতি দেবার কোনও লক্ষণ দেখালে না। রাজা বেশী পেড়াপীড়ি করলেও সে বিরক্ত হ'ত না, যদিও হাসতেও দেখা যেত না তাকে কোনও দিন। রাজা যখনই তার খুব কাছে এসে বসতেন, তখনই সে তার বীণা বাজাতে আরম্ভ করত। সেই রুপোর বীণার সুরে কি রকম যে মাদকতা ছিল, শোনবামাত্র রাজা ঘুমে ঢুলতে আরম্ভ করতেন, তাঁর সমস্ত শরীর ঝিমিয়ে আসত, একটু পরেই তিনি শুয়ে পড়তেন নিদ্রাভিভূত হ'য়ে। যখন জেগে উঠতেন তখন মনে হ'ত শরীরটা বেশ ঠাণ্ডা এবং হাল্কা হ'য়ে গেছে। মেয়েটিকে তখন তিনি আর উত্যক্ত করতেন না। ঘুমের মধ্যে অনেক সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখতেন তিনি, তাতেই তাঁর মন ভ'রে থাকত।

এই ভাবে রাজা যখন একটি মেয়ের গান-বাজনা শুনে, তার খেয়াল মেটাতে কোটি কোটি টাকা দু'হাতে অপব্যয় করছেন এবং ঘুমোচ্ছেন, তখন গ্রানাডার প্রজারা ধিক্কার দিতে আরম্ভ করেছে তাঁকে, তিনি তার খোঁজও রাখেন নি। হঠাৎ একদিন শহরের মধ্যেই একদল প্রজা বিদ্রোহী হয়ে রাজবাড়ী ঘেরাও করলে, দুর্গচূড়ার অশ্বারোহীমূর্তি কোনো পূর্বাভাস দিলে না তার। রাজার শরীরে যোদ্ধার রক্ত সঙ্গে সঙ্গে জানান দিয়ে উঠল, মুহূর্তমধ্যে একদল বিশ্বস্ত সৈন্য নিয়ে বেরোলেন তিনি, বিদ্রোহী দলকে দেখতে দেখতে ছিন্নভিন্ন করে দিলেন, বিদ্রোহ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হ'য়ে গেল।

(ক্রমশঃ)

ছড়া

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডু

হাম্‌দো বুড়ো,
মাম্‌দো ভূতের ছানা।
বিলেত থেকে আসলো শিখে
হাজার কিসিম খানা।

কোটর-চোখো,
চিম্‌সে ভূতের নাতী।
ফলসা তলায় জলসা করে
ফলার করে হাতী।

পাহাড় কেটে ছন্দ

শ্রীশ্যামলী সিংহ

একটি ক্ষুদ্র ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখতে বসেছি। কলম তুলে মনে হচ্ছে—যা লিখতে চাইছি তা হয়ত সম্পূর্ণ হবে না। বর্ণনার প্রলাপ হয়ত আমার অক্ষমতাকে আরও স্পষ্ট করে তুলবে। তবুও লিখছি—বিশ্বাস করুন,—মনের তাগিদে। কবি বলেছিলেন—

"বিশাল বিশ্বে চারিদিক হতে প্রতিকণা মোরে টানিছে—
আমার দুয়ারে নিখিল জগত শতকোটি কর হানিছে।"

—এই টানা-পোড়েনের দ্বন্দ্বে আবদ্ধ আমার এই ভেতরের সত্ত্বাটাও দিগ্‌দিগন্তে ঘুরে জীবনযাত্রার পাথেয় সঞ্চয় করতে চায়, কিন্তু বাহ্যিক সত্তা বলে—না, না, হাতে অনেক কাজ—সময় কোথায়? এটাই প্রশ্ন! তবুও সমস্ত সময়কে অতিক্রম করে মন পাখনা মেলে উড়ে যায়—দূর জনপদে,—পাহাড়তলী আর বনানীর নিবিড় ছায়া-ঘেরা গ্রামে। ঝর্ণার সুরে, পাখির গানে, মাতন লাগে—মনের তারে। আর মনে হয় বড় বিচিত্র এই পৃথিবী, হাজার রকমের রূপ-রস গন্ধ ঢেলে সাজিয়ে দিয়েছে—আমাদের জন্য;—অথচ আমরা ভ্রূক্ষেপও করছি না। তাই সুযোগ পেলেই বেরিয়ে পড়ি—দেশে দেশে; খুঁজে আনি—অমূল্যরতন—রেখে দিই স্মৃতির মণিকোঠায় তাকে যত্ন ক'রে। অভিজ্ঞতার তুলি-বুলোন মনটাকে তবু বার বার বলি—সাবধান! আর নয়! কিন্তু আবার ডাক আসে। এ অন্তরের কানে শোনা প্রকৃতির ডাক। এই ডাকের হাতছানিতেই সেবার বেরিয়ে পড়েছিলাম—হরিদ্বারের পথে।

জনশ্রুতি শুনেছিলাম—হরিদ্বারে বাঁধা আছেন বিষ্ণু—অনন্তকালের জন্য। সুরধুনী গঙ্গার লহরে লহরে তারই প্রতিধ্বনি। অপূর্ব নাকি তার রূপ ও ছন্দ। পাহাড়-কাটা জনপদ—নির্দেশ দিয়েছে—আর এক "মহাপ্রস্থানের পথ"কে,—কেদার আর বদরী ঘুরে অনন্ত শিবকে পাবার প্রচেষ্টায় তাই শত-তীর্থযাত্রী চলে এগিয়ে।

সকালের মিষ্টি রৌদ্রস্নাতা, প্রতীক্ষিতা আমি নামলাম ষ্টেশনে। উদ্দাম জনস্রোত—কল-কোলাহল—সব কিছু ছাপিয়ে চোখ চলে গেল পাহাড়-ঘেরা ছোট্ট ষ্টেশনের অপরূপ সৌন্দর্যের দিকে। ষ্টেশনের বাইরের দিকে—বসতিটা একটু ঘন। তাছাড়া টাঙ্গা ও রিক্‌শার ভিড়ে—জায়গাটা আরও জমজমাট।

ধর্মশালা ও বিভিন্ন হোটেলের প্রতিনিধিরা আমাকে উত্যক্ত করছিল—"আইয়ে, আইয়ে—'হরকী-প্যারী' পর অচ্ছা হোটেল—চলিয়ে।"

একটি মাড়োয়ারী ভদ্রলোক এলেন ভুঁড়ি দুলিয়ে—"আসেন হামার সাথে, ভাল হোটেলমে লিয়ে যাবে। খানাপিনা আচ্ছা আছে।" তারপর নিম্নস্বরে বললেন,— "চায় ভি অওর জরুরোত হোয় তো মছলি ভি খিলায়ে দেবে—রাম রাম।"
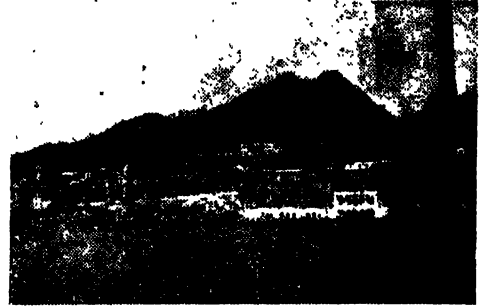
গঙ্গার এপার থেকে শহরের দৃশ্য

মনটা খারাপ হয়ে গেল। এখানেও কূটনৈতিক চাল। হরিদ্বারে মাছ মাংস কেউ ছোঁয় না। আগে পেঁয়াজও চলত না—এখন পাঞ্জাবীরা আসার পর পেঁয়াজ চলছে।

ঠিক করেই রেখেছিলাম ধর্মশালায় উঠব। টাঙ্গা নিয়ে বললাম—ভাল একটা ধর্মশালায় চলো। সে আমায় নিয়ে এলো ভোলাগিরির ধর্মশালার সামনে।

ম্যানেজার সৌম্য শান্ত। এর কথা অনেকের মুখে শুনেছি। সবাই এঁকে বলে পণ্ডিতজী। বললাম—ঘর চাই।

আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে—তাঁর সাদা দাড়িভর্তি মুখে একগাল হেসে বললেন—আচ্ছা ঘর পাবেন আপনি। উপরে তিনতলায় চলে যান—গঙ্গার দিকের ধরমশালা।

পরিষ্কার বাংলা বলেন পণ্ডিতজী। পরে আরও ঘনিষ্ঠতা হতে জেনেছি উনি দেবপ্রয়াগের লোক।

উপরে উঠেই ক্ষণেকের জন্য সবকিছু বিস্মৃত হ'লাম। ভুলে গেলাম—ধর্মশালায় লোক আমার বেডিং নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভুলে গেলাম—আমি ক্ষুধার্ত, শ্রান্ত।

দেখলাম—নীল আকাশের নিচে কালো পাহাড়ের রাশি। একটি পাহাড়ের উপরে রয়েছে—সাদা সুন্দর একটি মন্দির—ছোট্ট একটি মণ্ডপ যেন। ঐটিই বোধহয় চণ্ডী পাহাড়। নিচে শ্যামল-সবুজ বনানী—ধার দিয়ে ব'য়ে চলেছে সুরধুনী জাহ্নবী—সমস্ত মালিন্য ধুয়ে-মুছে।

"কম্‌রা খোল্ দিয়া"—শুনে চমকে ফিরে তাকালাম। তখন আমার জিনিসপত্র ও ঘরে ঢোকাচ্ছে।

এর পরের ঘটনা—আমার নিজস্ব কাজকর্ম। সে-সব কথা বলে পাঠককে বিব্রত করতে চাই
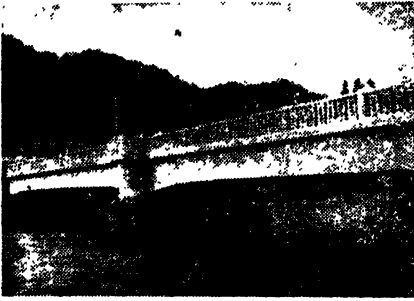
হরিদ্বারের নতুন ব্রীজ

না। দুপুর বেলা খাওয়া-দাওয়া সারলাম নিচের এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের হোটেলে। তারপরই বেরিয়ে পড়লাম—খাতা, কলম আর ক্যামেরা নিয়ে।

বাজারের রাস্তা ধরে এগিয়ে চললাম। আমার দু'পাশে ছোটবড় দোকান। তীর্থযাত্রীদের ভিড় দোকানে দোকানে। অথচ সবকিছুই পাওয়া যায়—মহানগরীতে। তবুও কেনা চাই। হয়ত এটাই তীর্থযাত্রার অন্যতম আকর্ষণ।

গঙ্গার ধারে—বাজার জমজমাট। একটা ব্রীজের মত জায়গায় উঠে—নিচে নামলাম। বাঁধান চত্বরের উপর ফুলের ডালা সাজিয়ে বসেছে পাঞ্জাবী মেয়ের দল। রয়েছে কর্পূর আর ফুলের নৌকা। শুভ-কামনায়—কল্যাণ ও শান্তির উদ্দেশ্যে—মা গঙ্গার বুকে প্রদীপ জ্বেলে নাকি ভাসিয়ে দিতে হয় ঐ ফুলের নৌকা। তা হেলতে-দুলতে এগিয়ে যায় দূরে—তরঙ্গায়িত স্রোতস্বিনীর বুকের ওপর দিয়ে। অনেকে ভাসাচ্ছে দেখলাম—আমিও ভাসালাম একটা।

আস্তে আস্তে এগিয়ে চললাম—দেখতে দেখতে। শিবদের মন্দির,—কোথাও কেউ শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ করেছেন, কেউ বা করছেন উপাসনা। এলাম "হর কি প্যারীতে"। শ্রীবিষ্ণুর এই নাকি প্রিয় স্থান—এইখানেই নাকি তাঁর লীলাক্ষেত্র। জল বাঁধা রয়েছে এক জায়গায়—এরই নাম ব্রহ্মাকুণ্ড। তীর্থ করতে আসিনি—তাই এর মধ্যে বেশী দূর যাবার চেষ্টাও করিনি। মাছের ঝাঁককে এখানে অনেক আটা ময়দার গুলি খাইয়েছিলাম—তা স্পষ্ট মনে আছে।

ওখানের জটলা মনকে সাড়া দেয় না,—তাই ব্রীজ পার হয়ে চললাম আরও নির্জন স্থানের উদ্দেশে। ব্রীজটা বেশ চওড়া আর বেশ পরিষ্কার।

গঙ্গা পার হয়ে ওপারেও দেখি—আধুনিকতার ছোঁয়াচ লেগেছে। বাঁধান সুদৃশ্য ঘাট। রয়েছে বসার ব্যবস্থা—মাঝে-মাঝে আলো আর ঝাউ গাছ। অনেক মেয়ে-পুরুষের জটলা—তাই চললাম আরও এগিয়ে। ঘাটের সীমানা পার হয়ে অবশেষে পেলাম—আমার বাঞ্ছিত শ্যামলী ঘাস। তারই ওপর ঢেলে দিলাম নিজেকে। বাতাসের স্নিগ্ধতায় আর জলের কলকল্লোলে মন উদাস হয়ে গেল। অন্ধকার হয়ে আসছিল—সন্ধ্যা ও রাত্রির সন্ধিক্ষণে চোখে পড়ছিল কালো পাহাড়ের গায়ে শহরের আলোকসজ্জা, আর চোখে পড়ছিল—দু'একটা ফুলের নৌকা চলেছে ভাসতে ভাসতে—কার শুভকামনায় কে জানে?

সন্ধ্যার পর ফিরে এলাম—ধর্মশালায়। এক কাপ চা খেয়ে, গেলাম পণ্ডিতজীর ওখানে। তিনি নেই। অগত্যা ছাদে গিয়ে—দেখতে লাগলাম চাঁদের আলোর বন্যায় ঢলঢলে রূপবতী ভাগীরথী:কে।

ব্রহ্মকুণ্ড—হরিদ্বার

পরদিন ছিল কোন তীর্থস্নানের পালা। আমার নেই ওসবে কোন আগ্রহ—তাই চুপ করে ছাদে দাঁড়িয়ে শুধু দেখলাম,—সবাইকার ব্যস্ততা।
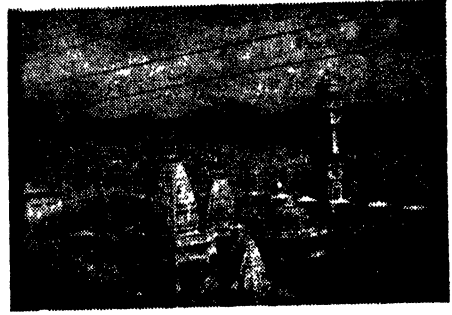
হঠাৎ কার মৃদু সম্বোধনে ফিরে তাকালাম দেখি একটা ছোট্ট মেয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলছে—"তোমার সঙ্গে বুঝি কেউ নেই। তুমি চান করতে যাবে না?

—মজা পেলাম। বললাম না, নিয়ে যাবে আমায়?

—বাঃ রে—আমি কেমন করে নিয়ে যাব। তুমি তো বড় হয়ে গেছ। তুমি নিজে চল না। চল—

—ওকি হচ্ছে পুপু?—ফিরে তাকালাম। দেখি,—এক দম্পতী। বললেন—পুপু খুব জ্বালাচ্ছে বুঝি? বললাম—না না, তা কেন?—তাঁদের সঙ্গে আলাপ হ'লো।

দুপুর বেলা পণ্ডিতজীর সঙ্গে গেলাম—ভোলাগিরির আশ্রমে। ওখানকার সেক্রেটারী প্রজ্ঞানন্দজীর সঙ্গে আলাপ হ'লো। খুব ভাল লাগল। সৌম্য, শান্ত, আলাপী সাধু।—কেমন ক'রে সময় কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। সেদিন বিকেলে বেড়ানোর ব্যবস্থা করে ফিরে এলাম ধর্মশালায়।

বিকেলে টাঙ্গা নিয়ে চললাম—বড় বাঁধে। সঙ্গে প্রজ্ঞানন্দজী—আর পুপুরা। সে দৃশ্য ভুলব না। প্রকৃতির শক্তি মানুষ রোধ করেছে সবলে। বিরাট ড্যাম। জলের সাদা সর্পিল ফেনরাশি যেন গভীর আক্রোশে আছড়ে পড়ছে পাথরগু:লার গায়ে। নানা ফুলের সমারোহে—সৌন্দর্যের অফুরন্ত রূপকে আরও সুন্দরতর করে তুলেছে।

গেলাম নীলধারায়। আসল গঙ্গা নাকি এটাই। সরু একটা ফিতের মত পড়ে রয়েছে এদিকে। চণ্ডী পাহাড়ের নিচের দিকটায় অবশ্য গভীর।

নুড়ি পাথরের ভারে—আমার ঝোলা ভর্তি হয়ে উঠল। পুপুর আব্দারে—আমাকে ছোট-বড় নানা পাথর জড় করতে হচ্ছিল। পুপুর বাবা শঙ্করবাবু অবশেষে হাসতে হাসতে বললেন—ভাল

সাথীই পেয়েছে ও। তা আপনি পাথরই খালি কুড়িয়ে যাবেন—বাড়ি ফিরতে হবে না? ওতে কি পেট ভরবে?

বাড়ির পথে হাসি-গল্পে সময় কেটে গেল। ইতিমধ্যে খবর পেলাম—কলকাতায় জরুরী কাজ পড়ে রয়েছে আমার জন্য। তাই ফেরার ডাক এসেছে। কর্তব্য করতেই হবে। ঠিক করলাম—আর দিন-তিনেকের মধ্যেই এদিকটা সেরে ফেলব।

পরদিন সকালে গেলাম গীতা-ভবনে। সুন্দর বিষ্ণুমূর্তি। মনের মধ্যে এক স্বর্গীয় ভাবের সূচনা করে। গীতা-ভবন হয়ে গেলাম ষ্টেশনে। ভারী ভাল লাগছিল। ষ্টেশনের পাশ দিয়ে রাস্তা চলে গেছে পাহাড় কেটে। যে দিকে চলছিলাম তার নাম বিল্বকেশ্বর। নির্জন পার্বত্য-স্থান। সাধকের সাধনার পুণ্যভূমি। রাত্রে নাকি বাঘ বেরোয় এখানে। একটু উঁচুতে উঠে গুহা। ভেতরে কয়েকটি দেবলিঙ্গ রয়েছে।

সেখান হয়ে ফিরতে বেশ বেলা হ'ল। পুপুরা তারপর দিন চলে যাবে। তাই বিকেলে বেরোলাম এক সঙ্গে। কি যে মানুষের মন! অজ্ঞাতে সে পরকে নিকটে এনে ফেলে, তারপর দুঃখ পায় তার বাঁধন ছিঁড়তে।

গেলাম ওঁদের সঙ্গে—কন্খল। সতীর একান্ন অংশের এক অংশ পড়েছিল এখানে। তাই এ স্থান অন্যতম পীঠস্থান।

কন্খল হয়ে গেলাম গুরুকুলে। এখানে রয়েছে ছাত্রদের বিদ্যাভবন, আবাস-গৃহ ইত্যাদি। বেশ লাগল এর পরিবেশ। এরপর আমরা গেলাম রামকৃষ্ণ মিশনের দিকে। শঙ্করবাবু দেখা করলেন—মাখন মহারাজের সঙ্গে। কথাবার্তায় আন্দাজ করলাম—পরিচয় এঁদের অনেক দিনের। পুপুর হাতে মাখন মহারাজ তুলে দিলেন—মস্ত বড় একটা বেল। প্রায় পুপুর মাথার মত। পুপু নিশ্চয় খুশী হয়েছিল।

সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা এলাম ভীমগড্ডায়। জনশ্রুতি আছে, এখানে ভীমের গদা পড়েছিল—আর তার ফলে সৃষ্টি হয়েছে একটি পুষ্করিণী। এখান থেকে গেলাম সপ্তধারায়—সপ্তঋষির আশ্রমে।

সন্ধ্যার আবছা আলোছায়ায় শ্রান্ত দেহ ও ক্লান্ত মন নিয়ে ফিরে এলাম ধর্মশালায়। শঙ্করবাবু বললেন—চলুন, আরতি দেখে আসি ভোলাগিরি আশ্রমে, আর প্রজ্ঞানন্দজীর সঙ্গে দেখা করে আসি।

সন্ধ্যায় মন্দিরে তখন আরতির ঘণ্টা বাজছে। স্তোত্রপাঠের সুরমূর্ছনায়—মনে হ'লো হরিদ্বার সত্যই উপাসনা-স্থান। যতই মানুষের পাপ-কলুষ মন এর অনিষ্ট করতে চাক না কেন—কেউ

ভোলাগিরির আশ্রম (হরিদ্বার)

পারবে না। অনাদি অনন্তকাল ধরে লোকপরম্পরায় তীর্থযাত্রীর কাছে তীর্থভূমি, আর আমার মতো ভাবুক ভবঘুরের কাছে—আদর্শ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি হয়ে থাকবে।

—রাত্রের আঁধার কেটে প্রথম সূর্যের আলো মাটিতে পড়তেই মনে হ'ল—আজ পুপুরা চলে যাবে। একদিনেই আমাকে বেঁধে ফেলেছে মেয়েটা।

দেখলাম—ওরা ভীষণ ব্যস্ত। আমাকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন পুপুর মা, সাবিত্রী দেবী। বললেন—আজকে আমাদের সঙ্গেই খাওয়াদাওয়া হবে—অন্য জায়গার ব্যবস্থা করবেন না। রান্নার ব্যবস্থা ওঁদের সবই ছিল। পুপুও খুব খুশী।
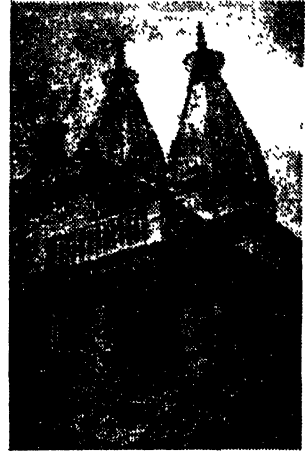
খাওয়াদাওয়া সারলাম একসঙ্গে। মন ভারক্রান্ত, মুখে হাসি। বিকেলের বাঁকা-রোদে টাঙ্গা এসে দাঁড়াল ধর্মশালার সামনে। এরপর বেরিয়ে পড়লাম আমরা।

ট্রেনে ভিড় হয়েছিল। অবশ্য পুপুরা জায়গা পেয়েছিল। শঙ্করবাবু আর সাবিত্রী দেবী বারবার করে বললেন—আসবেন আমাদের বাড়ীতে। নইলে রাগ করব।

পুপুর আমাকে ছেড়ে যেতে সে কি কান্না। আমার নিজের অজ্ঞাতে কখন যে জল টলটল করে চোখে ভ'রে এছেছিল বুঝতে পারিনি। ট্রেনের মন্থর সর্পিল গতির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বুঝলাম—ভালবাসা ও স্নেহ-মমতার হাত থেকে ছাড়ান পাবার জন্য আমার সৃষ্টি হয়নি। আমি সকলের সুখ-দুঃখ অনুভূতির সঙ্গী।

পরদিন সকালে বেরিয়ে পড়লাম—হৃষীকেশ লছমনঝোলার পথে। সেদিন আমার যাবার দিন। একলা মানুষ—কোন হাঙ্গামা নেই। তাই ভাবলাম এদিকটা ঘুরেই যাই।

দীর্ঘ বাসের রাস্তা—সুন্দর, সোজা। মনে পড়ল কন্যাকুমারীর কথা। সে আর এক স্মৃতি। সে সব কথা থাক। বাস থেকে যখন নামলাম তখন বেলা প্রায়—৯৷৷০টা ১০টা হবে। এক-এক করে কালি কমলীর ধর্মশালা থেকে আরম্ভ করে স্বর্গাশ্রম হয়ে—গেলাম আরও খানিকটা এগিয়ে। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। তাই বেশী দেরি না করে লছমনঝোলার ব্রীজ পার হ'লাম। ঝোলান ব্রীজ। লোহার মোটা তারে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত বাঁধা। নিচে ফেনিল তরঙ্গায়িত জলরাশি। ওপারে—বিভিন্ন মন্দির ধর্মশালা আর সাধুসন্তদের সমাবেশ। দলে দলে পুণ্যকামীর

এই সেই পুপু

দল এগিয়ে যাচ্ছে কেদারের পথে—ভারী ভাল লাগল এ দৃশ্য। বেশী দেরি করিনি। ১২টা নাগাদ বেরিয়ে ২॥০টা নাগাদ পৌঁছে গিয়েছিলাম হরিদ্বারে। ভাবছিলাম—চণ্ডী আর মনসা পাহাড়ে ওঠা হ'লো না। ওটা পরের বারের জন্য তোলা থাক।

ধর্মশালার চাকর ধীরু এসে খবর দিল—পণ্ডিতজী ডাকছেন। গেলাম। বললেন—আপনার তো যাবার সময় হয়ে এল।

—হ্যাঁ, আজই যাব—বললাম আমি।

—কোথায় যাবেন—কলকাতাতেই তো? জিজ্ঞাসা করলেন পণ্ডিতজী। বললাম—হ্যাঁ, আপাততঃ হাতে কাজ থাকায় তাই—তবে বলতে পারি না, আবার হয়ত চলে আসব এখানে—পথে ঘুরতে-ঘুরতে।

—হাসলেন পণ্ডিতজী—বললেন, বাঙ্গালীরা সাধারণতঃ একটু বেশী সুখী হয়। বাড়ীর বাঁধনই তাদের কাছে ভাল লাগে—আর মেয়েদের তো কথাই নেই! বললাম, এটা আমার সম্বন্ধে ভুল ধারণা—কেন না···

থামিয়ে দিলেন পণ্ডিতজী। বললেন,—ও সব কথা থাক। অনেক সময় যাবে। গিয়ে একটা চিঠি দেবেন—আর কি, মঙ্গলময়ের যা ইচ্ছা। বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

ট্রেনের সময় হয়ে আসছে। বেডিং আর সুটকেসটা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম ধর্মশালা থেকে। হঠাৎ যেন মনে হচ্ছিল—আমি বড় একা, কিন্তু সুখী!··

ট্রেন ছেড়ে দিল। বাইরের জমাট অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে মনে হ'ল—এক সপ্তাহের ভেতর অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলাম। পথিক আমি—তবু একবার বিচিত্র দেশ এই হরিদ্বারকে স্মরণ করে আবৃত্তি করলাম—

"অর্থ কিছু বুঝি নাই, কুড়ায়ে পেয়েছি কবে জানি
নানা-বর্ণে-চিত্র করা বিচিত্রের নর্ম বাঁশীখানি যাত্রাপথে।"··· *

*এই ভ্রমণবৃত্তান্তের আলোকচিত্রগুলি শ্রীমতী মালা সিংহ কর্তৃক গৃহীত।

ঢেঁকি

এটা নিশ্চয় একটা মন্তরের খেলা।

হরিপদ ধাঁ করে একটা মতামত দিয়ে দিলে।

সার্কাস দেখতে গেছে দু'জনে মিলে। শীতের সন্ধ্যে, ধীরে ধীরে কুয়াশায় চারদিক ঢেকে যাচ্ছে। গায়ে গরম জামা, আর মুখে মাথায় অলেষ্টার জড়িয়ে মামা, ভাগ্নে লাইনের পিছু পিছু তাঁবুর মধ্যে এসে ঢুকল। চারিদিক আলোয় ঝলমল করছে। দারুণ ভিড়। গ্যালারী ভর্তি হয়ে গিয়েছে। গেটের কোণে ব্যাণ্ড-পার্টির লোকেরা বিলিতী বাজনার তান ভাঁজছে। হরিপদ সুর মিলিয়ে মাথা দোলাতে লাগল।

কটা বাজল মামা?

প্রায় ছ'টা।

খেলা সুরু হ'লো ব'লে। ট্র্যাপিজের উপরে রঙীন আলো পড়ে স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। বা'ইরে মাইকে হিন্দী গান চলছে। ওদিকে একটা কামান, এদিকে লোহার খাঁচা একটা, এই খাঁচাতেই বাঘের খেলা দেখানো হয় নাকি? সবাই হৈ হৈ করে উঠলো, পর্দা উঠে গেলো।

তারপরে ট্র্যাপিজের খেলা হ'লো, ট্র্যাপিজের খেলা নয়, যেন ওসব চন্দ্রলোকের খেলা, মর্ত্যে বসে সবাই রুদ্ধশ্বাসে দেখছে। আচ্ছা, এই লোকগুলোকে স্পুটনিকে পাঠালে কেমন হয়। তারপরে আরও অনেক খেলা হ'লো। জল খাওয়ার খেলা, ব্যালান্সের খেলা, ওয়েট লিফ্‌টিংয়ের খেলা, তারের উপর দিয়ে সাইকেল চালানোর খেলা। না! বড় হয়ে হরিপদকে সার্কাসের দলে ভিড়তেই হবে।

তারপরে সুরু হ'লো হাতীর খেলা। রাজার বাহন, তারই উপযুক্ত পোষাক পরে বেরিয়ে এলো।

হরিপদ লাফিয়ে উঠল, মামা, মামা, এই হাতীটার পিঠেই চিড়িয়াখানায় উঠেছিলাম, তাই না?

মামা বললে, মেলা বক্ বক্ করিস নি। চুপ করে বস্ এখন।

তা মামা বলছে, গুরুজন, হরিপদ চুপ করে বসল। কিন্তু সার্কাস তো শুনতে আসেনি, দেখতে এসেছে, তার সঙ্গে কথা না বলার কি সম্পর্ক হরিপদ বুঝতে পারলে না।

তা হাতী এলো। হাতীর সঙ্গে রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্র নয়, এলো একটা ঢেঁকি। মস্ত বড় ঢেঁকি। চারটে লোকে ধরাধরি করে ঢেঁকিটাকে নিয়ে এলো। হরিপদ ধমক খেয়েও চুপ করে থাকতে পারলে না। বললে, মামা, এ তো আমাদের লেকের চিল্‌ড্রেন্‌স পার্কের ঢেঁকির মতো। এরকম ঢেঁকিতে ছোটবেলায় আমি আর গদাধর তো কতবার চড়েছি।

মামা শুধু একবার আড়চোখে তাকাল। জড়ো-সড়ো হয়ে বসল হরিপদ।

সেই ঢেঁকিটাকে কাঠের পাটাতনের উপরে ঠিকঠাক করে আটকে দেওয়া হ'লো।

হরিপদ বললে, মামা, চলো আমি আর তুমি দু'জনে মিলে ঢেঁকিটার পিঠে চাপি।

মামা শুধু চাপা গলায় বলল, আবার। হাতীটাকে নিয়ে এসে ট্রেনার ঢেঁকির চওড়া পাটাতনের একদিকে দাঁড় করিয়ে দিলে। অন্য দিকের পাটাতন ধাঁ করে উঠে গেল।

হরিপদ বললে, আর একটা হাতী না চাপালে, ওই পাটাতন নামানো মানুষের সাধ্য নেই।

তা হরিপদ কথা বলছিল একটু বেশী। কিন্তু নেহাৎ বাজে কথা বলেনি। সেটা বোঝা গেল একটু বাদেই। ট্রেনার যখন বললে, আসুন, যে কেউ উঠে এসে হাতীর উল্টো দিকের ঢেঁকিতে চাপুন, মজায় ওঠা-নামা করুন, তখন কেউ আর এগোল না। কেনই বা এগোবে, মানুষ মানুষই ; হাতী তো আর নয়।

হরিপদের খুব রাগ হচ্ছিল। এরকম বাজে রসিকতার কোনো অর্থ নেই। শুধু ঢেঁকি এনে যে কোন দু'জনকে ডাকলে ও আর মামা স্বচ্ছন্দে গট্‌মট্ করে নেমে গিয়ে ঢেঁকির খেলা দেখিয়ে দিতো। হোক মামা, ওজনে কিছু বেশীই হবে, কিন্তু হাতী তো আর নয়। হাতীটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়াচ্ছিল, কায়দা করে করে শুঁড় দোলাচ্ছিল, ওটা আর কিছু নয়, Challenge করার ভঙ্গী। কিছুটা সময় গেলো, সার্কাসের বাজনাটা একটু থিতিয়ে এসেছে। হাতীর ট্রেনার সেই আওয়াজ ছাপিয়ে আর একবার হাঁক দিলে। না, কেউই নেই। অত বড় তাঁবু, হাজারে হাজারে লোক, চারিদিকে নিয়ন লাইটের আলোর মধ্যেও তাঁবু অন্ধকার করে বসে রইল। একটা লোকও নেই হাতীর মতো।

তারপরে আর একটা ক্লাউন বেরিয়ে এলো পর্দার আড়াল থেকে বাজনার তালে তালে। যেমন লম্বা, তেমনি রোগা। হাতীর পাশে গেলো, পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, এ আর কী, এর চেয়ে আমার ওজন বেশী আছে। হো হো করে হেসে উঠলো সবাই। আর সেই হাসির মধ্যেই ক্লাউনটা অপর দিকের পাটাতনের উপরে লাফিয়ে উঠল। আর সকলের সঙ্গে হরিপদ অবাক বিস্ময়ে দেখলে ক্লাউনের পাটাতন নেমে গেলো মাটি পর্যন্ত আর উল্টোদিকে হাতীর পাটাতন উঠে গেছে অনেকটা। সব্বাই অবাক।

হরিপদই সান্ত্বনা দিলে মামাকে। ও কিছু নয়, ওই যে বাজনা বাজাচ্ছে। মুখে যে সানাইয়ের মতো কী সব নিয়ে পিঁপিঁ করছে, ওরই মধ্যে মন্ত্রপাঠ হচ্ছে। সেই মন্ত্রের জোরেই—

মামা বললে, চুপ কর্ হতভাগা। সত্যিই চুপ করল, হরিপদ। বাড়ী আসার আগে পর্যন্ত আর একটাও কথা বলেনি। বাড়ী এসেই মামা হো হো করে হেসে উঠল। মন্ত্রতন্ত্র কিছু নয়, স্রেফ গণিত, স্রেফ ষ্ট্যাটিক্স, স্রেফ মোমেণ্ট।

হরিপদ হাঁ করে বললে, মোমেণ্ট কি ?

মামা বললে, আয় বোস সে কথাই তোকে বোঝাবো।

মোমেণ্ট একটা গাণিতিক কথা, যে কথাটা Force-এর সঙ্গে যুক্ত আর এর সাহায্যে অনেক কঠিন কঠিন অঙ্ক অতি সহজে করা যায়। আর একটা কথা, খেয়াল রাখতে হবে যে মোমেণ্ট বের করবার বেলায় আমরা একটি নির্দিষ্ট বিন্দুর পরিপ্রেক্ষিতে সব সময়ে ফোর্সের মোমেণ্ট হিসেব করি। আমরা যদি O বিন্দুর পরিপ্রেক্ষিতে F ফোর্সের (যেটা AB লাইনের উপরে আছে আর Aএর থেকে Bএর দিকে যাচ্ছে) মোমেণ্ট বের করি, তাহ'লে F ফোর্সের মোমেণ্ট হবে F × OA (OA হচ্ছে O বিন্দু থেকে F ফোর্সের লাইন ABএর উপরে লম্ব, অর্থাৎ কোণ ODB = ৯০°)।

ঢেঁকির বেলায় যে লোহার ফ্রেমের (E F G H) উপরে ঢেঁকিটাকে বসানো আছে আমরা নির্দিষ্ট বিন্দুটাকে সেই লোহার ফ্রেমের উপরে নিই আর এই নির্দিষ্ট বিন্দুটাকে আমরা O' বিন্দু বলছি। এখন সমস্ত কায়দাটা ঢেঁকিটার উপরে। লোহার ফ্রেমটাকে ঢেঁকির মাঝে না বসিয়ে এক দিক চেপে বসানো থাকে। ধরা যাক সমস্ত ঢেঁকিটা ২৪ মিটার লম্বা। লোহার ফ্রেমটা এমন ভাবে বসানো থাকে যাতে একদিকে ২১ মিটার আর অন্যদিকে ৩ মিটার। আর সকলকে অবাক করবার জন্যে এই দশ মিটারের দিকেই হাতীটাকে বসানো দরকার। আর এই হাতী-টাকে বসানোর জন্যে একটা ফোর্স হ'লো। আর এই ফোর্সের জন্যে O' বিন্দুর পরিপ্রেক্ষিতে হাতীর দিকের মোমেণ্ট হবে হাতীর ওজনের সঙ্গে O' বিন্দুর থেকে হাতী যত দূরে আছে সেই দূরত্বের গুণফল। আর এখানে এই দূরত্ব ১০ মিটার। যদি হাতীর ওজন ৪০০ কিলোগ্রাম হয় তাহলে O' বিন্দুর পরিপ্রেক্ষিতে মোমেণ্ট হবে ৪০০ × ৩ = ১২০০ আর্গ (যেমন দূরত্বের বেলায় ফুট মিটার বলি, ওজনের বেলায় গ্রাম, পাউণ্ড, সের বলি, তেমনি মোমেণ্টর বেলায় দূরত্ব মিটারে মাপলে আর্গ আর ফুটে মাপলে ফুট পাউণ্ডাল বলি)।

এবারে ঢেঁকির অপর প্রান্তে আসা যাক। যদি অপরদিকের মানুষের ওজন ৬০ কিলোগ্রাম হয়, আর আমরা জানি O' বিন্দু থেকে অপর প্রান্তের দূরত্ব ১১ মিটার, তাহ'লে অপর প্রান্তে ফোর্সের জন্যে O' বিন্দুর পরিপ্রেক্ষিতে মোমেণ্ট = ২১ × ৬০ = '১২৬০ আর্গ। এবার বোঝাই যাচ্ছে ক্লাউনের দিকের মোমেণ্ট বেশী হওয়ার জন্যে সেদিকটা নীচে নেমে আসবে।—ও তোর মন্ত্রটন্ত্র কিছু নয়।

হরিপদ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, তাহ'লে সবটাই অঙ্ক। মামা বললে, হ্যাঁ।

হরিপদ বললে, মামা আমি যদি স্কুল ফাইনালে পাশ করি তাহ'লে আমি সায়েন্স পড়বো। মামা বললে, দেখা যাক্, তুমি অঙ্কে কী রকম নম্বর পাও।

যুদ্ধের বন্দী

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত

মহাযুদ্ধের সময়কার কথা।

স্থান, জর্মনীর এক যুদ্ধ-বন্দী শিবির। অনেক ইংরেজ মিলিটারী অফিসর যুদ্ধে জর্মনদের হাতে ধরা পড়েছিল ; তাদের আটক রাখা হয়েছিল ওখানে।

বিরাট এলাকা জুড়ে ঐ শিবির। চারদিক ঘেরাও করা। পাহারার ব্যবস্থা কড়া।

বন্দীদের ফায়-ফরমাস খাটত কিছু সংখ্যক ফরাসী আর ইংরেজ কয়েদী সৈনিক।

ওরা ছিল যুদ্ধক্ষেত্রে, চাঞ্চল্যের মধ্যে। ক্যাম্পে জীবনযাত্রা বন্দীদের কাছে লাগত একঘেয়ে। হাঁপিয়ে উঠত, ছটফট করত। ওদের মধ্যে অনেকে তাই মাঝে মাঝে শিবির থেকে পালিয়ে যাবার সুযোগ খুঁজে বেড়াত। এবং কেউ কেউ পালিয়েও যেত নানা ফন্দি-ফিকির করে, জর্মনদের চোখে ধূলি দিয়ে। সে বেশ মজার মজার কাহিনী।

অনেকদিন যাবৎ বন্দী-শিবিরের এক প্রান্তে বড় একটা কাঠের বাক্স পড়েছিল। পুরনো ভাঙাচোরা বাক্স একটা, তলায় চাকা লাগানো। দু'জন বন্দী ভেবেচিন্তে একটা ফন্দি আঁটল। একদিন দু'জনে পালিয়ে যাবার উপযোগী সাজ-পোশাক ভরতি করল ঐ বাক্সটাতে। তারপর বেশ গম্ভীরচালে ওটাকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে গেল একেবারে গেটের ধারে।

সেখানে পাহারায় ছিল এক জর্মন সার্জেণ্ট মেজর। সে হাঁক দিয়ে বলল : কী ব্যাপার ? বাক্সটা কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, শুনি ?

—এটাকে গেটের বাইরে রেখে আসতে হবে।

—কেন ?

—কম্যাণ্ডাণ্টের হুকুম।

ওদের সঙ্গে কোনো রক্ষী ছিল না বলে সার্জেণ্ট মেজরের মনে সন্দেহ হ'ল। বলল, মিথ্যা কথা। তোমরা তো ইংরেজ ?

—কিন্তু মশাই···

—উঁহু, বিশ্বাস হচ্ছে না আমার। খবরদার, আর এগোবে না, ওখানেই দাঁড়িয়ে থাক। আমি অফিস থেকে জেনে আসছি ব্যাপারটা।—বলেই সে ছুটল অফিস ঘরের দিকে।

সেদিনকার ডিউটি লিস্টে কার কার নাম ছিল, কোন্ কোন্ কাজের নির্দেশ ছিল, সব দেখে-শুনে খোঁজখবর নিয়ে অন্য একজন গার্ডসহ গেটে ফিরে এসে সার্জেণ্ট মেজর হতভম্ব ! ধারেকাছে কেউ কোথাও নেই, শুধু বাক্সটা পড়ে আছে। বন্দী দু'জন ইত্যবসরে সরে পড়েছে। কী আর করা ? মেজর অগত্যা ঐ খালি বাক্সটা ঠেলে নিয়ে গিয়ে আগের জায়গায় রেখে দিয়ে এল।

* * *

এভাবে জর্মনদের চোখে ধূলি দিয়ে অনেক বন্দীই ক্যাম্প থেকে পালিয়ে যেত। একবার জনৈক বন্দী কিছুকাল তাকে-তাকে থেকে একটা জর্মন ইউনিফর্ম যোগাড় করল এবং ফাঁক-ফন্দি করে গেটের তালার একটা চাবিও তৈরি করে নিল। তারপর একদিন ঐ ইউনিফর্ম পরে, দিন-দুপুরে সকলের চোখের সামনে গট্ গট্ করে এগিয়ে গিয়ে গেট খুলে বের হয়ে চলে গেল। রক্ষীর মনে কোনো সন্দেহ হয়নি, ভেবেছে নিজেদের লোক। আসল ঘটনা যখন জানা গেল তখন ঐ পলাতক বন্দী সীমান্ত ছাড়িয়ে চলে গেছে অনেক অনেক দূর।

* * *

বন্দীদের প্রত্যেককে একটা করে ট্রাঙ্ক রাখবার অনুমতি দেওয়া হ'ত। ওদের নেহাত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রাদি থাকত তাতে। বড় বড় ট্রাঙ্ক। কিন্তু ওগুলো রাখা নিয়ে হ'ল সমস্যা। এক এক ঘরে পনেরো-ষোলজন করে বন্দী, ট্রাঙ্ক রাখবার জায়গা কোথায়? অগত্যা কর্তৃপক্ষের আদেশানুযায়ী বাক্সগুলো রাখা হয়েছিল ক্যাম্পের বাইরে—গেটের ওপাশে একটা স্টোর রুমে। প্রয়োজন মাফিক কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে ওখান থেকে বাক্স আনা হ'ত। জনকয়েক বন্দী একবার এক মতলব স্থির করল। সেটা এই যে, স্টোর-রুম থেকে গোটাকতক বাক্স এনে এক-একটার ভিতরে এক-একজন ঢুকে থাকবে; অন্য বন্ধুরা সেগুলো ব'য়ে নিয়ে যাবে ষ্টোর-রুমে, এবং রাত্রিবেলা সেখান থেকে চম্পট দেওয়া হবে। যেমন পরামর্শ তেমন কাজ। প্রথমটা সব ঠিক ঠিক চলল। বেলা দুটোর মধ্যে সব কয়টা বাক্স ক্যাম্পের গেটের বাইরে চলে এল। প্রায় ষ্টোর-রুমের দরজার কাছে এসে পৌচেছে, এমন সময়ে এক জর্মন অফিসর এসে উপস্থিত। বলল, বাক্সগুলো আপাতত এখানে থাক, পাঁচটার সময়ে এসে ঘরে তুললেই হবে; অন্যত্র জরুরী কাজ আছে। এই বলে যারা বাক্সগুলো ব'য়ে নিয়ে এসেছিল তাদের সঙ্গে করে সে চলে গেল।

দিনটা ছিল গরম। একটা বাক্স থেকে নড়াচড়ার শব্দ আর কোঁ কোঁ আওয়াজ বের হচ্ছিল। ওদের যে সকল সঙ্গীরা গেটের কাছে ঘুর ঘুর করছিল, তারা কথা ব'লে, চীৎকার ক'রে, শিস্ দিয়ে আওয়াজটা ঢাকবার চেষ্টা করল। কিন্তু রক্ষীর মনে সন্দেহ হয়েছে, বার বার বাক্সটার দিকে তাকাচ্ছে। সৌভাগ্য যে লোকটা তার বেয়নেটের এ ঘা বসিয়ে দেয়নি বাক্সটাতে।

যাহোক শেষপর্যন্ত বাক্সগুলো তোলা হ'ল ঘরে। কিন্তু সম্ভবত ঐ রক্ষী তার সন্দেহের কথা অফিসরের কাছে বলেছিল; তাই রাত আটটায় দেখা গেল এক অফিসার জনকতক গার্ডসহ ঢুকল ষ্টোর-রুমে এবং বাক্স খুলে সব ক'জনকে পাকড়াও করল।

বেচারাদের শেষরক্ষা হ'ল না। অধিকন্তু, বন্দী-নিবাসের আইনানুযায়ী ওদের শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল।

* * *

ক্যাম্পের প্রয়োজনীয় নানা জিনিসপত্র আনা হ'ত ট্রাক্ বোঝাই করে। হামেশাই ট্রাক্ আসত। সাধারণতঃ ট্রাক এসে পৌছত বেলা শেষে। জিনিসপত্র খালাস করত বন্দীরা। প্রায়ই রাত হয়ে যেত। তখন ট্রাকটা থেকে যেত ক্যাম্পের কাছাকাছি কোথাও এবং পরদিন আবার চলে যেত যথাস্থানে।

এক রাত্রির কথা। একটা ট্রাক্ মালপত্র খালাস করে দিয়ে একপাশে দাঁড়িয়েছিল। দুই জর্মন সেন্ট্রি ক্যাম্পের চারধারে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছে। এক সময়ে তাদের ক্ষিদে পেয়ে গেল। কিন্তু অত রাত্রে বাইরে কোথায় কী পাবে? ঘুরতে ঘুরতে তারা ট্রাকটার কাছে এসে পড়ল। ভাবল, ওটাতে খাবার মতো কিছু মিলে যেতেও বা পারে। উঠে পড়ল দু'জনে। কিছু বালিমাটি আর কতগুলো খালি ক্যানেস্তা ছিল ট্রাকে। খুঁজতে খুজতে ওরা দেখে এক কোণে গুড়িশুড়ি মেরে বসে আছে এক কয়েদী সৈনিক, সারা গায়ে কাদামাটি মাখা!

বেচারীর আর পালানো হ'ল না।

* * *

জর্মন বন্দী শিবিরগুলিতে একটা করে বড় শিকারী কুকুর রাখার ব্যবস্থা ছিল। কোন বন্দী পালিয়ে গেলে ঐ কুকুরের সাহায্যেই খুঁজে-পেতে ধরে আনা হ'ত।

কিন্তু বন্দী-শিবিরেও দুর্নীতি ছিল। জর্মন অফিসাররাও যেমন উৎকোচের বশীভূত ছিলই, সেই সঙ্গে ঐ কুকুরগুলোও।

এখানে যে বন্দী-শিবিরের কথা বলা হচ্ছে, সেখানেও ছিল একটা প্রকাণ্ড শিকারী কুকুর। বন্দীরা প্রচুর ভাল ভাল জিনিস খেতে দিত কুকুরটাকে। আর তার জর্মন প্রভুরা তাকে সামান্যই খেতে দিত। তাই ও সব সময়েই ঘুর ঘুর করত বন্দীদের কাছে-পিঠে এবং খুব বশ মেনে গেল তাদের।

শেষ পর্যন্ত এক বন্দী যখন ক্যাম্প থেকে পালাল কুকুরটাও তার পিছু নিল। তার সঙ্গ ছাড়তে চায়নি কিছুতে। অনেক চেষ্টা, অনেক কসরৎ করেও ঐ পলাতক বন্দী ফেরৎ পাঠাতে পারেনি তাকে।

পরে জানা গেছে লোকটি নাকি কুকুরটাকে নদীতে ডুবিয়ে মারবারও চেষ্টা করেছিল! কিন্তু ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রকাণ্ড একটা কুকুরের মাথা কি জলের তলে চেপে ধরে রাখা যায়? আর যদি তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও সে তোমার পিছু নেয়, তা হলেই বা তুমি কী করতে পার?

জানোয়ারী কাণ্ড

——শ্রীসৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়——

জন্তু-জানোয়ারদের আজব কীর্তিকলাপের এত সব মজার কাহিনী আছে যে বলে শেষ করা যায় না। শোনো তা'হলে···এবারে বলি তোমাদের আরকটি আজব-মজার কাহিনী—ইয়া কেঁদো এক দুর্দান্ত বুনো-বাঘের উদ্ভট-কেরামতীর কথা। এ ঘটনাটি ঘটেছিল—আমাদের ভারতবর্ষেরই এক পাহাড়ী-জঙ্গলে।

উত্তর-ভারতের তরাই অঞ্চলের কোনো একটি পাহাড়ী শহরে ছিলেন এক নামজাদা জাঁদরেল শিকারী। আশপাশের লোকজনদের কাছে তাঁর ছিল রীতিমত খাতির···বন্দুকের গুলিতে কত যে বাঘ-ভাল্লুক মেরেছেন তিনি, তার আর ইয়ত্তা নেই—এমনই অব্যর্থ ছিল তাঁর হাতের টিপ! শিকারীর ভারী সখ—জঙ্গলে ফাঁদ পেতে জ্যান্ত বুনো-বাঘ ধরবার···উঁচু গাছের ডালে মাচান বেঁধে আর হাতীর পিঠে হাওদায় চড়ে বন্দুকের গুলির তাক্ করে বনের দুরন্ত জন্তু-জানোয়ার তিনি অনেক মেরেছেন, কিন্তু ফাঁদে বাঘ-শিকারের যে কী আনন্দ, সেটি পরখ করে দেখার আর সুযোগ জোটেনি কোনোদিন তাঁর বরাতে। কাজেই, জঙ্গলে ফাঁদ পেতে জ্যান্ত বুনো-বাঘ ধরার সুযোগের আশায় তিনি বরাবরই বিশেষ উৎসুক-আকুল হয়ে শিকারের খোঁজ-খবর রাখতেন।

কথায় বলে,—উদ্যোগী-পুরুষের ভাগ্যেই বিধাতার আশীর্বাদ জোটে···এক্ষেত্রেও শেষ পর্যন্ত তাই ঘটলো! আশপাশের পাহাড়ী-লোকজনদের মারফৎ নিয়মিত খোঁজ-খবর রাখার ফলে, শিকারী-মশাই হঠাৎ একদিন সুসংবাদ পেলেন, যে কাছেই এক জংলী-গাঁয়ে ভয়ংকর বাঘের উপদ্রব সুরু হয়েছে। বেয়াড়া-দুরন্ত সেই বুনো-বাঘের বেপরোয়া-দৌরাত্ম্যে গাঁয়ের নিরীহ লোকজনের জীবন একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে···নিশ্চিন্তে নিজেদের জমিতে চাষবাস, মাঠে-প্রান্তরে গরু-ভেড়া-ছাগল-মহিষ চরানো···জিনিসপত্র সওদা-বেসাতীর জন্য আশপাশের হাটে-বাজারে যাতায়াত···এমন কি, বৌ-ছেলেপুলে নিয়ে শান্তি-সুখে ঘরকন্না করাও প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। নিত্যই দেখা যায়—হয় এর গরু, নয় ওর মহিষ, কারো পোষা ছাগল-ভেড়া, কারো বা ছেলে-মেয়ে কিংবা বৌ···এমনি একজন না একজন কেউ বেঘোরে সেই দুরন্ত-ভয়ংকর বুনো-বাঘের খপ্পরে পড়ে নিতান্ত নিরুপায়ভাবে শুধু মারাত্মক চোট-জখমই নয়, উপরন্তু পৈতৃক প্রাণটুকু পর্যন্ত হারিয়ে বসেছে! সারা গাঁয়ে রীতিমত ছম্‌ছমে আতঙ্কের কালো-ছায়া···কখন যে কার আচম্‌কা বিপদ ঘটবে—সেই ভয়েই সারাক্ষণ সবাই কাবু হয়ে রয়েছে।

বাঘের দৌরাত্ম্যের খবর পেয়েই, শিকারীর মন উৎসাহ-উল্লাসে মেতে উঠলো···সত্যিই তা'হলে সুযোগ মিলেছে এতদিন অপেক্ষার পর!···তবে, এবারে আর অন্যান্যবারের মতো

গাছের মগ্ ডালে মাচান বেঁধে কিংবা হাতীর পিঠে চড়ে বন্দুকের গুলির তাক্ ক'ষে শিকার নয়, বরং জঙ্গলের বুকে রীতিমত ফাঁদ পেতে জলজ্যান্ত দুরন্ত বুনো-বাঘকে সশরীরে পাকড়াও করে আনা···না হলে, এতকালের এমন জবরদস্ত-জাঁদরেল পাকা-ঝানু নামজাদা-ওস্তাদ শিকারী হয়ে বাহাদুরীর আর কি পরিচয়ই বা দিলুম !···এই রকম পাঁচ-সাত চিন্তা করে শিকারী-মশাই শেষ পর্যন্ত ফন্দী আঁটলেন—বনের মধ্যে লোহার রেলিঙ-ঘেরা বেশ মজবুত একটি খাঁচা ব'য়ে নিয়ে গিয়ে, মাটিতে গভীর গর্ত খুঁড়ে সুকৌশলে সেটিকে বসিয়ে, আগাগোড়া জংলী ডাল-লতা পাতা চাপা দিয়ে, এমন কায়দায় জানোয়ার-ধরার ফাঁদ পাতবেন যে বাইরে থেকে দেখলে, সহজে কারো মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ জাগবে না—শিকারের এই আজব কারসাজির সম্বন্ধে। শুধু ফাঁদ পাতাই নয়, শিকারী-মশাই আরো মতলব ঠাওরালেন—ডাল পাতায় ঢাকা এই মজবুত-খাঁচার দরজাটি সামান্য খোলা রেখে, এমন কৌশলে দরজায় খিল-আঁটবার হুড়কোর সঙ্গে দড়ি দিয়ে দিব্যি পুরুষ্টু-নধর গড়নের একটি ছাগল শিকারের টোপ হিসাবে বেঁধে দেবেন যে, দুরন্ত বুনো-বাঘ সেই নিরীহ-অবোলা জীবটিকে উদরস্থ করবার লোভে যেমন ঐ খোলা-দরজার ফাঁক গ'লে খাঁচার ভিতরে সেঁধিয়ে টোপে টান লাগাবে, অমনি হুড়কোর দড়ির-বাঁধন আল্‌গা হয়ে ফাঁদের দরজাও ঝুপ করে বন্ধ হয়ে যাবে···সঙ্গে সঙ্গে জলজ্যান্ত বনের বাঘও বেকায়দায় পড়ে লোহার গরাদ-ঘেরা খাঁচা-ফাঁদের মধ্যে হবে বন্দী! তারপর খাঁচা-সমেত সেই বন্দী-বাঘকে জলজ্যান্ত অবস্থায় জঙ্গল থেকে লোকালয়ে নিয়ে আসা···সে আর এমন কি কঠিন কাজ!

যাই হোক, এমনি মতলব এঁটে শিকারী-মশাই শেষ পর্যন্ত একদিন সত্যি-সত্যিই সেই পাহাড়ী-গ্রামের প্রান্তে গভীর জঙ্গলের মাঝে লতা-পাতায় ঘেরা এক ঘন-ঝোপের আড়ালে লোহার গরাদ-আঁটা মজবুত খাঁচা খাটিয়ে বুনো-বাঘ ধরার আজব-ফাঁদ পেতে বসলেন। আগে থেকে এঁচে-রাখা মতলব মতোই তিনি খাঁচা-ফাঁদের দরজা ঈষৎ-খোলা রেখে, তার সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিলেন দিব্যি নধর-পুরুষ্টু গড়নের একটি কচি-ছাগল—দুরন্ত বুনো-বাঘ শিকারের টোপ্ হিসাবে। দিনের আলো থাকতে থাকতেই বাঘ-শিকারের এ সব আয়োজন সেরে, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই গাঁয়েরই দু'চারজন সাহসী পাহাড়ী-অনুচরদের সঙ্গী করে, বন্দুক-গুলি-হাতিয়ার, জোরালো টর্চ-লাইট, প্রয়োজন মতো কিছু খাবারদাবার আর জলের বোতল নিয়ে শিকারী-মশাই সদলে গিয়ে উঠলেন—খাঁচা-ফাঁদের পাশেরই বিরাট একটা ঝাঁকড়া-পাতায়-ঢাকা পিপুল-গাছের মগ্ ডালে বেঁধে-রাখা বাঁশের মাচায়। মাচার উপরে আশ্রয় নিয়ে সকলেই নিশুতি-অন্ধকারে গভীর জঙ্গলে অধীর-আগ্রহে নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগলো—কতক্ষণে সেই দুর্দান্ত বুনো-বাঘ শিকারের টোপ্ টেনে নিয়ে যাবার লোভে ফাঁদে এসে পদার্পণ করে।

কিন্তু, এমনই পোড়া-বরাত যে বাঘ-বাবাজীর আর দেখাই মেলে না···কোনো পাত্তাই নেই তার খাঁচা-ফাঁদের আশপাশে জঙ্গলের কোথাও !···ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপচাপ বসেই রাত কেটে যায়···বাঘের কোনো সাড়াশব্দটুকুও নেই !···চারিদিক নিস্তব্ধ-নিঝুম···গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ে না—এমন বিশ্রী-গুমোট আবহাওয়া !···নিরালা-অন্ধকার জঙ্গলের মাঝে কানে ভেসে আসে শুধু ঝিঁঝিপোকার অবিশ্রান্ত একঘেয়ে কলতান···আর সে তান ছাপিয়ে সারা বন প্রতিধ্বনিত করে মাঝে মাঝে জেগে ওঠে খাঁচা-ফাঁদের দরজার কোণে শিকারের টোপ হিসাবে বেঁধে-রাখা সেই ছাগল-ছানার বেয়াড়া-কর্কশ আর্ত-কাতর চীৎকার ! এছাড়া বিরাট গহন জঙ্গলে আর কোনো প্রাণের সাড়া নেই···অন্য সব জন্তু-জানোয়ারও যেন সে-রাতে সভয়ে বন ছেড়ে দূরে আর কোথাও সরে পালিয়েছে !

পাহাড়ী-জঙ্গলের ইয়া বড-বড ডাঁশ-মশার কামড়ের জ্বালা-দৌরাত্ম্য স'হে বহুক্ষণ এমনি চুপচাপ গাছের মগ্‌ডালে মাচার উপরে বসে-বসে অপেক্ষার পর, শিকারী-মশাই আর তাঁর সঙ্গীরা যখন হয়রান হয়ে প্রায় হাল ছেড়ে দেবার মতলব করছেন, এমন সময় হঠাৎ শোনা গেল—খাঁচা ফাঁদের আশেপাশে নিবিড় অন্ধকারের মাঝে কি যেন একটা ভারী জানোয়ার খশ্‌খশ্‌ শব্দে বনের চারিদিকে ঝরে-পড়া শুকনো পাতার রাশি মাড়িয়ে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করে বেড়াচ্ছে। শব্দ শুনেই শিকারী-মশাই সন্তর্পণে তাড়াতাড়ি তাঁর হাতের জোরালো টর্চ-লাইটের বোতাম টিপে বাতি জ্বাললেন···বাতির আলোতে সুস্পষ্ট দেখা গেল—মাচার নীচেই প্রকাণ্ড-কেঁদো এক হল্‌দি-কালো ডোরা-কাটা বুনো-বাঘ এসে সদর্পে ছাগল-ছানার টোপ্‌ বেঁধে রাখা খাঁচা-ফাঁদের আশেপাশে বেপরোয়া-ভঙ্গীতে টহল দিতে সুরু করেছে।

বাঘের চেহারা নজরে পড়তেই শিকারীর হতাশ মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো !···যাক্, বরাত তা'হলে ভালোই দেখছি···এতক্ষণ বাদে শিকারের দেখা মিললো শেষ পর্যন্ত ! এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে শিকারী-মশাই পাশের পাহাড়ী-সঙ্গীর হাতে টর্চ-লাইটটি সঁপে দিয়ে, তাড়া-তাড়ি নাগালের কাছেই গাছের ডালের গায়ে ঠেশান-দিয়ে-রাখা গুলি-ভরা বন্দুক হাতে তুলে নিয়ে রাতের অন্ধকারে নিঝুম-জঙ্গলে মাচার উপরে ঠায়-খাড়া সজাগ-উদগ্রীব হয়ে বসে রইলেন—আজব-ফাঁদ পেতে জলজ্যান্ত বুনো-বাঘ পাকড়াও করার সুযোগের অপেক্ষায়।

বুনো হলেও, বাঘ কিন্তু বেজায় সেয়ানা···ঘুটঘুটে-অন্ধকার বনের মাঝে সঙ্গীর হাতের টর্চ-লাইটের রোশ্‌নি-আলোর আচম্‌কা-ঝলক নজরে পড়তেই তার কেমন সন্দেহ হলো···এ আবার কী উদ্ভট-কাণ্ড !···আকাশে চাঁদ নেই···আঁধার-রাত···নিরালা জঙ্গলের মাঝে হঠাৎ কোথা থেকে আমদানী হলো এই চোখ-ধাঁধানো সর্বনাশা-আলোর ঝলকানি ?···কোনো অজানা-বিপদের সম্ভাবনা নয় তো ?···বাঘের মন সংশয়ে ভরে উঠলো···সে ভাবলো,—তুচ্ছ ঐ একটা ছাগল-ছানা

শিকারের লোভে শেষে কি আরো নিদারুণ নতুন কোনো বিপদের কবলে পড়ে বেঘোরে নিজের প্রাণটুকু পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হবে! তার চেয়ে বরং ঐ আজব-আলোর সর্বনাশা রোশ্‌নি-ঝলকের আওতার বাইরে দূরে অন্ধকারে বুনো-ঝোপঝাড়ের আড়ালে সরে থাকাই ভালো!

এমনি সাত-পাঁচ চিন্তার পর, বিপদ এড়িয়ে প্রাণ বাঁচানোর মতলবে হুঁশিয়ার বাঘকে গুটিগুটি খাঁচা-ফাঁদের ভিতরে দড়ি-বাঁধা পুরুষ্টু নধর ছাগল-ছানা ভক্ষণের দুর্বার লোভ ছেড়ে দিয়ে দূরে অন্ধকার জঙ্গলের ঘন ঝোপঝাড়ের আড়ালে সরে পড়বার উপক্রম করতে দেখেই শিকারী-মশাই তো প্রমাদ গণলেন…একেবারে মুঠোর নাগালে পেয়েও এমন জলজ্যান্ত-শিকার শেষে বুঝি তাঁর টর্চ-লাইটের আচমকা রোশ্‌নি-ঝলকের ভয়ে হাত ফসকে পালায়!…তাই এত সাধের শিকার ফসকানোর লোকসান সইতে না পেরে, তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর মাচার সঙ্গী পাহাড়ী-লোকটিকে হাতের টর্চ-বাতির বোতাম টিপে অবিলম্বে আলো নিভিয়ে দিতে ইশারা করলেন। কিন্তু টর্চ-বাতি হাতে শিকারীর সেই পাহাড়ী-সঙ্গীটি একেই নিতান্ত হাঁদা-বোকা উজবুক-ধরণের, তার উপর চোখের সুমুখে সত্য গাছের নীচেই জলজ্যান্ত ইয়া-বেদো দুরন্ত বুনো-বাঘকে সদর্পে বেপরোয়াভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে সে বেচারা ভয়ে-আতঙ্কে কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল।

কাজেই আচমকা শিকারী-মশাইয়ের ইশারা মতো যেমনি সে ঘাবড়ে তাড়াহুড়ো করে আনাড়ি-হাতে বোতাম টিপে টর্চ-বাতির আলো নেভাতে গেছে, অমনি বেহুঁশিয়ারী থাকার ফলে, বেটক্করে হাত ফসকে ঘুটঘুটে অন্ধকার জঙ্গলের মাঝে একমাত্র আলোর সম্বল সেই টর্চ-বাতিটি গাছের মগ্‌ডালে-বাঁধা মাচার উপর থেকে ঝুপ্ করে খসে পড়লো নীচের ঘন ঝোপঝাড়-আগাছায় ভরা বুনো পাহাড়ী-জমির খানাখন্দের কোন্ এক গভীর ফাটলের কন্দরে।

উপর থেকে নীচে শক্ত-পাথুরে পাহাড়ী-জমিতে ছিটকে পড়ার প্রচণ্ড ধাক্কায় কল বিগড়ে জ্বলন্ত টর্চ-বাতির রোশ্‌নি গেল নিভে…সঙ্গে সঙ্গে নিমেষের মধ্যেই চোখের সুমুখে বিরাট জঙ্গলের চারিদিক ছেয়ে গেল ঘুটঘুটে-কালো গাঢ় অন্ধকারে…এমন অন্ধকার যে কেবলমাত্র রাতের আকাশের আবছা-আভা আর একরাশ ঝিক্‌মিকে তারার বিন্দু ছাড়া আশপাশের কোনো কিছুই সহজে ঠাওর করা যায় না।

মিশ্‌-কালো নিশুতি রাতের সেই অস্পষ্ট-অন্ধকারে মাঝে মাঝে শুধু নজরে পড়ে—দূরে জংলী-ঝোপঝাড়ের আনাচে-কানাচে সোনালী চুম্‌কির মতো ইতস্ততঃ চিক্‌মিক্ করে জ্বলছে আর নিভছে জোনাকী-পোকার আলোর অসংখ্য বিন্দুর ছটা। (ক্রমশঃ)
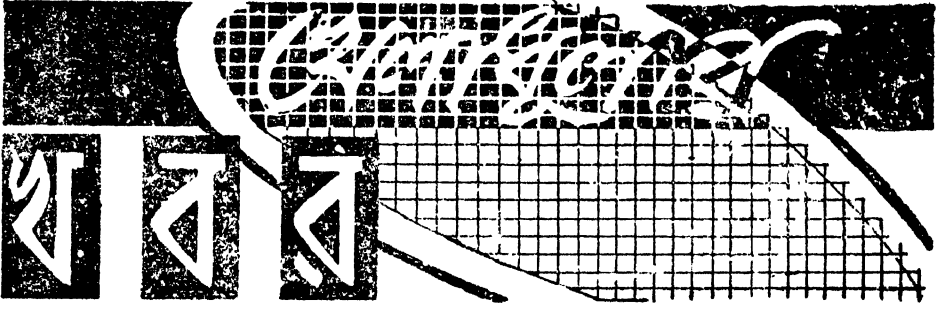
মেঠুড়ে

এশিয়ান লন টেনিস

ক'দিন আগে কলকাতার সাউথ ক্লাবে এশিয়ান লন টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের খেলা হয়ে গেছে। এবারের প্রতিযোগিতায় ভারতের খ্যাতনামা খেলোয়াড়রা ছাড়াও বিদেশের কয়েকজন সুখ্যাত খেলোয়াড় অংশ নিয়েছিলেন। এঁদের ভেতর অস্ট্রেলিয়ার বব হিউইট ও মার্টিন মুলিগান, গ্রেট ব্রিটেনের মাইক স্যাংস্টার টেনিস খেলার জগতে খুবই নামকরা। ফিলিপাইনের ডাঙ্গো ও কন্ট্রিয়াস, সিংহলের কুমারী খোদাগাদা এবং বব হিউইটের স্ত্রী ডিলাইলা হিউইটও সাউথ ক্লাবের অন্যতম আকর্ষণ ছিলেন। এঁদের সঙ্গে ছিলেন কৃষ্ণন, জয়দীপ, প্রেমজিৎ, লক্ষ্মী মহাদেবন, লীলা পাঞ্জাবী প্রমুখ একডাকে চেনা ভারতের টেনিস খেলোয়াড়রা। সুতরাং চ্যাম্পিয়নশিপের খেলা যে খুব উপভোগ্য হয়েছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

এশিয়ান লন টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের খেলায় ভারতের রমানাথন কৃষ্ণনের আবার বিজয়ীর সম্মানলাভ বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতন। এবার নিয়ে কৃষ্ণন মোট চারবারের ভেতর পরপর তিনবার এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ পেলেন। অস্ট্রেলিয়ার তিন নম্বর খেলোয়াড় এবং উইম্বলডন রানার্স মার্টিন মুলিগান সেমি-ফাইন্যালে এবং অস্ট্রেলিয়ার বব হিউইট ফাইন্যালে কৃষ্ণনের কাছে হেরে যান। মুলিগানের সঙ্গে কৃষ্ণনকে পাঁচ সেট খেলতে হয়েছিল এবং খেলাও হয়েছিল খুব প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ও চিত্তাকর্ষক। কিন্তু ফাইন্যালে কৃষ্ণনের কাছে বব হিউইটকে স্ট্রেট সেটেই হারতে হয়। হিউইট পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ডাবলস জুটির অন্যতম। সিঙ্গলসের খেলাতেও সিদ্ধহস্ত, কিন্তু কৃষ্ণনের কাছে হিউইটকে অনেক ছোট মনে হয়েছে। সিঙ্গলসের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য খেলোয়াড়ের ভেতর ভারতের বয়েজ চ্যাম্পিয়ন বোম্বাইয়ের এস. মিনোত্রার নাম উল্লেখ করার মতন। তাঁর কাছে ফিলিপাইনের এক নম্বর খেলোয়াড় ডাঙ্গোর পরাজয় যেমন আশ্চর্যের তেমনি উল্লেখযোগ্য কোয়ার্টার ফাইন্যালে রামনাথন কৃষ্ণনের কাছে থেকে তাঁর একটা সেট লাভ।

ভারতের জাতীয় টেনিস প্রতিযোগিতা

দিল্লিতে আয়োজিত ভারতের জাতীয় টেনিস প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে রমানাথন কৃষ্ণন আবার চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছেন। এবার নিয়ে বারো বারের মধ্যে আট বার কৃষ্ণন জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করলেন। ফাইন্যালে প্রতিদ্বন্দ্বী মার্টিন মুলিগান অসুস্থতার জন্যে কৃষ্ণনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নি। ফলে, বহু দর্শককে নিরাশ হতে হয়। ডাবলসের ফাইন্যালে অবশ্য অস্ট্রেলিয়ান জুটি মুলিগান ও বব হিউইটকে যথারীতি কৃষ্ণন ও মাইক স্যাংস্টারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়। এ খেলাতে কৃষ্ণন এবং স্যাংস্টার বিজয়ী হন।

এবার জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে সবচেয়ে উল্লেখ করার মতন ঘটনা মহিলাদের ফাইন্যালে ম্যারিয়ন ল-র বিজয়িনীর সম্মান। নিউজিল্যাণ্ডের এই মহিলা টেনিস খেলোয়াড়টি গতবারের এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন লক্ষ্মী মহাদেবনকে হারাবার পর ফাইন্যালে সদ্য এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন নিরূপমা বসন্তকে হারিয়ে দিন। মহিলাদের ডাবলসেও তিনি বিজয়ীর অংশীদার হন।

জাতীয় টেবল টেনিস

জলন্ধরে অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় মহারাষ্ট্রের খেলোয়াড় গৌতম দেওয়ান আবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। এবার নিয়ে গৌতম দেওয়ান পাঁচ বার জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের অধিকারী হলেন। শুধু সিঙ্গলসের চ্যাম্পিয়নশিপ নয়, সুনন্দা কারণদিকারকে নিয়ে খেলে দেওয়ান মিক্সড ডাবলসেরও বিজয়ী হয়েছেন। পুরুষদের ডাবলসেও দেওয়ান ও খোদাইজি জুটি রানার্সের সম্মান পেয়েছেন। খোদাইজি ও দেওয়ানের খেলায় উন্নত টেবল টেনিস নৈপুণ্যের পরিচয় মেলে। ফোর হ্যাণ্ড ও ব্যাক হ্যাণ্ড মারের নৈপুণ্যে দেওয়ান খোদাইজিকে হারিয়ে দেন। জাতীয় টেবল টেনিসে বাংলার কোনো ছেলেমেয়েই বিশেষ সুবিধে করতে পারেন নি। শুধু বালিকাদের ফাইন্যালে রূপা মুখার্জি পাঞ্জাবের মীনাক্ষী ভাটনগরের সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে শেষ পর্যন্ত জিততে পারেন নি।

নেহরু স্মৃতি হকি প্রতিযোগিতা

নেহরু হকি প্রতিযোগিতায় তেতাল্লিশটি দল অংশ নিতে চাইলেও পরিচালকদের পক্ষে চব্বিশটির বেশি দলকে খেলার সুযোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি। সাউথ ইস্টার্ণ রেলের কলিকাতা শাখার দল ছাড়া কলকাতার দু'টি সুপরিচিত ক্লাব মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলকে খেলার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। ইস্টবেঙ্গল দ্বিতীয় রাউণ্ডের প্রথম খেলায় দিল্লি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দলকে ১-০ গোলে হারাবার পর কোয়ার্টার ফাইন্যালে সাউথ ইস্টার্ণ রেলের সঙ্গে দু'দিন অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ

করে তৃতীয় দিনে ১-০ গোলে হেরে যায়। মোহনবাগানকে দ্বিতীয় রাউণ্ডে ইণ্ডিয়ান নেভীর সঙ্গে একদিন ৩-৩ গোলে অমীমাংসিত ভাবে খেলা শেষ করে দ্বিতীয় দিন ২-১ গোলে হার স্বীকার করতে হয়।

নেহরু স্মৃতি হকি প্রতিযোগিতায় বিজয়ী নর্দার্ণ রেল ও বিজিত সাউথ ইস্টার্ণ রেল দ্বিতীয় রাউণ্ড থেকে খেলে।

সাউথ ইস্টার্ণ একদিক থেকে একে একে দিল্লির খালসা ব্লুজকে ১-০ গোলে, ইস্টবেঙ্গলকে ১-১, ২-২ ও ১-০ গোলে এবং সেণ্ট্রাল কম্যাণ্ডকে ১-০ গোলে হারিয়ে দিয়ে ফাইন্যালে ওঠে।

অন্য দিকে ফাইন্যালে উঠতে নর্দার্ণ রেল পরাজিত করে পেরাম্বুরের ইনট্রিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরীকে ৫-০ গোলে, ইণ্ডিয়ান নেভীকে ৩-০ গোলে এবং বোম্বাই একাদশকে ২-১ গোলে। ফাইন্যালে নর্দার্ণ রেল ২-১ গোলে সাউথ ইস্টার্ণ রেলকে হারিয়ে নেহরু স্মৃতি প্রতিযোগিতার প্রথম বছরে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে।

বিজয়ী দলের পক্ষে একাই দুটো গোল করেন সর্ট কর্ণার হিটে সুদক্ষ খেলোয়াড় পৃথ্বিপাল সিং।

মোহনবাগানের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী

যে-কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পঁচাত্তর বছরের অস্তিত্ব গৌরবের।

মোহনবাগান ক্লাবের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তীর পঁচাত্তর দিনের জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান ক-দিন আগে শেষ হয়েছে। জয়ন্তী উপলক্ষে ক্লাবের কর্তৃপক্ষ খেলাধুলোর যে-সব ব্যবস্থা করেছিলেন, ক্লাবের সুনাম এবং মর্যাদার সঙ্গে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ।

জনপ্রিয় খেলার মধ্যে কোনো খেলাধুলোই বাদ যায় নি।

যে ভাবে সব খেলাধুলো শেষ হয়েছে এবং প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উৎসব পালিত হয়েছে তার জন্যে দেশসুদ্ধ লোক যে খুব খুশি হয়েছি তা বলাই বাহুল্য।

———
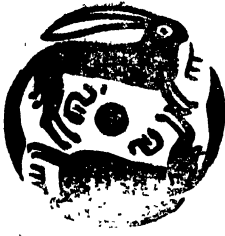
বছরের সব কয়টি উৎসব প্রায় শেষ—একমাত্র দোল বা বসন্তোৎসব বাকী। শীতের অন্তিমে এখন বসন্ত বয়ে আনছে প্রখর গ্রীষ্মকে—ফাল্গুনের শেষেই প্রখর তপন তাপের দাহ। বছরটি শেষ হবে। এই যে বৎসরটি শেষ হয়ে আসছে—তার ভিতর শুভ-সঙ্কেত কিছুই ছিল না। শ্রীনেহরুর মহাপ্রয়াণের পর দেশের উপর দুঃখ-দুর্দশার ছায়া ক্রমশঃ ঘনীভূত হয়ে আসছে, আরো অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে মানুষ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। নিত্য নতুন পরিস্থিতিতে তোমরা ও তোমাদের শিক্ষাক্ষেত্র নানা বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হচ্ছে। তবুও নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যে তোমরা অবিচলিত থাকবে ও শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প রাখবে—যাতে যত বাধাই আসুক, তোমরা যেন তা থেকে উত্তীর্ণ হতে পারো। অনেকেরই পরীক্ষা সুরু হচ্ছে, অনেকের শেষও হয়েছে। যাদের সুরু তাদের বিশেষ করে একথা বলার সময় এসেছে—নিয়ম ও অবিচলিত মনে নিষ্ঠা নিয়ে কাজ করে যাও,—সুফল তার পাবেই।

মহাজীবন থেকে—

পশ্চিমে ভারতের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে তখন চলছে যুদ্ধের তোড়জোড়। মহারাষ্ট্রের পার্বত্য অঞ্চলে শিবাজী তখন উড্ডীন করেছেন তাঁর গৈরিক পতাকা। প্রবল প্রতাপান্বিত ভারত সম্রাটের বিরুদ্ধে তিনি ঘোষণা করেছেন সশস্ত্র সংগ্রাম। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে দলে দলে এগিয়ে আসছে মারাঠী তরুণ আর যুবকেরা। এতো বড় শক্তিশালী প্রতিপক্ষ—তবু তাদের দেহে-মনে ভয় উদ্বেগের কোনো চিহ্নমাত্র নেই। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তারা সর্বস্ব, এমন কি প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত।

শত্রুদলও নিরস্ত থাকেনি। অস্ত্রবল, জনবলের দিক থেকে মারাঠীদের তুলনায় তারা বহু-গুণে বলীয়ান। সম্প্রতি নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে খবর এসেছে, শত্রুবাহিনী এবার একযোগে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আক্রমণ শুরু করবে। মারাঠা-নায়ক এই আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সম্ভাব্য সকল রকম ব্যবস্থা অবলম্বনে উদ্যত হলেন। দুর্বার উৎসাহ ও দুর্জয় সঙ্কল্প নিয়ে এগিয়ে এলো মারাঠী বীরেরা। শিবাজী রাজ্যের সর্বত্র ঘুরে-ফিরে সামরিক প্রস্তুতির তত্ত্বাবধান করতে লাগলেন। সীমান্ত প্রদেশ যাতে সুরক্ষিত থাকে—সেজন্য আবশ্যকীয় সকল রকম ব্যবস্থা অবলম্বন

করলেন। শত্রু-সৈন্যের গতিবিধি জানার জন্য গুপ্তচর নিয়োগ করলেন। পদস্থ সামরিক কর্মচারীদের সঙ্গে যুদ্ধ-পরিচালনার নীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করলেন। মারাঠার যুবশক্তির উপর তিনি যে আস্থা স্থাপন করেছিলেন, সে আস্থার মূল্য তারা দেবে একথা ভালোভাবেই জানতেন শিবাজী—তবু তিনি নিশ্চিন্ত বোধ করতে পারেন নি। রাজ্যের সীমানা পেরিয়ে বিক্ষিপ্ত দলে ভাগ হয়ে নানা অঞ্চলের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো তাঁর গুপ্ত-সংবাদবাহী অনুচরেরা। তবু শিবাজীর মনে হলো নিজের চোখে একবার পরীক্ষা করে আসবেন সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা আর শত্রু-অধিকৃত অঞ্চলের পরিস্থিতি।

খুবই বিপজ্জনক কাজ। শত্রুর হাতে ধরা পড়লে স্বাধীনতা-সংগ্রাম পরিচালনা করা দুষ্কর হয়ে উঠবে—তবু বিপদকে অবহেলা করে শিবাজী একদিন রাতের অন্ধকারে ছদ্মবেশে বেরিয়ে পড়লেন শত্রু-শিবিরের উদ্দেশে। সমস্ত রাত পরিভ্রমণ করে দিনের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এসে পৌঁছলেন শত্রুপক্ষের ছাউনীর অদূরে। শত্রুবাহিনীর অলক্ষ্যে আবশ্যকীয় গুপ্ত-সংবাদ সংগ্রহ করে শিবাজী এবার এগিয়ে গেলেন ছাউনীর অপর দিকে অবস্থিত পল্লী অঞ্চলের দিকে। স্থানীয় অধিবাসীদের মনে মুঘল বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার পরিমাণ যাচাই করাই তাঁর অভিপ্রায়। এ কাজেও বিপদের আশঙ্কা কিছুমাত্র কম নয়। তবু শিবাজী এগিয়ে গেলেন একটি মাত্র অনুচরকেও সঙ্গে না নিয়ে।

ক্রমশঃ সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলো। পথ-পরিক্রমায় ক্লান্তদেহ শিবাজী রাতটুকুর জন্য নিরাপদ আশ্রয় চাইলেন। দিনকাল খুব খারাপ, সহজে কেউ অচেনা লোককে বিশ্বাস করতে চায় না, আশ্রয় দেওয়া তো দূরের কথা। তবু শিবাজী পল্লীর প্রান্তে একটি গৃহস্থ-কুটীরে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে এলেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণের পর্ণকুটীর। ব্রাহ্মণ সেদিন বাড়ীতে অনুপস্থিত। ব্রাহ্মণী ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা। অতিথিকে তিনি প্রত্যাখ্যান করতে রাজী নন। অজ্ঞাতকুলশীল এই আগন্তুককে সন্দেহের চোখে দেখাই ছিল স্বাভাবিক—তবু ব্রাহ্মণী অতিথিকে নারায়ণ-জ্ঞানে আশ্রয় দিলেন। কুটীরের বাইরে তার জন্য বিছিয়ে দিলেন বিশ্রাম শয্যা। আগন্তুক সেই বিছানায় ছড়িয়ে দিলেন তাঁর পরিশ্রান্ত দেহ। কিন্তু ব্রাহ্মণী পরিতৃপ্তি বোধ করলেন না, অতিথি অভুক্ত থাকবে—এ যে কোনো রকমেই হতে পারে না। অথচ ঘরে সামান্য দু'মুঠো চাল ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। ব্রাহ্মণী সেই দু'মুঠো চাল গুঁড়ো করে তৈরী করলেন পায়েস। তাঁর আহ্বানে অতিথি শয্যা ছেড়ে উঠে এলেন। বারান্দার কোণে আসন বিছিয়ে দিয়ে ব্রাহ্মণী কলাপাতায় ঢেলে দিলেন সেই পায়েস। তরল পদার্থটি ছড়িয়ে পড়লো পাতাময়। অতিথি অনভ্যস্ত হাত দিয়ে কিছুতেই পায়েসের ছড়িয়ে যাওয়া রোধ করতে পারলেন না—পায়েসের কিছু অংশ পাতার সীমানা পেরিয়ে মাটিতে গিয়ে পড়লো। ব্রাহ্মণী ব্যাপার

দেখে অবাক—এ কী রকম মানুষ! পাতার একটি ধার উঁচু করে ধরলেই তো পায়েসকে বাগ মানান যেতে পারে। আগন্তুককে লক্ষ্য করে ব্রাহ্মণী বল্লেন: "বাবা, এই সহজ উপায়টা তোমার জানা নেই? পাতার একটি ধার এক হাত দিয়ে উঁচু করে ধরো। তারপর অন্য হাত দিয়ে সামান্য পরিমাণ পায়েস খেয়ে কোন রকমে ক্ষুন্নিবৃত্তি করো। আমরা বড় গরীব, তাই এর বেশী তোমার পাতে পরিবেশন করতে পারিনি।" ব্রাহ্মণীর কথা শুনে শিবাজীর চমক ভাঙলো—স্থানকাল ভুলে গিয়ে তার মন চলে গেল অন্য রাজ্যে, বৃহত্তর চিন্তার ক্ষেত্রে। তিনি ভাবলেন—সত্যিই তো, এই পরোপকারিণী ব্রাহ্মণ-জায়া অত্যন্ত মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। যে রাজ্য আমি জয় করেছি, সেটি আগে বেশ ভালোভাবে আয়ত্ত করে তবে এ ধারের রাজ্য জয়ের চেষ্টা করাই আমার পক্ষে সঙ্গত হবে।

পরদিন সকালে অতিথি বিদায় নিলেন—সঙ্গে নিয়ে গেলেন ব্রাহ্মণীর নির্দেশ থেকে গভীর শিক্ষা। ব্রাহ্মণী এই এক রাতের অতিথির কথা ভুলে গেলেন।

মাসকয়েক পর একদিন গ্রামে খবর এলো, শিবাজী সসৈন্যে এদিকে আসছেন। কারু মনে ভয়, কারু অন্তরে আনন্দ। শিবাজী সৈন্যদের নিয়ে গ্রামে ঢুকেই খোঁজ করলেন সেই ব্রাহ্মণ গৃহস্থের। সেদিনও ব্রাহ্মণ অনুপস্থিত। শিবাজীর অনুচরেরা ব্রাহ্মণীকেই নিয়ে গেল রাজার কাছে। ব্রাহ্মণীর মনে ভয়, রাজা-রাজড়ার সম্বন্ধে কৌতূহল যতো, তার চেয়ে ভয় অনেক বেশী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজসভায় রাজার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে একনিমিষে ব্রাহ্মণীর অন্তর থেকে কেটে গেল ভয়ের সকল চিহ্ন—কী আশ্চর্য! এই রাজাই তো তাঁর সেদিনকার একরাতের অতিথি। ছত্রপতি শিবাজী।

ছত্রপতি ব্রাহ্মণীকে সসম্মানে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, "মা, তোমার আতিথ্যের ঋণ আমি জীবনে ভুলবো না। তোমার কাছে থেকে সেদিন পেয়েছিলাম অমূল্য উপদেশ। আমার ঋণের বোঝা লাঘব করার জন্য তুমি গ্রহণ করো সামান্য এই দানপত্র।"

ছত্রপতি সেদিন ব্রাহ্মণ দম্পতিকে দান করেছিলেন সমস্ত গ্রামখানির মালিকানা স্বত্ব।

সামান্য ক'টি কথার কী অসামান্য প্রভাব!

তোমরা সকলে আমার ভালবাসা নিও।

তোমাদের—মধুদি'

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক
প্রভু প্রেস, ৩০ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য: ০'৪৫ নয়া পয়সা

✱ ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র ✱

৪৫শ বর্ষ] চৈত্র—১৩৭১ [১২শ সংখ্যা

ময়ূরপঙ্খি

শ্রীদেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

উড়লো বিনুর ময়ূরপঙ্খি ঘুড়ি
ছাদের থেকে হাল্‌কা হাওয়া কেটে,
ফুরিয়ে লাটাই মিললো শেষে জুড়ি—
আকাশ-পাড়ার সেই যারা ডাকসেটে।

বিকেল বেলার চিলতে আকাশখানা
পড়লো ঝুঁকে চিলেকোঠার ছাদে।
বাচ্চা গোটাকয়েক মেঘের ছানা
গড়িয়ে পড়লো ওধারে আহ্লাদে।

ওমা! এ যে উট্‌কো, বেপাড়ার!
কে এলি-রে হঠাৎ মেঘমুলুকে?
খুব যে সাহস! কর তো মাস্‌ল্ বার!
লড়বি নাকি! জোর আছে তো বুকে?

বাক্যি হরে গিয়েছে মুখ থেকে?
কী বললি? ভাব করতে এসেছিলি?
পান্তো, যা-তো, নিয়ায় তো সব ডেকে,
মিতের জন্যে আনিস পানের খিলি!

এগিয়ে এলো খানিকটা, শেষটায়
বোকার মতো পিছিয়ে গেল ঘুড়ি।
খুব যে দেখি চিত্রী করা গা-য়!
এ যে আবার ঠুক্‌রে দিতে চায়!

আরটু এগো?—একটি শুধু তুড়ি
দেখবো অত কায়দা কোথায় যায়!
আর কী হলো—ভাবার আগেই তারা
হাসির তোড়ে উঠলো সবাই ফেটে।

ছিঁড়লো অমন ঘুড়িটা—সেই যারা
মেঘমুলুকের নামকরা ডাকসেটে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব্‌ চিল্ড্রেন ওয়েলফেয়ারের তরফ থেকে তিনটি ছেলেকে পুরস্কৃত করেন তাদের বীরত্বের জন্য। তারা নিজেদের জীবন বিপন্ন ক'রে নদী থেকে নিমজ্জমান ব্যক্তিদের উদ্ধার করে। বাঁ দিক থেকে তৃতীয় ছেলেটির নাম শ্রী পি, কে, কুমারন (কেরল), প্রধানমন্ত্রীর দক্ষিণে শ্রীনির্মলকুমার মুখার্জী (কলিকাতা), প্রধানমন্ত্রীর বাঁ দিকে শ্রীঈশ্বর শিবু আম্বিগ (বাঙ্গালোর) এবং ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব্‌ চিল্ড্রেন ওয়েলফেয়ারের বিশিষ্ট উন্নয়ন কর্মী মিস্‌ এস, কন্‌ট্রাক্‌টারকে দেখা যাচ্ছে।

খ্যাংরা ফড়িং

প্রফুল্লচন্দ্র বসু

(১)

বোকনের পেছনে যেন শনি লেগেছিল। সেই শনিঠাকুর যার কুদৃষ্টিতে কত কেষ্টবিষ্টু কুপোকাৎ হয়েছেন। তাই তাকে নিয়ে পিঁপ্‌ড়ে, ব্যাঙ্‌ ও ম্যাওমাসীর পরে খ্যাংরা ফড়িং-এর তিড়িংবিড়িং!...

মা হেঁসেলে রান্না চড়িয়েছিলেন। তাঁর শুচিবাঁই। পিঁপ্‌ড়ে থেকে মানুষ সবার সেখানে ঢোকা মানা। কে কি অশুচি ব'য়ে আনে জানা নেই।

কিন্তু ফাষ্টক্লাস রাঁধেন তিনি। যখন ফোড়ন দেন বোকনের মন আন্‌চান করে ওঠে। সে বাইরে থেকে নাকটেনে ঘ্রাণ নেয়। 'ঘ্রাণেন অর্ধভোজনং',—গন্ধ শুকে সে খাবার আদ্ধেক সুখ পায়। সিকি মাইল জোড়া ম-ম করা মনহরা গন্ধ। বোকন প্যাণ্টের পকেটে হাত পুরে ষ্টাইল করে শোঁকে। কিন্তু হঠাৎ আঙ্গুলে কেমন সুড়সুড়ি লাগে।

এই প্যাণ্টে লুকিয়ে থেকে কাঁকড়াবিছে একদিন তাকে হুল ফুটিয়েছিল,—সে কথা সে ভুলে গিয়েছিল। ঘোৎ ঘোৎ করে হেসে জিজ্ঞেস করল, "কাঁতুকুঁতু দিচ্ছে কে রে?"

কোনও জবাব নেই। "জব্দ কর্‌ছি দাঁড়া", বলে সে হাত বার করে দেখে, এ মা, আঙ্গুলের ডগা জুড়ে একটা খ্যাংরা ফড়িং!

তালপাতার রোয়ায় তৈরী খ্যাংরা কাঠির মত সরু লিক্‌লিকে শরীর। তা নানান্ জায়গায় স্প্রীং দিয়ে জোড়া,—কলের পুতুলের মত নড়বড় করে। যখন চলে মনে হয়, খ্যাংরার সিকি গাছা সলা যেন না-বলা না-কওয়া, কোনও মানা না মেনে, সমস্ত শরীর ভেঙ্গে-চুরে আপন মনে গান গেয়ে চলেছে! অথচ দুষ্টুমী করে হাড়গোড় ভেঙেছে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। হাসপাতালে প্লাষ্টার বেঁধে তার চিৎপাত হয়ে থাক উচিত ছিল। দামাল ছোক্‌রা মা-বাপকে লুকিয়ে বকের মত খুঁড়িয়ে চলেছে। বোকামীর ঠেলা সাম্‌লাতে হিম্‌সিম্ খেতে হবে।

তা থাক্, বোকনের তাতে আপত্তি নেই। আপদটা তেড়ে-মেড়ে এসে জড়াজড়ি না কর্‌লেই হ'ল। কিন্তু খ্যাংরা ফড়িং তার জারিজুরি দেখাতে বোকনের আঙ্গুল জড়িয়ে উঠল। তারপর তার হাত বেয়ে, বগল তলা দিয়ে, এক্কেবারে কাঁধে। এত তাড়াতাড়ি যে সুড়সুড়ি লেগে বোকন হেসে গড়াগড়ি খেল।

কিন্তু তার আস্পর্ধা দেখে সে হাসি থামাল। খ্যাংরা ফড়িং ইয়ার্কী করে বল্‌ছিল, "বোকন, ফুক্কি!"

বোকন রেগেমেগে বল্‌ল, "একরত্তি খ্যাংরা ফড়িং, কাঁধে চড়ে ফাজ্‌লামো। সাহস তো কম নয়!"

উত্তর শোনা গেল, আমি খ্যাংরা ফড়িং নই গো,—তাল ফড়িং।"

বোকন মুখ বেঁকিয়ে বল্‌ল, "আহা রে, আমি যেন জানি নে। অত উঁচু তালগাছ, আর তার ফড়িং কিনা অত নিচু! তুমি তো খ্যাংরা কাঠি ভাঙ্গা ফড়িং, অর্থাৎ কিনা—"

"খ্যাংরা, খ্যাংরা বলে নোংরা করে দিও না বোকন। মানির অপমান বজ্রাঘাতের সমান, সে কথাও তুমি জান না! ইতিহাসে পড়নি যে আমাদের পূর্বপুরুষ লাফ মেরে তালগাছে চড়তেন? আর তাই নাম হ'ল তাল ফড়িং। চড়্‌চড়ে রোদ পুইয়ে রং হ'ল সবুজ। আর তুমি অবুঝের মত বলছ খ্যাঁরা ফড়িং। উঁচু গাছের মাথা মুড়িয়ে খ্যাংরা বানাও বলে, আমাদেরও বলছ—ছ্যা ছ্যা!"

(২)

ওরা লাফ মেরে তালগাছে চড়ে শুনে বোকন মাথা চুল্‌কাল। তার হঠাৎ মনে পড়ে কাঁকড়া-বিছের কামড় খেয়ে সে ক'টা হাইজ্যাম্প দিয়েছিল। কিন্তু তা আর কত উঁচু? বড় জোর একটা কচু বা বিচুটি গাছের সমান। এ গাছ আর তালগাছের ঝুঁটির মাপে পরিপাটি তফাৎ,—উঁই ঢিবি আর পর্বতের মত।

সে জিজ্ঞেস করল, "তালগাছ থেকে পড়ে গিয়ে বক্কেশ্বর চক্কোত্তি হয়েছ বুঝি?"

"তা আবার কেমন ফড়িং?"

বোকন শুধরে বলে, ফড়িং নয় গো। মানুষ,—পৈতে-অলা মানুষ। তার নামে গল্প পড়নি? তোমাদের মত বেঁকেচুরে চলে ব'লে ঐ নাম। দেখে হাসি পায়,—হিহিহিহি।"

খ্যাংরা ফড়িং গম্ভীর হয়ে বলে, "পরের দুর্দশা দেখে হাসতে নেই বোকন। আমরা আর জন্মে হেসেছিলেম বলে এ জন্মে এ দশা।"

শুনে বোকন হঠাৎ ভেউ ভেউ করে কাঁদে।—

খ্যাংরা ফড়িং অবাক হয়ে বলে, "কাদছ যে!"

বোকন বলে, "ঐ যে বল্‌লে হাস্‌তে নেই।"

"কিন্তু কাঁদতে আছে বলিনি তো।"

"ও!" বলে বোকন মুখে হাওয়া পুরে গাল ফুলাল।

খ্যাংরা ফড়িং বল্‌ল, "ওকি গালফুলো গোবিন্দের মা হলে যে!"

"ভুল কথা বোল না আমি বেটাছেলে, গোবিন্দের মা কি করে হব ?"

হাসির দাপটে শরীর বেঁকে-চুরে খ্যাংরা ফড়িং বলল, "তোমার গোঁফ নেই, দাড়ি নেই দেখে ভুল করেছিলেম বোকন। থুড়ি, গোবিন্দের বাপ হ'লে যে!"

বোকন বলল, "তাও হইনি। হাসব না, কাঁদব না,—তার মাঝামাঝি হতে হবে তো। মুস্কিল!"

সে ফুঃ করে মুখ থেকে হাওয়া বার করে দেয়। ঐটুকুই খ্যাংরাফড়িং-এর পক্ষে ঝড়-ঝাপ্টা। সে ধাক্কার দাপটে খ্যাংরা ফড়িং পড় তো পড় বোকনের নাকে। আর তাল সাম্‌লাতে সে সরু ঠ্যাং চালিয়ে দেয় তার নাকের ছেঁদায়। সেখানে যা পায় আঁকড়ে ধরে।

'পড় তো পড় বোকনের নাকে।'

দস্তুর মত নাকে কাঠি। আর তার পরিপাটি টিকাড়া-নাকাড়া বাজনা—হঁ্যাচচ্চো ফঁ্যাচ্‌চ্চো। শুধু তাই নয়, দড়ি টানাটানি (ট্যাগ্‌ অব্‌ ওয়ার)। একদিকে খ্যাংরা ফড়িং বোকনের নাকের ছেঁদা আঁকড়ে থাকে, অপর দিকে হাঁচির দাপট তাকে ছিটকে ফেলে। এ ধরনের টানা-পোড়নে তারা দু'জনে হয়রান হয়।

তখন খ্যাংরা ফড়িং বলে, "হাঁচি থামাও।"

বোকন বলে, "ঠ্যাং হটাও।"

এখন ছাদের খোড়লে একজোড়া চড়ুই পাখী বাড়ী তৈরীর তোড়জোড় করছিল। ছোট্ট হলে কি হবে, তাদের পেট ভরতি বুদ্ধি। ইট, চুন, শুরকীর দেদার দাম, সিমেন্টের পারমিট। জমি কিনতে হিমসিম খেতে হয়। তাই তারা ও-পথ মাড়ায় না। পরকে আপন করে, যেখানে সুবিধা খড়কুটো জুটিয়ে নিজ হাতে বাড়ী বানায়। তারপর বেপরোয়া কিচির-মিচির করে বলে, "নাম ধরি চড়ুই, কিন্তু তোমাদের থোড়াই পরোয়া করি। চড়াও করে এসেছি,—নদীর চর দখলের মত। তার কর নেই, খাজনা নেই। ধর দেখি, চড় মার দেখি,—ফুড়ুৎ।"

ঐ ছোট্ট চোখে তারা যেন দূরবীন এঁটে থাকে। তাই মানুষ চশমা চোখেও তাদের আঁটতে পারে না। বছরের পর বছর মানুষের মাথার ওপর বাসা বেঁধে তারা মনের সাধে থাকে।

বোকনের নাকে খ্যাংরা ফড়িং দেখে ভাবল, ভালই হ'ল। বনে-জঙ্গলের বদলে ঘরে বসে খড়কুটো পাওয়া গেল। সবুজ রঙের নতুন ঢঙের খড়। চড়ুইটা ফুড়ুৎ করে এসে খালি ঠোঁ মারবে, বোকন হাঁচি দাগ্‌ল হ্যাঁচচ্চো। সে দাপটে চড়ুই ছিটকে পড়ল কপাটের বাইরে। আর প্রাণ বাঁচাতে খ্যাংরা ফড়িং তড়বড়িয়ে ঢুকল বোকনের প্যান্টের আড়ালে।

তখন তাদের পরস্পরের প্রতি কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।—বোকন হাঁচি ফেলে খ্যাংরা ফড়িংকে চড়ুই-এর ঠোঁট থেকে বাঁচিয়েছে, আর খ্যাংরা ফড়িং নাক ছেড়ে প্যান্টে ঢুকে তাকে হাঁচি থেকে রেহাই দিয়েছে!

দু'জন দু'জনের উপকার করেছে। কাজেই ওরা হয়ে পড়ল মিতা।

(৩)

তখন খ্যাংরা ফড়িং বেরিয়ে এসে মিঠে স্বরে বলল, "মিতা, আমার জন্মদিনে তোমার নেমন্তন্ন রইল।"

বোকন খুসী হয়ে বলল, "তোমার জন্মদিন!"

"হাঁ গো, হাঁ। আজ আমার জন্ম হবে। তোমাদের বাড়ীর আনাচে-কানাচে ঝোড়-জঙ্গলে থাকি তো। তাই তোমাদের আদপ-কায়দা রপ্ত করেছি। নমস্তে, আঁদাব, গুডমর্নিং—জন্মদিন, মৃত্যুদিন!"

বোকন অবাক হয়ে বলে, "কিন্তু জন্মাবার আগে জন্মদিন!"

খ্যাংরা ফড়িং গালে হাত দিয়ে বলল, "আগে কোথায় গো? জন্মালেই তো আর জন্মদিন হ'ল না। জন্মের পর যেদিন খুব ভাল কাজ করা হয়, তাই হ'ল গিয়ে আসল জন্মদিন। আঁতুড় ঘরে ওঙা করে কেঁদে উঠলেই তা হ'ল না।"

বোকন প্রশ্ন করে, "ক ঝাঁক উলু দিলে, শাঁখ বাজালেও না?"

খ্যাংরা ফড়িং শরীর দুলিয়ে বলে, "উহুঁ। ভালো কাজের বাঁশীতে নিজে ফু দিলে তবে।"

"তুমি দিয়েছ?"

"হাঁ গো। এট্টু পরে তার সুফল হবে, আর তক্ষুনি আমার জন্মদিন।"

"কি সে ভালো কাজ বল না মিতে।" বোকন মিনতি করে।

খ্যাংরা ফড়িং বলে, "নিজের পুণ্যি-কথা বলতে নেই। তবে তোমায় মিতে বলে গণ্যি করি,

তাই বলছি। সাপের তাড়া খেয়ে একটা ব্যাঙ গর্তে লুকিয়ে আমায় বললে, বাঁচাও। তার কান্নায় মায়া হ'ল।"

বোকন অবাক হয়ে বলল, "খ্যাংরা কাঠির শরীরে নরম মায়া !"

"আছে হে, আছে। আমরা যে তালেবর।"

"তালের বড়া ? না তালগাছে থাক ব'লে ঐ নাম ?"

"উহুঁ। তালেবর মানে জাঁদরেল, মোড়ল। ব্যাঙকে বাঁচাবার জন্য সাপটাকে আটকে বললেম, কি খুঁজছ বোনপো,—ব্যাঙ ? সাপ হিসহিস করে বলল, ঠিক বলেছ মাসী। আর আমি আমার কথায় খাদ মিশিয়ে বললেম, এই এট্টু আগে লাফিয়ে লাফিয়ে পালাল। হোথা দিয়ে যাও, পেয়ে যাবে। আসলে এমন ঠিকানা দিলেম, যেখানে পেট মোটা বাঁশী, ওষুধ আর ঝাঁপি নিয়ে এক সাপুড়ে বসেছিল। তার খপ্পর থেকে কোনও সাপের নিস্তার নেই। বোকা সাপটা সেদিকে গিয়ে নির্ঘাৎ ধরা পড়েছে, আর ব্যাঙ গেছে বেঁচে। খবরটা এখনো পাইনি। আমাদের তো টেলিফোন, রেডিও, টেলিভিশন, ট্রানজিসটার নেই। সময় লাগবে। ততক্ষণ নেমন্তন্ন সেরে রাখলেম মিতে। চলো।"

মায়ের রান্না আর নেমন্তন্ন যাচাই করার জন্য পেটুক বোকন জিজ্ঞেস করে,"কি খাওয়াবে মিতা ?"

"বরং কি খাওয়াব না তা জিজ্ঞেস কর।" খ্যাংরা ফড়িং জিভে জল-ঝরান নানা খাবারের ফর্দ দেয়। তারপর জলসা, নাচ, আর মেলা-মোচ্ছবের ফিরিস্তি। সারা বনের আর্টিষ্ট আসবে। কোকিল, দোয়েল, ময়নার কালোয়াতি, ইষ্টিকুটুম পাখীর মিষ্টি বাঁশী, ময়ূরের পেখম-ধরা নাচ। তাছাড়া রামধনু চড়ে পরীরা আসবে সুধার ঝারি নিয়ে। শুনে বোকনের ভারী খিদে পায়। সে খ্যাংরা ফড়িং-এর পিছু চলে। জুতো পরার কথা ভুলে যায়।

আম কাঁঠালের বাগান পেরিয়ে গভীর ঝোঁপ-ঝাড়-জঙ্গল। শুকো পাতা আর কাঁটা পায়ে ফোটে। খ্যাংরা ফড়িং লাফিয়ে চলে, বোকন চলে খুঁড়িয়ে। সে শুকো মুখে বলে, "আর কদ্দুর মিতা ?"

"এই এলাম বলে।" কিন্তু খ্যাংরা ফড়িং-এর এ অশ্বাসের আর শেষ নেই! বোকনের পায়ে রক্ত আর চোখে জল বেরোয়।

(৪)

খ্যাংরা ফড়িং ঠ্যাং বাড়িয়ে আস্তানা দেখায়; কিন্তু তাতে বোকনের মনে রঙ্ ধরে না। উল্টো তাকে ঢঙ্ দেখাতে একটা কোলা ব্যাঙ্ কোত্থেকে তার মাথায় লাফিয়ে পড়ে। খ্যাংরা ফড়িং-এর দিকে ড্যাব্‌ড্যাবে চোখে চেয়ে শব্দ করে—কড়ড়্, কড়ড়্।

অর্থাৎ, আচ্ছা ছ্যাঁচ্‌ড়া মেয়েছেলে গা। গেরস্তকে বল সজাগ থাক, চোরকে বল চুরি কর। সাপের মাসী তুমি সে কথা তো বলনি। আমার লুকানো গর্ত বোনপোকে দেখিয়ে দিলে!

খ্যাংরা ফড়িং গালে হাত দিয়ে বলল, "এ কি কথা গা! কোথায় আমি চালাকি করে সাপকে পাঠালেম বাবুরাম সাপুড়ের কাছে। তার হাত থেকে কোনও সাপের বাপ ফস্‌কায় না। মিশ্‌মিশে কালো সাপই পারে না, আর সেটা তো খয়েরি। ভাবলাম, তোমাকে বাঁচাবার জন্যে আমার জন্ম হবে। তাই সবাইকে নেমন্তন্ন করেছি। তুমি তো বোন্ বেঁচে আছ। চল, চল তোমারও নেমন্তন্ন। আমার জন্ম হ'ল।"

কিন্তু পেছনে হিস্‌হিস্ ঈস্‌ঈস্ শব্দ শোনা গেল। একটা সাপ ব্যাঙটাকে তাড়া করে আসছিল সেটা খয়েরি নয়, অন্য। কালো আর হলুদ ডুরাই। এমন শাড়ী যারা পরে তাদের অন্দর ছেড়ে বাইরে দৌড়-ঝাঁপ করা উচিত নয়।

হয়ত খ্যাংরা ফড়িং সে কথা বোঝাতে চেষ্টা করত। কিন্তু ব্যাঙ্‌টা বোকনের মাথায় ঠ্যাঙের গুঁতো মেরে শব্দ করল—ক্কড়ড়্ ক্কড়ড়্। অর্থাৎ খ্যাংরা ফড়িং-এর প্যাচে পিছলে পড়ো না বোকন। ও হ'ল গিয়ে সাপের মাসী। জন্মদিনের ভাওতা দিয়ে আমাদেরও ইষ্টিকুটুমের আড্ডায় ঠেলে দেবে। ওর জন্মদিন হবে আমাদের মৃত্যুদিন। ছোটো, ছোটো।"

"ওরে বাবা রে!" ব'লে ব্যাঙ মাথায় ব'য়ে বোকন ছোটে। বেগতিক দেখে খ্যাংরা ফড়িং কেটে পড়ে। সাপ প্রায় ধরে ধরে, এ সময় কোত্থেকে একটা বেজি এসে তাকে আট্‌কালে। চোখ রাঙিয়ে বল্লে, "এই পাজি, দাঁড়া।" হেজিপেজি চিজ নয়; তাই বেজিকে সাপ ভয় পায়। আস্তে ঈস্‌ঈস্ শব্দ করে। অর্থাৎ, কত্তা, রাগ করেন কেন? ঐ রোগটা ছাড়ুন। খিদের সময় আসুন ভাগাভাগি করে খাই,—আমি ব্যাঙ্‌টাকে, আর আপনি বোকনকে।"

বোকন ভয় পেয়ে বলে, "কি হবে?"

ব্যাঙ্ ব'লে, "বোকনচন্দর, দু'জনেই ছুটি তবে। তাতে ছোটা ডবল হবে।"

বোকন বন-জঙ্গল দিয়ে ছোটে। কেটে-ছড়ে পায়ে রক্তারক্তি টেরও পায় না। ব্যাঙ্ তার ব্রহ্মতালুতে ছটোপুটি খায়। বোকন ভাবে, ব্যাঙ্‌ও যথাশক্তি ছুটছে,—সাপের মুখ থেকে তারা মুক্তি পেল ব'লে। আসলে সাপ আর বেজিতে তখন মারপিট চলেছে। সাপ পড়ে আছে জঙ্গলের ওপিঠে।

এ ভাবে তারা বোকনের বাড়ীর নিকটে এসে পৌঁছয়। তখন বোকন ব্যাঙ্‌কে বলে, "বাবাজী ভাগ্যিস মাথায় চড়েছিলে।"

ব্যাঙ্ বলে, "তার ফল কি সোজা? টিকটিকি মাথায় পড়লে হয় রাজা।"

"আর ব্যাঙ্ মাথায় পড়লে ?" বোকন জিজ্ঞেস করে।

"হয় সাজা,—তাই খ্যাংরা ফড়িং-এর নেমন্তন্ন খেতে মায়ের রান্না হারালো। এখন দেখ কান্নাকাটি ক'রে।—আচ্ছা নমস্কার।" ব্যাঙ্‌টা ঠ্যাঙ্ দিয়ে বোকনের মাথায় ল্যাঙ্ মেরে কোথায় লাফিয়ে গেল।

তখন বোকন চোখ কচ্‌লে মায়ের কাছে হাজির হ'ল।

মা বল্‌লেন, "কোথায় ছিলি রে ? খাবার নিয়ে আমি খুঁজে খুজে হয়রান। কাঁদছিস যে !"

হাঁদা হলেও বোকনের মাথায় হঠাৎ মাকে গলাবার মত সাদা বুদ্ধি এল। সে বল্‌ল, "আমায় ছেলেধরায় নিয়ে গিছল,—অ্যাঁ-অ্যাঁ— ।"

মা আঁৎকে উঠে বলেন, "ছেলেধরা, সর্বনাশ ! ভাগ্যিস ছাড়া পেয়েছিস। হে বাবা শনিঠাকুর, হে মা মঙ্গলচণ্ডী,—বোকনের মঙ্গল কর।"

তিনি বোকনকে চান করিয়ে খেতে দেন। ছেলেধরার বিবরণ তিনি জিজ্ঞেস করেন না, বোকনও খ্যাংরা ফড়িং-এর বর্ণনা গোপন রাখে। মায়ের রান্না নানান্ খাবার খেয়ে সে খ্যাংরা ফড়িং-এর চিড়িংবিড়িং ভুলে যায়।···

সেবা

শ্রীসমরকুমার চট্টোপাধ্যায়

সেবা হ'তে শ্রেষ্ঠ ধর্ম কিবা আছে আর
মানুষ আপন হয় পরশে ইহার।
দেশ, নর, জাতিভেদ করে না বিচার
দেব-সৃষ্ট জীবে সেবা তার অধিকার।
হিন্দু কিংবা মুসলিম ইহুদী খৃষ্টান,
সুমেরু কুমেরু কিংবা সুস্থান কুস্থান,
সেবকের কাছে নাই কোন ব্যবধান।

অজাতশত্রুর জাতি সর্ব-সমজ্ঞান,
মুমূর্ষুকে প্রাণ দেয় তৃষাতুরে জল—
তমসায় জ্বালে বাতি দুর্বলের বল।
নিরাশায় আশা সে যে দীনে দেয় দান,
বোবারে যোগায় ভাষা তৃপ্ত ভগবান।
অমৃতের পুত্র এরা ভালে জয়টীকা
প্রিয়তম বিধাতার সেবক-সেবিকা॥

ইলিশের জন্ত খুন হয়েছিলেন নবীন চক্রবর্তী মশাই। কনট্রোলের ইলিশ কিনতে গিয়ে নয়। তখন কনট্রোল কিউ-এর জন্মই হয়নি এদেশে। সব চলছে বেদম বে-কনট্রোলে। আর দামও তখন এত সস্তা যে কনট্রোলের দরকারই হ'ত না। সেই বে-কনট্রোল যুগের ইলিশের খুনের গল্প বলি।

তিন দশক আগের কথা। শ্রাবণের আকাশ থেকে ক'দিন ধরে অবিরাম চলেছিল বর্ষণ। সূর্যের সঙ্গে মুখ দেখাদেখি নেই। ঘরে বসে অতিষ্ট হয়ে উঠেছে সবাই। শেষে তিন দিনের মাথায় বর্ষাটা ধ'রে এল। মেঘের আড়াল থেকে উঁকি দিলেন সুয্যিমামা। বৃষ্টি-ধোয়া আমলকি গাছগুলোর মাথায় ঝলমল করতে লাগল বিকালের সোনালী রোদ।

দাদামশাই ডেকে বললেন, এখন খুব ইলিশ মাছ পড়বে যে নদীতে। চল রাজগঞ্জের হাটে যাওয়া যাক—

হাটে যাওয়া ছিল দাদামশাই-এর নেশা। রোজ যাবেন এক এক হাটে। এ সময় সঙ্গী চাই তাঁর বালক নাতিটিকে।

দাদামশাই যেন গোনা-পড়া জানতেন। সত্যিই সে দিন প্রচুর ইলিশ পড়েছিল। রুপালী মাছের ভারে টিকটিক করছিল জেলে নৌকোর খোল।

যেখানে অন্ত দিন দু' আনা দশ পয়সায় ইলিশ বিকোয়, আজ সেখানে তা নেবে গেছে দু' তিন পয়সায়। তবুও তাতে যেন খুশী নন দাদামশাই। সারা নৌকা ঘুরে ঘুরে দরদস্তর ক'রে ইলিশের

দারা সিং কিংকং জাতের এক জোড়া ইলিশ কিনলেন এক আনায়। ব'য়ে নিয়ে যাবার সুবিধের জন্ত জেলে মাছ দুটোর মুখ ফুটো করে কলার ডেগোয় ঝুলিয়ে দিল। তখন উল্টো যুগ ছিল। মছোদের এত রোয়াব ছিল না। খদ্দেরদের রীতিমত তোয়াজ করত।

সবে কলকাতা থেকে গেছি। হাতে ইলিশ ঝুলিয়ে পথ-চলায় যে কি দুর্ভোগ তা জানতাম না। হাট পেরিয়ে গ্রামের পথে পড়তেই তা টের পেলাম।

হয়ত বসে আছে দাওয়ায়, দোকানের বেঞ্চে, পুকুর ঘাটে কিংবা চলেছে পথে। যাঁহাতক জোড়া ইলিশ হাতে দাদামশাই-এর আবির্ভাব, অমনি যেন চুলবুলিয়ে ওঠে তাঁদের মুখ: কত দাম? কত হ'ল?

মিষ্টি হেসে প্রত্যেকেরই কৌতূহল নিবৃত্ত করছেন দাদামশাই। কোনও ক্লান্তি নেই। দাম শুনে কেউ কেউ তখনই গঞ্জের হাট-মুখো ছোটে। কেউ শুধু নিঃশব্দে শোনে।

প্রথম প্রথম বেশ মজা লাগছিল আমার। শেষে জনে জনে এমনি দাম বলতে দেখে ভারী বিরক্ত ঠেকল। দাদামশাইকে বললাম, কেন তুমি সবাইকে এমন দাম বলতে যাও?

দাদু মুচকি হেসে বললেন, এ যে নিয়ম এখানে। না বললে ওরা চটে যাবে।

কেন চটবে? পরের জিনিসের দাম জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা হওয়া উচিত।

এ তোমাদের কলকাতা নয়। এখানে ওতে কেউ কিছু মনে করে না।—তারপর একটু থেমে বললেন, আসল ব্যাপার কি জান? এই ভাবেই সস্তার খবরটা জানতে পারে লোকে। যা ইলিশের দাম—একটু সস্তা হলে দু'দিন প্রাণ ভরে খেতে পারবে।

কিন্তু এত সস্তা শুনেও তো সবাই বাজার-মুখো ছুটল না—। তবু কেন ওরা দাম জিজ্ঞেস করে?

দাদু চট্ করে জবাব দিতে পারেন না।—বড় মুস্কিলে ফেললি আমায়। শেষে হেসে বললেন, তা হলে সত্যি কথা বলি। এ হ'ল লোভ। ইলিশ মাছ বাঙ্গালীর বড় লোভনীয়। দেখলে কেউই স্থির থাকতে পারে না। ছেলেবেলায় এ নিয়ে আমরা অনেক হাসাহাসি করেছি। বাজীও ধরেছি। বাজার থেকে ইলিশ মাছ হাতে আসবে, অথচ কেউ দাম জিজ্ঞাসা করবে না। এমনি ভাবে যে ইলিশ আনতে পারবে তাকে এক টাকার রসগোল্লা খাওয়ান হবে।—

কেউ জিতছিল বাজী? সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করি আমি।

কেউ না! ইলিশ হাতে দেখলে দাম জিজ্ঞাসা না করে পারবে, এমন লোক তো পরমহংস!

পথের আরও গণ্ডাদশেক লোককে ইলিশের দাম বলতে বলতে আমরা যখন বাড়ীর কাছে পৌছালাম তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

'দু' পয়সায় এক জোড়া'—

ঝোপে-ঝাড়ে ঝিকমিক জোনাকি জ্বলতে শুরু করেছে। ভাবলাম, এতক্ষণে বুঝি দাম বলার পালা শেষ হ'ল দাদুর। কিন্তু না। আরও একজনকে বলা তখনও বাকী ছিল।

নবীন চক্রবর্তী মশাই যজমান বাড়ীতে পুজো সেরে ফিরছিলেন। দূর থেকে দেখতে পেলেন দাদামশাই-এর হাতের নধরকান্তি ইলিশ জোড়া। দেখেই থমকে দাঁড়ালেন। যেন কণ্টকিত, রোমাঞ্চিত শরীর। বুঝলাম, এবার তাঁর মুখ দিয়ে কি কথা বের হবে?

কাছে এলে, উনি মুখ খুলবার আগেই আমি হেঁকে উঠলাম: দারুণ সস্তা। দু' পয়সা এক জোড়া—

বল কি? চোখ জোড়া বড় বড় হয়ে উঠল তাঁর।

যদি কিনতে চান এখুনি যান রাজগঞ্জের হাটে—

আ:! বলে একটা আর্তনাদ ছাড়লেন উনি। সেটা পরিতৃপ্তির না ভয়ের বুঝলাম না। পরমুহূর্তেই দেখলাম তিনি সামনে থেকে অদৃশ্য।

দাদু আমায় খুব বকলেন, মিথ্যা বলাটা উচিত হয়নি।

দাদু একটু 'সদা সত্য কথা বলবে' মার্কা পিউরিট্যান গোছের মানুষ ছিলেন। তবু বকুনি খেয়ে বেকুবের মত জিজ্ঞাসা করলাম, কেন?

খাইয়ে লোক। হয়ত গণ্ডা দুই ইলিশ কিনতে ছুটবেন। যেয়ে দেখবেন সব মিথ্যে! মনে মনে গালাগাল দেবেন দৌড় করানোর জন্য!

নবীন চক্রবর্তী মশাই-এর বয়স হয়েছিল। কিন্তু হলে কি হবে, ইলিশের নাম শুনলে তখনই জিভে জল আসে। আর ইলিশ এক-আধ টুকরো খেলে তো আশ মিটবে না তাঁর। ঝালে, ঝোলে, ভাজায়, ভাতে, গোটা দুই তো তিনি একাই শেষ করতে পারেন। কাজেই এক পয়সায় ইলিশের এমন সুযোগ কি ছাড়া যায়?

ভুলে গেলেন যে তাঁর বয়স হয়েছে। দৌড়-ঝাপের শরীর নেই। তবু দাম শুনেই তিনি প্রায় ফ্লাট রেশ দৌড়াতে শুরু করলেন। বাড়ীর উঠোনে ঢুকেই হাঁকতে লাগলেন—চাবি, চাবি কই আমার হাত বাক্সের ?

হাঁক-ডাক আর রণচণ্ডিমূর্তি দেখে নবীন চক্রবর্তী মশাই-এর স্ত্রী তো ভয়েই অস্থির।—হঠাৎ চাবির কি দরকার হ'ল ?

অত কথা বলার সময় নেই! চাবি দাও! রুক্ষ মেজাজে মুখ-ঝাড়া দিয়ে উঠলেন। আজে-বাজে বকবক করতে গিয়ে শেষে না রাজগঞ্জের সব ইলিশ ফুরিয়ে যায়!

চাবিটা ছিনিয়ে নিয়ে কয়েকটা লম্বা লম্বা লাফে উঠান পার হয়ে উঠলেন দাওয়ায়। সেখান থেকে এক লাফে ঘরে। দশ দিক কাঁপিয়ে ঝমঝম শব্দ তুলে হাতবাক্স খুললেন। বহুদিনের জমানো দু' আনা পয়সা ছিল হাত বাক্সে। পাগলের মত হাতড়ে হাতড়ে খুঁজতে লাগলেন সেটা! যতই হাতড়ান, ততই যেন সেটা লুকিয়ে পড়তে চায়।

দু' আনিটাও যেন সময় বুঝে শত্রুতা শুরু করেছে। এখন কি এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করা চলে ? প্রতি মিনিটেই রাজগঞ্জের হাট থেকে ইলিশের বোঝা অদৃশ্য হচ্ছে। আর ঠিক এই সময়ই কিনা দু' আনিটা বেমালুম অদৃশ্য! রাগে জ্বলতে লাগলেন, নবীন চক্রবর্তী মশাই। চটে গেলেন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উপর। সবাই যেন ষড়যন্ত্র করেছে···তাঁর ইলিশ কেনার পথরোধ করতে।

শেষ পর্যন্ত লুকোনো দু' আনিটা বের হ'ল।···

কিন্তু সামনে যে দুস্তর পথ। সময় অতি অল্প। অনেক সময় নষ্ট হয়েছে বাক্স হাতড়ানোয়। এই অল্প সময়ের মধ্যে কি করে পার হওয়া যায় ঐ দুস্তর পথ ? প্রথমে ধরা যাক ঐ বিরাট দাওয়া। তারপর ঐ উঠান। তারপর এক মাইল পথ পেরিয়ে রাজগঞ্জের হাট। যেতে যেতেই হয়ত হাট ভেঙে যাবে! সব নৌকোর মাছই···

যদি একজোড়া পাখা থাকত, কি একটা পক্ষিরাজ ঘোড়া। তা'হলে এখনই, এই মুহূর্তে গিয়ে তিনি তুলে আনতে পারতেন গণ্ডা দুই···

ভাবতেও আনন্দে চোখ বুঁজে আসে। আহা তেল জবজব সরষে-বাটা মাখা ইলিশ মাছ ভাতে—ননীর মত কোমল, নরম তুলতুলে। আর ইলিশের তেল—তার তুলনা কোথায় ?···ভাবতে ভাবতে কোৎ করে খানিকটা লালা গিলে ফেললেন নবীন চক্রবর্তী মশাই!

পাখা না থাক। পক্ষিরাজ না পাওয়া যাক। আছে তার দু'খানা শ্রীচরণ। এই দুই শ্রীচরণের জোরে দুর্বার লাফ দিয়ে তিনি সাগর লঙ্ঘন করতে পারেন, তা ঐটুকু রাজগঞ্জের পথ। মনে মনে হিসাব করে ফেললেন : এক লাফে প্রথম বারান্দা, তারপর কয়েক লাফে উঠান, তারপর

জোর পায়ে হেঁটে·· না, না, এখন সন্ধ্যা হয়ে এল যে, পথে লোকজন কম। কে আর দেখছে? ছুটচেন তিনি—সারা পথটা ইস্কুলের স্পোর্টসের ছেলেদের মত···লুকিয়ে লুকিয়ে এমনি ফ্লাট রেস দৌড়ে পৌছে যাবেন গঞ্জের বাজারে। ঠিক দশ মিনিটেই! ততক্ষণে নিশ্চয়ই সব ইলিশ বিক্রি হয়ে যাবে না···

নিমেষে হিসাব-নিকাশ করে দু'আনিটা হাতে নিয়ে লাফ মেরেছিলেন নবীন চক্রবর্তী মশাই। এই ইলিশের চৌঘুড়ি টানে লাফটা হয়ত একটু বেশীই হয়ে গিয়েছিল। ঘর থেকে লাফিয়ে পড়েছিলেন বারান্দার কিনারে। সেখান থেকে ছিট্‌কে উঠানে। তার আগে ক'টা ঠোকক্কর খেয়েছিলেন তালের সিঁড়িতে।

মাথার একটা শিরা নাকি ছিঁড়ে গিয়েছিল তাতেই···

আমরা তখন বিশ্রাম করছি, নবীন চক্রবর্তী মশাই-এর বাড়ী থেকে একজন লোক হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এল। উনি ছিলেন আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী।

কিন্তু আমরা গিয়ে আর কি করব? তখন আরও একটা বড় লাফ দিয়েছেন নবীন চক্রবর্তী মশাই। সে লাফটা বৈতরণী নদীর তীর থেকে।

চৈত্র-সাঁঝে

শ্রীবিকাশচন্দ্র পাল

চাঁদ ওঠে ধীরে ধীরে হিজলের আড়ে।
ব'সে দাওয়ার 'পরে—দেখি বারে বারে॥

কোথায় কোকিল ডাকে আপনার মনে।
রিমি-ঝিমি বাজে দূর বাবলার বনে॥

জ্যোৎস্নায় ছেয়ে গেছে সারাটা আকাশ।
মৃদু মৃদু বহিতেছে সাঁঝের বাতাস॥

বাঁশ-ঝাড়ে ঝিঁঝি পোকা বাজায় ঝাঁজর।
তারই নীচে শিবাগুলি বসায় আসর॥

ডোবায় ফুটেছে বহু সাপলার ফুল।
আঙিনায় পড়ে ঝ'রে আম্র-মুকুল॥

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হ'ল, কিন্তু রাজার মনে ভয় ধরে গেল তাঁর রক্ষীমূর্তিটির গুণ কমে গেছে দেখে। তিনি নিজে গেলেন জ্যোতিষীর গুহাশ্রমে সন্ধি করতে। বললেন, "হে আবু আজীবের সুপণ্ডিত পুত্র, বন্দিনীর সঙ্গে থাকলে আমি যে বিপদে পড়ব, সে কথা আপনি পূর্বেই বলেছিলেন, আপনার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে। এখন কি করা যায় বলুন ?"

ইব্রাহিম বললেন, "ঐ বিধর্মী মেয়েটাকে ত্যাগ করুন, তা'হলেই আপনার কল্যাণ হবে।" রাজা বললেন, "তার আগে রাজ্য ত্যাগ করব।" ইব্রাহিম বললেন, "শীঘ্রই আপনার রাজ্য এবং রাজকন্যা—দুইই হারাবার সম্ভাবনা দেখছি।"

রাজা ভয় পেলেন। বললেন, "রাগ করবেন না। আমি শক্তি চাই না, ঐশ্বর্য চাই না।

যে মেয়েটিকে ভালোবাসি তাকে নিয়ে একটু শান্তিতে জীবনটা কাটাতে চাই, আপনি শুধু আমাকে এমন একটু জায়গা ক'রে দিন যেখানে কেউ আমার শান্তির ব্যাঘাত ঘটাবে না।"

দার্শনিকপ্রবর তাঁর পাকা চুলের ঝোঁপে-ভরা ভুরু দু'টি কুঁচকে রাজার দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, "আপনাকে যদি ঐরকম একটি জায়গা যোগাড় করে দিই তবে আপনি আমাকে কি দেবেন ?"

রাজা বললেন, "আমার শক্তি এবং সাধ্যের মধ্যে যা দেওয়া সম্ভব এমন কিছুই আপনাকে অদেয় থাকবে না সে ক্ষেত্রে।"

জ্যোতিষী বললেন, "মহারাজ, আপনি নিশ্চয় আরব দেশের 'ইরেম' নামক উদ্যানের নাম শুনেছেন! রাজা বললেন, "শুনেছি এবং পড়েছি। কোরানের 'দিবসের উষা' নামক অধ্যায়ে বর্ণনা আছে বাগানটির। তাছাড়া মক্কাযাত্রী কা'রও কা'রও মুখে সেই আলৌকিক উদ্যানের বর্ণনা শুনেছি। তবে যারা নানা দেশ ভ্রমণ ক'রে বেড়ায়, তারা বাড়ী ফিরে অনেক গালগল্প বানিয়ে বলে, আমি তাদের বর্ণনাকে সেইজন্যে তেমন গুরুত্ব দিইনি।"

জ্যোতিষী বললেন, "মহারাজ, তীর্থযাত্রীদের বর্ণনা অবিশ্বাস করবেন না, পৃথিবীর দূরতম প্রান্ত থেকে অনেক সত্য খবর তারা নিয়ে আসে। ইরেমের উদ্যান এবং প্রাসাদ সম্বন্ধে তারা মোটামুটি সত্য কথাই বলেছে মনে হয়। আমি নিজের চোখে দেখেছি সেগুলি। আপনি আমার বিবরণ শুনলেই বুঝতে পারবেন আপনার বর্তমান অনুরোধের সঙ্গে আখ্যায়িকাটির যোগ আছে।

মহারাজ, বালক বয়সে আমি সাধারণ মরুচারী আরবদের রীতি অনুযায়ী আমার বাবার উটের পাল চরাতুম। এডেনের কাছে উট চরাতে চরাতে একদিন আমার একটা উট দল ছাড়া হয়ে কোথায় হারিয়ে গেল। আমার তো ভারী দুশ্চিন্তা হ'ল; দিন নেই রাত নেই সেই হারানো উটের সন্ধানে ঘুরছি। শেষে একদিন দুপুরবেলা খুব ক্লান্ত হয়ে একটা ছোটো কুয়ার ধারে খেজুর গাছের ছায়ায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লুম। ঘুম ভাঙতেই দেখি সামনে একটা পাঁচিল-ঘেরা শহরের তোরণদ্বার। ভিতরে ঢুকলুম। বড়ো বড়ো রাজপথ, সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ, খেলার মাঠ, বাগান, কিছুরই অভাব নেই, কেবল দেশে মানুষ দেখতে পেলুম না। শেষে ঘুরতে ঘুরতে একটা বিরাট রাজপ্রাসাদের মধ্যে গিয়ে ঢুকলুম। ফোয়ারা, পুকুর, ফুলে ফলে ভরা বাগান—সবই আছে, কেবল জনপ্রাণীর দেখা নেই কোথাও। কেমন ভয় করতে লাগল সেই নির্জনতায়, ফেরবার জন্য যাত্রা করলুম তাড়াতাড়ি। নগর-তোরণ পেরিয়ে পিছন ফিরে চাইলুম এতবার, শহরটা শেষবারের জন্য দেখে নেব ব'লে। কোথায় বা শহর, কোথায় বা কি? যতদূর দৃষ্টি যায়—দেখি ধূ ধূ করছে মরুভূমি!

মনটা খারাপ হ'য়ে গেল। একি চোখের ভুল, না ভোজবাজি? ঘুরতে ঘুরতে সেই অঞ্চলের এক দরবেশের দেখা পেলুম, তিনি সে দেশের সব রকম কিংবদন্তী এবং গুপ্ত-সংবাদ জানতেন। আমার অলৌকিক পুরী দর্শনের গল্প শুনে তিনি বললেন, "তুমি যা দেখেছ, সে হচ্ছে মরুভূমির বিখ্যাত আশ্চর্য 'ইরেম' উদ্যান। তোমার মত পথিকদের সামনে মাঝে মাঝে সেটি প্রকাশিত হয়, দুর্গ, প্রাসাদ, ফলভারাবনত গাছে-ভরা পাঁচিল-ঘেরা বাগান, এই সব দিয়ে মুহূর্তকাল দর্শককে বিমুগ্ধ ক'রে আবার সেটি মরু-বালুকাতে মিলিয়ে যায়। ওর উপাখ্যান এই: পুরাকালে হজরত নূহের প্রপৌত্র, 'আদ'-এর পুত্র মহারাজ 'শেদ্দাদ্' এইখানে একটি সুন্দর নগর স্থাপন করেছিলেন। শহর শেষ হতেই তার শোভা দেখে রাজার খুব গর্ব হ'ল। তিনি স্থির করলেন, শহরে বাগান-ঘেরা এমন একটি রাজপ্রাসাদ তৈরি করবেন যা কোরানে বর্ণিত স্বর্গের সঙ্গে মিলে যায়।

কিন্তু এই অতিদর্পের জন্য স্বর্গের অভিশাপ লাগল রাজাকে। রাজা প্রজাদের সবাইকে নিয়ে হঠাৎ একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে উড়ে গেলেন একটা প্রলয় ঝড়ে, পৃথিবীতে আর তাঁদের কেউ কোনোদিন দেখেনি। তাঁর অপুর্ব সুন্দর শহরটি তার প্রাসাদ, উদ্যান প্রভৃতি নিয়ে দেবমায়ায় লোকলোচনের অন্তরালে চলে গেল চিরদিনের জন্যে; কেবল কদাচ কখনও, তুমি যেমন দেখেছ তেমনি, কোনও কোনও ভাগ্যবান দেখতে পায় সেটিকে, সেদ্দাদের শাস্তি মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যই এই ব্যবস্থাটা হয়েছে।

মহারাজ, দরবেশের ব্যাখ্যান এবং আমার চোখে দেখা মায়াপুরীর কথা আমি জীবনে ভুলতে পারিনি। পরে যখন মিশরে মহাজ্ঞানী সলোমনের জ্ঞানভাণ্ডারের অধিকারী হলুম, তখন স্থির করলুম আমি সেই মায়া-নগরীটি আর একবার দেখব। তাই করলুম আমি, সেই মায়া-শহর শুধু চোখে দেখলুম না, নবলব্ধ শক্তি বলে সদ্দাদের রাজপ্রাসাদ দখল ক'রে বাস করলুম কিছুদিন। আমার যাদুমন্ত্রে প্রাসাদরক্ষী দৈত্যেরা আমার বশীভূত ছিল, তাদের কাছে জানতে পারলুম, কি করে পুরীটি বহুদিন অদৃশ্য থেকে মাঝে মাঝে লোক চক্ষে ধরা দেয়।

মহারাজ, আমি আপনার জন্য এইখানেই রাজধানীর পাশেই ইচ্ছা করলে সেইরকম মায়াপুরী সৃষ্টি করতে পারি। মহাজ্ঞানী সলোমনের জ্ঞান-ভাণ্ডারের পুঁথি আমার হাতে, বিশ্বের যা কিছু ইন্দ্রজাল বিদ্যা, সব আমি জানি, সুতরাং আমার অসাধ্য কিছু নেই।"

আবেন হাবুজ আনন্দে গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বললেন, "হে আবু আজীবের মহাজ্ঞানী পুত্র, আশ্চর্য আপনার ভ্রমণবৃত্তান্ত, অদ্ভুত আপনার শক্তি। আপনি আমাকে সেইরকম একটি মায়াপুরী তৈরি ক'রে দিন, আমি আমার অর্ধেক রাজত্ব আপনাকে দান করব।"

'জ্যোতিষী নিজের হাতে একটি চাবি আঁকলেন।'

ইব্রাহিম বললেন, "মহারাজ, অত কিছু চাই না আমার। মায়া-নগরীর তোরণদ্বারে প্রথম যে ভারবাহী পশুটি প্রবেশ করবে সেটি এবং তার পিঠের বোঝাতে যা থাকবে সেইটুকু পেলেই আমার সামান্য প্রয়োজন মিটে যাবে। আমি অল্পে তুষ্ট বৃদ্ধ দার্শনিক, বুঝতেই তো পারছেন।"

রাজা জ্যোতিষীর এই সামান্য আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে তখনই রাজি হলেন। জ্যোতিষী কাজ আরম্ভ করে দিলেন সঙ্গে সঙ্গে। পাহাড়ের চুড়োয় কাছে তাঁর ভূগর্ভস্থ প্রাসাদের ঠিক সামনেই একটি বিরাট তোরণ-দ্বার তৈরি হ'ল, একটি দুর্গ প্রাচীরের ঠিক কেন্দ্র রইল তোরণটি। তোরণ দ্বার দিয়ে ঢুকে প্রথমেই পড়ে একটা উঠোন, খিলান দেওয়া থামে ঘেরা। খুব উঁচু আর ভারী একটি দরজা তাতে বসানো হ'ল। সেই দরজার চাবি দেওয়ার জায়গায় জ্যোতিষী পাথর খোদাই ক'রে নিজের হাতে একটি চাবি আঁকলেন, তেমনি বাইরের খিলানের গায়ে নিজের হাতে একটি মানুষের হাত খুঁদে বার করলেন তিনি। তোরণ-দ্বারের কাজ শেষ হতেই জ্যোতিষী দু'দিন তাঁর ভূগর্ভস্থ গুহা-ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে কি সব গুপ্ত মন্ত্র পড়লেন, তৃতীয় দিনে পাহাড়ের চুড়োয় সারাদিন একা ব'সে কাটালেন। রাত্রে নেমে এসে তিনি রাজার কাছে উপস্থিত হলেন। বললেন, "মহারাজ, আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। পাহাড়ের চুড়োয় মানুষের কল্পনা যতদূর কামনা করতে পারে, তেমনি সুন্দর এক অপূর্ব নগর সৃষ্টি করেছি! তাতে বহু প্রাসাদ, চিত্রশালা, পুষ্পোদ্যান, ফোয়ারাএবং স্নানাগার আছে, মোট কথা সমস্ত পাহাড়টাই স্বপ্নপুরীতে পরিণত হয়েছে! ইরেমের উদ্যানের মতোই এটি মায়াপুরী। যারা মন্ত্রজ্ঞ নয়, চিরদিনই তাদের চক্ষুর অগোচরে থাকবে এই নগরটি। আপনি সেখানে নির্বিঘ্নে বাস করতে পারবেন।"

আবেন হাবুজের আনন্দ আর ধরে না। বললেন, "বেশ হয়েছে, কাল উষালোক ফোটবার সঙ্গে সঙ্গে আমি গিয়ে শহরের দখল নেব।" সে রাত্রে রাজার ঘুম হ'ল না ভালো ক'রে! পরদিন ভোরবেলা সিয়েরানেভেদা পর্বতের তুষারাবৃত শৃঙ্গে উষালোক পড়তে না পড়তে রাজা বাছাই করা কয়েকজন অনুচর নিয়ে রওনা হলেন সেই মায়াপুরীর উদ্দেশে, সঙ্কীর্ণ খাড়া পার্বত্য পথে তাঁর প্রিয় ঘোড়াটিতে সওয়ার হয়ে। সঙ্গে আর একটি ছোটো ঘোড়ায় চ'ড়ে চললেন তাঁর বন্দিনী গথজাতীয়া রাজকন্যা। তাঁর রূপও যেমন, সাজসজ্জাও তেমনি। হীরা মুক্তো মণিমাণিক্যর জ্যোতিতে ঝলমল করছিল তাঁর সর্বাঙ্গ, পাশে সেই চিরসঙ্গী রুপোর বীণাটি ঝুলছিল। দার্শনিক চলেছিলেন রাজার বাঁ পাশে। তিনি ঘোড়ায় চড়েন না কোনোদিন, চিত্রাক্ষর লেখা লাঠির সাহায্যেই পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন তিনি। আবেন হাবুজ প্রতি মুহূর্তে আশা করছিলেন, এইবার নগরীর প্রাসাদমালা এবং পাঁচিলঘেরা ফলে ফুলে ভরা বাগানগুলি প্রভাত সূর্যকিরণে উজ্জ্বল হয়ে ধরা দেবে তার চোখের সামনে, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলেন না সেরকম। জ্যোতিষীকে প্রশ্ন করতে তিনি বললেন, "মায়াপুরীর ঐ তো রহস্য, ঐ তো তার রক্ষাকবচ। যতক্ষণ না আপনি ঐ মন্ত্রপূত তোরণ পার হয়ে পুরীর দখল নিচ্ছেন ততক্ষণ কিছুই দেখতে পাবেন না।"

তোরণের তলায় এসে পড়লেন সকলে। জ্যোতিষী তোরণ পার হয়ে এসে ভিতরের উঠানের খিলানে এবং দরজায় খোদাই করা মন্ত্রপূত হাত এবং চাবিটি দেখালেন রাজাকে। বললেন, "ঐ দেখুন মায়াপুরীর রক্ষাকবচ। যতক্ষণ না এই হাত নেমে এসে ওই চাবি ধরবে, ততক্ষণ কোনো মানুষের কোনো যাদুবিদ্যার সাধ্য হবে না এই পাহাড়ের অধিপতিকে স্থানচ্যুত করার, তাঁকে পরাজিত করার।"

আবেন হাবুজ তাঁর ঘোড়াটিকে দাঁড় করিয়ে বিস্ময়ে অবাক হয়ে দেখছিলেন চারদিক, এমন সময় তাঁর পার্শ্বচারিণী রাজকন্যার ঘোড়াটি আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষী বলে উঠল, "দেখুন মহারাজ, আপনি আমাকে যে পুরস্কার দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন সেই পুরস্কার আমার দরজা পার হ'ল।"

রাজা প্রথমে ভেবেছিলেন জ্যোতিষী ঠাট্টা করছেন, তাই হেসে উঠেছিলেন; কিন্তু যখন বুঝলেন, সত্যিই জ্যোতিষী রাজকন্যাকে দখল করতে চান তখন রাগে কাঁপতে লাগল তাঁর সর্বাঙ্গ, তাঁর পাকা দাড়ি। তিনি বললেন, "আবু আজীবের কুলাঙ্গার, তুমি জানো আমি কি প্রতিজ্ঞা করেছিলুম। প্রথম ভারবাহী পশুর ভার ও পশু তুমি পাবে। আমার অশ্বশালার সবচেয়ে ভালো অশ্বতরীটিতে রাজভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠ রত্ন বোঝাই ক'রে তুমি নিতে পারো, কিন্তু সাবধান, আমার প্রাণের আনন্দ ঐ রাজকন্যার দিকে নজর দিয়ো না, ভালো হবে না।"

'ঐন্দ্রজালিক গিয়ে ধরলেন রাজকন্যার ঘোড়ার মুখের লাগাম।'

ইব্রাহিম বললেন, "আমাকে কী ঐশ্বর্য দেখাচ্ছ তুমি রাজা? কত রত্ন আছে তোমার ভাণ্ডারে? জানো, মহাজ্ঞানী মহারাজ সলোমনের জ্ঞানভাণ্ডারের চাবি আমার কাছে, পৃথিবীর যেখানে যত গুপ্তধন আছে সব আমি চাইলেই পেতে পারি। রাজার প্রতিজ্ঞা নিষ্ফল হতে পারে না, ন্যায়তঃ ধর্মতঃ ঐ রাজকন্যা আমার, আমি নিয়ে যাব ওকে।"

দুই বৃদ্ধের মধ্যে তুমুল ঝগড়া বেধে গেল, সুন্দরী রাজকন্যা অবজ্ঞাভরে চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন সেই দৃশ্য, তাঁর ঠোঁটে ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠল সহসা। ততক্ষণে রাজা ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়েছেন, বললেন, "ঘৃণ্য মরুভূমির সন্তান, তোমার অনেক যাদুবিদ্যা জানা থাকতে পারে কিন্তু জেনো, আমি এখানে তোমার প্রভু। তোমার রাজার সঙ্গে বাঁদরামি করবার স্পর্ধা আর বেশীক্ষণ সহ্য করা হবে না, জেনে রেখো।"

জ্যোতিষী মুখ বেঁকিয়ে ব'লে উঠলেন, "ওরে আমার প্রভু রে! ওরে আমার উইটিপির রাজা রে! তোমার এতদূর স্পর্ধা যে সলোমনের জ্ঞানভাণ্ডারের অধিকারীকে তুমি তোমার হুকুমের চাকর মনে করেছ? বিদায়, আবেন হাবুজ! থাকো তুমি তোমার এক ছটাকের রাজত্ব নিয়ে, মূর্খের স্বর্গে ব'সে আনন্দ করো যত খুশি। আমি তোমাকে তৃণজ্ঞান করি। আমি তোমাকে উপহাস ক'রে উপেক্ষা ক'রে চললুম আমার দর্শনচর্চার নির্জনবাসে, সাধ্য থাকে তো আটকাও।"

বলতে-বলতে ঐন্দ্রজালিক গিয়ে ধরলেন রাজকন্যার ঘোড়ার মুখের লাগাম, তাঁর মন্ত্রপূত লাঠি দিয়ে মাটিতে ঘা মারলেন একবার। সঙ্গে সঙ্গে মাটি ফাঁক হয়ে গেল, জ্যোতিষী অশ্বারোহিণী রাজকন্যাকে নিয়ে নিমেষ মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন ভূগর্ভে। যে ফাঁক দিয়ে তাঁরা অদৃশ্য হলেন পরমুহূর্তে তার কোনও চিহ্ন পর্যন্ত রইল না পাথরের গায়ে।

আবেন হাবুজ কিছুক্ষণের জন্য বিস্ময়ে স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। পরক্ষণেই উন্মাদ হয়ে উঠলেন প্রতিহিংসা নেবার জন্যে। তাঁর হুকুমে হাজার জন মজুর গাঁতি কোদাল নিয়ে পাহাড়

কাটতে লেগে গেল তখনই। বৃথা চেষ্টা। পাহাড়ের পাথর যেন আরও শক্ত হ'য়ে উঠেছে, অনেক পরিশ্রমে যদিই বা একটু গর্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে সে গর্ত আপনি ভ'রে ওঠে, কাজ এগোয় না। পাহাড়ের তলায় যে কুয়োর মতো দ্বার-পথে ইব্রাহিম তাঁর গুহা-প্রাসাদে যেতেন, তারও কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না, পাহাড়ের আগাগোড়া সমস্তই কঠিন পাথর হ'য়ে গেছে, কোথাও তার ফাঁক নেই।

এদিকে ইব্রাহিম ইবন আবু আজীবের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে দুর্গ চূড়ার যোদ্ধমূর্তি তার মন্ত্রশক্তি হারিয়ে বসেছে। সে আর নড়ে না, কেবল যেদিকের পাহাড়ে ইব্রাহিম পাতাল প্রবেশ করেছেন, সেইদিকেই তার বল্লমটি উঁচিয়ে সে দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে আছে, যেন বলছে, 'তোমার প্রবলতম শত্রু ঐদিকে আছে'।

তারপর মাঝে মাঝে পাহাড়ের তলা থেকে খুব মৃদু বাজনার শব্দ এবং মিষ্টি মেয়েলী গলার গান শোনা যেত। একদিন একজন চাষা এসে রাজাকে খবর দিলে যে, আগের রাত্রে সে পাহাড়ে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একটা ফাটল দেখতে পায়, সে ফাটল দিয়ে একটু নেমে সে দেখেছে, নীচে একটা প্রকাণ্ড সাজানো ঘরে মখমলের গদিতে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে সেই জ্যোতিষী বসে বসে ঢুলছেন আর সেই রাজকন্যা তাঁর রুপোর মায়া-বীণাটি বাজিয়ে চলেছেন আপন মনে।

আবেন হাবুজ সদলে গেলেন পাহাড়ের সেই ফাটল খুঁজতে, কিন্তু কোথাও দেখা গেল না আর সেটিকে। তিনি আবার লোক লাগিয়ে মাটি পাথর কেটে জ্যোতিষীকে ধরবার চেষ্টা করলেন, কোনও ফল হ'ল না। সেই বিরাট তোরণ আর সেই খিলানের হাত আর দরজার গায়ে চাবির দাগ অক্ষুণ্ণ ছিল, তাদের মায়া ভেদ করা সাধ্য ছিল না গ্রানাডা রাজ্যের।

পর্বতচূড়ায় যেখানে মায়াপুরী থাকবার কথা, সেখানে বহুদিন খানিকটা জনশূন্য খালি জায়গা পড়েছিল। মনে হয় জ্যোতিষীর সেই মায়াপুরীটি মায়াবলে লোকলোচনের বাইরে অবস্থান করছিল, না হয় সেটি জ্যোতিষীর বানানো নিছক গল্প মাত্র। লোকে দয়া ক'রে শেষের মতটাই গ্রহণ করেছিল, জায়গাটার নাম দিয়েছিল, "রাজার মূঢ়তা"। কেউ কেউ "মূর্খের স্বর্গ" ব'লেও দেখাতো জায়গাটাকে।

রাজার দুঃখের ভরা পূর্ণ করতে সেই সময়ে চতুর্দিক থেকে শত্রুরা তাঁর রাজ্য আক্রমণ করতে আরম্ভ করলেন। জ্যোতিষীর ঐন্দ্রজালিক শক্তির দ্বারা রক্ষিত হয়ে, মধ্যে এতদিন তিনি যেমন প্রতিবেশী রাজাকে অপমান করেছিলেন বা যাঁদের পরাজিত ক'রে রাজ্যাংশ কেড়ে নিয়েছিলেন, এখন তাঁরা সবাই তাঁর সেই মন্ত্রশক্তি সহায় নেই জেনে নির্ভয়ে তাঁর রাজ্যে হানা দিতে

লাগলেন। শেষ জীবনটা অনবরত সেই সব শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে মহা অশান্তিতে কাটতে লাগল শান্তিপ্রিয় গ্রানাডারাজের।

শেষে একদিন আবেন হাবুজ মারা গেলেন। কবর দেওয়া হ'ল তাঁকে। তারপর বহু যুগ কেটে গেছে। তাঁর মায়াপুরী যেখানে হবার কথা ছিল পরবর্তীকালে সেইখানে সেই পাহাড়ের গায়ে আল্‌হাম্‌ব্রার প্রাসাদ এবং উদ্যান তৈরি হ'য়ে তাঁর 'ইরেম' উদ্যান রচনার স্বপ্ন কিছুটা বাস্তবে পরিণত করেছে।

কিন্তু বহু পুরাতন সেই মন্ত্রশক্তিসম্পন্ন তোরণ-দ্বার আজও দাঁড়িয়ে আছে এতকাল পরে। বলা বাহুল্য, তার গায়ে খোদাই করা হাত আর চাবি তাকে রক্ষা করেছে এতদিন। সেটিকে এখন লোকে 'সুবিচারের তোরণ বলে'। জনপ্রবাদ, সেই তোরণের তলায় ভূগর্ভের গুহাকক্ষে সেই দীর্ঘজীবী জ্যোতিষী আজও সুখাসনে ব'সে সুন্দরী রাজকন্যার বীণাধ্বনি শুনতে শুনতে ঘুমে ঢুলছেন।

আল্‌হাম্‌ব্রার রাজপ্রাসাদে বর্তমানে যে সব বুড়ো প্রহরী পাহারা দেয়, তারা গ্রীষ্মকালের নিস্তব্ধ রাত্রে নাকি এক-একদিন ভূগর্ভোত্থিত সেই বীণার শব্দ শুনতে পায়, সেই বীণার ঘুমপাড়ানি শক্তির গুণে পাহারার জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঘুমিয়ে পড়ে তারা। জায়গাটার এমনই ঘুম-ঘুম স্থান-মাহাত্ম্য যে, প্রায়ই দিন-দুপুরে আল্‌হাম্‌ব্রায় গেলে দেখা যায়, দরজার পাশে প্রহরীরা পাথরের বেঞ্চিতে বসে ঢুলছে, না-হয় কাছেই কোনও গাছের ছায়ায় শুয়ে নাক ডাকিয়ে কর্তব্যপালন করছে, সুতরাং সমগ্র খৃষ্টান জগতের মধ্যে আল্‌হাম্‌ব্রাকে সবচেয়ে ঘুম-কাতুরে যোদ্ধ-নিবাস বলা যেতে পারে।

কিংবদন্তী বলে, এই অবস্থা যুগ-যুগান্তর ধরে চলবে। রাজকন্যা জ্যোতিষীর কাছে মায়াবলে কার্যতঃ বন্দিনী হয়ে থাকবেন, আর জ্যোতিষী রাজকন্যার মায়া-বীণার ঝঙ্কারে নিদ্রাতুর অবস্থায় তাঁর বন্দী হ'য়ে দিন কাটাবেন। একমাত্র যদি কখনও মায়াশক্তিসম্পন্ন পাথরের হাত নেমে এসে চাবি ধরতে পারে, তবেই সেদিন এই মায়া-পাহাড়ের মায়াজাল ছিন্ন হবে, তার আগে নয়।*

* ওয়াশিংটন আরভিং-এর ইংরেজী গল্প থেকে অনূদিত।

জানোয়ারী কাণ্ড

শ্রীসৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

পাহাড়ী-সঙ্গীর হকচকানির ফলে, অচমকা টর্চ-বাতিটি হারিয়ে শিকারী-মশাই পড়লেন মহা ফ্যাসাদে…রাতের ঘুটঘুটে অন্ধকারে এমন বিরাট গহন-জঙ্গলে সেয়ানা-দুরন্ত সেই বাঘের গতিবিধির দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখবেন, তার উপায়টুকু নেই…হাতে গুলি-ভরা বন্দুক বাগিয়ে গাছের মগডালে-বাঁধা মাচার উপরে চুপচাপ সে শুধু কান খাড়া করে নীচের বুনো-জমিতে শিকারের গতিবিধির শব্দ শুনে তার ফন্দি-ফিকির-কারসাজির আন্দাজ-অনুমান করা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর নেই। কাজেই নিরুপায় হয়ে শিকারী-মশাই শেষে শিকারের আশায় নিতান্ত নাছোড়বান্দাভাবেই নিবিড় অন্ধকারে চুপচাপ কান-খাড়া রেখে অধীর আগ্রহে গাছের উপরে মাচায় বসে রইলেন—জঙ্গলের আশেপাশে কাছাকাছি কোনো ঝোপঝাড়ের আড়ালে কোথাও যদি আচমকা সেই সেয়ানা-ফন্দিবাজ বুনো-বাঘের গতিবিধির এতটুকু নিশানা মেলে !

এমনিভাবে ঠায় চুপচাপ বসেই দশ মিনিট…বিশ-মিনিট…আধঘণ্টা…একঘণ্টা সময় বৃথা কেটে গেল—সেয়ানা-ধূর্ত সেই বুনো-বাঘের কিন্তু কোন সাড়া শব্দ নেই…ভোজবাজীর জাদু-মন্তরে মহাপ্রভু যে গভীর জঙ্গলের অন্ধকারে কোথায় সট্‌কে পালিয়ে নিখোঁজ হয়েছে, তার সন্ধান মেলা ভার !… খাঁচা-ফাঁদের দোরের কোণে বাঁধা অমন যে নধর-কচি ছাগল-ছানার টোপ—সেদিকেও তার লোভ নজর নেই এতটুকু !…নাঃ, বরাত দেখছি—নেহাৎই মন্দ !—বুনো-বাঘ শিকারের এত সব উদ্যোগ-আয়োজন…আগাগোড়াই মিথ্যা-পণ্ডশ্রম হলো শেষ পর্যন্ত !…শিকারীর মনের আশা-উৎসাহ সবই প্রায় কর্পূরের মতো উবে যাবার দাখিল।…এত টাকা-পয়সা খরচ আর কষ্ট-দুর্ভোগ সহে আজব-কায়দায় খাঁচা-ফাঁদ পেতে শিকারের কেরামতী দেখিয়ে জলজ্যান্ত বুনো-বাঘ ধরে নিয়ে গিয়ে দুনিয়ার লোকজনকে তাক্ লাগিয়ে রাতারাতি বাহাদুর বনে ওঠার যে রঙীন স্বপ্ন তিনি দেখছিলেন, সে কি এমনিভাবেই বিফল হয়ে যাবে !… ভাবনায়-চিন্তায় শিকারীর মন আকুল হয়ে উঠলো… তবু তাঁর রোখ ছাড়লেন না তিনি !…নিশুতি-রাতের অন্ধকারে সজাগ-দৃষ্টি মেলে হাতের গুলি-ভরা বন্দুক বাগিয়ে শিকারের অপেক্ষায় ঠায় চুপচাপ মাচার উপরে বসে রইলেন জাঁদরেল শিকারী-মশাই…কখন সেই সেয়ানা-ধূর্ত বুনো-বাঘ লোভে পড়ে খাঁচা-ফাঁদের ভিতরে রাখা টোপ্ গিলতে আসে—এই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য !

কিন্তু বাঘ-বাবাজীর আর দেখা নেই ! রাত ওদিকে ক্রমেই গড়িয়ে চলেছে…ভোর হতে আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকী ! থম্‌থমে নির্জন বন…কোথাও জনপ্রাণীর কোনো সাড়াশব্দটুকু

পর্যন্ত নেই…জংলী-ঝোপঝাড়ের সোঁদা-গন্ধে ভ'রে আছে চারিদিক…রাতের এলোমেলো বাতাসে দূর থেকে শুধু কানে ভেসে আসছে—ঝিঁঝিপোকার একঘেয়ে সুরের তান। শিকারী-মশাই দমবার পাত্র নয়…তখনও সজাগ-দৃষ্টিতে ঠায় বন্দুক বাগিয়ে চুপচাপ উদ্‌গ্রীবভাবে মাচায় বসে রয়েছেন—শিকারের প্রতীক্ষায়।

শেষ রাতের দিকে আকাশের কোণে ফুটে উঠলো একফালি চাঁদের আভা…চাঁদের সেই আব্‌ছা-অস্পষ্ট আভায় শিকারী-মশাইয়ের হঠাৎ নজরে পড়লো যে, বুনো ঘাস-লতা-পাতার ঘন ঝোপঝাড়ের আড়ালে খুব সন্তর্পণে আত্মগোপন করে নিঃশব্দে অন্ধকার গভীর জঙ্গলের ফাঁকে-ফাঁকে গুঁড়ি মেরে খাঁচা-ফাঁদের দরজার পানে এগিয়ে চলেছে তাঁর এতক্ষণের একান্ত-সাধনার শিকার—ইয়া-কেঁদো সেয়ানা-শয়তান বেয়াড়া-দুরন্ত বাঘ! গাছের মগডালে-বাঁধা মাচায় বসে দূর থেকে আব্‌ছা-অন্ধকারে ঠিকমতো ঠাওর না হলেও, শিকারের সন্ধান মিলতেই শিকারী-মশাই সজাগ-ভাবে হাতের বন্দুক বাগিয়ে ধরে, বাঘের গতিবিধির পানে একাগ্র-দৃষ্টি রেখে তাগ্‌ করলেন।

বুনো-জংলী হলেও বাঘও রীতিমত সেয়ানা-চতুর…ঝোপঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে গুটিগুটি খাঁচা-ফাঁদের দরজার কোণে বেঁধে-রাখা পুরুষ্টু-নধর ছাগল-ছানার পানে এগুনোর সময় সেও বরাবর নজর রেখেছিল—মাচার উপরে বন্দুকধারী শিকারী-মশাইয়ের সজাগ-পাহারাদারীর দিকে। কাজেই

শিকারী-মশাইকে গাছের মগ্‌ডালে বন্দুক বাগিয়ে বসতে দেখেই সে আরো হুঁশিয়ার হয়ে উঠলো · শিকারীর নজর এড়িয়ে সোজা-পথ ছেড়ে জঙ্গলের নিবিড় ঝোপঝাড়ের অন্তরালে সন্তর্পণে আত্মগোপন করে নিঃশব্দে বাঁকা-পথে গুঁড়ি মেরে সটান্ এগিয়ে চললো খাঁচা-ফাঁদের দিকে—দরজার কোণে বেঁধে-রাখা নধর-ছাগলছানাটিকে উদরস্থ করবার দুর্বার লোভে!

চতুর বাঘের এই চতুরালীর ফলে, শিকারী-মশাই কিন্তু পড়লেন মহা-ফাঁপরে!···পলকের দেখা দিয়েই অন্ধকারে জংলী-ঝোপঝাড়ের আড়ালে কোথায় আবার পালিয়ে অদৃশ্য হলো তাঁর এত সাধের শিকার—সেই সেয়ানা-দুরন্ত বাঘ! হাতের এমন নাগালে এসে, এবারেও কি আগের মতোই চোখে ধুলো দিয়ে এড়িয়ে যাবে সে শয়তান!···শিকার ফশ্‌কানোর উদ্বেগ-চিন্তায় শিকারী-মশাই রীতিমত আকুল হয়ে উঠলেন···মাচার নীচে সুমুখের আব্‌ছা-অন্ধকার জংলী ঝোপঝাড়ের দিকে উৎসুক-দৃষ্টি মেলে দিয়ে হাতের গুলি-ভরা বন্দুক বাগিয়ে তিনি ঠায় সজাগ বসে রইলেন শিকারের অপেক্ষায়—একবার দেখা পেলেই···ব্যস্!···এবার আর রেহাই নেই বাছাধনের!

এমনি মতলব এঁটে শিকারী-মশাই অধীর-আগ্রহে মাচার নীচে আশপাশের জংলী ঝোপ-ঝাড়ের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে বসে রইলেন···তবু সেই সেয়ানা-চতুর বুনো-বাঘের চেহারার এতটুকু নজরে পড়লো না চকিতের জন্যও! · বেয়াদপ বাঘের এই বেয়াড়াপনা শেষ পর্যন্ত অসহ্য ঠেকলো তাঁর কাছে···শিকারী-মশাই রীতিমত অস্থির-চঞ্চল হয়ে উঠলেন···সঙ্গে সঙ্গে অদূরে মাচার নীচে আব্‌ছা-অন্ধকার ঘন ঝোপঝাড়ের আড়ালে কায়দা করে লুকিয়ে রাখা খাঁচা-ফাঁদের ওদিক থেকে হঠাৎ ভারী লোহা-কাঠের দরজা পড়ার বেয়াড়া-বিকট হুড়মুড় আওয়াজ স্তব্ধ-নিথর সারা বন কাঁপিয়ে তুললো! সে আওয়াজ কানে পৌঁছতেই শিকারী-মশাইয়ের মুশ্‌ড়ে-পড়া মন উল্লাসে ভরে উঠলো···রাতের অন্ধকারে দূর থেকে চোখে ঠিকমতো ঠাওর করতে না পারলেও, তিনি স্পষ্টই বুঝলেন যে, খাঁচা-ফাঁদের মধ্যে এতক্ষণে সেই বুনো-বাঘ সেঁধিয়েছে বলেই আগন্তুক-জানোয়ারের দেহের ধাক্কায় সশব্দে খাঁচার দরজা বন্ধ হয়ে গেছে! শিকারী-মশাইয়ের ধারণা যে নির্ভুল—তার প্রমাণও মিলে গেল হাতে-নাতে! খাঁচার দরজা বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই নিশুতি-বন প্রতিধ্বনিত করে জেগে উঠলো ফাঁদের ভিতরে বাঘ-শিকারের টোপ্ হিসাবে বেঁধে-রাখা নিরীহ-অসহায় ছাগল-ছানার আর্ত-করুণ চীৎকার আর বন্দী-বাঘের সরোষ-আস্ফালনের প্রচণ্ড হুংকার-গর্জন—সে আওয়াজের তীব্র-তেজে সারা জঙ্গল আতংকের শিহরণে কাঁপিয়ে তোলপাড় করে তুললো।

সেয়ানা-বাঘ শেষ পর্যন্ত ফাঁদে পড়েছে দেখে শিকারী-মশাইয়ের মন আনন্দে মশগুল হয়ে উঠলো···মুখে-চোখে তাঁর বিজয়-গৌরবের আভা! শ্রান্তভাবে হাতের বন্দুকটা ক্ষণেকের জন্য মাচার কোণে নামিয়ে রেখে, রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে তিনি ভাবতে সুরু করলেন যে

নিশুতি-রাতের এই গাঢ় অন্ধকারে খাঁচা-ফাঁদে বন্দী দুরন্ত-শয়তান বাঘকে বন্দুকের গুলিতে প্রাণে না মেরে, কি উপায়ে তাকে দড়ি-দড়া বেঁধে জলজ্যান্ত পাকড়াও করা যাবে! শিকারের নেশায় মেতে একবার মতলব আঁটলেন যে, অকারণ দেরি করে লাভ নেই···তার চেয়ে বরং এখনই হাতিয়ার সমেত লোকজন সঙ্গে নিয়ে মাচা থেকে নেমে সটান গিয়ে হাজির হওয়া যাক খাঁচা-ফাঁদের সুমুখে···সেখানে পৌছে রাতের অন্ধকারেই কষ্টেসৃষ্টে কোনোমতে ঠিক ঠাওর-আন্দাজ করে সবাই মিলে দড়ি-দড়া দিয়ে জলজ্যান্ত বন্দী-বাঘকে দিব্যি পিছমোড়াভাবে বেঁধে ফেলা যাক্। কিন্তু পরক্ষণেই মনে কেমন দ্বিধা জাগলো···নাঃ, কাজটা নেহাৎই গোয়ার্তুমীর সামিল!···তাছাড়া সঙ্গে তাঁদের কোনো মশাল, লণ্ঠন···এমন কি সামান্য টর্চ-বাতিটি পর্যন্ত নেই! কাজেই নিশুতি রাতের অন্ধকারে সুবিশাল এই গভীর জঙ্গলে নিছক ঝোঁকের বশে অজানা বিপদের এতখানি ঝুঁকি নেওয়া আদৌ সুবুদ্ধির পরিচয় নয়···উপরন্তু, এর ফলও হয়তো শেষ পর্যন্ত ভালো হবে না! তার চেয়ে বরং ··

কিন্তু বাকীটুকু ভাববার আর সুযোগ পেলেন না শিকারী-মশাই·· খাঁচা-ফাঁদের ভিতরে বন্দী বুনো-বাঘ ততক্ষণে আরো দুরন্ত-তেজে রীতিমত উদ্দাম-অস্থিরভাবে প্রচণ্ড তর্জন-গর্জন-হুংকারে আশপাশের মেদিনী প্রকম্পিত করে তুলছিল। বাঘের এই উদ্দাম-চঞ্চল অস্থির দাপট-আস্ফালনে শিকারী-মশাই বেশ একটু চিন্তিত-দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে উঠলেন। বন-জঙ্গলে জন্তু-জানোয়ার শিকারের কায়দা-কানুন সম্বন্ধে দীর্ঘ-অভিজ্ঞতা থাকার দরুণ তাঁর আকাঙ্ক্ষা হলো—বন্দুক, হাতিয়ার আর লোকজন সঙ্গে থাকলেও, রাতের অন্ধকারে গাছের মগডালে-বাঁধা নিরাপদ-মাচার আশ্রয় ছেড়ে বিনা-আলোতে এমন গভীর জঙ্গলে ঝোপঝাড়ে-ভরা জমিতে নেমে খাঁচা-ফাঁদে বন্দী ক্ষিপ্ত-দুরন্ত জলজ্যান্ত বুনো-বাঘকে দড়ি বেঁধে পাকড়াও করে আনবার দুঃসাহস না দেখানোই মঙ্গল। কারণ, অনেক সময় দেখা যায় যে, এ-ধরনের দুরন্ত বুনো-বাঘ জঙ্গলে একা-একা বিচরণ করে না··· সঙ্গে তার আরেকটি দোসর···অর্থাৎ অন্য একটি বাঘ কিংবা বাঘিনী থাকে। বনে-জঙ্গলে বিচরণকালে এদের মধ্যে কেউ যদি বিশেষ কোনো কারণে কিছুক্ষণের জন্যও তার সহচর-সঙ্গীর কাছে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তা'হলেই সাথী-হারা বাঘটি ব্যাকুল হয়ে সহুংকারে ডাক দিয়ে আশেপাশে সর্বত্র খুঁজে বেড়ায় সেই নিরুদ্দিষ্ট মিতাকে এবং সেই হারানো সঙ্গীকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত অন্য বাঘের খোঁজা-খুঁজির প্রয়াসেরও সহজে অন্ত নেই—এমনি নিবিড় এই জংলী-জানোয়ারদের বন্ধুত্বের বিচিত্র বন্ধন! কাজেই, জন্তু-জানোয়ারদের জংলী সমাজের রীতি অনুসারে, শিকারী-মশাইয়ের ধারণা হলো যে, যদি এই সন্ত খাঁচা-ফাঁদে-বন্দী বুনো-বাঘের সহচর-সঙ্গীটি আশপাশে কাছাকাছি কোথাও থাকে, তা'হলে সে হয়তো তার সাথীর এমন প্রচণ্ড তর্জন-গর্জন শুনে অবিলম্বে মাচার নীচে ঝোপঝাড়ের

সামনে ছুটে এসে সোৎসাহে হারানো-সাথীকে খুঁজে বেড়াবে। সে সময়ে বন্দুক-হাতিয়ার হাতে নিয়ে যেমনি আমরা সদলে মাচার উপর থেকে নীচে অন্ধকার জংলী জমিতে নামবো, অমনি সে মনের আক্রোশে আচম্‌কা আমাদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে খুন-জখম কাণ্ড বাধিয়ে বসবে! সুতরাং মিথ্যা বাহাদুরী দেখিয়ে লাভ নেই···তার চেয়ে বরং বাকী রাতটুকু এমনিভাবে গাছের মগডালে মাচায় বসে নিরাপদে কাটিয়ে দেওয়াই ভালো!···রাত তো প্রায় শেষ হয়ে এলো·· ভোর হতে আর তো মাত্র ঘণ্টা দুয়েক বাকী! এটুকু সময় কোনমতে চুপচাপ বসে কাটিয়ে, ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই বরং বন্দুক-হাতিয়ার বাগিয়ে সদলবলে মাচা থেকে নেমে সাবধানে খাঁচা-ফাঁদের কাছে গিয়ে জলজ্যান্ত বুনো-বাঘ পাক্‌ড়াও করে দড়ি-দড়া বেঁধে ধরে আনা যাবে!···এমনি মতলব স্থির করে শিকারী-মশাই সে রাতটুকু গাছের উপর থেকে জমিতে পদার্পণ না করে, সদলে মাচার নিরাপদ আশ্রয়ে ঠায় চুপচাপ বসেই কাটিয়ে দিলেন।

এদিকে বাকী রাতটুকু যতই ভোরের দিকে গড়িয়ে চলে—দূরে খাঁচা-ফাঁদের দিক থেকে বন্দী বাঘের তর্জন-গর্জন আর দাপট-হুংকার ততই প্রবল-প্রচণ্ড হয়ে ওঠে! এমনিভাবে বাকী রাতটুকু সারাক্ষণ তুমুল তর্জন-গর্জন আর অসহ্য দাপট-দৌরাত্ম্যের পর, ভোরের আবছা আলোর প্রথম রেখা ফোটবার কিছুক্ষণ আগেই খাঁচা-ফাঁদের ভিতর বন্দী বুনো-বাঘের হুংকার হুটোপাটি আচম্‌কা সব একেবারে চুপচাপ নিস্তব্ধ হয়ে গেল!

ভোর রাতের আলো-আঁধারি কুয়াশায় মাচার উপর থেকে দূরের কিছু ঠিকমতো ঠাওর না হলেও, খাঁচা-ফাঁদের ওধার থেকে দুরন্ত বাঘের বেয়াড়া তর্জন-গর্জনের কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে শিকারী-মশাই এতক্ষণে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবার অবসর পেলেন···ভাবলেন—যাক্‌ বাব্বাঃ··· বাঁচা গেল···বাঘ-বাছাধন তা'হলে শেষ পর্যন্ত কাবু হয়েছিল দেখছি! ··এই জন্যই লোকে কথায় বলে —বাঘের প্রাণ!···কথাটা নেহাৎ বাজে নয় তা'হলে!

যাই হোক, স্বচক্ষে না দেখলেও, সারা রাত ফাঁদে-আটক দুরন্ত-বাঘের হাঁক-ডাক-হুংকার আর বুকের দমের প্রাচুর্যের পরিচয় পেয়ে, অভিজ্ঞ প্রবীণ শিকারী-মশাই মনে মনে আঁচ করলেন যে, সদ্য-পাওয়া শিকারটি সাইজে বেশ বড়সড় গোছেরই হবে—অন্ততঃপক্ষে দশ থেকে বারো ফুট তো নিশ্চয়ই। সারা রাত অন্ধকার জঙ্গলে এত সব কষ্ট-দুর্ভোগ স'য়ে এমন দুর্লভ যে শিকারটি মিলেছে বরাতে—স্বচক্ষে সেটিকে দেখবার এবং পাকড়াও করে লোকালয়ে নিয়ে গিয়ে সকলকে দেখিয়ে বাহাদুরী আদায়ের রঙীন স্বপ্নে শিকারী-মশাই অধীর আগ্রহে ভোরের আলো ফোটবার প্রতীক্ষায় গাছের মগডালে মাচায় বসে পল গুণতে সুরু করলেন।

পুবের আকাশে সবে যেই দিনের আলোর রঙ ফুটেছে, অমনি শিকারী-মশাই তাঁর দলবল আর

হাতিয়ার সঙ্গে নিয়ে উদ্‌গ্রীব কৌতূহলে মাচা থেকে জঙ্গলে নেমে সটান গিয়ে হাজির হলেন খাঁচা-ফাঁদের সুমুখে।

খাঁচা-ফাঁদের সামনে এসে সবাই দেখলেন—রীতিমত তাজ্জব ব্যাপার! অর্থাৎ, খাঁচার মজবুত দরজা অটুট বন্ধ বটে...তবে খাঁচা একেবারে খালি...ফাঁকা...বুনো-বাঘের চিহ্নমাত্র নেই—শয়তান বাঘ শেষ পর্যন্ত রাতের অন্ধকারের সুযোগে তাঁদের সবাইকার চোখে ধূলো দিয়ে সটান কোথায় যে সট্‌কে পালিয়েছে, তার কোনো হদিশই মেলে না আর! রুদ্ধদ্বার সেই শূন্য-খাঁচার মধ্যে পড়ে রয়েছে শুধু দড়ি-বাঁধা নিরীহ অসহায় ছাগল ছানাটির ক্ষতবিক্ষত প্রাণহীন দেহ!

এ দৃশ্য দেখে শিকারী-মশাই আর তাঁর সঙ্গীরা সবাই হতভম্ব!...আচ্ছা, ধূর্ত-শয়তান তো সেই বুনো-বাঘ!...এমন নিপুণভাবে তাঁদের সবাইকার নজর এড়িয়ে সটকে পালিয়েছে যে তার কোনো কূল-কিনারাই মেলে না! সামান্য একটা জংলী-জানোয়ারের ফন্দী-ফিকিরের কায়দায় এভাবে অপদস্থ হয়ে জাঁদরেল শিকারী-মশাই আর তাঁর সঙ্গীরা সবাই মিলে তন্নতন্ন করে খাঁচা-ফাঁদের পলাতক-বাঘের হদিশের সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিতে সুরু করলেন! খানিকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর তাঁরা হঠাৎ লক্ষ্য করলেন যে, খাঁচার দরজার সামনে জংলী-জমির কতকটা জায়গা তাজা-রক্তে ভিজে রাঙা-সপসপে হয়ে আছে আর শক্ত-মজবুত লোহার রেলিং-আঁটা খাঁচা-ফাঁদের দরজার কোণে তখনও লেগে আটকে রয়েছে গত রাত্তিরের শিকার সেই দুরন্ত সেয়ানা বুনো-বাঘের ল্যাজের ডগার এক টুকরো চামড়া আর মাংস!

নমুনা দেখেই আসল ব্যাপারটা বুঝতে শিকারী-মশাইয়ের আর এতটুকু বিলম্ব হলো না!... অর্থাৎ, তিনি স্পষ্টই অনুমান করতে পারলেন যে, নধর ঝাগল-ছানার লোভে ফাঁদের মধ্যে সেঁধুতেই খাঁচার দরজায় টান লেগে দরজার ডালাটি সজোরে উপর থেকে নীচে খ'সে পড়ে বন্ধ হবার ঠিক পূর্ব-মুহূর্তেই চতুর বাঘ সম্ভবতঃ বুঝতে পেরেছিল শিকারীর অভিসন্ধি...তাই আত্মরক্ষার চেষ্টায় সে সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে, পড়ন্ত ফাঁদের দরজার ফাঁক গলে বাইরে আসে! কিন্তু তার দেহটি সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় ফাঁদের বাইরে বেরিয়ে আসার আগেই খাঁচার ভারী দরজাখানা সজোরে উপর থেকে নীচে খ'সে প'ড়ে এঁটে বন্ধ হয়ে যায়...তাই পলাতক বাঘের দেহটি বরাতক্রমে অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে এলেও, তার লম্বা ল্যাজের ডগার একটু অংশ পড়ন্ত লোহার দরজার ভারী-ওজনের চাপে নিতান্ত বেকায়দায় আটকে গিয়ে ছিঁড়ে দু'টুকরো হয়ে রেলিঙের গায়ে সেঁটে রয়েছে!

বেকায়দায় এমন বেয়াড়া-বিপদে পড়ে নিজের লম্বা ল্যাজের টুকরো হারিয়েই বেচারী বুনো-বাঘ বোধহয় সারা রাত তাই যন্ত্রণায় কাতর হয়ে অত ছটফট করেছে আর তুমুল আর্ত-হুংকারে মেদিনী কাঁপিয়ে তুলছে...এবং শেষ পর্যন্ত আপ্রাণ চেষ্টার ফলেও, খাঁচার দরজার ভারী-ওজনের চাপ থেকে ল্যাজের ডগাটুকু উদ্ধার করতে না পেরে নিতান্ত নিরুপায় হয়েই বেচারীকে তুচ্ছ ল্যাজের মায়া

ত্যাগ করে, নিজের দেহ থেকে সেটিকে টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে রেখে কোনোমতে বনে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে হয়েছে। শিকারী-মশাইয়ের ধারণা—এ ঘটনাটি সম্ভবতঃ ঘটেছিল শেষ রাত্তিরের দিকে ·· কারণ, ভোরের আলো ফোটবার খানিকক্ষণ আগেই—খাঁচা-ফাঁদে বন্দী বুনো-বাঘের তুমুল তর্জন-গর্জন-হুংকার সবই একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল! যাই হোক, দীর্ঘকাল বনে-জঙ্গলে জন্তু-জানোয়ার শিকার করে বাহাদুরী দেখিয়ে জাঁদরেল শিকারী-মশাইয়ের জীবনে এ কিন্তু এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা! এ ঘটনার স্মৃতি তাঁর মন থেকে সহজে মুছে যাবার নয়! তাই প্রচুর অর্থব্যয় আর রীতিমত উদ্যোগ-আয়োজন করে, আজব কায়দায় শিকার করে, জঙ্গলের জলজ্যান্ত বুনো-বাঘ পাকড়ানোর চেষ্টায় এসে সারা রাত অপরিসীম কষ্ট-দুর্ভোগ স'য়ে শিকারী-মশাই শেষ পর্যন্ত সেয়ানা-চতুর জানোয়ারের ফন্দী-বাজীতে বেবাক্ বোকা বনে গিয়ে, বাঘের সেই পরিত্যক্ত ছেঁড়া ল্যাজের টুকরোটি পকেটে পুরে সদলে সেবারের মতো শিকারের সফর সেরে মুখটি চুন করে ঘরে ফিরে এলেন! তবে এ-ধরনের আজব-অভিজ্ঞতার পর, জাঁদরেল শিকারী-মশাই আর কোনোদিন বন্দুক হাতে বনে-জঙ্গলে শিকার অভিযানে বেরিয়েছিলেন কিনা—সেটা ঠিক জানা নেইকো কারো।

ছিপে

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

জীবনবাবুর জামাই গেছেন জামাইকাতে কাজ করতে,
মাঝে মাঝে শখ চাপে তাঁর সেইখানেতে মাছ ধরতে।
কলকাতাতে ছিলেন যবে মাছ খেতে যে জান বেরোতো,
ভোর না হতেই বাজারেতে মস্ত বড় লাইন হ'ত!
সেই কথাটা ভুলতে তিনি পারছেন না আজো যে, তাই—
জামাইবাবু জামাইকাতে পুকুর খুঁজে দিশেহারাই!
অবশেষে পুকুর পেলেন।—সে এক রবিবারের দিনে,
মাছ ধরতে গেলেন হেসে দু'টিন কেঁচোর চার যে কিনে।
কেঁচোর চার-এ মাছ খাবে কি, অবাক হলেন অবশেষে : ·
ঘরে নিয়ে এলেন যারে—সে কী ভীষণ সর্বনেশে!
জামাইকাতে জামাইবাবুর চক্ষু হ'ল ছানাবড়া,
শুয়ে থাকেন—চল্লিশেতেই যেন তাঁকে ধরল জরা!
চেটেই চলেন জামাইবাবু পুরিয়ার এক কাগজ কুঁচো,
ওই ছিপে তাঁর ধরা নাকি পড়েছে এক মস্ত ছুঁচো!

কেলে-ভূতের কারসাজি

শ্রীবীথিকা ঘোষ

একটা কেলে-ভূত ছিল—
প্রাণে বেজায় জুত ছিল,
বেলগাছেতে ঠক্‌ঠকিয়ে
কাঠের গজাল পুঁতছিল।
শয়তানীতে পেট ঠাসা,
ভাবছে—এ-প্ল্যান খুব খাসা!
কাঠ-গজালের মই বেয়ে
মগডালেদের লাগ পেয়ে
নাচব, কুঁদব,—ধুন্ধুমার,
ছিঁড়ব, খুঁড়ব,—একাক্কার।
বুঝবে তখন কাণ্ডখান।
হাবু-বাবুর বড্ড মান!
ভূত-ছানাদের পায় না ভয়,
এ-ও কখনো সহ্য হয়?
সাধের গাছের সব বাহার—
কচি বেলের সব পাতার
মটকাব ঘাড় মাঝ-দুপুরে,
করব সাবাড়,—জান্‌ছে কে?
হাবু গেছে কাল্‌নাতে
বাবু ছিল জাল্‌নাতে
হঠাৎ ছাখে বেলগাছে
'কেটা কি সব কর্‌তাছে?'
তড়াক ক'রে লাফ দিয়ে
ছুটল হকি-স্টিক নিয়ে
তাই-না দেখে ভূত-ছানা
মুখ হ'ল তার ছাই-পানা।
'গেছি এবার, উরিব্বাস্!'
দৌড় দিল সে—ঊর্ধ্বশ্বাস।
বাবুর সঙ্গে পারবে কে?
ধরল ভূতের ল্যাজ চেপে,
হেঁড়ে গলায় বল্‌ল তেড়ে
'এইগুলা সব আন্‌ছে কে?'
'ভূতের পোলা, তর টাকে
ঠুকুম গজাল তিনটাকে'—
এই-না শুনে ভূত-ছানা
ছাই-পানা তার মুখখানা
চিম্‌সে গেছে লম্বা কান,
'এবার বুঝি উড়ল প্রাণ।'
ঠক্‌ঠকিয়ে শুক্‌নো পা
কাঁপছে, ঘেমে যাচ্ছে গা।
'এবার যদি পাই ছাড়া
মাড়াব না এই পাড়া'
এই-না ব'লে মল্‌ল নাক,
'পায় পড়ি তোর, গজাল রাখ।'
বল্‌ল বাবু লজ্জা পেয়ে—
'ওমা! এটা কান্‌ছে যে!'
'টিক্কি আছে, বাঃ বেড়ে!'
দেখ্‌ল বাবু হাত নেড়ে।
'ঠিক আছে তয়। ভূতের ছা!
আইজ্‌কা তবে দোল্‌না খা।'
ফাঁস বানিয়ে টিক্কিটায়
গজাল-পোঁতা গাছের গায়
ছবির মত ঝুল্‌ল ভূত,
জব্দ এবার ভূতের পুত।
ভাবল কেঁদে—'প্ল্যানটাতে মোর
এত্তবড় খুঁত ছিল!'

বিদ্যাসাগর

শ্রীপূর্ণেন্দু বসু

বাংলার নব জাগরণের ইতিহাসের পাতায় যে সব মনীষীর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁদের মধ্যে অন্যতম। কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাংলায় যে ধ্বংসের বীজ রোপিত হয়েছিল, তা দূর করতে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। দেশের দরিদ্রের সেবায় তিনি জীবন অতিবাহিত করেছেন। তিনি অনাথের নাথ, দীনের বন্ধু।

আবার বাঙালীর শিক্ষা-সমস্যার সমাধানকল্পে তিনি লেখনী ধারণ করেছিলেন। জাতির পুনরুজ্জীবনে তিনি কুসংস্কার দূর ক'রে নূতন সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি গ'ড়ে দিয়ে গিয়েছেন। রামমোহনের পরে তিনিই অজেয় দৃঢ় মনোবল নিয়ে সমাজের কুসংস্কারের পাষাণ শৃঙ্খল ছিন্ন করতে এগিয়ে এসেছিলেন। বিধবা বিবাহ প্রবর্তন ও বাল্যবিবাহ উঠিয়ে দেবার জন্য তাঁকে জীবনে যে কত ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জ্জরিত হ'তে হ'য়েছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু তবুও তিনি একটুও বিচলিত হন নি স্বীয় সঙ্কল্প থেকে। সমাজের সে সময়ের একদল গোঁড়া ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় তাঁর বিরুদ্ধে কত চক্রান্তই না করেছে! কিন্তু অসহায় কত বালিকার ক্রন্দন তাঁকে বিচলিত ক'রেছে। মানুষের জীবন যাতে সমাজের অপগণ্ডদের হাতে অকালেই ঝরে না যায় তারই প্রচেষ্টা তিনি করেছিলেন। বড় হয়ে সে সব কথা তোমরা ভাল ক'রে জানতে পারবে। বাংলার এই বীর সন্তান ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জীবনের কত গল্পই না তোমরা শুনেছ। তাঁর মাতৃভক্তি, দয়া ও অধ্যবসায়ের পরিচয় চিরদিন আমাদের অনুপ্রাণিত ক'রবে।

দারিদ্র্যের সাথে কঠোর সংগ্রাম ক'রে তাঁকে মানুষ হ'তে হয়েছিল। অসাধারণ মেধাবী ছিলেন তিনি। নিজের আগ্রহ ও চেষ্টায় তিনি সকল বাধাকে দূরে ঠেলে বিদ্যা অর্জন ক'রেছিলেন।

আলোর অভাবে গ্যাসপোষ্টের তলায়, গৃহের সকল কাজের ফাঁকে ফাঁকে অধ্যয়ন ক'রেছেন। এইভাবে অধ্যয়ন ক'রে পণ্ডিত হ'য়ে উঠলেন তিনি। তাঁর বিদ্যা ও জ্ঞানের পরিধি ছিল অসীম। তাই তিনি হলেন বিদ্যাসাগর। কিছুকাল তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ-রূপে কাজ করেন। কলেজের বাঁধা-ধরা নিয়মের মধ্যে স্বাধীনতা-প্রিয় বিদ্যাসাগর বেশীদিন চাকরী করতে পারেন নি। মায়ের অসুখের সংবাদ পেয়ে ছুটির দরখাস্ত করে ছুটি পেলেন না।

চাকরী ছেড়ে দিয়ে নদী পার হয়ে এসে পৌছুলেন মায়ের কাছে। এমন মানুষ জগতে ক'টা মেলে যে মায়ের জন্যে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত।

বিদ্যাসাগর জাতিভেদ মানতেন না। দুঃস্থ, দরিদ্র রোগীকে তিনি সেবা ক'রেছেন আপন হাতে। বাইরে ছিল তাঁর কর্তব্যের দৃঢ়তা আর অন্তরে ছিল একটি কোমল হৃদয়।

স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি ছিল তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। তাই বাঙালীর সবাই যাতে প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে পারে তার জন্য তিনি বুঝেছিলেন 'শিক্ষা'র একান্ত প্রয়োজন। তাই তিনি নিজে নূতন পদ্ধতিতে পাঠ্যপুস্তক রচনা করলেন। তাঁর বর্ণবোধ, বর্ণপরিচয়, কথামালা, আখ্যান মঞ্জরী প্রভৃতি পাঠ্যপুস্তক বাংলা ভাষা শিক্ষার আদর্শ গ্রন্থ।

সংস্কৃত ভাষা যাতে বাঙালী সহজে শিক্ষালাভ ক'রতে পারে তার জন্য তিনি লিখলেন "ব্যাকরণ কৌমুদী"। এ গ্রন্থ আজও সংস্কৃত শিক্ষালাভে অপরিহার্য্য।

এ সব ছাড়াও তাঁর আর একটি শ্রেষ্ঠ দান হ'ল—বাংলা গদ্য সাহিত্যকে তিনি একটি সার্থক ছন্দ-সুষমা দান করেছিলেন। সংস্কৃতের শব্দ ভাণ্ডার থেকে শব্দ আহরণ ক'রে ও গদ্যে 'কমা' 'যতি' প্রভৃতি প্রবর্তন ক'রে বাংলা গদ্যকে তিনি একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত ক'রে গিয়েছেন। পরবর্ত্তীকালের লেখকরা তাঁর ভিত্তির উপর আজ কারুকার্য মণ্ডিত প্রাসাদ গ'ড়ে তুলেছেন। বাংলা গদ্য আজ অপূর্ব্ব সমৃদ্ধি লাভ করেছে।

পাশ্চাত্য জগতের জ্ঞানভাণ্ডারের যা কিছু ভাল তাঁর চোখে পড়েছে, তা তিনি আমাদের কাছে এনে দিয়েছেন। বহু ইংরাজী গ্রন্থের তিনি বঙ্গানুবাদ ক'রে গিয়েছেন সুন্দরভাবে।

ইংলণ্ডে অবস্থানকালে মাইকেল মধুসূদন অর্থাভাবে একবার খুব বিপন্ন হন। লিখলেন বন্ধু বিদ্যাসাগরকে সাহায্যের জন্য। মাইকেল জানতেন তাকে এই বিপদ থেকে মুক্ত করতে পারেন একমাত্র বিদ্যাসাগর। আর হ'লও তাই। বিদ্যাসাগর অবশ্য অনেক কষ্টে টাকা যোগাড় করেছিলেন কিন্তু মধুসূদন এই সাহায্যের জন্য বিদ্যাসাগরকে 'করুণার সিন্ধু' রূপে অন্তরে অর্চ্চনা করেছেন। তাঁর সেই শ্রদ্ধার্ঘ হোক আমাদেরও আজকের শ্রদ্ধাঞ্জলি—

"বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু!—উজ্জ্বল জগতে
হিমাদ্রির হেমকান্তি অম্লান কিরণে।"

———

স্নেহের শাসন

সুখরঞ্জন রায়

ত্রিপুরা রাজ্যের কথা অনেকেরই হয়তো জানা আছে। সেই রাজ্যে একজন দেশীয় রাজা পুরুষানুক্রমে রাজত্ব করিতেন।

সে অনেক দিনের আগের কথা। তখন বর্তমান রাজার একজন পূর্বপুরুষ সেখানকার রাজা। সেই বড় রাজার অধীনে অনেক ছোট ছোট কুকি রাজা বা সর্দার ছিল। সেই কুকি রাজারা মাঝে মাঝে ত্রিপুরা-রাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিত। তাহারা ত্রিপুরা রাজ্যের সীমানায় আসিয়া লুটপাট করিত, ধনরত্ন ও শস্য অপহরণ করিয়া প্রজাদিগকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিত।

প্রজারা উৎপাত সহিতে না পারিয়া একদিন দলে দলে গিয়া মহারাজার নিকট নালিশ করিল। মহারাজা রাগিয়া বলিলেন—"সেনাপতি, এক সপ্তাহের মধ্যে এক হাজার কুকি সর্দারকে বন্দী করে আন্‌তে হবে।"

সেনাপতি যুদ্ধ-যাত্রা করিলেন। দেখিতে দেখিতে এক হাজার বন্দীতে বন্দীশালা ভরিয়া গেল। এক হাজার শৃঙ্খলের শব্দে বাতাস মুখরিত। তাহাদের হাতে শৃঙ্খল, চোখেমুখে বিজাতীয় ক্রোধ। কিন্তু কি করিবে, উপায় নাই। তাহারা যে বন্দী! মহারাজা বিচারালয়ে বসিয়া আদেশ দিলেন—"কাল ভোরে এক হাজার বন্দীর প্রাণদণ্ড।" একই দিনে একই সময়ে এক হাজার বন্দীর প্রাণদণ্ড! সারা রাজ্যে দিকে দিকে সে খবর রটিয়া গেল। কত দূরের গ্রাম হইতে দলে দলে লোক আসিতে লাগিল, তাহারা বিদ্রোহীদের প্রাণদণ্ড দেখিবে।

সে খবর যথাসময়ে অন্তঃপুরে পৌঁছিল। রাণী তাহা শুনিয়া ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। কিন্তু কাহাকেও কিছু বলিলেন না। অপরাহ্নে রাজা রাণীর কক্ষে বিশ্রাম করিতে আসিলেন। রাণী তাঁহার পায়ের কাছে গিয়া বসিয়া বলিলেন—"কাজটা কি ভাল হচ্ছে?"

—"কোন্ কাজটা?"

"কুকি সর্দারদের প্রাণবধ?"

রাজা একটু রাগিয়া গিয়া বলিলেন—"এর ভালমন্দ তুমি ঠিক বুঝ্‌বে না। রাজ্যশাসন নারীদের কাজ নয়। বিদ্রোহীদের শাস্তি না দিলে রাজ্যশাসন করা যায় না।"

রাণী বিনীতভাবে বলিলেন—"নারীরা কি কখনও দেশ শাসন করেন নি? বিদ্রোহীদের প্রাণ-দণ্ড না দিলে কি তাদের শাসন হয় না? আচ্ছা, কুকি সর্দারেরা কদ্দিন ধরে এরূপ বিদ্রোহ করছে?"

"সাতপুরুষ ধরে।"

রাণী বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"সাতপুরুষ ধরে যুদ্ধ মারামারি কাটাকাটি জরিমানা প্রাণদণ্ড এ'সব চলছে! কিন্তু বিদ্রোহের দমন হলো কই? আচ্ছা, মহারাজ, এদের শাসনের ভার আমার ওপর দিতে পারেন?"

"শাসনের ভার তুমি নেবে? কি করে শাসন করবে কুকি সর্দারদের?"

রাণী বলিলেন—"আমি বলছি আমি এদের বিদ্রোহ দমন করে দেব। এদের ভার আমার ওপর ছেড়ে দিন, মহারাজ।"

রাজা বলিলেন—"দেখ, এ বড় মস্ত দায়িত্ব, এর ওপর রাজ্যের সুখ-শান্তি নির্ভর করছে। চিন্তা করে কথা বলো।"

"আমি চিন্তা করেছি মহারাজ। এ দায়িত্ব আমি মাথা পেতে নিলুম। আমার বিশ্বাস আছে আমা দ্বারা রাজ্যের সুখ-শান্তি নষ্ট হবে না, বরং বাড়বে। আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন।" এই বলিয়া রাণী রাজার পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

রাজা কিছুক্ষণ ভাবিয়া সম্মতি দিলেন। রাণী বলিলেন—"আমার একটি অনুরোধ আছে। রাত্রি দ্বিপ্রহরের আগে আমি এক হাজার সোনার কৌটা চাই।"

রাজ-স্যাকরার ডাক পড়িল। রাত্রি দ্বিপ্রহরের আগেই এক সহস্র স্বর্ণ-কৌটা প্রস্তুত হইয়া আসিল।

ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত্রি। রাণী অন্তঃপুর হইতে বাহির হইলেন। তাঁহার সঙ্গে দুইজন দাসী। একজনের হাতে রূপার প্রকাণ্ড থালায় এক সহস্র স্বর্ণ-কৌটা। অন্যজনের হাতে মশাল। মশালের উজ্জ্বল আলো অন্ধকারের বুক চিরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রাণী বন্দীশালার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রক্ষী সসম্মানে পথ ছাড়িয়া দিল। বন্দীশালায় এক হাজার বন্দী নীরবে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহাদের চোখে ঘুম নাই, মুখে আসন্ন মৃত্যুর করাল ছায়া।

রাণী নিজ হাতে আসিয়া তাহাদের হাতের শৃঙ্খল খুলিয়া দিলেন। কুকি সর্দারেরা বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। তাঁহাদের হাত তখন মুক্ত, বন্দীশালার দরজা খোলা, কিন্তু তাহারা পলাইল না।

রাণী বলিলেন—"তোমরা আমার সন্তান, আমার বুকের দুধ পান করে তোমরা ঘরে যাও।" এই বলিয়া এক একটি স্বর্ণ-কৌটায় দুই এক বিন্দু করিয়া স্তন্যদুগ্ধ দিয়া কুকি সর্দারদের প্রত্যেকের হাতে তুলিয়া দিলেন। তাহারা স্তন্যদুগ্ধ পান করিয়া সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—"জয়, রাণী মাইকী জয়!" সেই চীৎকারে নৈশ-আকাশ যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল।

তখন হইতে কুকি সর্দারেরা 'রণে-বনে' ত্রিপুররাজের সহায়। তাহারা সাতপুরুষের বিদ্রোহ ভুলিয়া গিয়া রাণীর স্নেহের শাসনে রাজার দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ হইয়া উঠিল। এখন পর্যন্ত তাহাদের বংশ-ধরেরা সেই স্বর্ণ-কৌটা যত্নের সহিত রক্ষা করিয়া আসিয়াছে এবং বিগ্রহের মত পূজা করিতেছে।

বসন্তের ছড়া

শ্রীশৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়

বসন্ত এলো, শীত হয়ে গেল অন্ত,
অলিকুল বিলকুল উড়ে উড়ে ক্লান্ত !
গাছে গাছে কচি পাতা,
ইচ্ছাটি তোলে মাথা ;
আকাশের বুকে-মুখে কাঁপে হাওয়া ঝুর্‌ঝুর্ !
অলিকুল উড়ে যাও, উড়ে যাও কদ্দূর !

শিমুল বনের রোদ পলাশেতে লাগল,
দীঘির পদ্মকলি তাই দেখে জাগল !
বলাকারা ভেসে যায়
সাগরের কিনারায়,
নীলিমায় থৈ থৈ আকাশ সমুদ্দুর !
বলাকারা ভেসে যাও, ভেসে যাও কদ্দূর !

কেশবতী কন্যে

শ্রীনির্মলকুমার ভট্ট

কেশবতী কন্যে।
নেড়া মাথায় কাঁকুই ঘষেন
চুল বাড়াবার জন্যে।
উঠ্‌ল বেড়ে কেশবতীর
মাথা-ভরা চুল।
কেশবতীর কর্ণে দোলে
হীরে-মোতির ফুল॥
কিসের হীরে, কিসের মোতি ?
কিসের সোনার দুল ?

রাজকন্যের কর্ণে মানায়
কর্ণিকারের ফুল।
কর্ণিকারের ফুলের খোঁজে
ছুট্‌লো ব'দে বিশে।
নাদ্‌না কাঁধে হাঁকৃরে ছোটে
নন্দ ঘোষের পিসে॥
কেউ পারে না চড়্‌তে গাছে
চড়লো গেছো ব্যাং।
রাজ্যি জুড়ে বাদ্যি বাজে
ড্যাং ড্যাঙা ড্যাং ড্যাং॥

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক উপন্যাস 'কাঁকর-পথের যাত্রী' তাঁর বিশেষ অসুস্থতার জন্য সম্প্রতি 'মৌচাকে' প্রকাশ বন্ধ আছে। এজন্য আমরা তাঁর সুস্থতা কামনার সঙ্গে গ্রাহক গ্রাহিকাদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করছি।
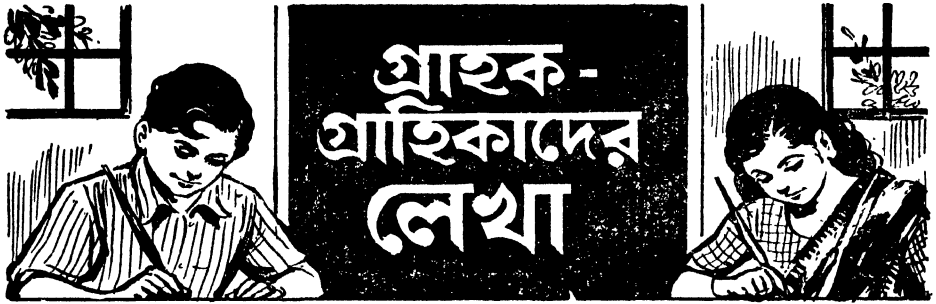
ঝিলাম নদীর তীরে

ঝিলাম নদীর তীরে
ছিলাম দু'দিন ধরে।
সেথায় সূর্য ওঠেন হেসে
হাসি-মুখের রাঙা বেশে,
নদীর উপর নৌকা চলে
ঢেউ-এর পরে দুলে।
সেথায় রংবেরং-এর ফুলের বনে
রামধনু যে পড়েন হেলে,
সেথায় মৌমাছিরা মধু ফেলে
মৌচাকেতে বেড়ায় খেলে,
গিয়েছিলাম এমনি ধারা দেশে।
বেড়িয়ে এলাম খানিক খেলে-হেসে॥

কুমারী মৈত্রী গুপ্তা

—

বনস্পতি চা-বাগানে কয়েকদিন

বহুদিন থেকে ইচ্ছে ছিল আসামের বনস্পতি চা-বাগান ও গরমপানি দেখে আসব। বাবা বনস্পতি চা-বাগানের ম্যানেজার। অবশেষে সে সুযোগ এল। পূজোর পর শুভদিন দেখে নিউ জলপাইগুড়ি ষ্টেশন থেকে ট্রেনে উঠে শিলিগুড়ি জংশনে এলাম। শিলিগুড়ি জংশনে বহুলোকের ভিড় ঠেলে কোনমতে উঠলাম ট্রেনে। গাড়ী ছাড়বার ঘণ্টা বেজে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী সচল হ'ল। ষ্টেশন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর গতি বাড়তে লাগলো। প্রথমে গাড়ী এসে দাঁড়াল মাল জংশনে। পাঁচ মিনিট বিশ্রামের পর আবার চলতে চলতে একে একে বানার হাট, দলগাঁ, হ্যামিলটন, রাঙ্গাভাতখাওয়া প্রভৃতি ছেড়ে ভোরবেলা গাড়ী এসে আলিপুরদুয়ার জংশনে দাঁড়াল।

গাড়ী হতে নেমে কলে হাত-মুখ ধুয়ে চা ও জলযোগ সেরে আবার গাড়ীতে উঠলাম। গাড়ী ছাড়ল, চলন্ত গাড়ী হতে দু'পাশের সুন্দর দৃশ্য—কখন শস্যক্ষেত্র কখন গ্রাম ঘর বাড়ী দেখতে দেখতে এসে পড়লাম বাংলা ও আসামের সীমানায়—কামাখ্যাগুড়ি ষ্টেশনে। কামাখ্যাগুড়ির পর একটা রেলওয়ে ব্রীজ পেরিয়ে গাড়ী আসামে

প্রবেশ করল। গাড়ীর জানালা দিয়ে দেখলাম লাইনের দুই পাশের ফাঁকা মাঠ-গুলিতে একই কায়দায় অনেকগুলি ঘর তৈরি হচ্ছে। আমাদের কামরার একজন যাত্রীর কাছে শুনলাম, ঘরগুলি পাকিস্থান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের জন্য তৈরি করা হচ্ছে। ধীরে ধীরে অনেকগুলি ষ্টেশন পেরিয়ে গাড়ী এসে দাঁড়াল ফকিরাগ্রাম জংশনে। ফকিরাগ্রামে কয়েকজন রেলওয়ে পুলিশ উঠল আমাদের কামরায়। তারা প্রথমে আমাদের বাক্সগুলো নাড়াচাড়া করে দেখল, তারপর কয়েকজন যাত্রীকে কয়েকটি প্রশ্ন করে নেমে পড়ল। পনের মিনিট পর জল ও কয়লা নিয়ে গাড়ী আবার ছাড়ল। একে একে কোঁকড়া ঝাড়, বঙ্গাইগাও, সরভোগ, রঙ্গিয়া প্রভৃতি ছেড়ে বেলা দেড়টায় ব্রহ্মপুত্রের ব্রীজ পার হয়ে গৌহাটি পৌঁছলাম। ব্রহ্মপুত্রের ব্রীজ পার হওয়ার সময় ট্রেন থেকে কামাখ্যা দেবীর মন্দির দেখলাম। দূর থেকে পাহাড়ের উপর সাজানো বাড়ীগুলো দেখতে খুবই সুন্দর লাগে। গৌহাটিতে নেমে স্টেশনেই স্নানাদি সেরে গাড়ীতে উঠলাম। বিকাল পাঁচটায় গাড়ী ছাড়ল। গৌহাটির পরই নারেঙ্গি। নারেঙ্গিতে এক মিনিটের জন্য গাড়ী দাঁড়াল। গাড়ী হতেই দেখলাম নারেঙ্গির বিরাট তৈল-শোধনাগার। পুনরায় গাড়ী চলতে লাগল। দেখতে দেখতে চাপাড় মুখ, হোজাই, লঙ্কা প্রভৃতি স্টেশন পেরিয়ে রাত এগারোটায় পৌঁছলাম লামডিং ষ্টেশনে।

ষ্টেশনে নেমে শুনলাম নাগাদের উপদ্রবের জন্য ভোর চারটের আগে কোন ট্রেনই লামডিং থেকে বড়-পাথার যাবে না। দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা সময় হাতে। প্ল্যাটফরমের মধ্যে বিছানা পেতে ঘুমিয়ে পড়লাম। সারাদিনের ক্লান্তিতে এত ঘুম পেয়েছিল যে কখন চারটা বেজে গেছে টের পাইনি। কুলিদের হইচইয়ে ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম থেকে উঠেই দেখি গাড়ী ছাড়বার উপক্রম করছে। তাড়া-তাড়ি বিছানাপত্র বেঁধে গাড়ীতে উঠে পড়লাম। গাড়ীতে বেশী ভিড় ছিল না। কয়েকজন মিকির, দুইজন আসামী ভদ্র-লোক ও আমিই ছিলাম ট্রেনের যাত্রী। গাড়ী ছাড়ল। কখনো পাহাড়ের মাথায় উঠছে গাড়ী, কখনো দুটি পাহাড়ের মাঝ দিয়ে চলছে। কখনো গভীর জঙ্গলের পাশ দিয়ে, কখনো বা গভীর খাদের ধার ঘেঁষে ছুটছে। ভয় হয় নীচের দিকে চাইলে—একটু এদিক-ওদিক হয়ে গাড়ী যদি খাদের মধ্যে পড়ে যায়!

সকাল আটটায় অনেক পার্বত্য-জঙ্গল ও স্টেশন পার হয়ে বড়পাথার স্টেশনে গাড়ী হতে নামলাম। বড়পাথার স্টেশন হতে বনস্পতি চা-বাগানের দূরত্ব আট মাইল। বাবা বাগান থেকে জীপ পাঠিয়েছিলেন। আমি বাক্স-বিছানা নিয়ে জীপে উঠলাম।

লালমাটির পথে ধূলো উড়িয়ে ছুটে চলল দুরন্ত-গতি জীপ। দু'ধারে সবুজ ধান ক্ষেত। কচি কচি ধানের মঞ্জরীর সঙ্গে হাওয়ায় দোল খাচ্ছে পাখীর দল। রাখাল বালকেরা গাছতলায় বসে বাঁশী বাজাচ্ছে।

এই সব দেখতে দেখতে বেলা দশটায় বনস্পতি চা-বাগানে পৌছুলাম। বাবা বাংলোর গেটের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি জীপ থেকে নেমে বাবাকে প্রণাম করলাম। একজন কুলি আমার বাক্স ও বিছানা নিয়ে বাংলোর ভিতরে গেল। আমরাও বাংলোর ভিতরে প্রবেশ করলাম। বাংলোটি খুব সুন্দর। চারিদিক চা-গাছে ঘেরা। রান্নাঘরের পাশে বিরাট ফলের বাগান। বাগানের পেছন দিয়ে কুলকুল করে বয়ে চলেছে ধানশ্বরী নদী। আমি ধানশ্বরীতেই স্নান করলাম। আহারাদি সারতে আমাদের একটা বেজে গেল। ঘণ্টা দুই বিশ্রাম করে বেলা তিনটের সময় গরমপানি দেখবার জন্য বাবা, পল্টুদা ও আমি জীপে করে বেরিয়ে পড়লাম।

বনস্পতি থেকে গরমপানির দূরত্ব সাত মাইল। এখানে একটি গরম জলের উৎস আছে বলেই জায়গাটির নাম গরম-পানি (গরম জল)।

গরম জলের উৎসটি সত্যই দেখবার মত। মাটির তল থেকে আপনা হতে অনবরত গরম জল উঠছে। প্রকৃতির এই এক অদ্ভুত খেয়াল। এই গরম জল যেখান দিয়ে উঠছে, সেখানে একটি কুণ্ড বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে। লোকে এই কুণ্ডে স্নান করে। আমরাও এই গরম জলের কুণ্ডে হাত-পা ধুলাম। কুণ্ডের জল রীতিমত গরম। প্রথমে জলে নামতে বেশ কষ্ট হয়, পরে অবশ্য গরমটা সয়ে যায়। কুণ্ডের পাশেই একটা ছোট্ট টিনের ঘর। এই ঘরটি স্নানার্থীরা কাপড় ছাড়ার জন্য ব্যবহার করে। আমরা গরমপানি দেখে জীপে চড়ে বাড়ীর পথে পাড়ি দিলাম।

যখন বাংলোয় পৌঁছলাম তখন সাতটা বেজে গেছে। আমি অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলাম তাই খেয়েদেয়েই ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন সকালবেলা বাবার সঙ্গে বাগান দেখতে বের হলাম। চা-বাগানটি দেখবার মতো। প্রথমে আমরা গেলাম আট নম্বর বাগান দেখতে। সেখানে দেখলাম একদল পুরুষ মাটি কোপাচ্ছে এবং কয়েকজন স্ত্রীলোক সেই মাটি গুড়ো করে আট ইঞ্চি ফাঁক ফাঁক চা গাছের বীচি লাগাচ্ছে। এক লাইন লাগানো হয়ে গেলেই স্ত্রীলোকেরা বীচিতে জল দিয়ে সেগুলো খড় দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে। আট নম্বর বাগান দেখা হলে আমরা গেলাম পাঁচ নম্বর বাগান দেখতে। সেখানে দেখলাম, একদল স্ত্রী ও পুরুষ পিঠে ঝাঁকা বেঁধে চা-পাতা তুলছে। কয়েকজন স্ত্রীলোক গাছতলায় বসে বিশ্রাম করছিল। বাবাকে দেখেই তারা চা-পাতা তুলতে

লেগে গেল। পাঁচ নম্বর বাগান দেখা হলে আমরা আর কয়েকটি জায়গা দেখে বাংলোয় ফিরে এলাম।

বিকেলবেলা ফাটাশিল যাওয়া ঠিক হ'ল। বনস্পতি থেকে ফাটাশিল বেশ কয়েক মাইল দূরে। আমাদের গাড়ীটা খারাপ থাকায় আমরা হেঁটেই ফাটাশিলের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। চলতে চলতে চা-গাছের ঝোপের মধ্যে উল্লুক ও বনমুরগীর দল দেখতে পেলাম। আমাদের চলার শব্দে ভয় পেয়ে বনমুরগীর দল উড়ে গেল এবং উল্লুকগুলো গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। পল্টুদা আমাকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, উল্লুকের কাছ দিয়ে একা কখন যাবে না। ওরা মানুষকে একা পেলেই ধারালো নখের সাহায্যে আক্রমণ করে মেরে ফেলে। আমি পল্টুদা'র কথা শুনে ভয়ে ভয়ে চলতে লাগলাম। সন্ধ্যের কিছু আগে আমরা ফাটাশিলে পৌছুলাম। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য খুব সুন্দর। এখানে একটি বড় পাথর দেখতে পেলাম। পাথরটির এক অংশ ফাটা। ফাটা অংশ দিয়ে জল পড়ছিল। নিকটে কোথাও মানুষের ঘর দেখতে পেলাম না। চারিদিক কেবল চালতা, আমলকী ও জঙ্গলী কলা গাছ। সন্ধ্যের পর এখানে দলে দলে বুনো হাতী এসে জমা হয়। আমরা কিছুক্ষণ চালতা তলায় দাঁড়িয়ে ফাটাশিলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করে ফিরলাম বাংলোয়।

দিনগুলি কাটছিল বেশ আনন্দের মধ্য দিয়ে। কিন্তু ক্রমেই সময় ফুরিয়ে আসছিল। ব্যথা লাগছিল মনে এই আনন্দের পরিবেশ ছেড়ে যেতে। আবার সেই কলেজ, রুটিন-বাঁধা কাজ। এই ভেবে আর মন এগোতে চাইছিল না। কিন্তু যেতেই হবে। একদিন জিনিসপত্তর সব গোছানো হ'ল; আমরা জীপে করে বড়পাথার স্টেশনে এলাম। স্টেশনে আমার সঙ্গে বাবা, পল্টুদা, অমলদা এবং আরও অনেকে এসেছিলেন। তাঁদের সাহায্যে কোনমতে উঠলাম ট্রেনে। গাড়ী ছাড়বার ঘণ্টা বাজতেই আমাদের গাড়ী ছেড়ে দিল নিউ জলপাইগুড়ির উদ্দেশে।

শ্রীঅশোককুমার মিত্র

বছর হ'ল শেষ

বছর হ'ল শেষ রে ভাই
বছর হ'ল শেষ;
সামনে আছে নতুন খাতা
মজাটা ভাই বেশ।
শপথ গ্রহণ করব এবার
নতুন বছর এলে,
করব না আর দিনগুলি সব
নষ্ট হেসে-খেলে।

মিনতি মুখোপাধ্যায়
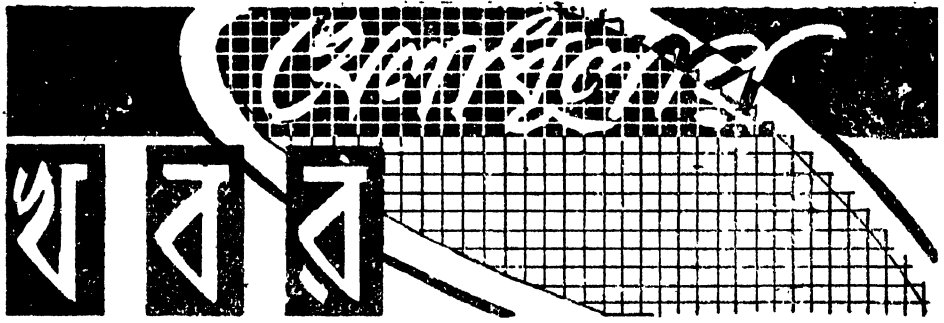
মেঠুড়ে

রোভার্স কাপ

কলকাতার বি. এন. রেল দলের এবার পশ্চিম ভারতের প্রধান ফুটবল প্রতিযোগিতা রোভার্স কাপ জয় বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতন ঘটনা। কারণ কলকাতার ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের মতন দুটো শক্তিশালী দলকে হারিয়ে বি. এন. রেল দলের রোভার্স কাপ লাভ সত্যিই কৃতিত্বের। কৃতিত্ব আরো এইজন্যে বি. এন. রেল দলকে শক্তিশালী ইস্টবেঙ্গল ও মোহন-বাগানের সঙ্গে দু'দিন ধরে লড়তে হয়। সেমি-ফাইন্যালে ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে প্রথম দিনের খেলা ১—১ গোলে অমীমাংসিতভাবে শেষ হবার পর দ্বিতীয় দিন ইস্টবেঙ্গলকে ১—০ গোলে হার স্বীকার করতে হয়। ফাইন্যালেও মোহনবাগানের সঙ্গে রেল দলের প্রথম দিনের খেলাও ১—১ গোলে শেষ হয়। দ্বিতীয় দিনের ফাইন্যালে ১—০ গোলে মোহনবাগানকে হারিয়ে রেল দল সর্বপ্রথম রোভার্স কাপ জয় করে। সেমি-ফাইন্যাল খেলার আগে রেল দল চতুর্থ রাউণ্ডে মাদ্রাজ ইঞ্জিনীয়ারিং গ্রুপের বিরুদ্ধে ১—০ গোলে এবং কোয়ার্টার ফাইন্যালে বোম্বাইয়ের টাটা স্পোর্টস ক্লাবের বিরুদ্ধে ২—০ গোলে বিজয়ী হয়। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে আই. এফ. এ. শীল্ড বিজয়ী বি. এন. রেল দলের এই বিজয়ে কৃতিত্ব যতখানি, আনন্দ তার চেয়ে অনেক বেশি।

কলকাতা থেকে পাঁচটা দল এবার রোভার্স কাপে যোগ দেয়। মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব তৃতীয় রাউণ্ড থেকে আর এরিয়ান, ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান ও বি. এন. আর. চতুর্থ রাউণ্ড থেকে খেলে। মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব তৃতীয় রাউণ্ডে মহীশূর জেলা একাদশকে হারিয়ে চতুর্থ রাউণ্ডে ওঠে, কিন্তু চতুর্থ রাউণ্ডে তাদের হারতে হয় ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরী দলের কাছে। চতুর্থ রাউণ্ডে প্রথম খেলায় মফৎলাল মিলস দল এরিয়ানকে হারিয়ে দেয়। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব বি. এন. রেল দলের কাছে সেমি-ফাইন্যালে হারার আগে চতুর্থ রাউণ্ডে ওয়েষ্টার্ণ রেল দলকে ১—০ গোলে এবং পাঞ্জাব পুলিসকে ১—১ ও ১—০ গোলে হারিয়ে দেয়। মোহনবাগান ই. এম. ই. সেণ্টার, ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরী ও মফৎলাল মিলসকে একে একে হারিয়ে ফাইন্যালে ওঠে।

দলীপ সিংজী ট্রফি

ভারতের আঞ্চলিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতা দলীপ সিংজী ট্রফির খেলায় পশ্চিমাঞ্চল আবার বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে। ১৯৬১-৬২ সালে দলীপ ট্রফির খেলা আরম্ভ হবার পর থেকে প্রতি বছরই পশ্চিমাঞ্চল বিজয়ী হয়ে আসছে; শুধু গত বছর পশ্চিমাঞ্চল দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে যুগ্ম বিজয়ীর সম্মান পেয়েছিল। এবার ফাইন্যালে পশ্চিমাঞ্চল মধ্যমাঞ্চলকে এক ইনিংস ও ৮৯ রানে হারিয়ে দেয়। মধ্যমাঞ্চলকে হারাতে পশ্চিমাঞ্চলের পুরো চারদিন সময়ও লাগেনি—চারদিনের খেলা তিন দিনেই শেষ হয়।

ভারতকে পাঁচটা অঞ্চলে ভাগ করে দলীপ প্রতিযোগিতার খেলা হয়ে থাকে। বোম্বাই, বরোদা, মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও সৌরাষ্ট্র কে নিয়ে পশ্চিমাঞ্চল; মহীশূর, মাদ্রাজ, অন্ধ্র, হায়দরাবাদ ও কেরল নিয়ে দক্ষিণাঞ্চল; বাঙালা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামকে নিয়ে পূর্বাঞ্চল; সার্ভিসেস, রেলওয়ে, দিল্লি, দক্ষিণ পাঞ্জাব, উত্তর পাঞ্জাব, জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে উত্তরাঞ্চল; রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, বিদর্ভ ও উত্তর প্রদেশকে নিয়ে মধ্যমাঞ্চল। এবার এই পাঁচটা অঞ্চলের খেলায় উত্তর অঞ্চল ও মধ্যমাঞ্চলের প্রথম খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হলেও প্রথম ইনিংসের ফলাফলে মধ্যমাঞ্চল জয়ী হয়ে সেমি-ফাইন্যালে উঠে। দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে মধ্যমাঞ্চলের সেমি-ফাইন্যাল খেলাতেও মধ্যমাঞ্চল জয়ী হয় প্রথম ইনিংসের ফলাফলে। সুতরাং মধ্যমাঞ্চল ফাইন্যাল খেলার অধিকার পায়। অন্যদিকে পশ্চিমাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলের সেমি-ফাইন্যাল খেলাতেও পশ্চিমাঞ্চল প্রথম ইনিংসের ফলাফলে জয়ী হয়ে ফাইন্যালে ওঠে। বোম্বাইয়ের ব্রাবোর্ণ ষ্টেডিয়ামে ফাইন্যাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমাঞ্চল দলে আটজন, মধ্যমাঞ্চল দলে চারজন টেষ্ট খেলোয়াড় ছাড়াও দু'দলে উঠতি খেলোয়াড়ের সংখ্যাও কম ছিল না। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং-এ পশ্চিমাঞ্চলের খেলোয়াড়রা পর্যাপ্ত প্রাধান্যের পরিচয় দিলেও মধ্যাঞ্চলের খেলোয়াড়রা নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারেননি এমন নয়। ফলো-অনের পরও তাঁরা অনমনীয় দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ করে দ্বিতীয় ইনিংসে সেলিম দুরানীর সেঞ্চুরী এবং পি. সি. পোদ্দারের ৬৩ রান প্রশংসা করার মতন।

মধ্যমাঞ্চল টসে জয়লাভ করলেও অধিনায়ক মঞ্জরেকার প্রতিপক্ষ দলকে প্রথম ব্যাট করবার সুযোগ দেন। পশ্চিমাঞ্চল বে-পরোয়া পিটিয়ে প্রথম দিনেই ৭ উইকেটে ৪৪৬ রান তোলে। এই রানের মধ্যে ফারুক ইঞ্জিনীয়ারের ১৪২, বিজয় ভোঁসলের ১০০ এবং অধিনায়ক চাঁদু বোরদের ৯১ রান উল্লেখ করার মত। ইডেন উদ্যানে সেমি-ফাইন্যালে প্রথম ব্যাট করে পশ্চিমাঞ্চল দল পূর্বাঞ্চলের বিরুদ্ধে প্রথম দিনে সংগ্রহ করেছিল ৩ উইকেটে ৪১৩ রান। দ্বিতীয় দিনে ৫৬৫ রানে পশ্চিমাঞ্চলের প্রথম ইনিংস শেষ হবার পর ১৩৫ রানে মধ্যমাঞ্চলের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। ফলো-

অন করে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ঐ দিন মধ্যমাঞ্চল এক উইকেটে ৪৩ রান তোলে। তৃতীয় দিন ৩৩১ রানে মধ্যমাঞ্চলের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়। পশ্চিমাঞ্চল এক ইনিংস ও ৮৯ রানে মধ্যমাঞ্চলকে হারিয়ে দেয়।

নিউজিল্যাণ্ড ক্রিকেট দল

নিউজিল্যাণ্ড পৃথিবীর ম্যাপে খুঁজে বের করা বেশ মুস্কিল। অষ্ট্রেলিয়া নিজে দুইটি ছোট দ্বীপপুঞ্জ —একটা South Island অপরটা North Island. এই দুইটি দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে নিউজিল্যাণ্ড নাম।
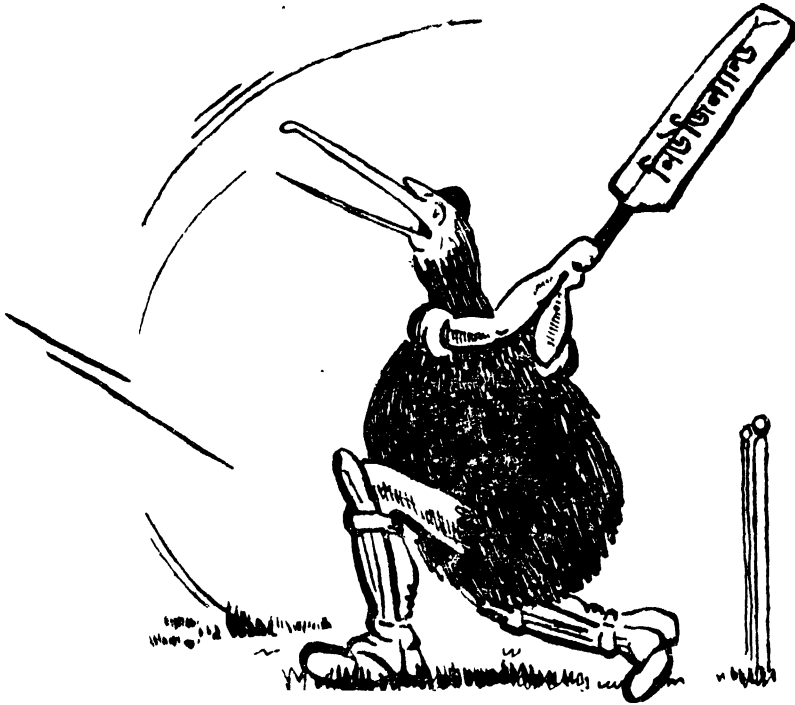
এই দেশও অষ্ট্রেলিয়ার মত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত কমনওয়েল্‌থ। বলা-বাহুল্য, যেখানেই ব্রিটিশরা উপনিবেশ বা রাজ্য স্থাপন করেছে, সেখানেই ক্রিকেটকে একরকম জাতীয় খেলা বলে সেই দেশ-বাসী গ্রহণ করেছে। কমনওয়েল্‌থের অন্য সভ্য দেশ ভারতবর্ষ যখন এই ক্রিকেট গণ্ডীর মধ্যে এসে পড়ল, তখন নিউজিল্যাণ্ড বনাম ভারতবর্ষের মধ্যে ক্রিকেট খেলার সূচনা হোল।

প্রথম টেষ্ট খেলা হয় এই দুই দেশের মধ্যে ১৯৫৫-৫৬ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে। এই খেলায়

পাঁচটি টেষ্ট হয়। এতে নিউজিল্যাণ্ড একটা টেষ্টেও জয়লাভ করতে পারেনি। ৫টি টেষ্টের মধ্যে ভারতবর্ষ দুইটি খেলায় জয়লাভ করে এবং আর তিনটি খেলার ফলাফল ড্র হয়। এই খেলায় একটা পৃথিবীর record হয়ে আছে। ভারতীয় খেলোয়াড় মানকড় ও পি. রায় তৃতীয় উইকেট জুটিতে প্রায় ৩০০ রান করেছিল। এবারে নিউজিল্যাণ্ড ভারতবর্ষে চারটি টেষ্ট খেলা খেলতে এসেছে। এবারে কিন্তু এই দল বেশ শক্তিশালী। এদের মধ্যে ক্যাপ্টেন রিড, টিলার এবং সার্টক্লিফ বেশ দুর্ধর্ষ খেলোয়াড়। মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কলকাতায় তিনটি টেষ্টের ফলাফলই হয়েছে ড্র।

বাঙালা দেশে ভলিবলের জনপ্রিয়তা

বাঙালা দেশে ভলিবল খেলার জনপ্রিয়তা যেমন দিন দিন বাড়ছে তেমনি খেলোয়াড়দেরও দক্ষতা বেড়েছেও অনেকখানি। সম্প্রতি সর্বভারতীয় দুটো ভলিবল প্রতিযোগিতায় বাঙালার দুটো দলের কৃতিত্ব কম নয়। জামসেদপুরে আয়োজিত হিলিয়ার মেমোরিয়াল প্রতিযোগিতায় চেতলা পার্ক রানার্সের সম্মান পেয়েছে, চ্যাম্পিয়ন হয়েছে অন্ধ্র পুলিস দল। ডালমিয়ানগরে শেঠ গোবিন্দদাস ভলিবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে বড়বাজার যুবক সভা। দুটো প্রতিযোগিতাতেই যাঁরা শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের সম্মান পেয়েছেন, তাঁরা বাঙালারই খেলোয়াড়।

জয়ন্তবিষ্ণু নারলিকার

উপরের এই নামটি তোমরা ক'জনেই বা শুনেছ ? কিন্তু পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক মহলে এই ভারতীয় বৈজ্ঞানিক নূতন আবিষ্কার করে বেশ তোলপাড়ের সৃষ্টি করেছেন। এঁর আবিষ্কারের ভিত্তি হচ্ছে মহাকর্ষ (gravitation) সম্বন্ধে। বিখ্যাত ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক হয়েলের সঙ্গে ইনি কাজ করে বিখ্যাত হয়েছেন।

সম্প্রতি ইনি ভারতবর্ষে এসে বিভিন্ন বিখ্যাত বিজ্ঞানসংস্থায় তাঁর আবিষ্কারের কথা বলেছেন। নারলিকারের তত্ত্ব বিশদভাবে ছেলেমেয়েদের বোঝানো সম্ভবপর নয়। পৃথিবী-বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন তাঁর আবিষ্কৃত যে আপেক্ষিকতাবাদ বিশদভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা সিদ্ধ করতে চেষ্টা করেছেন, তা এখনও বহুক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই ভারতীয় বৈজ্ঞানিক জয়ন্তবিষ্ণু সেটাই সম্পূর্ণ করতে চেষ্টা করেছেন।

নারলিকার এই যুবক বয়সেই বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন। তিনি এখন কেমব্রিজের King's College-এর গবেষক হিসাবেই কাজ করেন। কলকাতার এক বৈজ্ঞানিক সভায় তিনি বলেছেন—আমি এমন কোন উচ্চ ব্যক্তি নই, যে সংবাদপত্রে দৈনন্দিন আমার ছবি বা সংবাদ ছাপতে হবে। আমার কাজ নিয়েই আমি সন্তুষ্ট থাকতে চাই।

মানুষ হ'তে হ'লে

শ্রীসরোজ রায়

গোমড়া মুখে ব'সে থাকা সব ব্যাপারেই লাজ।
বায়না ধরা যখন-তখন নয় সে তো সৎ কাজ॥
টগ্‌বগিয়ে উঠবে ঘোড়ায় ধরবে টেনে লাগাম।
তবেই হবে কর্মী দেশের ছুটবে তুমি আগাম॥
অবাক হবে দেশের লোকে ভাববে তোমার মুখ।
ছেলের মতো ছেলে বটে দেখছে দেশের সুখ॥
আর যদি ভাই কাজ না ক'রে চুপটি ব সে থাকো।
অলসতা ধরবে তোমায় মানুষ হবে নাকো॥

❋ মৌচাকের সমালোচনা প্রতিযোগিতা ❋

(কেবলমাত্র গ্রাহক-গ্রাহিকাদের জন্য তিনটি বিশেষ পুরস্কার)

১ম পুরস্কার বিনামূল্যে ৩ বছরের মৌচাক, ২য় পুরস্কার ২ বছরের মৌচাক, ৩য় পুরস্কার ১ বছরের মৌচাক।

বিগত ১৩৭১ সালের সম্পূর্ণ ১২ মাসের মৌচাকের একটি সমালোচনা ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখে পাঠাতে হবে এই প্রতিযোগিতার জন্য। কি ধরনের কোন্ লেখা ভাল লেগেছে এবং কেন ভাল লেগেছে,—তা সে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ অথবা অন্য যে-কোন বিষয়ই হোক, বিগত এক বছরের মধ্যে যা প্রকাশিত হয়েছে, তার উপর সমালোচনা করতে হবে এবং ভালমন্দ দু'দিকেই আলোচনা করার সুযোগ থাকবে।

সমালোচনাটি আগামী (১৩৭২) আষাঢ় মাসের শেষ তারিখের মধ্যে সম্পাদকের হাতে এসে পৌঁছানো চাই। খামের উপর 'সমালোচনা প্রতিযোগিতা' কথাটি লিখে দিতে হবে এবং ঠিকানাসহ গ্রাহক-গ্রাহিকা সংখ্যাও দিতে হবে লেখার সঙ্গে। মৌচাকের আগামী ভাদ্র-সংখ্যায় ফলাফল ও লেখাগুলি প্রকাশিত হবে এবং ১৩৭৩ সালের গোড়া থেকে এই পুরস্কারের কাগজ দেওয়া হবে।

(সমালোচনার জন্য দু'খানি বই পাঠাবেন)

সমাজ-কল্যাণে স্বামীজী—শ্রীসতীকুমার নাগ। দি নিউ বুক স্টল, ৫।১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৯ হইতে শ্রীমহেন্দ্রনাথ পাল কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ২.০০

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে যেমন মহান্ কীর্তি রেখে গেছেন, তেমনি সমাজের কল্যাণ-কামনায় বহু উপদেশ ও কর্মপদ্ধতি দিয়ে গিয়েছেন। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, তিনি যা কিছু করেছেন, তার সবটাই সর্বকালের সর্বমানুষের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য।

এই বইখানির মধ্যে লেখক সহজ সুন্দর ভাষায়, স্বামীজীর জীবনের পুণ্য-কাহিনীর মধ্যে দিয়ে তাঁর সমাজ-কল্যাণের বহুমুখী আদর্শের কথা বলেছেন। প্রসঙ্গত, স্বামীজীর সঙ্গে ঠাকুর পরমহংসদেবের বহু কথোপকথন এবং গুরুভাইদের সঙ্গে স্বামীজীর সমাজধর্ম নিয়ে কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনাগুলিও বাদ যায়নি। বইখানি ছোট-বড়ো সকলেই পড়ে উপকৃত হবেন। কিন্তু ৭৩ পৃষ্ঠার এই বইয়ের দাম দু'টাকা একটু বেশীই মনে হয়।

মৌচাকের নতুন বছর

(গ্রাহক-গ্রাহিকাদের প্রতি)

এই চৈত্র-সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে মৌচাকের আর একটি বছর শেষ হ'ল। আগামী বৈশাখ থেকে তোমাদের এই সর্বপুরাতন পত্রিকাটি ৪৬ বছরে পদার্পণ করবে।

ছোটদের একটি পত্রিকার পক্ষে এই দীর্ঘদিন নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে আসা কম আনন্দের কথা নয়। এর জন্য মৌচাকের গ্রাহক-গ্রাহিকা তোমাদের ও তোমাদের অভিভাবকদের আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

এই সহানুভূতি থেকে আমরা যাতে বঞ্চিত না হই, সেজন্য এই চৈত্র-সংখ্যার সঙ্গে যাদের বার্ষিক এবং ষাণ্মাসিক চাঁদা শেষ হবে, তারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বৈশাখ থেকে নতুন বছরের (১৩৭২ সাল) চাঁদা মনিঅর্ডার করে পাঠিয়ে দেবে।

বৈশাখের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে গ্রাহক-গ্রাহিকা থাকার অনিচ্ছা প্রকাশ করে কোন চিঠিপত্র না এলে, আমরা ভিঃ পিঃতে পুরাতন গ্রাহক-গ্রাহিকার নামে কাগজ পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব। আশা করি ভিঃ পিঃ ফেরত দিয়ে তোমরা আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত করবে না। মৌচাকের বার্ষিক চাঁদা ৫.০০, ষাণ্মাসিক ২.৫০, ভিঃ পিঃ-তে ৬২ পয়সা বেশী লাগবে।
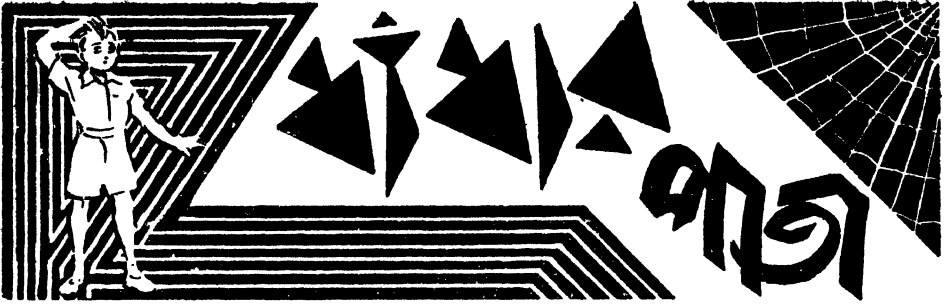
বলতে পারো ঃ টর্চ সম্বন্ধে

১। ইলেকট্রিক বাল্ব-এর মধ্যে যেটা জ্বলে তাকে কি বলে। ২। ইলেকট্রিসিটি কিভাবে বাল্ব-এ গিয়ে পৌঁছয়। ৩। বিভিন্ন ব্যাটারির মধ্যে সংযোগ-সূত্র কোনটি। ৪। একটি টর্চের মধ্যে বৈদ্যুতিক-সার্কিট কিভাবে হয়ে থাকে।

★

॥ এর মধ্যে কোনটি ঠিক বার করো ॥

১। 'লামা' (Lama) বলতে কি এবং কাকে বোঝায় ?

(অ) একজন বৌদ্ধ-পুরোহিত, (আ) তিব্বতের কোন ব্যক্তি,
(ই) সাউথ আমেরিকার কোন জন্তু, (ঈ) শাসক।

★

২। কোন সমুদ্রে 'ক্রিশমাস দ্বীপ' আছে ?

(অ) প্যাসিফিক, (আ) আর্টিক, (ই) এ্যাটলান্টিক, (ঈ) ভারত সমুদ্র।

★

৩। 'পোপ' কোন দেশের সর্বময় কর্তা হিসাবে খ্যাত ?

(অ) রোম. (আ) ভেটিকান, (ই) নেপলস্, (ঈ) মিলান।

★

৪। 'জেট' বিমান কে প্রথম আবিষ্কার করে ?

(অ) স্যার হামফ্রে ডেভি, (আ) থমাস আলভা এডিসন,
(ই) স্যার ফ্রাঙ্ক হুইট্‌ল, (ঈ) মাইকেল ফ্যারাডে।

★

৫। প্রথম ইংরেজী অভিধান কে করেন ?

(অ) ডঃ জনসন, (আ) চসার, (ই) সুইফ্‌ট, (ঈ) শেকস্‌পীয়র

(উত্তর আগামীবার বেরুবে)

আমাদের প্রাত্যহিক জীবন ঘিরে রয়েছে অসঙ্গতি আর অব্যবস্থা। এর ফল তোমাদের আমাদের সকলকেই ভোগ করতে হচ্ছে। পরীক্ষা সকলের যখন সন্নিকট—তখন চারিদিকে ধর্মঘট হওয়াতে—আশঙ্কা হচ্ছিল, হয়তো তোমাদের পরীক্ষা হবে না—কিন্তু সুখের বিষয় সব পরিস্থিতি হালকা হয়েছে এবং তোমরাও সুস্থ মনে পরীক্ষা দিতে পেরেছ বা পারছ। সকল বিঘ্ন-দুর্বিপাক কাটিয়ে সুস্থ মনে পরীক্ষা দিয়ে জয়ী হও তোমরা—একথা বার বার বলি।

বছর শেষ হয়ে এলো। নতুন বছরে নতুন সঙ্কল্প গ্রহণ করো তোমরা—জীবনে শুভ ও মঙ্গলস্পর্শ আসুক। বিদায়ী বৎসরের দিকে চেয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানাই।

মহাজীবন থেকে—

সেদিন দুপুর বেলা থেকে চলছে ঝড় আর বৃষ্টি। বৃষ্টি আর ঝড়। কোলকাতার এক সাহেব চলেছেন পায়ে হেঁটে গ্রামের দিকে। অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ধারায় ভিজে গিয়েছে তাঁর সমস্ত শরীর। কাদা-ভর্তি রাস্তা, হাঁটু পর্যন্ত জল—সেই জলে-কাদায় জুতোসুদ্ধ পা দুটো বার বার ডুবে যাচ্ছে। ঝড়ের প্রচণ্ড হাওয়া ঠেলে ফেলে দেবার চেষ্টা করছে সাহেবকে—কিন্তু এত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও সাহেব অটল, তাঁকে যেতে হবেই। জনাই গ্রামের স্কুল দেখতে যাবার কথা আজ। সেখানে গ্রামের সবাই অপেক্ষা করছে কখন তিনি আসবেন। শেষ পর্যন্ত জল-ঝড় অগ্রাহ্য করে সাহেব জনাই এসে হাজির হলেন। সবাই অবাক। এই ঝড়-জলের মধ্যে সাহেব এলেন কি করে? সাহেব তাদের প্রশ্নের উত্তরে বললেন: বাঃ, কথা দিয়েছি যে। তারপর সেই ভিজে জামা-কাপড় পরেই তিনি মহা উৎসাহে স্কুল দেখতে লাগলেন। তাঁর চোখ দু'টো আনন্দে জল জল করে উঠলো—এখানে ছেলেরা পড়বে, মানুষ হবে তারা—ভাবতে তাঁর কী আনন্দ। বললেন: কী যে খুশী হলাম তোমাদের ইস্কুল দেখে। এই সাহেব হলেন—ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুন। ছেলেদের লেখাপড়ার কথা, মানুষ করে তোলার কথাই শুধু তিনি ভাবতেন না, এই দেশের মেয়েদের কথাও ভাবতেন। সে যুগে যখন স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার ছিল না, তখন তিনি সেই কথাই ভাবতেন দিনরাত। আর তিনি নিজেও ছিলেন মহাপণ্ডিত। ভারতবর্ষে এলেন আইন সচিবের পদ নিয়ে; কিন্তু সরকারী কাজের ভিড়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন নি কোনদিন। ভাল-

বাসলেন এ দেশকে—এই দেশের ছেলেমেয়েদের। বন্ধুত্ব হলো পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে। যেন মণিকাঞ্চন যোগ। দু'জনে মিলে অসীম অধ্যবসায়ে গড়ে তুললেন হিন্দু ফিমেল স্কুল। ঈশ্বরচন্দ্র হলেন স্কুলের সম্পাদক। বেথুন আর বিদ্যাসাগর দু'জনে মিলে বাড়ী বাড়ী ঘুরে সংগ্রহ করলেন ছাত্রী—মেয়েদের লেখাপড়ার রেওয়াজ তখন তো ছিল না। অনেক বাধা-বিপত্তি এলো তাই তাঁদের সামনে—তবু এগিয়ে চললেন তাঁরা। তাঁদের চেষ্টা যে বিফল হয়নি তার প্রমাণ আজ শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের অগ্রগতি। সেদিন অনেকখানি আশা নিয়ে বেথুন সাহেব মেয়েদের জন্য ইস্কুলটির ভিত্তি স্থাপন করলেন। সেদিন এই উপলক্ষে তিনি বলেছিলেন—"যেখানে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি, সেইখানে আমি প্রতিষ্ঠা করবো হিন্দু মেয়েদের জন্য বিদ্যালয়—ভগবানের আশীর্বাদে এই বিদ্যালয় একদিন দেশের মেয়েদের অজ্ঞতা দূর করে, সারা দেশ জুড়ে জেলে দেবে জ্ঞানের অনির্বাণ দীপশিখা।" বেথুন সাহেবের এই আশা সফল হয়েছে—আজ শহরে গ্রামে ক্রমবর্ধমান-সংখ্যায় বেড়ে চলেছে মেয়েদের শিক্ষা কেন্দ্র—শিক্ষা ক্ষেত্রে মেয়েদের অগ্রগতি। এ দেশের সঙ্গে যাঁর নাড়ীর যোগ ছিল না, পেশা ছিল সরকারী চাকরী, অথচ কতখানি ভালবাসা ছিল তাঁর অন্তরে আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য—এ থেকে তোমরা তার প্রমাণ পাবে।

এঁরা হলেন মানবপ্রেমিক—এঁদের ভালোবাসা দেশ-কালের গণ্ডীর ধার ধারে না—জাতি-ধর্মের ভেদ এঁরা মানেন না, এরা হলেন মানবতার পূজারী, তাই মানুষের সেবায় এঁরা উৎসর্গ করেছিলেন নিজেদের। সেই যে ঝড়-বাদলের দিনে বেথুম সাহেব জনাই গেলেন—সেখান থেকে ফিরে আসার পরই তিনি জ্বরে শয্যাশায়ী হলেন। সেই জ্বর আর ছাড়লো না—এ দেশের মাটিতেই ত্যাগ করলেন তিনি তাঁর শেষ নিঃশ্বাস। তাঁর মৃত্যুর ব্যথা সবচেয়ে বেশী বেজেছিল তাঁর বন্ধু ও সহকর্মী বিদ্যাসাগরের বুকে। বিদ্যাসাগর ছিলেন পুরুষসিংহ—তবু সেদিন তাঁর দু'চোখ বেয়ে অঝোর ধারায় জল ঝরেছিল। বালকের মত তিনি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলেন। কত বড় বড় খেতাবধারী সরকারী কর্মচারী আমাদের দেশে এসেছেন, কত দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল তাঁদের—তাঁদের অনেকের কথাই আমাদের মনে নেই—কিন্তু ভুলতে পারিনি আমরা ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুনকে—ভুলতে পারবোও না কোনদিন। এই মহাপ্রাণ বিদেশীর কাছে আমাদের ঋণ কোনদিন শোধ হবে না, তাঁর স্মৃতি-বিজড়িত বেথুনের সুউচ্চ অট্টালিকায় আজ মেয়েরা নিজেদের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে মাথা উঁচু করে বেরিয়ে আসছে—নমস্কার করি তাঁকে।

নতুন বছরে আবার দেখা হবে তোমোদের সকলের সঙ্গে। তোমাদের এই সর্বপুরাতন কাগজটি দীর্ঘদিন ধরে যে আনন্দ দিয়ে আসছে তোমাদের, আশা করি তোমরা তা বিস্মৃত হবে না এবং তার সঙ্গে তোমাদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন না হয়ে নতুন বছরের সঙ্গে আরও নিবিড় হবে।

শুভ-কামনায়— তোমাদের—মধুদি'

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক ১৭ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক প্রভু প্রেস, ৩০ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য: ০·৪৫ পয়সা